বিষাদ-সিন্ধু

মীর মোশাররফ হোসেন

কলিকাতা : ঢাকা : রাজসাহী :

মরহুম মীর মোশাররফ হোসেন

মীর মোশার্‌রফ হোসেনের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ "বিষাদ-সিন্ধু" প্রণেতা মীর মোশার্‌রফ হোসেন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কুমারখালির নিকটবর্ত্তী গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পারিবারিক উপাধি "সৈয়দ"। কিন্তু ইঁহাদের কোন এক পূর্ব্বপুরুষ নবাব-সরকারে চাকরি করিতেন। সেই চাকরীর পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহারা বংশগত-ভাবে "মীর" উপাধি লাভ করেন।

মোশার্‌রফ হোসেনের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রামের জগমোহন নন্দীর পাঠশালায়। এখানে সেকেলে নিয়মে বাংলা-শিক্ষা লাভ করিবার পর মোশার্‌রফ হোসেন আসিলেন কুষ্টিয়ার 'ইংরাজী-বাংলা' স্কুলে। এখানেও বেশীদিন তাঁহার পড়াশুনা চলিল না। অতঃপর পদমদীর নবাব-স্কুলে এক বৎসর পড়িবার পর তিনি—পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন সাহেবের নির্দ্দেশে 'কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে'র ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি সঙ্গীদের সহিত কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন। মৌলভী নাদির হোসেন নামক তাঁহার এক পিতৃবন্ধু চেতলায় বাস করিতেন, ইনি আলিপুরের আমিন ছিলেন। মোশার্‌রফ হোসেন আসিয়া তাঁহার বাসায় উঠিলেন। পিতৃবন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে ও পিতার অনুমতিক্রমে মোশার্‌রফ হোসেন তাঁহার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন।

চেতলায় অবস্থানকালে মৌলভী নাদির হোসেনের প্রথমা কন্যা লতিফুন্নেসার সহিত মোশার্‌রফ হোসেনের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। এই সংবাদ মোশার্‌রফের পিতামাতা অথবা বাড়ীর অন্য কেহ জানিত না। নানা কারণে এই নির্দ্দিষ্ট কন্যার সহিত বিবাহ না দিয়া নাদির হোসেন সাহেব দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মাৎ আজিজুন্নেসার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে এই বিবাহ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। পিতৃবন্ধুর এই আচরণে মোশার্‌রফ হোসেন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। এবং ইহার আট বৎসর পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার এই নব-পরিণীতা স্ত্রীর নাম বিবি কুলসুম। বিবি কুলসুমের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল।

মীর মোশর্‌রফ হোসেন জীবনের অধিকাংশ সময় জমীদারী সেরেস্তায় চাকুরী করিয়াছিলেন। ফরিদপুর নবাব এষ্টেটে দীর্ঘকাল কার্য্য করিবার পর বাংলা ১২৯১ সাল হইতে তিনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমাস্থ গজনভী সাহেবদের দেলতুয়ার এষ্টেটের ম্যানেজার-পদে কার্য্য করিতে থাকেন। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

মীর মোশার্‌রফ হোসেন দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এই সাহিত্য-সেবার মধ্য দিয়াই—দেশ ও সমাজের কাছে তাঁর পরিচয়, সাহিত্যিক হিসাবে লোকে তাঁহাকে চিনিয়াছে, তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছে। তিনি যে সময়ে সাহিত্য-সেবায় হাত দিয়াছিলেন তখন সাহিত্য-সেবীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। কাগজ তখন এখনকার মত প্রচুর পাওয়া যাইত না। ছাপাখানারও সংখ্যা ছিল অতি মুষ্টিমেয়, যে কোন 'প্রেসে' বই ছাপিতে দিয়া গ্রন্থকারকে ধৈর্য্যহারা হইতে হইত। কারণ, মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে বই বাহির করা সহজসাধ্য ছিল না। এমনি সময় মীর মোশার্‌রফ হোসেন সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করেন, তাহাও আবার সুদূর পল্লীতে থাকিয়া। সুতরাং তাঁহাকে কত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া যে সাহিত্যসেবা করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মীর সাহেবের লিখিত পুস্তক-সংখ্যা কম নহে। তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ পঁচিশখানি বইয়ের সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। একমাত্র "বিষাদ-সিন্ধুই" মীর সাহেবকে বাঙলার পাঠক-সমাজের কাছে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। "বিষাদ-সিন্ধু"র 'মহরম পর্ব্ব' বাংলা ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর যথাক্রমে ১২৯৪ সালের ১লা শ্রাবণ 'উদ্ধার পর্ব্ব' এবং ১২৯৭ সালে 'এজিদ-বধ পর্ব্ব' প্রকাশিত হইয়াছিল। "বিষাদ-সিন্ধু" বাহির হইলে সাহিত্য-সমাজে এক তুমুল সাড়া পড়িয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামপ্রাণ গুপ্ত, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি তখনকার সাহিত্যিকগণ মীর সাহেবের সাহিত্য-প্রতিভাকে শত মুখে প্রশংসা করেন। এমন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কোন মোছলমান বই লিখিতে পারেন. মীর সাহেবের "বিষাদ-সিন্ধু" বাহির হইবার পূর্ব্বে এই ধারণা কাহারও ছিল না। পুঁথি সাহিত্যের প্রভাব এড়াইয়া সে যুগে যে সমস্ত মোছলমান সাহিত্যিক প্রাঞ্জল বাঙলা ভাষায় বই লিখিতে আরম্ভ করেন, মীর মোশার্‌রফ হোসেনকে তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী বলা যায়। মীর সাহেব "আজিজুন্নাহার" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। খুব সম্ভব ইহা মোছলেম সমাজের সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা। কোথা হইতে কোন্ সালে ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, দুঃখের বিষয়, বিস্মৃতির আঁধার যবনিকা ভেদ করিয়া এখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মীর সাহেব

'প্রভাকর' 'গ্রামবার্ত্তা' কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রভৃতি তৎকালীন পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

মীর সাহেবের দ্বিতীয় উপাদেয় গ্রন্থ "গাজী মিয়াঁর বস্তানী"। বাংলা ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাসে ৪০০ শত পৃষ্ঠার এই বৃহৎ বইখানি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক বিখ্যাত মোছলমান জমিদার পরিবারের সহিত এই বইয়ের বিষয়বস্তুর নাকি অনেকটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবে গাজী মিয়াঁ যে কে, গ্রন্থকার সে রহস্য গোপন রাখিয়া কাজ উদ্ধার করিয়াছেন। "গাজী মিয়াঁর বস্তানী" উপন্যাসের ছাঁচে লেখা, ইহাতে নাই, এমন জিনিষ ও বিষয় দুর্ল্লভ। পড়িতে পড়িতে মনে হইবে আমাদের সকলকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝি বইখানি লিখিত হইয়াছে, সমস্ত দুর্নীতি এবং অনাচারের বিরুদ্ধে গাজী মিয়াঁ কশাঘাত করিয়াছেন—এই কশা প্রত্যেকের পিঠে পড়িয়াছে। "গাজী মিয়াঁর বস্তানীর" ভাষা, ভাব এবং কাহিনীবিন্যাস-কৌশল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য শিক্ষামূলক বইখানির প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমাজের তীব্র অসন্তোষ বোধ হয় ইহার কারণ।

মীর সাহেবের "গো-জীবন," "উদাসীন পথিকের মনের কথা," "মোসলেম বীরত্ব" "হজরত বেলালের জীবনী" "বিবি কুলসুম" প্রভৃতি পঁচিশখানি পুস্তকের প্রচার আর নাই। তিনি "আমার জীবনী" নামক এক সুবৃহৎ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। ৪১৫ পৃষ্ঠা পূর্ণ ১২ খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয়, এই বইখানিও কোথাও এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মোটকথা—এক "বিষাদ-সিন্ধু"ই মীর সাহেবের সমস্ত প্রতিভা ও সাহিত্য-সাধনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। "বিষাদ-সিন্ধু"র প্রত্যেকটি তরঙ্গ-লহরী আজিও তাঁহার জয়গান করিতেছে।

বাঙ্লা ১৩১৮ সালে মীর মোশার্‌রফ হোসেন পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন।

—প্রকাশক

মুখবন্ধ

চান্দ্র মাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহর্‌রম। হিজরীর ৬১ সালের ৮ই মহর্‌রম তারিখে মদিনাধিপতি হজরত ইমাম হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা-ভূমিতে উপস্থিত হন এবং এজিদ প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। সেই শোচনীয় ঘটনা মহর্‌রম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ঘটনায় মূল কি এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগূঢ় তত্ব বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া "বিষাদ-সিন্ধু" বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। মাদৃশ লোকের পক্ষে তদ্বিষয়ের যথার্থ গৌরব রক্ষার আকাঙ্ক্ষা 'বামনের বিধু-ধারণের আকাঙ্খা' বলিতে হইবে। তবে মহর্‌রমের মূল ঘটনাটি বঙ্গভাষাপ্রিয়—প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ়বন্ধনে বাধ্য হইয়া "বিষাদ-সিন্ধু" মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল। বিজ্ঞমণ্ডলী ইহাতে যদি কোন প্রকার দোষ বিবেচনা করেন, সদয়ভাবে মার্জ্জনা করিবেন।

দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল
হিজরী ১৩০২ সন
বাঙ্গালা ১২৯১ সাল

গ্রন্থকার

উপক্রমণিকা

একদা প্রভু মোহাম্মদ প্রধান শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বর্গীয় প্রধান দূত "জেব্রাইল" আসিয়া তাঁহার নিকট পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আদেশবাক্য কহিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। প্রভু মোহাম্মদ ক্ষণকাল ম্লানমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ভয়াকুল হইলেন। কি কারণে প্রভু এরূপ চিন্তিত হইলেন কেহই তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সবিষাদ নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পবিত্র বদনের মলিন ভাব দেখিয়া সকলের নেত্রই বাষ্প-সলিলে পরিপ্লুত হইল। কিন্তু কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না।

প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা হঠাৎ এরূপ দুঃখিত ও বিষাদিত হইয়া কাঁদিতেছ কেন ?"

শিষ্যগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অগোচর কি আছে ? ঘনাগমে কিম্বা নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হঠাৎ মলিন ভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতিঃ তখন কোথায় থাকে ? আমরা আপনার চির-আজ্ঞাবহ। অকস্মাৎ প্রভুর পবিত্র মুখের মলিন ভাব দেখিয়াই আমাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। যতক্ষণ আপনার সহাস্য আস্যের ঈদৃশ বিসদৃশ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ ততই আমাদের দুঃখবেগ পরিবর্দ্ধিত হইবে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, সামান্য বাতাঘাতে পর্ব্বত কম্পিত হয় নাই। সামান্য বায়ু প্রবাহেও মহাসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই। প্রভো! অনুকম্পা প্রকাশে শীঘ্র ইহার হেতু ব্যক্ত করিয়া অল্পমতি শিষ্যগণকে আশ্বস্ত করুন।"

প্রভু মোহাম্মদ নম্রভাবে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কাহারও সন্তান আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইবে; হাসানকে বিষপান করাইয়া মারিবে এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নিধন করিবে।"

এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ নির্ব্বাক হইলেন। কাহারও মুখে একটিও কথা সরিল না। কণ্ঠ, রসনা ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল। কিছুকাল পরে

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"প্রভুর অবিদিত কিছুই নাই; কাহার সন্তানের দ্বারা এরূপ সাংঘাতিক কার্য্য সংঘটিত হইবে,—শুনিতে পাইলে তাহার প্রতিকারের উপায় করিতে পারি। যদি তাহা ব্যক্ত না করেন, তবে আমরা অদ্যই বিষপান করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিব। যদি তাহাতে পাপগ্রস্ত হইয়া নারকী হইতে হয়, তবে সকলেই অদ্য হইতে আপন আপন পত্নীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করিব। প্রাণ থাকিতে আর স্ত্রী-মুখ দেখিব না, স্ত্রীলোকের নামও করিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ বলিলেন, "ভাইসকল! ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বাধা দিতে এ জগতে কাহারও সাধ্য নাই, তাঁহার কলম রদ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তবে তোমরা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা শ্রবণ করিয়া কেন দুঃখিত থাকিবে? নিরপরাধিণী সহধর্ম্মিণীগণের প্রতি শাস্ত্রের বহির্ভূত কার্য্য করিয়া অবলাগণের মনে কেন ব্যথা দিবে? তাহাও ত মহাপাপ! তোমাদের কাহারও মনে দুঃখ হইবে বলিয়াই আমি তাহার মূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। নিতান্ত পক্ষেই যদি শুনিতে বাসনা হইয়া থাকে, বলিতেছি শ্রবণ কর:—"তোমাদের মধ্যে প্রিয়তম মাবিয়ার এক পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র জগতে এজিদ নামে খ্যাত হইবে; সেই এজিদ হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইয়া তাহাদের প্রাণ বধ করাইবে। যদিও মাবিয়া এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই, তথাপি এই অসীম জগদ্বিধান জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নহে, কখনই হইবে না। সেই অব্যক্ত সুকৌশলসম্পন্ন অদ্বিতীয় প্রভুর আদেশ কখনই ব্যর্থ হইবে না।"

মাবিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবিত থাকিতে বিবাহের নাম করিব না; নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনও স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্তও দেখিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "প্রিয় মাবিয়া, ঈশ্বরের কার্য্য! তোমার মত ঈশ্বরভক্ত লোকের এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তাঁহার মহিমার পার নাই, ক্ষমতার সীমা নাই, কৌশলের অন্ত নাই।" এই সকল কথার পর সকলেই আপন আপন বাটিতে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ* লইয়াছেন। সেই

* কুলুখ—ঢিল, জলের পরিবর্ত্তে ঢিল ব্যবহার করা শাস্ত্রসঙ্গত

কুলুখ এমন অসাধারণ বিষসংযুক্ত ছিল যে, তিনি বিষের যন্ত্রণায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে দিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বন্ধুবান্ধব সকলের কর্ণেই মাবিয়ার পীড়ার সংবাদ গেল। অনেকরূপ চিকিৎসা হইল; কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই যন্ত্রণার হ্রাস হইল না। মাবিয়ার জীবনের আশায় সকলেই নিরাশ হইলেন। ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয় প্রভু মোহাম্মদের কর্ণগোচর হইলে তিনি মহাব্যস্তে মাবিয়ার নিকট আসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া বিষসংযুক্ত স্থানে ফুৎকার প্রদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময় স্বর্গীয় দূত আসিয়া বলিলেন, "হে মোহাম্মদ! কি করিতেছ? সাবধান! ঈশ্বরের নাম করিয়া মন্ত্র পূত করিও না। এ সকল ঈশ্বরের লীলা। তোমার মন্ত্রে মাবিয়া কখনই আরোগ্য লাভ করিবে না। সাবধান!—ইহার সমুচিত ঔষধ স্ত্রী-সহবাস। স্ত্রী-সহবাস মাত্রেই মাবিয়া বিষম বিষযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। উহা ব্যতীত এ বিষ নিবারণের ঔষধ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।" এই বলিয়া স্বর্গীয় দূত অন্তর্দ্ধান হইলেন।

প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এ রোগের ঔষধ নাই। ইহজগতে ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা নাই। একমাত্র উপায় স্ত্রী-সহবাস। যদি মাবিয়া স্ত্রী-সহবাস করিতে সম্মত হয়, তবেই তার প্রাণরক্ষা হইতে পারে।"

মাবিয়া স্ত্রী-সহবাসে অসম্মত হইলেন। আত্মহত্যা মহাপাপ—প্রভু কর্ত্তৃক এই উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাব্যস্ত হইল যে, অশীতিবর্ষীয়া কোন বৃদ্ধা স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিবেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। বিষম রোগ হইতে মাবিয়া মুক্ত হইলেন ও তাঁহার জীবন রক্ষা হইল।

অসীম করুণাময় পরমেশ্বরের কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া উঠা মানব-প্রকৃতির সাধ্য নহে। সেই অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা স্ত্রী কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। মাবিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যদি পুত্র হয়, তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। কিন্তু সুকোমল বদনমণ্ডলের প্রতি একবার নয়ন-পাত করিবামাত্রই বৈরীভাব অন্তর হইতে তিরোহিত হইল। হৃদয়ে সুমধুর বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইয়া

তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিল। তখন পুত্রের প্রাণহরণ করিবেন কি, নিজেই পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত! আপন প্রাণ অপেক্ষাও তিনি এজিদ্‌কে অধিক ভালবাসিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সময়ে সময়ে সেই নিদারুণ হৃদয়বিদারক বাক্য মনে করিয়া তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইতেন। কিছুদিন পরে মাবিয়া দামেস্ক নগরে স্থায়িরূপে বাস করিবার বাসনা প্রভু মোহাম্মদ ও মাননীয় আলীর নিকটে প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "এজিদের কথা আমি ভুলি নাই। হাসান-হোসেনের নিকট হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার অভিলাষেই আমি মদিনা পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি।"

মাননীয় আলী সরল ও সন্তুষ্টচিত্তে জ্ঞাতি-ভ্রাতা মাবিয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া নিজ অধিকৃত দামেস্ক নগর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "মাবিয়া! দামেস্ক কেন, এই জগৎ হইতে অন্য জগতে গেলেও ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন হইবে না।"

মাবিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না! অল্প দিবস মধ্যে তিনি সপরিবারে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া দামেস্ক নগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রজাপালন ও ঈশ্বরের উপাসনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভু মোহাম্মদ হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিয়ল-আউওয়াল সোমবার বেলা ৭ম ঘটিকার সময় পবিত্রভূমি মদিনায় পবিত্র দেহ রাখিয়া স্বর্গবাসী হইলেন। প্রভুর দেহত্যাগের ছয় মাস পরে বিবি ফাতেমা (প্রভু-কন্যা, হাসান-হোসেনের জননী, মহাবীর আলীর সহধর্ম্মিণী) হিজরী ১১ সনে পুত্র ও স্বামী রাখিয়া জান্নাতবাসিনী* হইলেন। মহাবীর আলী হিজরী ৪০ সনের রমজান মাসের চতুর্থ দিবস রবিবার দেহত্যাগ করেন। তৎপরেই মহামান্য এমাম হাসান মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। দামেস্ক নগরে এজিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরবর্ণিত ঘটনা আরম্ভ হইল।

* জান্নাত—স্বর্গ
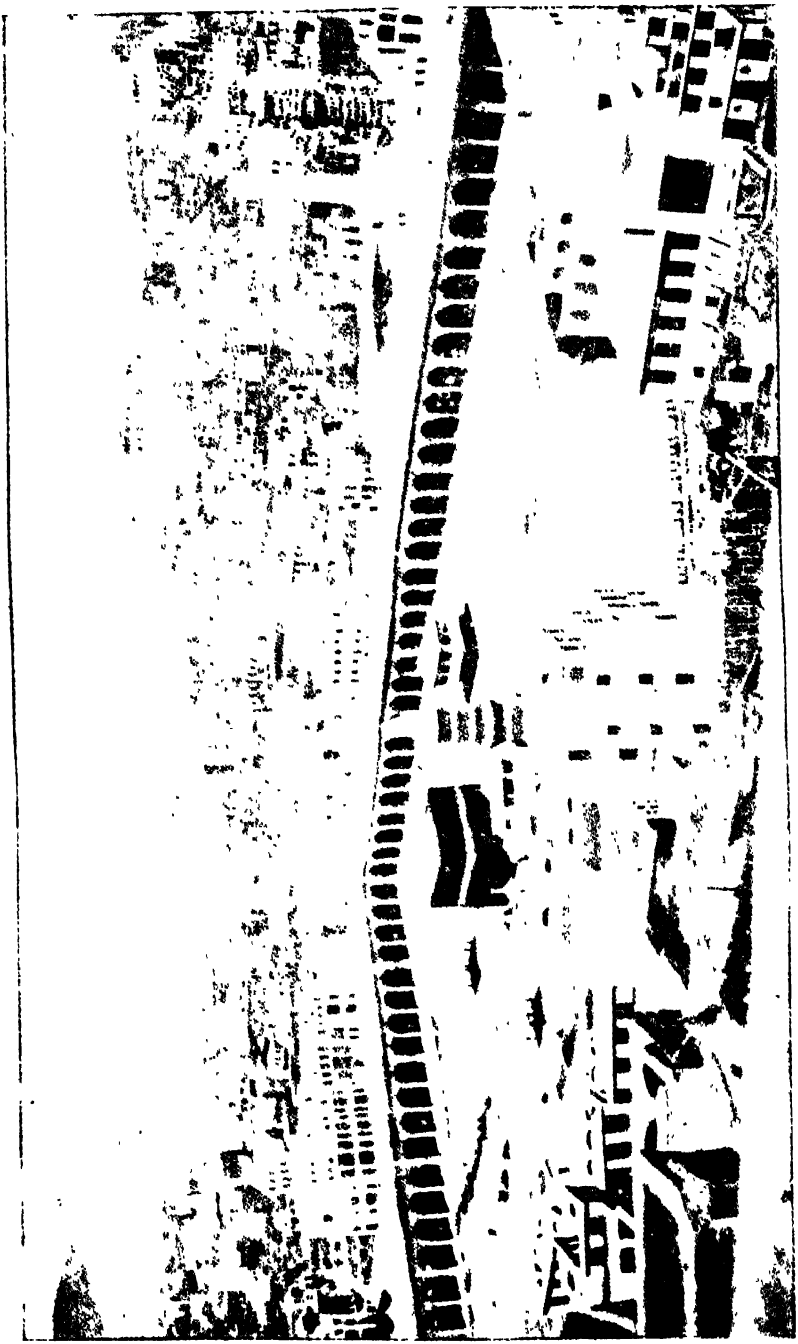
মক্কা শরীফের দৃশ্য

মহরম পর্ব্ব

প্রথম প্রবাহ

"তুমি আমার একমাত্র পুত্র। এই অতুল বিভব, সুবিস্তৃত রাজ্য এবং অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সকলই তোমার। দামেস্করাজমুকুট অচিরে তোমারই শিরে শোভা পাইবে। তুমি এই রাজ্যের কোটি কোটি প্রজার অধীশ্বর হইয়া তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন এবং জাতীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া সর্ব্বত্র পূজিত এবং সকলের আদৃত হইবে। বল ত, তোমার কিসের অভাব? কি মনস্তাপ? আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি সর্ব্বদাই মলিনভাবে বিষাদিত চিত্তে বিকৃতমনার ন্যায় অযথা চিন্তায় অযথা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতেছ। সময়ে সময়ে যেন একেবারে বিষাদ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া জগতের সমুদয় আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবিনাশে প্রস্তুত হইতেছ—ইহারই বা কারণ কি? আমি পিতা, আমার নিকট কিছুই গোপন করিও না। মনের কথা অপকটে প্রকাশ কর। যদি অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, ধনভাণ্ডার কাহার জন্য? যদি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বাসনা হইয়া থাকে—বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে মহামূল্য রাজবেশে সুসজ্জিত করাইয়া রাজমুকুট তোমার শিরে অর্পণ করাইতেছি—এখনই তোমাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইতেছি। আমি স্বচক্ষে তোমাকে রাজকার্য্যে নিয়োজিত দেখিয়া নশ্বর বিশ্ব-সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলে তাহা অপেক্ষা ঐহিকের সুখ আর কি আছে? তুমি আমার একমাত্র পুত্ররত্ন। অধিক আর কি বলিব—তুমি আমার অন্ধের যষ্ঠি, নয়নের

পুত্তলী, মস্তকের অমূল্য মণি, হৃদয়ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন, জীবনের জীবনী-শক্তি, আশা-তরু অসময়ে মঞ্জুরিত, আশা-মুকুল অসময়ে মুকুলিত, আশা-কুসুম অসময়ে প্রস্ফুটিত। বাছা, সদা-সর্ব্বদাই তোমার মলিন মুখ ও বিমর্ষ ভাব দেখিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়াছি, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মনের কথা অকপটে আমার নিকট প্রকাশ কর। আমি পিতা হইয়া মনের বেদনায় আজ তোমার হস্তধারণ করিয়া বলিতেছি, সকল কথা মন খুলিয়া আমার নিকট কি জন্য প্রকাশ কর না?" মাবিয়া নির্জ্জনে আগ্রহসহকারে এজিদকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এজিদ্ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিতে অগ্রসর হইয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না; কণ্ঠরোধ হইয়া জিহ্বায় জড়তা আসিল। মায়ায় আসক্তির এমনি শক্তি যে, পিতার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াও মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াও মুক্তহৃদয়ে প্রকৃত মনের কথা পিতাকে বুঝাইতে পারিলেন না। যদিও বহুকষ্টে "জয়" শব্দটি উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু সে শব্দ মাবিয়ার কর্ণগোচর হইল না। কথা যেন নয়নজলেই ভাসিয়া গেল, শব্দটি কেবল জলমাত্রই সার হইল। গণ্ডস্থল হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিষাদ-বারিতে সিক্ত হইতে লাগিল। সেই বিষাদ-বারি-প্রবাহ দর্শন করিয়া অনুতপ্ত মাবিয়া আরও অধিকতর দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। জলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু প্রেমাগ্নি অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রথমে নয়ন দুইটির আশ্রয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে, পরিণামে জলে পরিণত হইয়া স্রোতে বহিতে থাকে। সে জলে হয়ত বাহ্যবহ্নি সহজে নির্ব্বাপিত হইতে পারে; কিন্তু মনের আগুন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ জ্বলিয়া উঠে। এজিদ্ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত এবং রাজ-মুকুটের প্রত্যাশী নহেন, রাজসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষীও নহেন। তিনি যে রত্নের প্রয়াসী, তিনি যে মহামূল্য ধনের প্রত্যাশী, তাহা তাঁহার পিতার মনের অগোচর, বুদ্ধির অগোচর। পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া মাবিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। শেষে অশ্রুসম্বরণে অক্ষম হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "এজিদ্! তোমার মনের কথা খুলিয়া

আমার নিকট ব্যক্ত কর। অর্থে হউক বা সামর্থ্যে হউক, বুদ্ধিকৌশলে হউক, যে কোন প্রকারেই হউক, তোমার মনের আশা আমি পূর্ণ করিবই করিব। তুমি আমার যত্নের রত্ন, অদ্বিতীয় স্নেহাধার। তুমি পাগলের ন্যায় হতবুদ্ধি, অবিবেকের ন্যায় সংসারবর্জ্জিত হইয়া পিতামাতাকে অসীম দুঃখসাগরে ভাসাইবে, বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বেড়াইয়া বেড়াইয়া অমূল্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে হয়ত কোন দিন আত্মঘাতী হইয়া এই কিশোর বয়সে মৃত্তিকাশায়ী হইবে, ইহা ভাবিয়া আমার প্রাণ নিত্যই আকুল হইতেছে; কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। জীবন যেন দেহ ছাড়িয়া যাই যাই করিতেছে, প্রাণ-পাখী যেন দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়ি উড়ি করিতেছে। বল দেখি, বৎস! কোন্ প্রাণে মাবিয়া তোমার মৃতদেহে শেষ বসন (কাফন) পরাইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে?”

এজিদ্ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, “পিতঃ! আমার দুঃখ অনন্ত। এ দুঃখের সীমা নাই, উপশমের উপায় নাই। আমি নিরুপায় হইয়াই জগতের আশা হইতে একেবারে বহুদূরে দাঁড়াইয়া আছি। আমার বিষয়-বিভব, ধনজন, ক্ষমতা, সমস্তই অতুল তাহা আমি জানি। আমি অবোধ নই; কিন্তু আমার অন্তর যে মোহিনী-মূর্ত্তির সুতীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইতেছে, সে বেদনার উপশম নাই। পিতঃ! সে বেদনার প্রতিকারের উপায় নাই। যদি থাকিত, তবে বলিতাম। আর বলিতে পারি না। এতদিন অতি গোপনে মনে মনে রাখিয়াছিলাম, আজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মনের কথা যতদূর সাধ্য বলিলাম। আর বলিবার সাধ্য নাই। হয় দেখিবেন, না হয় শুনিবেন, —এজিদ্ বিষপান করিয়া যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশা নাই, অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন কোন নির্জ্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্রধামে চলিয়া গিয়াছে। আর অধিক বলিতে পারিতেছি না, ক্ষমা করিবেন।” এই কথা শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধা মহিষী একগাছি সুবর্ণ যষ্টি-আশ্রয়ে ঐ নির্জ্জন গৃহমধ্যে আসিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এজিদ্ শশব্যস্তে উঠিয়া জননীর পদচুম্বন করিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণান্তর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দামেস্কাধিপতি মহিষীকে অভ্যর্থনা করিয়া অতি যত্নে মস্নদের* পার্শ্বে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহিষি! তোমার কথাক্রমে আজ বহু যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না; মনের কথা কিছুতেই ভাঙ্গিল না। পরিশেষে আপনিও কাঁদিল, আমাকেও কাঁদাইল! সে রাজ্যধনের ভিখারী নহে, অবিনশ্বর ঐশ্বর্য্যের ভিখারী নহে; কেবল এই মাত্র বলিল যে, আমার আশা পূর্ণ হইবার নহে। আর শেষে যাহা বলিল তাহা মুখে আনা যায় না; বোধ হইতেছে, যেন কোন মায়াবিনী মোহিনীর মোহনীয় রূপে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ মোহময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

রাজমহিষী অতি কষ্টে মস্তক উত্তোলন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি অনেক সন্ধানে জানিয়াছি, আর এজিদ্‌ও আমার নিকটে আভাসে বলিয়াছে;—আবদুল জব্বারকে বোধ হয় জানেন?"

মাবিয়া কহিলেন, "তাহাকে ত অনেক দিন হইতে জানি।"

"সেই আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম জয়নাব।"

হাঁ হাঁ ঠিক হইয়াছে! আমার সঙ্গে কথা কহিবার সময় 'জয়' পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারে নাই।" একটু অগ্রসর হইয়া মাবিয়া আবার কহিলেন, হাঁ! সেই জয়নাব কি?"

আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই জয়নাবকে দেখিয়াই ত এজিদ্ পাগল হইয়াছে। আমার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, মা! যদি আমি জয়নাবকে না পাই, তবে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না, নিশ্চয়ই জানাজাক্ষেত্রে†কাফনবস্ত্রের তাবুতাসনে ধরাশায়ী দেখিবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহিষী পুনরায় কহিলেন, "আমার এজিদ যদি না বাঁচিল, তবে আর এই জীবনে ও বৃথা ধনে ফল কি?"

যেন একটু সরোষে মাবিয়া কহিলেন, "মহিষি! তুমি আমাকে কি করিতে বল?"

"আমি কি করিতে বলিব? যাহাতে এজিদের প্রাণরক্ষা হয় তাহারই

---

*মস্নদ পারস্য শব্দ। অনেকে যে মসনন্দ শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম।
† জানাজা—মৃত শরীরের সদ্গতির উপাসনা।

উপায় করুন। আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমার সাধ্যই বা কি কথাই বা কি ?’

মাবিয়া রোষভরে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, বৃদ্ধা মহিষী হস্ত ধরিবামাত্র অমনি বসিয়া পড়িলেন ও বলিতে লাগিলেন, “পাপী আর নারকীরা ওকার্য্যে যোগ দিবে। আমি ওকথা আর শুনিতে চাই না। তুমি আর ওকথা বলিয়া আমার কর্ণকে কলুষিত করিও না। আপনার জিহ্বাকে ওপাপ কথায় আর অপবিত্র করিও না। ভাবিয়া দেখ দেখি, ধর্ম্ম-পুস্তকের উপদেশ কি ? পর-স্ত্রীর প্রতি কুভাবে যে একবার দৃষ্টি করিবে, কোন প্রকার কুভাবের কথা মনোমধ্যে যে একবার উদিত করিবে, তাহারও প্রধান নরক ‘জাহান্নামে’ বাস হইবে। আর ইহকালের বিচার ত দেখিতে পাইতেছি। লৌহদণ্ড দ্বারা শত আঘাতে পরস্ত্রীহারীর অস্থি চূর্ণ, চর্ম্ম ক্ষয় করিয়া জীবনান্ত করে। ইহা কি একবারও এজিদের মনে হয় না ? প্রজার ধন, প্রাণ, মান, জাতি, এ সমুদয়ের রক্ষাকর্ত্তা রাজা। রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্মই তাহা। এই কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে রাজাকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইতে হয়, পরিণামে নরকের তেজোময় অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মসাৎ হইতে হয়। তাহাতেও নিস্তার নাই। সে ভস্ম হইতে পুনরায় শরীর গঠিত হইয়া পুনরায় শাস্তিভোগ করিতে হয়। এমন গুরু পাপের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, শুনিতেও পাপ। এজিদ আত্মবিনাশ করিতে চায় করুক, তাহাতে দুঃখিত নহি। এমন শত এজিদ—শত কেন সহস্র এজিদ এই কারণে প্রাণত্যাগ করিলেও মাবিয়ার চক্ষে এক বিন্দু জল পড়া ত দূরে থাকুক, বরং সন্তুষ্ট হৃদয়ে সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। একটি পাপী জগৎ হইতে বহিষ্কৃত হইল বলিয়া ঈশ্বরের সমীপে এই মাবিয়া সেই জগৎ-পিতার নামে সহস্র সহস্র সাধুবাদ সমর্পণ করিবে। পুত্রের উপরোধে, কি তাহার প্রাণরক্ষার কারণে ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া মাবিয়া কি মহাপাপী হইবে, তুমি কি ইহাই মনে কর, মহিষি ? আমার প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না, মাবিয়া জগতে থাকিতে তাহা ঘটিবে না, কখনই না।”

বৃদ্ধা মহিষী একটু অগ্রসর হইয়া মহারাজের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, “দেখুন মহারাজ ! এজিদ যে ফাঁদে পড়িয়াছে,

সে ফাঁদে জগতের অনেক ভাল লোক বাঁধা পড়িয়াছেন। শত শত মুনি-ঋষি, ঈশ্বরভক্ত কত শত মহাতেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাশক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ এই ফাঁদে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আসক্তি, প্রেম ও ভালবাসার কথা ধর্ম্মপুস্তকেও রহিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, মানুষের মনেই ভালবাসার জন্ম; ইহাকে শিক্ষা দিতে হয় না, দেখাদেখিও কেহ শিক্ষা করে না, ভালবাসা স্বভাবতঃই জন্মে। বাদশা নামদার! ইহাতে নূতন কিছুই নাই। আপনি যদি মনোযোগ দিয়া শুনেন, তবে আমি এই প্রণয়প্রসঙ্গ অনেক শুনাইতে পারি, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেও পারি। জগতে শত শত ভালবাসার জন্ম হইয়াছে, অনেকেই ভালবাসিয়াছে, তাহাদের কীর্ত্তি-কলাপ আজ পর্য্যন্ত কেন, জগৎ বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত মানবহৃদয়ে সমভাবে অঙ্কিত থাকিবে। বলিবেন, পাত্রাপাত্র বিবেচনা চাই। ভালবাসারূপ সমুদ্র যখন হৃদয়াকাশে মানসচন্দ্রের আকর্ষণে স্ফীত হইয়া উঠে, তখন আর পাত্রা-পাত্র জ্ঞান থাকে না। পিতা, মাতা, সংসার, ধর্ম্ম, এমন কি ঈশ্বরকেও মনে থাকে কিনা সন্দেহ। ইহাতে এজিদের দোষ কি বলুন দেখি? এই নৈসর্গিক্ কার্য্য নিবারণ করিতে এজিদের কি ক্ষমতা আছে? না, আমার ক্ষমতা আছে? না, আপনারই ক্ষমতা আছে? যাহাই বলুন মহারাজ! ভালবাসার ক্ষমতা অসীম।"

মাবিয়া বলিলেন, "আমি কি ভালবাসার দোষ দিতেছি? ভালবাসা ত ভাল কথা। মানব-শরীর ধারণ করিয়া যাহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই, সে কি মানুষ? প্রেমশূন্য হৃদয় কি হৃদয়? এজিদের ভালবাসা ত সেরূপ ভালবাসা নয়। তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই।" মহিষী কহিলেন, "আমি বুঝিয়াছি, আপনি বুঝিতে পারেন নাই। দেখুন মহারাজ, আমার এই অবস্থাতেই ঈশ্বর সদয় হইয়া পুত্র দিয়াছেন। এ জগতে সংসারী মাত্রেই পুত্র কামনা করিয়া থাকে। বিষয়-বিভব ধন-সম্পত্তি অনেকেরই আছে; কিন্তু উপযুক্ত পুত্ররত্ন [illegible]ার ভাগ্যে কয়টি ফলে বলুন দেখি? পুত্রকামনায় লোকে কি না করে? [illegible]শ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরভক্ত এবং ঈশ্বরপ্রেমিক লোকের অনুগ্রহের প্রত্যাশা, যথাসাধ্য দীনদুঃখীর ভরণপোষণে সাহায্য প্রভৃতি যত প্রকার সৎকার্য্যে মনের

আনন্দ জন্মে, সন্তান কামনায় লোকে তাহা সকলই করিয়া থাকে। আপনি ঈশ্বরের নিকট কামনা করিয়া পুত্রধন লাভ করেন নাই। আমিও পুত্রলাভের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া এই শোণিতবিন্দু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি নাই। দয়াময় ভগবানের প্রসাদে অযাচিত এবং বিনাযত্নে আমরা উভয়ে এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছি। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে হয়। যে এজিদের মুখ এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হন, যে এজিদকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়াও আপনার দেখিবার সাধ মিটে না, অন্তর দিয়া আপনি কি তাহার অমঙ্গল কামনা করিতে পারেন? আমি ত সকলই জানি; কোন সময়ে এই এজিদকে প্রাণে মারিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা পারিলেন কৈ? ঐ মুখ দেখিয়াই ত হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল! অস্ত্রাঘাতে পুত্রের প্রাণবধ সঙ্কল্প সাধন দূরে থাকুক, ক্রোড়ে লইয়া শত শত বার মুখচুম্বন করিয়াও মনের সাধ মিটাইতে পারেন নাই।"

মাবিয়া বলিলেন, "আমাকে তুমি কি করিতে বল?"

মহিষী বলিলেন, "আর কি করিতে বলিব? যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায়, লোকের নিকটে নিন্দনীয় না হইতে হয়, অথচ এজিদের প্রাণরক্ষা হয়, এমন কোন উপায় অবলম্বন করাই উচিত।"

"উচিত বটে, কিন্তু উপায় আসিতেছে না। মূল কথা, যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায়, ধর্ম্মোপদেষ্টার আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়, অথচ প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষা হয়, ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল। লোকনিন্দার ভয় কি? যে মুখে লোকে একবার নিন্দা করে, সে মুখে সুখ্যাতির গুণগান করাইতে কতক্ষণ লাগে?"

মহিষী বলিলেন, "আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, কিছু বলিতেও হইবে না; কিন্তু কোন কার্য্যে বাধা দিতেও পারিবেন না। মারওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই আমি সকল কার্য্য করিব। যেখানে ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ধর্ম্মের অবমাননা, কি ধর্ম্মোপদেষ্টার আজ্ঞালঙ্ঘনের অণুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতে পান, বাধা দিবেন, আমরা ক্ষান্ত হইব।"

মহারাজ মহাসন্তোষে হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তাহা যদি পার, তবে ইহা অপেক্ষা সন্তোষের বিষয় আর কি আছে? এজিদের অবস্থা দেখিয়া

আমার মনে যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। যদি সকল দিক রক্ষা করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে পার, তবেই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল, এজিদও প্রাণে বাঁচে, আমিও নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর-উপাসনা করিতে পারি।”

শেষ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা মহিষী অনুকূলভাবে বিজ্ঞাপনসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তখন তাঁহার মনে যে কথা ছিল, রসনা তাহা প্রকাশ করিল না। আকার-ইঙ্গিতে পতিবাক্যে সায় দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মৌন যেন কথা কহিয়া কহিল, ‘এই সংকল্পই স্থির’।

দ্বিতীয় প্রবাহ

মহারাজের সহিত মহিষীর পরামর্শ হইল। এজিদও কথার সূত্র পাইয়া তাহাতে নানা প্রকার শাখাপ্রশাখা বাহির করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত আবদুল জব্বারের নিকট ‘কাসেদ’ প্রেরণ করিলেন।

পাঠক! কাসেদ যদিও বার্ত্তাবহ, কিন্তু বঙ্গদেশীয় ডাকহরকরা, কি পত্রবাহক মনে করিবেন না। রাজপত্র-বাহক, অথচ সভ্য ও বিচক্ষণ—মহামতি মুসলমান লেখকগণ ইহাকেই ‘কাসেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কাসেদের পরিচ্ছদ সভ্যতাবর্জ্জিত নহে। সুধীর, সুগম্ভীর, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, সুশ্রী না হইলে কেহ কাসেদ-পদে বরিত হইতে পারে না। তবে দূতে ও ‘কাসেদে’ অতি সামান্য প্রভেদ মাত্র, ‘কাসেদ’ দূতের সমতুল্য মাননীয় নহে। বিশেষভাবে মনোনীত করিয়াই আবদুল জব্বারের নিকট কাসেদ প্রেরিত হইয়াছিল। আবদুল জব্বার ভদ্রবংশসম্ভূত, অবস্থাও মন্দ নহে, স্বচ্ছন্দে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন; তজ্জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইত না। কিন্তু তাঁহার ধনলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিসে দশ টাকা উপার্জ্জন করিবেন, কি উপায়ে নিজ অবস্থার উন্নতি করিবেন, কি কৌশলে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, এই চিন্তাই সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। তাঁহার একমাত্র স্ত্রী জয়নাব স্বামীর অবস্থাতেই পরিতৃপ্তা

ছিলেন, কোন বিষয়েই তাঁহার উচ্চ আশা ছিল না। যে অবস্থাতেই হউক, সতীত্বধর্ম্ম পালন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ধর্ম্ম-চিন্তাতেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। আবদুল জব্বার সুশ্রী পুরুষ না হইলেও তাঁহার প্রতি তিনি ভক্তিমতী ছিলেন। স্বামীপদ-সেবা করাই স্বর্গলাভের সুপ্রশস্ত পথ, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। লৌকিক সুখে তিনি সুখী হইতে ইচ্ছা করিতেন না, ভালও বাসিতেন না; ভ্রমেও ধর্ম্মপথ হইতে এক পদ বিচলিত হইতেন না। আবদুল জব্বার নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সময়ে সময়ে এজিদের ঐশ্বর্য্য ও এজিদের রূপলাবণ্যের ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতে সতী-সাধ্বী জয়নাব মনে মনে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইতেন। নিতান্ত অসহ্য হইলে বলিতেন,—"ঈশ্বর যে অবস্থায় যাহাকে রাখিয়াছেন তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া কায়মনে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। পরের ধন, পরের রূপ দেখিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। দেখুন, জগতে কত লোক যে, আপনার অপেক্ষা দুঃখী ও পর-প্রত্যাশী আছে, তাহা গণনা করা যায় না। ঈশ্বরের বিবেচনা অসীম। মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার বিবেচনায় দোষার্পণ করিতে পারে? তবে অজ্ঞ মনুষ্যগণ না বুঝিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু তিনি এমনি মহান, এমনি বিবেচক, যাহার যাহা সম্ভবে, যে যাহা রক্ষা করিতে পারিবে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় তিনি কাহাকেও কোন বিষয়ে বঞ্চিত করেন না। কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার গুণানুবাদ করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

স্ত্রীর কথায় আবদুর জব্বার কোন উত্তর করিতেন না, কিন্তু কথাগুলি বড় ভাল বোধ হইত না। তাঁহার মত এই যে, ধনসম্পত্তিশালী না হইলে জগতে সুখী হওয়া যাইতে পারে না; সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই অর্থ-চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে যখন যাহা সুবিধা মনে করিতেন তখন তাহাই অবলম্বন করিতেন। নিকটস্থ বাজারে অন্যান্য ব্যবসায়ি-গণের নিকট প্রায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনের পথ

অনুসন্ধান করিতেন, কেবল আহারের সময় বাটী আসিতেন; আহার করিয়া পুনরায় কার্য্যস্থানে গমন করিতেন। আজ জয়নাব স্বামীর আহারীয় আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিলেন এবং স্বামীর সম্মুখে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিয়া স্বহস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন। স্বামী যাহাতে সুখে আহার করিতে পারেন, সে পক্ষে সেই সাধ্বী সতী পরম যত্নবতী। একে উত্তপ্ত প্রদেশ, তাহাতে জ্বলন্ত অনলের উত্তাপ, এই উভয় তাপে জয়নাবের মুখখানি রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ললাটে ও নাসিকার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু শোভা পাইতেছে। গণ্ডদেশ বহিয়া বুকের বসন পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। পৃষ্ঠবসনের ত কথাই নাই, এত ভিজিয়াছে যে, সে সিক্তবাস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশের সুদৃশ্য কান্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পরিহিত বস্ত্রের স্থানে স্থানে কালির চিহ্ন। এই সকল দেখিয়া আবদুল জব্বার বলিলেন, "তুমি যে বল, ঈশ্বর যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; কিন্তু তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমি কি প্রকারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, বল দেখি? আমি যদি ধনবান হইতাম, আমার যদি কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে তোমার এত কষ্ট কখনই হইত না। স্থানবিশেষে, পাত্রবিশেষে ঈশ্বরের বিবেচনা নাই, এইটিই বড় দুঃখের বিষয়। তোমার এই শরীর কি আগুনের উত্তাপ সহনের যোগ্য? এই শরীরে কি এত পরিশ্রম সহ্য হয়? দেখ দেখি, এই দর্পণখানিতে মুখখানি একবার দেখ দেখি, কিরূপ দেখাইতেছে।"

আবদুল জব্বার এই কথা বলিয়া বাম হস্তে একখানি দর্পণ লইয়া স্ত্রীর মুখের কাছে ধরিলেন। জয়নাব তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া দর্পণখানি গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশন-স্থানের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। গম্ভীর বদনে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের কার্য্য কি?"

আবদুল জব্বার বলিলেন, "তাহা আমি জানি। আমার অবস্থা ভাল হইলে আমি অসংখ্য দাসদাসী রাখিয়া দিতাম; তাহারা সকল কার্য্য করিত। তোমাকে এত পরিশ্রম, এত কষ্ট কখনই সহ্য করিতে হইত না।"

জয়নাব বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন, আমি তাহাতে সুখী হইতাম

না। আপনি বোঁধ হয় স্থির করিয়াছেন যে, যাহাদের অনেক দাস-দাসী আছে, মণিমুক্তার অলঙ্কার আছে, বহুমূল্য বস্ত্রাদি আছে, তাহারাই জগতে সুখী—তাহা মনে করিবেন না; মনের সুখই যথার্থ সুখ।"

আবদুল জব্বার বলিলেন, "ও কোন কথাই নহে। টাকা থাকিলে সুখের অভাব কি? আমি যদি এজিদের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতাম, তোমাকে কত সুখে রাখিতাম, তাহা আমি জানি আর আমার মনই জানে। ঈশ্বর টাকা দেন নাই, কি করিব, মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল।"

গম্ভীর বদনে জয়নাব কহিলেন, "ও কথা বলিবেন না। শাহ্‌জাদা এজিদের ন্যায় আপনি ক্ষমতাবান বা ধনবান হইলে আমার ন্যায় কুশ্রী স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা জন্মিত না। আপনারই নয়ন আমাকে দেখিয়া ঘৃণা করিত। ঈশ্বরের সৃষ্টি অতি বিচিত্র! কাহাকেও তিনি সীমাবিশিষ্ট করিয়া রূপবতী করেন নাই। উচ্চাসনে বসিলে আপনার মন সেইরূপ উচ্চরূপেই মোহিত হইত। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের মনের পরীক্ষা হয়।"

"অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেই কি প্রণয়, মায়া, মমতা, ভদ্রতা ও সুহৃদ-ভাবের পরিবর্ত্তন হয়?"

"হীন অবস্থার পরিবর্ত্তনে অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন হয়,—কিছু কেন? প্রায়ই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। চারিদিকে চাহিলেই অনেক দেখিতে পাইবেন। যাহারা ধনপিপাসু, অর্থকেই যাহারা ইহকাল-পরকালের সুখসাধন মনে করে, অর্থলোভে অতি জঘন্য কার্য্য করিতে তাহারা একটুও চিন্তা করে না, অতি আদরের ও যত্নের ভালবাসা জিনিসটিও অর্থলোভে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না।

কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া আবদুল জব্বার কহিলেন, "এ কথাটা এক প্রকার আমাতেই বর্ত্তিল। তুমি যাহাই বল, জগতের সমুদয় অর্থ, সমুদয় ঐশ্বর্য্য একত্র করিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেও আমি আমার ভালবাসাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। সকলেরই মূল্য আছে, ভালবাসার মূল্য নাই। যখন মূল্য নাই, তখন আর তাহার সঙ্গে অন্য বস্তুর তুলনা কি, কথাই বা কি?"

আবদুল জব্বারের আহার শেষ হইল। রীতিমত হস্তমুখাদি প্রক্ষালন

করিয়া ব্যবসায়ের হিসাবপত্রাদি লইতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইলেন ও যেখানে যাহা রাখিয়াছেন, একে একে সংগ্রহ করিলেন। ব্যবসায়ের সাহায্যকারী অথচ নিকটস্থ আত্মীয় ওস্‌মানের নাম করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখনও আসিল না। আজ অনেক অসুবিধা হইবে। আর কতক্ষণ বিলম্ব করিব ?"—এই কথা বলিয়াই বাটী হইতে যাত্রা করিবেন, এমন সময়ে ওস্‌মান অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, "আবদুল জব্বার ! দামেস্ক হইতে একজন কাসেদ আসিয়াছে—অত্যন্ত ব্যস্ত, অতিশয় পরিশ্রান্ত, অতিশয় ক্লান্ত। সেই লোক তোমাকেই অন্বেষণ করিতেছে, তোমার বাসস্থানের অনুসন্ধান না পাইয়া অনেক ঘুরিয়াছে। শুনিলাম, তাহার নিকট দামেস্কাধিপতির আদেশপত্র আছে।"

ওস্‌মানের মুখে এই কথা শুনিয়া আবদুল জব্বার শশব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিলেন। কাসেদ ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া দামেস্কাধিপতির বন্দনার পর অতি বিনীতভাবে আবদুল জব্বারের হস্তে শাহী-নামা প্রদান করিলেন।

আবদুল জব্বার শত শত বার সেই শাহী-নামা চুম্বন ও মস্তাকোপরি ধারণ করিয়া কাসেদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি শাহীনামা-হস্তেই অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ; তথায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ ভক্তি-সহকারে শাহী-নামাখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত আছে,—

"সম্ভ্রান্ত আবদুল জব্বার !

তোমাকে জানান যাইতেছে যে, দামেস্কাধিপতি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন। অবিলম্বে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রসাদলাভে সৌভাগ্য জ্ঞান কর।

প্রধান উজীর—
মারওয়ান।"

আবদুল জব্বার এতৎপাঠে মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া জয়নাবকে কহিলেন, "আমি এখনই দামেস্কযাত্রা করিব। আমি এমন কি পুণ্য কার্য্য করিয়াছি যে, স্বয়ং বাদশাহ্ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ! ঈশ্বর জানেন, ভবিষ্যতে কি আছে !"

আবদুল জব্বারের এই সংবাদ শ্রবণে প্রতিবেশীরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আবদুল জব্বারের মহাসৌভাগ্য! সকলেই শাহী-নামা মহামান্যে মস্তকোপরি রাখিয়া দামেস্ক-সিংহাসনের গৌরবরক্ষা করিলেন। সকলেই এক-বাক্যে আবদুল জব্বারের গুণানুবাদ করিয়া কহিলেন, "আবদুল জব্বারের কপাল ফিরিল"; সমবয়সীরা বলিতে লাগিল, "ভাই, তুমি ত ভাগ্যগুণে বাদশাহের নিকট পরিচিত হইলে, সম্মানের সহিত রাজদরবারেও আহূত হইলে; আমাদের কথা মনে রাখিও।"

আবদুল জব্বার ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজধানী গমনে উদ্‌যোগী হইলেন। আত্মীয়স্বজন এবং সাধারণ প্রতিবেশিগণের নিকট ও জয়নাবের সমক্ষে তিনি বিনম্রভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শাহী দরবারে গমনোপযোগী যে সকল বসন তাঁহার ছিল, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া বাহক-বাহন-সমভিব্যাহারে দামেস্ক-নগরাভিমুখে গমনার্থ তিনি প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশিবর্গ সহাস্যবদনে তাঁহার প্রশংসাগান কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ব-স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। জয়নাবের চক্ষু দুইটি বাষ্পসলিলে পরিপূর্ণ হইল। মনের উল্লাসে আবদুল জব্বার তৎ-কালে এতদূর বিহ্বল হইলেন যে, যাত্রাকালে প্রিয়তমা জয়নাবকে একটি মনের কথাও বলিয়া যাইতে মনে হইল না; সামান্যতঃ বিদায় গ্রহণ করিয়াই ত্বরিত গতিতে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। পদমর্য্যাদার এমনই কুহক!

তৃতীয় প্রবাহ

এজিদের শিরায় শিরায়, শোণিতবিন্দুর প্রতি পরমাণু-অংশে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, শয়নে, স্বপ্নে, জয়নাব-লাভের চিন্তা অন্তরে অবিরতভাবে রহিয়াছে। কিন্তু সে চিন্তার উপরেও আর একটি চিন্তা মস্তিষ্কমধ্যে ঘুরিতেছে। এক সময়ে এক মনে দুই প্রকারের চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু মূলকার্য্যের কৃতকার্য্যতা-লাভের আশায় অন্য একটি চিন্তা বা কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হওয়া যায়, এরূপ নহে। প্রথম চিন্তায় কৃতকার্য্য হইবার আশাতেই বাহ্যিক চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠে। চিন্তার আধার মস্তক, কিন্তু

ভালবাসার চিন্তাটুকু মস্তকে উদিত হইয়াই একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থান অধিকার করিয়া বসে। তাহা যখনই মনে উদিত হয়, অন্তরে ব্যথা লাগে, হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে, হৃদয়তন্ত্রী বেহাগ রাগে বাজিয়া উঠে। এজিদ আপাততঃ বাহ্য চিন্তাতেই মহাব্যস্ত। কারণ, এই চিন্তার মধ্যে আশা, ভরসা, নিরাশা সকলই রহিয়াছে। কাজেই পূর্ব্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বোধ হইতেছে। এজিদের নয়নে, ললাটে ও মুখশ্রীতে যেন ভিন্ন ভাব অঙ্কিত। দেখিলেই বোধ হয়, যেন কোন দগ্ধীভূত বিকৃত ধাতুর উপরে কিঞ্চিৎ রজতের পাকা গিল্টি হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলেই চাকচিক্যবিশিষ্ট রজতপাত্র বলিয়াই ভ্রম জন্মে, কিন্তু মনোনিবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলে, সমাবৃত বিকৃত ধাতুর পরমাণু অংশ নয়নগোচর হইয়া চাক্‌চিক্যবিশিষ্ট উজ্জ্বলভাব যেন বহু দূরে সরিয়া যায়। পুরবাসিগণ এবং অমাত্যগণ সকলেই রাজপুত্রের তাদৃশ বাহ্যিক প্রসন্নভাব দর্শন করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

মারওয়ান যদিও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু এজিদের বুদ্ধি, বল, সহায়, সাহস ইত্যাদি যত কিছু,—সকলই মারওয়ান। প্রধান মন্ত্রী হামান কেবল রাজ-কার্য্য ব্যতীত সাংসারিক অন্য কোন কার্য্যে মারওয়ানের মতে বাধা দিতে পারিতেন না, কারণ তিনি এজিদের প্রিয়পাত্র। সকল সময়েই সকল বিষয়েই মারওয়ানের সহিত এজিদের পরামর্শ হইত। সে পরামর্শের সময় অসময় ছিল না। কি পরামর্শ, তাহা তাঁহারাই জানিতেন!

মারওয়ান বলিলেন, "রাজকুমার! মহারাজ বর্ত্তমান না থাকিলে আপনাকে কখনই এত কষ্ট পাইতে হইত না।"

এজিদ বলিলেন, "পুত্রের স্বাধীনতা কোথায়? কি করি, পিতা বর্ত্তমানে পিতার অমতে কোন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া পুত্রের পক্ষে অনুচিত। আমি হাসান-হোসেনের ভক্ত নহি, শাহজাদা বলিয়া মান্য করি না; নতশিরে তাহা-দের নামে দণ্ডবৎ করি না; সেইজন্য পিতা মহাবিরক্ত। আবার অন্যায় বিচারে একজনের প্রাণ বধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে সাহস হয় না, ইচ্ছাও করে না। লোকাপবাদ—তাহার পর পরলোকের দণ্ড! আর কেন? মহারাজ যে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতেই ত মনস্কামনা সিদ্ধি—আর কি চাই?

ধর্ম্মবিরুদ্ধ না হইলে কোন কার্য্যে তিনি বাধা দিবেন না; ইহাই যথেষ্ট। যে মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে আর অন্য পথে যাইবার আবশ্যক কি? একটা গুরুতর পাপভার মাথায় বহন করিবারই বা প্রয়োজন কি? নরহত্যা মহাপাপ।"

হঠাৎ সাদিয়ানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এজিদ কহিলেন, "অসময়ে আনন্দ-বাদ্য কি জন্য? বুঝি আবদুল জব্বার আসিয়া থাকিবে।" উভয়ে একটু ত্রস্তভাবে দরবার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি যে যে প্রকার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমস্তই প্রতিপালিত হইয়াছে। কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা হয় নাই। দরবার পর্য্যন্ত গমনপথে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণ এখনও পর্য্যন্ত যথাস্থানে দণ্ডায়মান। তদ্দর্শনে তাঁহারা আরও অধিকতর উৎসাহে দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পথে কাসেদের সহিত দেখা হইল। কাসেদ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, "রাজাদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। আবদুল জব্বার সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন। মহারাজ আম-দরবার বরখাস্ত করিয়া আবদুল জব্বারের সহিত খোশমহলে বার দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া কাসেদ পুনরায় অভিবাদন পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এজিদ মারওয়ানের সহিত আনন্দ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া আবদুল জব্বারের সহিত মহারাজের কথোপকথন শুনিবার অপেক্ষায় উৎসুক রহিলেন।

আবদুল জব্বার বিশেষ সতর্কতার সহিত জাতীয় সভ্যতা রক্ষা করিয়া করজোড়ে মহারাজ সমীপে বসিয়া আছেন। পুত্রের পরামর্শমত এজিদের জননী স্বামীর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, যে প্রকার কথার প্রস্তাব করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, মাবিয়া অবিকল সেইরূপ বলিতে লাগিলেন,—"আবদুল জব্বার! আমার ইচ্ছা, তোমাকে আমি সর্ব্বদা আমার নিকটে রাখি। কোন প্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, তাহাতে সময়ে সময়ে নানা প্রকার চিন্তায় চিন্তিত হইতে হইবে, মন্ত্রিদলের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে। অথচ রাজনীতি-অনুসারে কোন প্রকার পদমর্য্যাদা রক্ষা করা তোমার

পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে। কাজেই সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়ারই সম্ভাবনা। আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে নিশ্চিতভাবে রাজপরিবারের মধ্যে রাখিয়া দিই।”

করজোড়ে আবদুল জব্বার বলিলেন, “আমি দাসানুদাস, আজ্ঞাবহ ভৃত্য; যাহা আদেশ করিবেন, শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিব। আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, আমি আমার আশার অতিরিক্ত আদৃত হইয়া রাজসমীপে উপবেশনের স্থান পাইয়াছি।”

মাবিয়া বলিলেন, “আবদুল জব্বার! আমার মনোগত অভিপ্রায় প্রধান উজীর মারওয়ানের মুখে শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর। আমার উপাসনার সময় অতীতপ্রায়, আমি আজিকার মত বিদায় লইলাম।”

এই বলিয়াই মাবিয়া খোশমহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মন্ত্রী মারওয়ান বাদশাহের প্রতিনিধিস্বরূপ বলিতে লাগিলেন, “মাননীয় আবদুল জব্বার সাহেব! আমাদের ইচ্ছা যে, রাজসংসার হইতে আপনার নিত্য-নিয়মিত রাজোচিত ব্যয়োপযোগী সম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক অদ্বিতীয়া রূপযৌবনসম্পন্না, বহুগুণবতী, নিষ্কলঙ্কচন্দ্রাননা, মহামাননীয়া রাজকুমারী সালেহার সহিত শাস্ত্র-সঙ্গত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এই দামেস্ক নগরে আপনাকে স্থায়ী করি। ইহাতে আপনার মত কি?”

কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবামাত্র আবদুল জব্বার মনের আনন্দে বিভ্রান্ত হইয়া কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। এজিদের ভগ্নী সালেহার পাণিগ্রহণ করিবেন, স্বাধীনভাবে ব্যয়বিধানের জন্য সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? জীবনে যাহা তিনি আশা করেন নাই, স্বপ্ন যে অমূলক চিন্তা, সে স্বপ্নেও কোন দিন যাহা উপদেশ পান নাই, অভাবনীয়-রূপে আজ তাহাই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল! ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন। মন্ত্রিমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আবদুল জব্বার যেন ক্ষণকালের জন্য আত্ম-হারা হইলেন; তখনই সম্মতিসূচক অভিপ্রায় জানাইতেন, কিন্তু হর্ষবিহ্বলতা আশু তাঁহার বাক্‌শক্তি হরণ করিল। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, “মন্ত্রিবর! আমার পরম সৌভাগ্য। রাজাদেশ শিরোধার্য্য।”

মারওয়ান বলিলেন, "আপনার অঙ্গীকারে আমরাও পরমানন্দ লাভ করিলাম। সমস্তই প্রস্তুত, এখনই এই সভায় এই শুভলগ্নে শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হউক।"

পূর্ব্ব হইতেই এজিদ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মারওয়ানকে ইঙ্গিত করিবামাত্র পুরোহিত, অমাত্যবর্গ, পরিজনবর্গ সকলেই একসঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। পুরোহিতের আদেশমত এজিদ পাত্রীপক্ষের প্রতিনিধি সাব্যস্ত হইলেন; মারওয়ান এবং আবদুর রহমান সাক্ষী হইলেন।

এই স্থানে হিন্দু পাঠকগণের নিকট কিছু বলিবার আছে। আমাদের বিবাহ-প্রথা একটু সংক্ষেপে বুঝাইয়া না দিলে, এ উপস্থিত বিবাহ-বিষয় বুঝিতে একটু আয়াস আবশ্যক হইবে। আমাদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পাত্রপক্ষীয় কোন পুরুষ কি স্ত্রীর পাত্রীকে দেখিবার প্রথা নাই।

পাত্র পূর্ণবয়স্ক হইলে পুরোহিতের উপদেশক্রমে, যে দেশে হউক-না, কয়েকটি কথা আরবীয় ভাষায় উচ্চারণ করিতে হয়। পাত্রীপক্ষীয় অভি-ভাবকগণের মনোনীত প্রতিনিধিকে পাত্রের সেই কথাগুলির প্রত্যুত্তরস্বরূপ কয়েকটি কথা বলিতে হয়। বিবাহের মূল কথাই এই—প্রস্তাব আর স্বীকার (ইজাব-কবুল)। পাত্রী যে বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ দুইটি সাক্ষীর প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আমাদের বিবাহে অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মার্চ্চনা, কি মন্ত্রপাঠ, কি অন্য কোন প্রকারের ক্রিয়া কিছুই নাই। তবে লৌকিক প্রথানুসারে ধর্ম্মভাবে শিথিলপ্রযত্ন ব্যক্তিগণ, কি কেহ, আমোদের অঙ্গ মনে করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। তাহা না করিলেও বিবাহ-বন্ধনের সুদৃঢ় গ্রন্থি শিথিল হয় না। নিয়ম-লঙ্ঘন-দোষে কোন প্রকার অমঙ্গল ভয়েও কোন পক্ষকে ভয়াতুর হইতে হয় না।

প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে এতদ্বিষয়ের আর অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন বোধ করি। তবে একটি স্থূল কথা 'দেনমোহর'। অধুনা যে প্রকার লক্ষ লক্ষ টাকার দেনমোহর-প্রথা ভারতে মুসলমান-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, যে প্রথানুসারে স্বামীর যথাসর্ব্বস্ব কন্যার কোষগত করিয়া স্বামীকে পথের ভিখারী

করা হইতেছে, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। বৃটিশ-বিধিও যদি এই ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাপারে কেবলমাত্র স্বীকার-উক্তির জন্যই যথার্থ টাকার দায়িত্ব স্বীকারের অপরাধে স্বামীকে দায়ী করিয়া তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি, আবাসভূমি বিক্রয়, পরিশেষে দেহ পর্য্যন্ত বন্দিশ্রেণীর সহিত কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকেন; তবে তাহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! আমাদেরও দোষ না আছে, এরূপ নহে। আপন আপন দুহিতার ভবিষ্যৎ হিত-কামনায় আমরা ক্রমে "মোহরানার" সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছি! যাঁহারা ঐহিক, পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা, সেই প্রভু মোহাম্মদের পরিবারগণের মোহরানার সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রভু মোহাম্মদের কন্যা, হাসান-হোসেনের জননী বিবি ফাতেমার দেনমোহর আধুনিক পরিমাণ মুদ্রার হিসাব-অনুসারে চারি টাকা চারি আনার বেশী ছিল না।

পাত্রীর সম্মতিসূচক স্বীকারবাক্য স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিনিধি মহাশয় সাক্ষীসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা সভায় প্রত্যাগত হইয়া জাতীয় রীত্যনুসারে সভাস্থ সভ্যগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "বিবি সালেহা এ বিষয়ে অসম্মত নহেন, কিন্তু তাঁহার একটি কথা আছে। সে কথা এই যে, তিনি লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছেন, এই মাননীয় সম্ভ্রান্ত আবদুল জব্বার সাহেবের জয়নাব নামে একটি স্ত্রী আছেন, ধর্ম্মানুসারে জয়নাবকে পরিত্যাগ না করিলে তিনি এ বিবাহে সম্মতি দান করিতে পারেন না।" আরও তিনি বলিলেন, "জয়নাবের যত দেনমোহরের জন্য আবদুল জব্বার দায়ী, তাহার পরিমাণ তিনি জানিতে চাহেন ও জয়নাবের ভরণ-পোষণের জন্য তদতিরিক্ত আরও সহস্র মুদ্রা প্রদানেও তিনি প্রস্তুত আছেন।" এই প্রস্তাবে হয়ত অনেকেরই মস্তক ঘুরিয়া যাইত, চিন্তাশক্তির পরীক্ষা হইত, আন্তরিক ভাবেরও পরীক্ষা হইত, কিন্তু আবদুল জব্বারের বিবেচনাশক্তি এতদূর প্রবল যে, তিনি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার জন্য তাঁহার চিন্তাশক্তিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত করিলেন না। যেমনি প্রশ্ন তেমনি উত্তর।

আবদুল জব্বার বলিলেন, "আমি সম্মত আছি। মুখের কথা কেন, তালাকনামা (স্ত্রী-পরিত্যাগ-পত্র) এখনই লিখিয়া দিতেছি।"

লেখনী ও কাগজ সকলই প্রস্তুত ছিল। আবদুল জব্বার প্রথমে পরমেশ্বরের নাম, পরে প্রভু মোহাম্মদের নাম লিখিয়া পতিপরায়ণা নিরপরাধিনী সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণী জয়নাবকে তালাক দিলেন। সভাস্থ অনেক মহোদয় সাক্ষিশ্রেণীতে স্ব-স্ব নাম স্বাক্ষর করিলেন। প্রতিনিধির হস্ত দিয়া সেই তালাকনামাখানি সালেহার নিকট প্রেরিত হইল। প্রতিনিধি পুনরায় সাক্ষীসহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলেই প্রফুল্লচিত্তে সুস্থির হইয়া বসিলেন; নূতন রাগে, নূতন তালে আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল। বিবাহসভা সম্পূর্ণরূপেই আনন্দময়ী। আবদুল জব্বারের ভবনে জয়নাবের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল। জলপূর্ণ আঁখি দুইটি বোধ হয় জলভারে ডুবিল। আবদুল জব্বারের প্রত্যুত্তর অবধি তালাকনামা লিখিয়া প্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করা পর্য্যন্ত জয়নাবের মুখশ্রীর ও তাঁহার অজ্ঞাত বিপদ সময়ে চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকৃত ছবি প্রকৃতরূপে বিচিত্র করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না। কারণ, তাহা কল্পনাশক্তির অতীত—মসী-লেখনীর শক্তিবহির্ভূত।

প্রতিনিধি ফিরিয়া আসিলেন, পূর্ব্ব রীত্যনুসারে সভাস্থ সকলকেই পুনরভিবাদন করিয়া বলিলেন,—

"এ সভায় রাজমন্ত্রী, রাজসভাসদ, রাজপারিষদ, রাজাত্মীয়, রাজহিতৈষী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং বহুদর্শী ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত আছেন। সালেহা বিবি যাহা বলিলেন, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া আমি তাহা অবিকল বলিতেছি, আপনারা মনযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।—

"যে ব্যক্তি ধনলোভে, কি রাজ্যলোভে, কি মানসম্ভ্রম-বৃদ্ধির আশায় নিরপরাধিনী সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, বহুকালের প্রণয় ও ভালবাসা যে ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তে ভুলিতে পারে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রণয়ের বন্ধনরজ্জু অকাতরে ছিন্ন করিতে পারে, তাহাকে বিশ্বাস কি? তাহার কথায় আস্থা কি? তাহার মায়ায় আশা কি? এমন বিশ্বাসঘাতক স্ত্রী-বিনাশক অর্থলোভী নরপিশাচের পাণিগ্রহণ করিতে সালেহা বিবি সম্মত নহেন।"

সভাস্থ সকলেই রাজকুমারীর বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রশংসা করিতে

লাগিলেন। আবদুল জব্বারের মস্তকে যেন সহস্র অশনির সহিত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার আকাশকুসুমের আমূল চিন্তাবৃক্ষটি এককালে নির্ম্মূল হইয়া গেল। প্রতিনিধির বাক্য-বজ্রাঘাতে সুখ-স্বপ্ন-তরু দগ্ধীভূত হইল। পরিচারকগণ রাজকুমারীর অঙ্গীকৃত অর্থ আবদুল জব্বারের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। আবদুল জব্বার তাহা গ্রহণ করিলেন না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভাভঙ্গের গোলযোগে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া রাজদত্ত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিলেন ; গৃহে প্রতিগমন করিলেন না।

কথা গোপন থাকিবার নহে। আবদুল জব্বারের সঙ্গীরা ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার আবাসপল্লীতে উক্ত ঘটনা রাষ্ট্র হইয়াছিল। মূল কথাগুলি নানা অলঙ্কারে বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া বাতাসের অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া জয়নাবকে এবং প্রতিবেশিগণকে মহা দুঃখিত করিয়াছিল। তখন পর্য্যন্তও নিশ্চিত সংবাদ কেহ পান নাই। অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সেই অনেকের মধ্যে জয়নাব একজন। আবদুল জব্বারের সঙ্গিগণ বাটীতে ফিরিয়া আসিলে জয়নাবের সন্দেহ দূর হইল। তাঁহার আশাতরী বিষাদ-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেল। জয়নাব কাহাকেও কিছু বলিলেন না ; কেবল তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিয়া অতি মলিনবেশে দুঃখিত হৃদয়ে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ প্রবাহ

পথিক ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতেছেন,—বিরাম নাই, মুহূর্ত্তকালের জন্য বিশ্রাম নাই। এজিদ গোপনে বলিয়া দিয়াছেন, যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইবে, চলৎ-শক্তি রহিত হইবে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িবে, সেই সময়ে একটু বিশ্রাম করিও। কিন্তু বিশ্রামহেতু যে সময়টুকু অপব্যয় হইবে, বিশ্রামের পর দ্বিগুণ বেগে চলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিবে। পথিক এজিদ-আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছেন। একে মরুভূমি, তাহাতে প্রচণ্ড আতপতাপ, বিশেষ ছায়াশূন্য প্রান্তর,—বিশ্রাম করিবার স্থান অতি বিরল। দেশীয়

পথিকের পক্ষে বরং সহজ, অপরিচিত ভিন্ন দেশীয় পথিকের পক্ষে এই মরুস্থানে ভ্রমণ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। এ পথিক দেশীয় এবং পরিচিত। দামেস্ক হইতে যাত্রা করিয়াছেন। কোথায় কোন্ পর্ব্বত, কোথায় কোন্ নির্ঝরিণীর জল পরিষ্কার ও পানোপযোগী, তাহাও পূর্ব্ব হইতে তাঁহার জানা আছে। পথিক একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে যাইতেছেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিয়া এক্ষণে অনেক দুর্ব্বল হইয়া অতিকষ্টে যাইতেছেন। নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের নিকটস্থ হইলে পূর্ব্ব-পরিচিত আক্কাস ও তৎসহ কয়েকজন অনুচরের সহিত তাঁহার দেখা হইল।

মোস্‌লমকে দেখিয়া আক্কাস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই মোস্‌লেম! কোথায় যাইতেছ?"

মোস্‌লেম উত্তর করিলেন, "পিপাসায় বড়ই কাতর, অগ্রে পিপাসা নিবৃত্তি করি, পরে আপনার কথার উত্তর দিতেছি।"

আক্কাস্ বলিলেন, "জল অতি নিকটেই আছে। ঐ কয়েকটী খর্জ্জুরবৃক্ষের নিকট দিয়া সুশীতল নির্ঝরিণী অতি মৃদু মৃদুভাবে বহিয়া যাইতেছে। চল, ঐ খর্জ্জুর-বৃক্ষতলে সকলেই বসিয়া একটু বিশ্রাম করি। আমিও কয়েকদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেছি।"

সকলে একত্র হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট খর্জ্জুর-বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। আক্কাস একখণ্ড প্রস্তর ভূমি হইতে উঠাইয়া তত্তলস্থ ঝর্ণার সুস্নিগ্ধ জলে জলপাত্র পূর্ণ করিয়া এবং থলিয়া হইতে কতকগুলি খোর্‌মা বাহির করিয়া মোসলেমের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। মোসলেম প্রথমে জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। দুইটি খোর্‌মা মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই আক্কাস্! এজিদের বিবাহ-পয়গাম (প্রস্তাব) লইয়া জয়নাবের ভবনে যাত্রা করিতেছি।"

আক্কাস্ বলিলেন, "সে কি! আবদুল জব্বার কি মরিয়াছে?"

মোস্‌লেম বলিলেন,—"না আবদুল জব্বার মরেন নাই। জয়নাবকে তালাক দিয়াছেন।"

আক্কাস্ বলিলেন,—"আহা, এমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি দোষে পরিত্যাগ

করিল ? জয়নাবের মত পতিপরায়ণা ধর্ম্মশীলা, পতিপ্রাণা, নম্রস্বভাবা রমণী এ প্রদেশে অতি কমই দেখা যায়। আবদুল জব্বারের প্রাণ এত কঠিন, ইহা ত আমি আগে জানিতাম না। কোন্ প্রাণে সে সোণার জয়নাবকে পথের ভিখারিণী করিয়া বিষাদ-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে ?"

মোসলেম বলিলেন, "ভাই ! ঈশ্বরের কার্য্য মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে কি করেন, কাহার মনের কি গতি, কি কারণে কোন্ কার্য্য সাধনে কোন্ সময়ে কি কৌশলে কিরূপ করিয়া যে, কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা ভ্রমপূর্ণ অজ্ঞ মানব। আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তকে, এই ক্ষুদ্র চিন্তায়, সেই অনন্ত বিশ্বকৌশলীর বিচিত্র কৌশলের অণুমাত্র বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, সাধ্যও নাই।"

আক্কাস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন আবদুল জব্বার জয়নাবকে পরিত্যাগ করিয়াছে ?"

"অতি অল্প দিন মাত্র।"

"বোধ হয়, এখনও এদ্দাৎ (শাস্ত্রসঙ্গত বৈধব্যব্রত) সময় উত্তীর্ণ হয় নাই ?"

"প্রস্তাবে ত আর কোন বাধা নাই। এদ্দাৎ সময় উত্তীর্ণ হইলেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে।"

"ভাই মোস্‌লেম ! আমিও তোমাকে আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিলাম। জয়নাবের নিকট প্রথমে এজিদের প্রস্তাব, শেষে আমার প্রার্থনার বিষয়ও প্রকাশ করিও। রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া সে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবে, যদিও ইহা সম্ভব নহে, তথাপি ভুলিও না। দেখ ভাই ! আশাতেই সংসার, আশাতেই সুখ, এবং আশাতেই জীবন। আশা কাহারও কম নহে। আমার কথা ভুলিও না। জয়নাব রূপ-লাবণ্যে দেশ-বিখ্যাত, পুরুষমাত্রেরই চক্ষু জয়নাব-রূপে মোহিত ; স্বভাব, চরিত্র, ধীরতা ও নম্রতাগুণে জয়নাব সকলেরই নিকটেই সমাদৃত—তাহা আমি বেশ জানি। এ অবস্থাতেও বোধ হয় আমার আশা দুরাশা নহে। দেখ ভাই,—ভুলিও না। মনের অধিকারী—ঈশ্বর। তিনি যেদিকে মন ফিরাইবেন, যেদিকে মন চালাইবেন,

তাহা নিবারণ করিতে এজিদের রূপের ক্ষমতা নাই, অর্থেরও কোন ক্ষমতা নাই। সেই ক্ষমতাতীতের নিকটে কোন ক্ষমতারই ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, আমার প্রার্থনা জয়নাবের নিকট অবশ্যই জানাইবে। আমার মাথা খাও, ঈশ্বরের দোহাই, এ বিষয়ে অবহেলা করিও না।"

এইরূপ কথোপকথনের পর পরস্পর অভিবাদন করিয়া উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেলেন। মোস্লেম কিছু দূর যাইয়াই দেখিলেন, মাননীয় এমাম হাসান সশস্ত্র মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন। এমাম হাসান এক্ষণে স্বয়ং মদিনার সিংহাসনে বসিয়া শাহীমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছেন; রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। মোস্লেমকে দূর হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি আলিঙ্গনার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন। মোস্লেম পদানত হইয়া হাসানের পদচুম্বন করিয়া জোড়করে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শাহজাদা হাসান বলিলেন, "ভাই মোস্লেম। আমার নিকট এত বিনয় কেন? কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, অসঙ্কোচে প্রকাশ কর। তুমি ত আমার বাল্যকালের বন্ধু।"

মোস্লেম কহিলেন, "আপনি ধর্ম্মের অবতার, ঐহিক-পারত্রিক—উভয় রাজ্যের রাজা। আপনার পদাশ্রয়েই সমস্ত মুসলমানের পরিত্রাণ, আপনার পবিত্র চরণযুগল দর্শনেই মহাপুণ্য; আপনার পদধূলি পাপ-বিমোচনের উপযুক্ত মহৌষধি; আপনাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে কাহার না ইচ্ছা করে? আপনার পদসেবা করিতে কে না লালায়িত হয়? আপনার উপদেশ শ্রবণ করিতে কে না সমুৎসুক হইয়া থাকে? আমি দাসানুদাস, আদেশ প্রতিপালনই আমার সৌভাগ্য।"

"আজ আমার শিকারযাত্রা সু-যাত্রা। আজিকার প্রভাত আমার সু-প্রভাত। বহুদিনান্তে আজ বাল্যসখার দেখা পাইলাম। এক্ষণে তুমি ভাই কোথায় যাইতেছ?"

"এজিদের পরিণয়ের পয়গাম জয়নাবের নিকট লইয়া যাইতেছি। হজরত মাবিয়ার আদেশ, যত শীঘ্র হয়, জয়নাবের অভিপ্রায় জানিয়া সংবাদ দিতে হইবে।"

"এজিদ যে-কৌশলে এই ঘটনা ঘটাইয়াছে, তাহা সকলই আমি শুনিয়াছি। হজরত মাবিয়া যে যে কারণে এজিদের কার্য্যের প্রতিপোষকতা করিয়াছেন, তাহাও জানিয়াছি। অথচ, মাবিয়া যে, ঐ সকল ষড়যন্ত্রের মূল বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন, তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই।"

"আক্কাস্ও জয়নাবের প্রার্থী। বিশেষ অনুনয় করিয়া, এমন কি, ঈশ্বরের শপথ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—অগ্রে এজিদের প্রস্তাব করিয়া, পরিশেষে আমার প্রস্তাবটি করিও। - এজিদ ও আক্কাস, উভয়েরই পয়গাম লইয়া আমি জয়নাবের নিকট যাইতেছি। তিনি যে কাহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

হাস্য করিয়া হাসান কহিলেন, "মোস্লেম! আক্কাসের প্রস্তাব লইয়া যাইতে যখন সম্মত হইয়াছ, তখন এ গরীবের কথাটিই বা বাকী থাকে কেন? আমিও তোমাকে উকিল নিযুক্ত করিলাম। সকলের শেষে আমার প্রার্থনাটিও জয়নাবকে জ্ঞাপন করিও। স্ত্রীজাতি প্রায়ই ধনপিপাসু হয়, আবার কেহ কেহ রূপের প্রত্যাশিনী হইয়াও থাকে, আমার না আছে ধন, না আছে রূপ। এজিদের ত কথাই নাই, আক্কাস্ও যেমন ধনবান, তেমনি রূপবান। অবশ্য ইঁহাদের প্রার্থনাই অগ্রগণ্য। জয়নাব-রত্ন ইঁহাদেরই হৃদয়-ভাণ্ডারে থাকিবার উপযুক্ত ধন। সে ভাণ্ডারে যত্নের ত্রুটি হইবে না, আদরেরও সীমা থাকিবে না। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই বাহ্যিক সুখকেই যথার্থ সুখ বিবেচনা করিয়া থাকে। আমার গৃহে সংসারিক সুখ যত হইবে, তাহা তোমার অবিদিত কিছুই নাই। যদিও আমি মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছি, কিন্তু ধরিতে গেলে আমি ভিখারী। আমার গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কোন প্রকার সুখ-বিলাসের আশা নাই। বাহ্য জগতে সুখী হইবার এমন কোন উপকরণ নাই যে, তাহাতে জয়নাব সুখী হইবে। সকলের শেষে আমার এই প্রস্তাব জয়নাবকে জানাইতে ভুলিও না। দেখ ভাই! মনে রাখিও। ফিরিয়া যাইবার সময় যেন জানিতে পারি যে, জয়নাব কাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।" এই বলিয়া পরস্পর অভিবাদনপূর্ব্বক উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিলেন।

পথিক যাইতেছেন! মনে মনে বলিতেছেন, "হাঁ! ঈশ্বরের কি মহিমা! এক জয়নাব-রত্নের তিন প্রার্থী—এজিদ, আব্দাস্ আর মাননীয় হাসান! এজিদ ত পূর্ব্ব হইতেই জয়নাবের রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে! এজিদ যে দিন জয়নাবকে দেখিয়াছে, জয়নাবের অজ্ঞাতে যে দিন এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমল-সুধা পান করিয়াছে, সেই দিন এজিদ জয়নাবকেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাবের রূপ-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে; জয়নাবকেই জপমালা করিয়া দিবানিশি জয়নাব-নাম জপ করিতেছে। জয়নাব ধ্যান, জয়নাব জ্ঞান!—আব্দাস্ ত এত অর্থশালী, এমন রূপবান পুরুষ, তাহারও মন আজ জয়নাব-নামে গলিয়া গেল! এমাম হাসান —যাঁহার পদছায়াতেই আমাদের মুক্তি, যাঁহার মাতামহ প্রসাদাৎ আমরা এই অক্ষয় ধর্ম্মের সুবিস্তারিত পবিত্র পথ দেখিয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে চিনিয়াছি, যাঁহার ভক্তের জন্যই সর্ব্বদা স্বর্গের দ্বার বিমোচিত রহিয়াছে, এমন মহাপুরুষও জয়নাব লাভের অভিলাষী! অহো! জয়নাব কি ভাগ্যবতী!" পথিক মনে মনে এইরূপ নানা কথা আন্দোলন করিতে করিতে পথবাহন করিতে লাগিলেন। চিন্তারও বিরাম নাই, গতিরও বিশ্রাম নাই।

পঞ্চম প্রবাহ

পতিবিয়োগে নারীজাতিকে চারি মাস দশ দিন বৈধব্যব্রত পালন করিতে হয়। সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া নিয়মিতাচারে মৃত্তিকায় শয়ন করিতে হয়,* সুগন্ধ-তৈল স্পর্শ, চিকুরে চিরুণী দান, মেহেদী কি অন্য কোন প্রকারের অঙ্গ-রাগ শরীরে লেপন,—যাহাতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, তাহার সমুদয় হইতে একেবারে বর্জ্জিত থাকিতে হয়। জয়নাবের বৈধব্যব্রত এখনও শেষ হয় নাই; তাঁহার পরিধানে মলিন বসন। (আব্‌রুহ্ অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যস্থিত উভয় পার্শ্ব হইতে কপোল ও ওষ্ঠের নিম্ন দিয়া সমুদয় স্থানকে আব্‌রুহ্ কহে। এই আবরুহ্-স্থানে অপর পুরুষের চক্ষু পড়িলেই শাস্ত্রানুসারে মহাপাপ। স্ত্রীলোকের পদতলের উপরিস্থিত সন্ধিস্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাপ। সমুদয়

অঙ্গ বস্ত্রে আবৃত করিয়া যদি উপরিস্থ স্থানদ্বয় অনাবৃত রাখে, তাহা হইলেও তাহাকে উলঙ্গ জ্ঞান করিতে হয়। স্থূল কথা, মণিবন্ধ হইতে পায়ের গুল্‌ফ পর্য্যন্ত এবং নির্দ্দিষ্ট আব্‌রুহ্‌-স্থান বস্ত্রাবৃত না থাকিলে জাতীয় ধর্ম্মানুসারে তাহাকে উলঙ্গ জ্ঞান করিতে হয়। এই প্রকারে বস্ত্রের ব্যবহার করিতে না পারা সত্বেই আমাদের দেশে "জানানা"-রীতি প্রচলিত হইয়াছে। আবার কোন কোন দেশে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় "বোর্‌কা" অর্থাৎ শরীরাবরণ-বসনের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত প্রদেশ-গুলিতে সচরাচর প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে হইলে বোর্‌কা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) জয়নাব শাস্ত্রসঙ্গত বৈধব্য অবস্থায় শুভ্রবেশ পরিধান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় দিবস-যামিনী যাপন করিতেছেন; হস্তে তস্‌বীহ্‌ (জপমালা); সংসারের সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয় বিবেচনাতেই আন্তরিক দুঃখ সহ্য করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই নির্ভর করিয়া আছেন। এত মলিনভাব, অথচ তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও রূপমাধুর্য্যে মানুষমাত্রেই বিমোহিত!

মোস্‌লেম যথাসময়ে জয়নাবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। স্বাধীন দেশ, স্বাধীন প্রকৃতি, নিজের ভালমন্দ নিজের প্রতিই নির্ভর করে। বিশেষতঃ, পূর্ণবয়স্ক হইলে বিবাহ-বিষয়টি স্বেচ্ছাধীন হইয়া থাকে, নিজের বিবেচনার প্রতি সমস্তই নির্ভর করে। জয়নাব পিতার বর্ত্তমানে ও দেশীয় প্রথানুসারে এবং শাস্ত্রসঙ্গত স্বাধীনভাবেই মোস্‌লেমের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; তাঁহার পিতা অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মোস্‌লেম বলিলেন, "ঈশ্বরের প্রসাদে পথশ্রম দূর হইয়াছে। সতি! যে উদ্দেশ্যে আমি দৌত্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি, একে একে নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। যদিও আপনার বৈধব্যব্রত আজ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, কিন্তু প্রস্তাবে অধর্ম্ম নাই। আমাদের দামেস্কাধিপতি হজরত মাবিয়ার বিষয় আপনার অবিদিত কিছুই নাই। তাঁহার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সকলই আপনি জ্ঞাত আছেন। সেই দামেস্কাধিপতির একমাত্র পুত্র এজিদের বিবাহ-পয়গাম

লইয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। যিনি এজিদকে স্বামীত্বে বরণ করিবেন, তিনিই দামেস্ক-রাজ্যের পাটরাণী হইবেন। রাজভোগ ও রাজ-পরিচ্ছদে তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। আর অধিক কি বলিব, তিনিই সেই সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন। আর একটি কথা।—পথে আসিতে আসিতে প্রভু মোহাম্মদের প্রিয় পারিষদ আক্কাস্ আমাকে কহিলেন, তিনিও আপনার প্রার্থী। ঈশ্বর তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্যের অতুল আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি অতুল বিভবের অধীশ্বর। তিনিও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। অধিকন্তু প্রভু মোহাম্মদের কন্যা বিবি ফাতেমার গর্ভজাত হজরত আলীর ঔরসসম্ভূত-পুত্র মদিনাধিপতি হজরত হাসানও আপনার প্রার্থী। কিন্তু এজিদের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ নাই, সৈন্য-সামন্ত নাই, সমুজ্জ্বল রাজপ্রাসাদও নাই। এই সকল বিষয়ে সম্ভ্রম-সম্পদশালী এজিদের সহিত কোন অংশেই তাঁহার তুলনা হয় না। তাঁহার দ্বারা ইহকালের সুখ-সম্ভোগের কোন আশাই নাই, অথচ সেই হাসান আপনার প্রার্থী। এই আমার শেষ কথা। বিন্দুমাত্রও আমি গোপন করিলাম না—কিছুমাত্রও অত্যুক্তি করিলাম না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া জয়নাব অতি মৃদুস্বরে সুমধুর সম্ভাষণে বলিলেন, "আজ পর্য্যন্ত আমার বৈধব্যব্রত শেষ হয় নাই। ব্রতাবসানে অবশ্যই আমি স্বামী গ্রহণ করিব। কিন্তু এ সময়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিলে আমার মনে মহা কষ্টের উদ্রেক হয়। কি করি, পিতার অনুরোধে ও আপনার প্রস্তাবে অগত্যা মনের কথা প্রকাশ করিতে হইল। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে আমাকে সৃজন করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যের গুহ্য কারণ কেবল তিনিই জানেন। আমি তাঁহার যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ, তাহা আমার জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি কেন—অনেকে আপন আপন মূল্যের পরিমাণ বুঝিতে অক্ষম। দয়াময় ঈশ্বর আমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন, বিধাতা অদৃষ্টফলকে যাহা যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয় এবং অনিবার্য্য। কাজেই সকল অবস্থাতেই সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের

নিয়োজিত কার্য্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। জীবন কয় দিনের ? জীবনের আশা কি ? এই চক্ষু মুদ্রিত হইলেই সকল আশা-ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। তবে কয়েক দিনের জন্য দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া অমূলক উচ্চ আশায় লালায়িত হওয়ায় ফল কি ? ধন-সম্পত্তি, রাজ্য বা রূপের আমি প্রত্যাশী নহি। বড় মানুষের মন বড়, আশাও বড়। তাঁহাদের সকল কার্য্যই আড়ম্বরবিশিষ্ট, অথচ কিছুই নহে। বিশ্বাসের ভাগ অতি অল্প। স্থূল কথা—বিষয়বিভব, রাজ-প্রাসাদ ও রাজ-ভোগের লোভী আমি নহি। সে লোভ এ জীবনে কখনই হইবে না। মনের কথা আজ অকপটে আপনার নিকট বলিলাম।

মোস্‌লেম কহিলেন, "ইহাতে ত আপনার মনোগত ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না ”

"ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কি আর হইতে পারে ? যিনি ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা, তিনি যখন আমাকে দাসীশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী রমণী অতি কমই দেখিতে পাইবেন। আর ইহা কে না জানে যে, যাঁহার মতামহের নিমিত্তই জগতের সৃষ্টি; আদিপুরুষ হজরত আদম জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াই ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা-সূচক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবার পর মস্তক উত্তোলন করিয়া সেই দয়াময়ের আসনের শিরোভাগে যাঁহার নাম প্রথমেই দেখিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রভু হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র। তিনি যখন জয়নাবকে চাহিয়াছেন, তখন জয়নাবের স্বর্গসুখ ইহকালেই সমাগত। পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় না আছে ? কিন্তু সাধুপুরুষের পদাশ্রিত হইতে পারিলে পরকালের মুক্তি-পথের পাপকণ্টক বিদূরিত হইয়া স্বর্গের দ্বার পরিষ্কার থাকিবে। তাঁহারা যাহার প্রতি একবার সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই ব্যক্তি নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া প্রধান স্বর্গ জান্নাতে নীত হইবে। আর অধিক কি বলিব, আমার বৈধব্যব্রত পূর্ণ হইলেই প্রভু হাসান যে সময়ে আমাকে দাসীত্বে গ্রহণ করিবেন, আমি মনের আনন্দে সেই সময়েই সেই পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ করিব। অন্য কোন প্রার্থীর কথা আর মুখে আনিব না।"

মোস্‌লেম বলিলেন, "জয়নাব! তুমিই জগতে পবিত্র কীর্ত্তি স্থাপন করিলে। জগৎ বিলয় পর্য্যন্ত তোমার এই অক্ষয় কীর্ত্তি সকলের অন্তরে দেদীপ্যমান থাকিবে। ধনসম্পত্তি-সুখবিলাসের প্রত্যাশিনী হইলে না, রূপমাধুরীতেও ভুলিলে না, কেবল অনন্তধামে অনন্ত সুখের প্রত্যাশাতেই দৃঢ় পণ করিয়া পার্থিব সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলে! আমি তোমাকে সহস্রবার অভিবাদন করি। আমার আর কোন কথা নাই। আমি বিদায় লইলাম।"

মোস্‌লেম বিদায় লইলেন। যথাসময়ে প্রথমে এমাম হাসান পরে আব্বাসের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া, অপূর্ব্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, তিনি দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ প্রবাহ

মোস্‌লেমকে জয়নাবের নিকট পাঠাইয়া এজিদ প্রত্যহ দিন গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গণনা-অনুসারে যে দিন মোস্‌লেমের প্রত্যাগমন সম্ভব, সে দিন চলিয়া গেল। মোস্‌লেমের আগমন-প্রতীক্ষায় এজিদ সূর্য্যাস্তের কামনা করিয়া সন্ধ্যাদেবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তমোময়ী সন্ধ্যাও দিবাকরের অস্তাচল-গমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিলেন। কিন্তু এজিদ মোস্‌লেমকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর ক্রমে সপ্তাহ যায়, মোস্‌লেমের সংবাদ নাই। যে পথ অতি কষ্টে এক দিনে অতিক্রম করা যায়, সে পথ এজিদ মনঃকল্পিত গণনায় অর্দ্ধ দিনে আনিয়া, মোস্‌লেমের প্রত্যাগমন সম্ভব স্থির করিয়া যে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, সে তাঁহার ভ্রম নহে। কারণ, প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়রত্ন লাভের সুসংবাদ শুনিতে অমূল্য সময়কে যত শীঘ্র হয় দূর করিয়া এক দিনে দুই তিন বার সূর্য্যকে উদয়-অস্ত করাইতে ইচ্ছা করে। আবার সুখসময়ের দীর্ঘতার জন্য অনেকে অনেক সময় লালায়িত হয় —ল্যাপল্যাণ্ডবাসীকে সহস্রবার ধন্যবাদ দেয়। ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধি আছে যে, সুখসূর্য্য শীঘ্রই অস্তমিত হয়, সুখনিশি শীঘ্র শীঘ্র ঊষাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রভাতকে আনয়ন করে। সুখী দুঃখী, পরস্পর সকলেরই আক্ষেপ এবং

সকলেরই দুঃখ! কিন্তু স্বভাব কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না! প্রণয়ীর প্রতি অথবা প্রণয়ের প্রতিও ফিরিয়া তাকায় না! বিরহীর দুঃখেও দুঃখিত হয় না! সময় যে নিয়মে যাইতেছে, সেই নিয়মে কত দিন যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এজিদের মনে কত কথাই উদয় হইতেছে। কথা ভাঙ্গিবার একমাত্র দোসর মারওয়ান! সে মারওয়ানও এক্ষণে উপস্থিত নাই। তাই নানা প্রকার চিন্তায় তিনি চিন্তিত।

মাবিয়া পীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা অতি কম। এজিদের সেদিকে দৃকপাত নাই, পিতার সেবা-শুশ্রূষাতেও মন নাই। প্রস্ফুটিত গোলাপদল-বিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদনমণ্ডলের আভা, সেই আয়ত-লোচনার নয়নভঙ্গীর সুদৃশ্য দৃশ্য—দিবারাত্র তাঁহার অন্তরপটে আঁকা। জয়নাবের ভ্রূ-যুগলের অগ্রভাগ, যাহা সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্র তিনি সেই বিষেই বিষম কাতর! সেই নাসিকার সরল ভঙ্গিমায় সর্ব্বদাই আকুল! সেই ঈষৎ লোহিত অধরোষ্ঠ পুনঃ পুনঃ দেখিবার আশা সততই তাঁহার বলবতী! আজ পর্য্যন্ত তিনি সেই চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভা ভুলিতে পারেন নাই! সামান্য অলঙ্কার, যাহা জয়নাবের কর্ণে দুলিতে দেখিয়াছেন, সেই দোলায় তাঁহার মস্তক আজও পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে দুলিতেছে। জয়নাবের ললাটের উপরিস্থিত মালার জালি * অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চিকুরের সহিত মিলিত হইয়া যাহার কিঞ্চিৎভাগ ললাটের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল, তাঁহার মনঃপ্রাণ সেই জালে আটক পড়িয়া আজ পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেই হাসিপূর্ণ মুখখানির হাসির আভা, জয়নাবের অজ্ঞাতে একবার তিনি দেখিয়াছেন। কতবার তিনি নিদ্রা গিয়াছেন, কত শতবার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাপি সেই মধুর হাসির আভাটুকু আজ পর্য্যন্তও তাঁহার চক্ষের নিকট হইতে সরিয়া যায় নাই, মনে সদাই জাগিতেছে।

মোস্‌লেম আসিলেই জয়নাবের কথা শুনিবেন! কত আগ্রহে জয়নাব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে, কথার ছলে, সেই কথাটি অন্ততঃ দুইবার তিনবার দোহোরাইয়া শুনিবেন! কি ভাবে বলিয়াছিল, মোস্‌লেমকে বার

* জালি—আরবদেশীয় অলঙ্কার

বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার আদি-অন্ত তন্ন তন্ন রূপে শুনিবেন! প্রথম মিলনের নিশিতে জয়নাবকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আজ পর্য্যন্তও তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই! সালেহার বিবাহের আদি অন্ত ঘটনা এবং তাঁহার ভগ্নী কেহই নাই, অথচ সালেহা নাম—এই ষড়যন্ত্র যে কেবল জয়নাব-লাভের জন্য হইয়াছিল, তাহা তিনি অকপটে বলিবেন কি—না, আজ পর্য্যন্তও স্থির করিতে পারেন নাই। এই সকল অমূলক চিন্তায় এবং মোস্‌লেমের প্রত্যাগমনের বিলম্বে পূর্ব্ব হইতে তিনি আরও অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন। আজ খাদ্যসামগ্রী যথাস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে, সেবকগণ প্রভুর আহারের প্রতীক্ষায় কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া কত কি বলিতেছে, মৃদুমৃদুভাবে নানা প্রকার অকথা-কথনে এজিদের নিন্দা করিতেছে—"ঈশ্বর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে, কি করিব, উপায় নাই!"—এই বলিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে। রজনী দ্বিপ্রহর গত হইল, তথাপি এজিদের চিন্তার শেষ হইল না; কখনও উঠিতেছেন, গৃহমধ্যে দুই চারিবার পদচালনা করিয়া আবার বসিতেছেন, ক্ষণ-কাল ঐ উপবেশন-শয্যাতেই শয়ন করিয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিলে অবশ্যই তিনি আহারের প্রতি মনোযোগ দিতেন। সমস্তই ভুল! কিছুতেই তিনি মন স্থির করিতে পারিতেছেন না।

সকল সময়েই সকল স্থানেই এজিদের নিকট মারওয়ানের যাইবার অনুমতি ছিল। মারওয়ান আসিয়াই অভিবাদন করিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এজিদের চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "যখন কোন পথ ছিল না, তখনই চিন্তিত হইবার কথা, এখন ত হস্তগত হইবারই অধিক সম্ভাবনা; এখন আর চিন্তা কি? বলুন ত, জগতে সুখী হইতে কে না ইচ্ছা করে? আবার সে সুখ সামান্য নয়, একেবারে সীমার বহির্ভূত। অবস্থার একটু উচ্চ পরিবর্ত্তন হইলেই লোকে মহাসুখী হয়; এ ত একটু পরিমাণ নয়, একেবারে পাটরাণী! বিশেষ, স্ত্রীজাতি বাহ্যিক সুখপ্রিয়। আপনি কোন প্রকার সন্দেহ মনে স্থান দিবেন না; নিশ্চয় জানিবেন, জয়নাব কখনই অসম্মত হইবে না। আমি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিতে পারি যে, জয়নাব আপনারই হইবে এবং আপনারই অঙ্ক শোভা করিবে।"

এজিদ বলিলেন, 'সন্দিহান মনের সন্দেহ অনেক। সকলগুলি যে যথার্থ সন্দেহ, তাহা নহে। আমি সে জন্য ভাবিতেছি না। জয়নাবের বৈধব্যব্রত সমাধা হইতে এখনও অনেক বিলম্ব।"

"সেই বা আর কত দিন? সময় যাইতেছে, ফিরিতেছে না, একভাবেও থাকিতেছে না। সময়ের গতির বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। অবশ্যই যাইবে, অবশ্যই বৈধব্যব্রত সমাধা হইবে।"

এজিদ সর্ব্বদাই চকিত। কোন প্রকার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই এজিদের মন কাঁপিয়া উঠিত। কারণ আর কিছু নহে, মোস্‌লেমের আগমন সম্ভাবনা। এজিদ উঠিয়া বসিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কর্ণে কোন প্রকারের শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা না হইলে উঠিয়া বসিবেন কেন? মারওয়ানের তত মনোযোগ নাই। এজিদ উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতার প্রধানা পরিচারিকা ত্রস্তে আসিতেছে। সে নিকটে আসিয়া বলিল, "শীঘ্র আসুন, মহারাজ আপনাকে মনে করিয়াছেন।"

এজিদ যে বেশে বসিয়াছিলেন, সেই বেশেই পিতার নিকটে গমন করিলেন। মারওয়ানকে বলিয়া গেলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"—এই বলিয়া এজিদ চলিয়া গেলেন।

মাবিয়া পীড়িত, শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। এজিদের মাতা পার্শ্বে নিম্নতর আর একটি শয্যায় বসিয়া বিষণ্ণ বদনে চাহিয়া আছেন। এজিদ সসম্ভ্রমে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া নিকটেই বসিলেন। মাবিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মোস্‌লেম ফিরিয়া আসিয়াছে। (এজিদ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কাহাকেও দেখিলেন না।) জয়নাবের বুদ্ধিকে আমি শত শত ধন্যবাদ দিই। এত অল্প বয়সে এত ধৈর্য্যগুণ কাহার? এমন ধর্ম্মপরায়ণা সতী-সাধ্বীর নাম আমি কখনই শুনি নাই। জয়নাবের প্রত্যেক কথায় মন গলিয়া যায়। ইচ্ছা হয় যে, ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ তাঁহার নিকট আমরাও শিক্ষা করি। ঈশ্বর তাহাকে যেমন সুশ্রী করিয়াছেন, তেমনি বুদ্ধিমতী করিয়া আরও দ্বিগুণ রূপ বাড়াইয়া দিয়াছেন। আহা! তাহার ধর্ম্মে মতি, ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি এবং ধর্ম্মনীতির সুনীতি-কথা

শুনিলে কে না তাহাকে ভালবাসিবে? আবদুল জব্বার নিরপরাধ ঐ অবলা সতীর মনে যে দুঃখ দিয়াছে, ইহার প্রতিফল সে অবশ্যই পাইবে।

এজিদ আসল কথার কিছুই সন্ধান পাইতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইতেছে না; মনের মধ্যে মনের ভাব তোলপাড় করিতেছে। কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাও হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তবে মনে মনে এই একটু স্থির করিলেন,—এত প্রশংসা কেবল আমার শিক্ষার নিমিত্ত। ইহার অর্থই এই যে, আমি তাহাকে বিশেষ আদরে রাখি, যত্ন করি। এই ভাবিয়া বিশেষ আগ্রহে শুনিতে লাগিলেন।

এজিদের মাতা বলিলেন, "ধর্ম্মে মতি অনেকেরই আছে, সুশ্রীও অনেক আছে।"

এজিদের অন্তরস্থিত জয়নাবের ভ্রূযুগলের অগ্রভাগস্থ সুতীক্ষ্ণ বাণ যাহা অন্তরে বিঁধিয়াই ছিল, তাহাতে আঘাত লাগিল।

মাবিয়া কহিলেন, "অনেক আছে বটে, তবে এমন আর হইবে না। এই ত মহৎগুণের পরিচয় এখনই পাইলে। জয়নাব—রূপ, ধন, সম্পত্তির প্রত্যাশী নহে; রাজরাণী হইতেও তাহার আশা নাই। যাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে পরকালে মুক্তি পাইবে, তাঁহারই পয়গাম কবুল করিয়াছে।"

এজিদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে পরকালে মুক্তি হয়? সে ব্যক্তি কে?"

মাবিয়া বলিলেন, "তিনি প্রভু মোহাম্মদের দৌহিত্র, মাননীয় আলীর পুত্র হাসান। তুমি যাঁহার নাম শুনিতেও কষ্ট বোধ কর, জয়নাব স্ত্রীবুদ্ধি-প্রভাবেই সেই মহাত্মার গুণ জানিয়াই তাঁহার পয়গাম সন্তোষের সহিত স্বীকার করিয়াছে। দেখ এজিদ! তুমি আর হাসান-হোসেনের প্রতি ক্রোধ করিও না। মন হইতে সে সকল পাপ দূর কর। সত্যপথ অবলম্বন কর। পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষা কর। পরকালের সুগম্য পথের দুরূহ কণ্টক সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃপ্রবাহে বিনষ্ট করিয়া স্বর্গের দ্বার আবিষ্কার কর। সেই সঙ্গে ন্যায়পথে থাকিয়া এই সামান্য

রাজ্য রক্ষা কর। আমি আর কয়দিন বাঁচিব? আমি যে প্রকারে এমাম হাসান-হোসেনের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তুমি তাহার চতুর্গুণ করিবে। তোমার অপেক্ষা তাঁহারা সকল বিষয়েই বড়।"

তখন এজিদের মুখে কথা ফুটিল, বাক্‌শক্তির জড়তা ঘুচিল। পিতৃবাক্য-বিরোধী হইয়া তিনি বলিতে অগ্রসর হইলেন, "আমি দামেস্কের রাজপুত্র। আমার রাজকোষ সর্ব্বদা ধনে পরিপূর্ণ; আমি সৈন্য-সামন্ত সর্ব্ববলে বলীয়ান; আমার সুরম্য অত্যুচ্চ প্রাসাদ এদেশে অদ্বিতীয়। আমি সর্ব্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ও অভাব-শূন্য। আমি যাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমি যাহার জন্য রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া এই কিশোর বয়সে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে অগ্রগামী, যাহার জন্য এত দিন কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই জয়নাবকে হাসান বিবাহ করিবে? এজিদের চক্ষে তাহা কখনই সহ্য হইবে না। এজিদের প্রাণ কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। যে হোসেনের এক সন্ধ্যা আহারের সংস্থান নাই, উপবাস যাহাদের বংশের চিরপ্রথা, একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে যাহাদের প্রায়ই ক্ষমতা হয় না, সেই হোসেনকে এজিদ মান্য করিবে? মান্য করা দূরে থাকুক, জয়নাব-লাভের প্রতিশোধ এবং সমুচিত শাস্তি অবশ্যই এজিদ তাহাদিগকে দিবে। আমার মনে যে ব্যথা দিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা শত সহস্রগুণে তাহাদের মনে ব্যথা দিব! এখনই হউক বা দুদিন পরেই হউক, এজিদ বাঁচিয়া থাকিলে ইহার অন্যথা হইবে না; এই এজিদের প্রতিজ্ঞা।"

মাবিয়া অতি কষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া সরোষে বলিতে লাগিলেন, "ওরে নরাধম! কি বলিলি? রে পাষণ্ড! কি কথা আজ মুখে উচ্চারণ করিলি? হায়! হায়! নূরনবী মোহাম্মদের কথা আজ ফলিল! তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইল। ওরে পাপাত্মা! তুই কিসের রাজা? তুই কোন্ রাজার পুত্র? তার কিসের রাজ্য? তোর ধনাগার কোথায় রে বর্ব্বর? তুই ত আজই প্রধান জাহান্নামী (নারকী) হইলি! আমাকেও সঙ্গী করিলি! রে দুরাত্মা পিশাচ! সে দিন কে বাঁচাইল? হায়! হায়! আমি তোর এই পাপমুখ দেখিয়াই অস্ত্র হাতেই রাখিয়াছিলাম। তাহার ফল আজ হাতে হাতেই পাইলাম।

ওরে বিধর্ম্মী এজিদ! তোর পিতা যাঁহাদের দাসানুদাস, তুই কোন্ মুখে তাঁহাদের প্রতি এমন অকথ্য কথা বলিলি? তোর নিস্তার কোন লোকেই নাই; —ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই। তুই জানিস, এ রাজ্য তোর পিতার নহে। সেই হাসানের পিতা আলী অনুগ্রহ করিয়া—ভৃত্যের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু যেমন কিছু দান করেন, সেইরূপ তোর পিতাকে কেবলমাত্র ভোগের জন্য এই রাজ্য দান করিয়া গিয়াছেন। বল্ ত, কোন্ মুখে এমন কর্কশ শব্দ তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করিলি? আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! তোর ও-পাপ মুখ আমি আর এ চক্ষে দেখিব না! আর দেখিব না! তুই দূর্ হ।"

এজিদ ম্লান মুখে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এজিদের মাতা নানা প্রকার সান্ত্বনা দিয়া মাবিয়াকে বুঝাইতে লাগিলেন, "আপনি স্থির হউন! ইহাতে আপনার পীড়ার বৃদ্ধি হইবে। আপনি যত বেশী উত্তেজিত হইবেন, ততই আপনার পীড়া বৃদ্ধি হইবে।"

মাবিয়া বলিলেন, "পীড়াই বৃদ্ধি হউক, আর আমার প্রাণ বাহির হইয়াই যাউক, যে কথা আমি আজ শুনিয়াছি, তিলার্দ্ধ কাল বাঁচিতে আমার আর ইচ্ছা নাই!" সজোরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাবিয়া দুই হস্ত তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'হে দয়াময়! হে করুণাময়! তুমি সর্ব্বশক্তিমান! আমাকে উদ্ধার কর। আমি যেন এজিদের পাপমুখ আর না দেখি। এজিদের কথাও যেন কর্ণে না শুনি। এজিদ আজ আমার অন্তরে যে আঘাত দিয়াছে, আর ক্ষণকাল বাঁচিতেও আমার ইচ্ছা নাই। শীঘ্র আমাকে এই পাপপুরী হইতে উদ্ধার করিয়া লও।' হজরত মাবিয়া এই প্রকার কাতর উক্তিতে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ব্যাধিশয্যায় শয়ন করিলেন।

সপ্তম প্রবাহ

সময় যাইতেছে। যাহা যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না। আজ যে ঘটনা ঘটিল, কাল তাহা দুই দিন হইবে। ক্রমে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অধীনে বৎসরে পরিণত হইবে। বৎসর, বৎসর,—অনন্ত বৎসর। যে কোন ঘটনাই হউক, অবিশ্রান্ত গতিতে তাহা দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। জয়নাবের বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল। হাসান স্বয়ং জয়নাবের ভবনে যাইয়া জয়নাবকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। প্রথমা স্ত্রী হাসনেবানু, দ্বিতীয়া জাএদা, তৃতীয়া জয়নাব। হাসনেবানু প্রথমা স্ত্রী, তদ্গর্ভজাত একমাত্র পুত্র—আবুয়ল কাসেম। আবুয়ল কাসেম পূর্ণবয়স্ক, সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, এ পর্য্যন্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় নাই; পিতার অনুবর্ত্তী থাকিয়াই কালাতিপাত করিতেছেন। পুণ্যভূমি মদিনা অতি পবিত্র স্থান। লোকমাত্রেই ঈশ্বরভক্ত, পাপশূন্য-চরিত্র। কাসেম পবিত্র বংশে জন্মিয়াছেন; তাঁহার আপাদমস্তক পবিত্র। অস্ত্রবিদ্যাতেও তিনি বিশারদ। এই অমিততেজা মহাবীর কাসেমের কীর্ত্তি বিষাদ-সিন্ধুর একটি প্রবল-তরঙ্গ। পাঠকগণকে পূর্ব্বেই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া রাখিলাম। জাএদার সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই। এক ব্যক্তির দুই প্রার্থী হইলেই মহা গোলমাল উপস্থিত হয়। সপত্নীবাদ কোথায় না আছে? হাসনেবানু হাসানের প্রধানা স্ত্রী, সকলের মাননীয়া। তৎপ্রতি জাএদার আন্তরিক বিদ্বেষভাব থাকিলেও তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। কিন্তু জয়নাবের সহিত তাঁহার সমভাব চলিতে লাগিল। জাএদা ভাবিয়াছিলেন, হাসান তাঁহাতেই অনুরক্ত; পূর্ব্বে যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন না। এক্ষণে দেখিলেন, তাঁহার সে বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল। এখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন, হাসানের ভালবাসা আন্তরিক নহে;—আন্তরিক হইলে এরূপ ঘটিত না, এক মনও ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারিতেন না। ক্রমেই তিনি পূর্ব্ব ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলেন। হাসানের কথায়,

কার্য্যে ভালবাসার কিছুই ত্রুটি পাইলেন না ; তথাচ পূর্ব্ব ভাব, পূর্ব্ব প্রণয়. পূর্ব্ব ভালবাসার মধ্যে কি যেন একটু ছিল, তাহা নাই। সেই গৃহ, সেই স্বামী সেই হাসান, সেই জাএদা—সকলই রহিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে কি যেন অভাব হইয়াছে। জাএদা মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, এ দোষ তাঁহার নয়, এ দোষ জয়নাবের। জয়নাবকে তিনি যে, এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, আজও করিলেন, কালও করিলেন, জীবন-শেষ পর্য্যন্ত করিয়া রাখিলেন। সে দোষ ক্রমেই অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া শত্রুভাব আসিয়া দাঁড়াইল। জয়নাব এক্ষণে তাঁহার দুই চক্ষের বিষ। জয়নাবকে দেখিলেই তাঁহার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানুর ভয়ে যে আগুন এক দিন চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশির জ্যোতিঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সেই আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরে আগুন, মুখেও জয়নাব-নাম শ্রবণে তিনি একেবারে আগুন হইয়া উঠিতেন। শেষে হাসনেবানু পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন যে, জাএদা জয়নাবের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানু কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কিন্তু জয়নাবকে মনে মনে ভালবাসিতেন।

হাসান জাএদাকে পূর্ব্ব হইতেই ভালবাসিতেন, যত্নও করিতেন ; এখনও পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তথাপি জাএদার মনে কেন উদাসভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন ; আর কাহারও জানিবার শক্তি নাই।

এক অন্তরে দুই মূর্ত্তি-স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কি প্রকারে সঙ্কুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণীতে স্থান পাইল, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না ; সুতরাং পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষমতা কত ? অপ্রশস্ত অন্তরের আয়ত্ততাই বা কত যে, ঐ মহাপুরুষের কীর্ত্তিকলাপে বুদ্ধি চালনা করি ? মনের কথা মনেই থাকিল। হাসান প্রকাশ্যে স্ত্রী-ত্রয়ের মধ্যে যে, কিছু ইতর-বিশেষ জ্ঞান করিতেন, তাহা কেহ কখনই জানিতে পারেন নাই। তিন স্ত্রীকে তিনি সম-নয়নে দেখিতেন, সমভাবে ভালবাসিতেন ; কিন্তু সেই সমান ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হাসনেবানুকে অপেক্ষাকৃত অধিক মান্য করিতেন। জয়নাব সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ; স্বভাবতঃ তিনি

তাঁহাকে বেশী আদর ও বেশী যত্ন করেন, জাএদার মনে এইটিই বদ্ধমূল হইল। প্রকাশ্যে কোন বিষয়ে বেশী ভালবাসার চিহ্ন জাএদা কখনও দেখিতে পান নাই, তথাপি তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি কোন দিন তাঁহার প্রতি যত্নের ক্রটি, কি কোন বিষয়ে ক্ষতি, কি অণুমাত্রও ভালবাসার লাঘব দেখিলেন না। তথাপি জয়নাব তাঁহার পরম শত্রু, চক্ষের শূল, সুখ-পথের প্রধান কণ্টক!

এমাম হাসান ধর্ম্মশাস্ত্রের অকাট্য বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া জয়নাবকে বিবাহ করেন নাই। ইচ্ছা হইলে এখনও চতুর্থ সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারেন। ভাল-বাসার ন্যূনাধিক্যে তাঁহার কোন স্ত্রী তাঁহাকে কোন নিন্দা করিতে পারেন না। তবে জাএদা এত বিষাদিনী হইলেন কেন? কেন জয়নাবকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন? বোধ হয়, জাএদা ভাবিতেন যে, একটি স্ত্রীর তিনটি স্বামী হইলে সে স্ত্রীলোকটি যে প্রকার সুখী হয়, তিনটি স্ত্রীর এক স্বামীও বোধ হয় সেই প্রকার সুখভোগ করে। কিন্তু সেই স্বামীত্রয়ের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে অসুবিধা, কি কোন কারণে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া আত্ম-কলহ উপস্থিত হয় এবং একের অনিষ্ট-চিন্তায় দ্বিতীয় যত্নবান হয়, তৃতীয় কাহারও স্বপক্ষে, কি উভয়কে শত্রু মনে করিয়া শত্রুবিনাশে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে আমারই বা না হইবে কেন? আমিও ত শরীরী, আমারও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, মাংসপেশী, ধমনী, হৃদয়, শোণিত, অস্থি, চর্ম্ম ও ইচ্ছা—সকলই আছে, তবে মনোভাবের বিপর্য্যয় হইবে কেন? এক উপকরণে গঠিত শরীরে স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন অথবা ভিন্ন ভাব হওয়া অসম্ভব। জগতে শত্রু তিন প্রকার;—প্রথম প্রকৃত শত্রু, দ্বিতীয় শত্রুর বন্ধু, তৃতীয় মিত্রের শত্রু। এই সূত্র-অনুসারে মৈত্রীবন্ধন হইতে হাসান যেন অল্পে অল্পে সরিতে লাগিলেন।

স্বামীর নিরপেক্ষ ভালবাসা জাএদা আর ভালবাসিলেন না। মনের কথা মনেই থাকিল। কোন দিন কোন প্রকারে, কি কোন কথায়, কি কোন কথার প্রসঙ্গেও সে কথা মুখে আনা দূরে থাকুক, কণ্ঠে পর্য্যন্তও আনিলেন না। স্ত্রীলোকমাত্রই স্বভাবতঃ কিছু চাপা। তাহারা কাজ-কর্ম্মে যেমন ভারী, পরিমাণেও তদপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী; সহজে উঠাইতে

কাহারও সাধ্য নাই। এক একটি স্ত্রীলোকের মনের কবাট খুলিয়া যদি চেনা যায়, তাহা হইলে অনেক বিষয় শিক্ষাও পাওয়া যায় এবং মনের অন্ধকার প্রায়ই ঘুচিয়া যায়। সে মনে না আছে এমন জিনিসই নাই; সে হৃদয়-ভাণ্ডারে না আছে এমন কোন পদার্থ ই নাই। জয়নাব হাসনেবানুকে মনের সহিত ভক্তি করিতেন। জাএদাকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় মান্যের সহিত স্নেহ করিতেন। কিছুদিন এই ভাবেই চলিল। কোন কালেই কোন প্রকার লোকের অভাব হয় না। এজিদের চক্রান্তে আবদুল জব্বারের দুরবস্থা হাসান পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার এখন পর্য্যন্তও জয়নাবের মোহিনী-মূর্ত্তি এজিদের চক্ষে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। তাঁহার বিবাহের পর এজিদের প্রতিজ্ঞা, মাবিয়ার ভৎ´সনা, সকল কথাই মদিনায় আসিয়াছে। কোন কথা শুনিতে তাঁহার আর বাকী নাই। মাবিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও বলহীন হইতেছেন, বাঁচিবার ভরসা অতি কম, তাহাও তিনি লোকমুখে শুনিতেছেন। এজিদের সহিত বাল্যকালে বাল্যক্রীড়ায় ঝগড়াবিবাদ হইত, এজিদ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে পারিত না, একথাও হাসান সময় সময় গল্পচ্ছলে জয়নাবকে শুনাইতেন। এক্ষণে জয়নাব-লাভে বঞ্চিত হইয়া শত্রুভাব সহস্রগুণে এজিদের অন্তরে দৃঢ়রূপে স্থায়ী হইয়াছে, তাহাও জয়নাবকে বলিতেন। হাসান অনেক লোকের মুখে অনেক কথা শুনিতেন; সে সকল কথায় মনোযোগ দিয়া, কি বিশ্বাস করিয়া তাহার আদি-অন্ত তন্ন তন্ন করিয়া কখনই শুনিতেন না। সাধারণের মুখে এক কথার শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া শতসহস্র পত্রে পরিণত হয়। সে সময় মূল কথা অণুমাত্রও বিশ্বাসের উপযুক্ত হয় না - হাসান তাহাই বিবেচনা করিয়া এক কর্ণে শুনিতেন, অন্য কর্ণে বাহির করিয়া দিতেন। ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্মচর্চ্চাই জীবনের একমাত্র কার্য্য মনে করিয়া, তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও মদিনার রাজা, কিন্তু রাজ-সিংহাসনের পারিপাট্য নাই, সৈন্য-সামন্ত ধন-জন কিছুই নাই। কিন্তু আবশ্যক হইলে ভগবৎপ্রসাদে কিছুর অভাবও নাই। মদিনাবাসীরা হাসান-হোসেন, এই দুই ভ্রাতার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর; তাঁহাদের কার্য্যে, তাঁহাদের বিপদে বিনা অর্থে, বিনা স্বার্থে, বিনা লাভে জীবন দিতে প্রস্তুত।

হাসান সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাধা করিয়া তস্‌বীহ্ (জপমালা) হস্তে উপাসনা-মন্দির সম্মুখে পদচালনা করিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ফকির জাতীয় প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ফকিরের মলিন বেশ, শতগ্রন্থিযুক্ত পরিধান, মলিন বস্ত্রে শির আবৃত, গলায় প্রস্তরের তস্‌বীহ্, হস্তে কাষ্ঠযষ্ঠি। হাসানের কিঞ্চিৎদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বৃদ্ধ বলিলেন; "প্রভো! আমি একটি পর্ব্বতের উপর বসিয়াছিলাম। দেখি যে, একজন কাসেদ আসিতেছে। হঠাৎ ঈশ্বরের নাম করিয়া সেই কাসেদ ভূতলে পতিত হইল। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নিকটস্থ হইয়া দেখি যে, একটি লৌহশর তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া, কঠিন প্রস্তরখণ্ড বিদ্ধ করিয়াছে। শোণিতের ধারা বহিয়া চলিতেছে। কোথা হইতে কে শরনিক্ষেপ করিল! লঘুহস্তে শরনিক্ষেপ এমন সুনিপুণ যে, এক বাণে পথিকের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভেদ করিল! তখনও তাহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। অস্ফুট স্বরে দুই একটি কথা যাহা শুনিলাম, আর ভাবেও যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহার মর্ম্ম এই যে, হজরত মাবিয়া আপনার নিকট কাসেদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পীড়িত, বাঁচিবার ভরসা অতি কম। জীবনের শেষ দেখাশুনার জন্যই আপনাকে সংবাদ দিতে, বোধ হয়, কাসেদ আসিতেছিল। আমি দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, এজিদ অশ্বোপরি বীরসাজে ধনুহস্তে বেগে আসিতেছে; পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে তূণীর ঝুলিতেছে। দেখিয়াই পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইলাম। আড়াল হইতে দেখিলাম, এজিদ অশ্ব হইতে নামিয়া পথিকের কটিবন্ধ খুলিয়া একখানি পত্র লইয়া অশ্বে কশাঘাত করিতে করিতে চক্ষুর অগোচর হইল। আপনার নিকট সেই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আর আমার কোন কথা নাই।"—এই বলিয়া আগন্তুক ফকির পুনরভিবাদন করিয়া একটু দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

হাসান ভাবিতে লাগিলেন: ফকির কে? কেনই বা আমাকে এ সংবাদ দিতে আসিয়াছিল? কথার স্বর ও মুখচ্ছবি একেবারে অপরিচিত বলিয়াও বোধ হইল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফকিরের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি শেষে

সাব্যস্ত করিলেন যে, এ ফকির আর কেহই নয়, এ সেই আবদুল জব্বার। একে একে আবদুল জব্বারের অবয়ব, ভাব-ভঙ্গী, কথার স্বরে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইল যে,—আর কেহই নয়, এ সেই আবদুল জব্বার। কি আশ্চর্য্য! মানুষের অবস্থা কখন কিরূপ হয়, কিছুই জানিতে পারা যায় না। হজরত মাবিয়ার কথা যেরূপ শুনিলাম, ইহাতে তাঁহার জীবনাশা নাই বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, হোসেনের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা করিতে হয় করিব; এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম প্রবাহ

মাবিয়া পীড়িত। এক্ষণে নিজবশে আর উঠিবার শক্তি তাঁহার নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এজিদের মুখ দেখিবেন না। দামেস্করাজ্য যাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য, তাঁহাদিগকে দিয়া যাইবেন, মনে মনে স্থির করিয়া হাসান-হোসেনকে আনিবার জন্য তিনি কাসেদ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত আসিতেছেন না, সে জন্য তিনি মহাব্যস্ত ও চিন্তিত। সেই কাসেদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি প্রধান উজীর হামানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসান-হোসোনের এত দিন না আসিবার কারণ কি?"

হামান্ উত্তর করিলেন, "কাসেদ যদি নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় যাইয়া থাকে, তবে হাসান-হোসেনের না আসিবার কারণ আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না। আপনার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা যে নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছেন, ইহা কখনই বিশ্বাস্য নহে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কাসেদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে।"

এজিদ সেই রাত্রি হইতে আর মাবিয়ার সম্মুখে যাইতেন না, গুপ্তভাবে অর্থাৎ মাবিয়ার দৃষ্টির অগোচরে কোনস্থানে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। মাবিয়া হামানের সঙ্গে যে কথা কহিতেছেন, তাহাও তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া সমুদয় শুনিতেছেন। মাবিয়া ক্ষণকাল পরে

আবার মৃদু-মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এ রাজ্যে মঙ্গলের আর সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কাসেদ কোন বিপদে পড়িয়াছে। তাঁহারা মদিনায় না থাকিলে, অবশ্যই কাসেদ ফিরিয়া আসিত। যাহাই হউক, আমার চিরবিশ্বাসী বহুদর্শী মোস্‌লেমকেই পুনরায় মদিনায় পাঠাও। আর হাসান-হোসেনের নিকট আমার পক্ষ হইতে একখানি প্রার্থনাপত্র লিখিয়া মোস্‌লেমের সঙ্গে দাও। তাহাতে লিখিয়া দাও 'আমার বাঁচিবার আশা নাই। পাপময় জগৎ পরিত্যাগের পূর্ব্বে আপনাদের উভয় ভ্রাতাকে একবার স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি। আরও একটি কথা আমি স্থির-সঙ্কল্পে মনস্থ করিয়াছি। আপনাদের এই পৈতৃক দামেস্ক রাজ্য আপনাদিগকে প্রত্যর্পণ করিব, আমার আর রাখিবার সাধ নাই।' এ কথাও লিখিও—'আপনাদিগকে এই সিংহাসনে বসিতে দেখিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।' হামান্! মোস্‌লেমকে বিশেষ সাবধানে মদিনায় পাঠাইও। নানা প্রকারের সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত ও উদয় হইয়াছে; (এজিদ এই মাত্র শুনিয়া হামানের অদৃশ্যে তথা হইতে অতি ত্রস্তে প্রস্থান করিলেন।) এত গোপনে মোস্‌লেমকে পাঠাইবে যে, তাহার সন্ধান যেন আর একটি প্রাণীও না জানিতে পারে।" হামান বিদায় হইলেন, এবং রাজাদেশ প্রতিপালন করিয়া তখনি মোস্‌লেমকে মদিনায় পাঠাইলেন।

এমামভক্ত মোস্‌লেম উর্দ্ধশ্বাসে মদিনাভিমুখে চলিলেন। মোস্‌লেম পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। ক্রমে রাজধানী ছাড়িয়া তিনি একটি প্রশস্ত বালুকাময় প্রান্তরমধ্য দিয়া যাইতেছেন। বালুকাময় ভূমি রৌদ্রের উত্তাপে অগ্নিময় হইয়া মোস্‌লেমের গমনে বিশেষ বাধা দিতেছে। কি করেন? শীঘ্র যাইতে হইবে, কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছেন। অনেক স্থলেই ভূমি সমতল নহে, স্থানে স্থানে প্রস্তরকণার ন্যায় স্তূপাকার বালুকারাশি প্রস্তরে পরিণত হইবে বলিয়া ভূমি হইতে শিরোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মোস্‌লেম দেখিলেন: তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্তূপাকারের আড়াল হইতে চারিজন অস্ত্রধারী পুরুষ বেগে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঐ আক্রমণকারী-দিগের মুখ বস্ত্র দ্বারা এরূপে আবৃত যে, তাহাদের স্বরূপ এবং আকৃতি কিছুই দেখা যাইতেছিল না। মোস্‌লেম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা কে?

কেনই বা আমার গমনে বাধা দিতেছ ?" তাহাদের মধ্য হইতে এক জন গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল, "মোস্‌লেম! তোমার সৌভাগ্য যে, আজ তুমি কাসেদ-পদে বরিত হইয়াছ। তাহা না হইলে জিজ্ঞাসা করার অবসর পাইতে না,—"তোমরা কে ?" এ কথা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই তোমার শির বালুকায় গড়াগড়ি যাইত, দেহটিও দিব্যি লোহিত রঙে রঞ্জিত হইয়া ধরাশায়ী হইত; পরিশ্রম করিয়া আর হাঁটিয়া কষ্ট করিতে হইত না। যাহা হউক, যদি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিতে চাও, তবে আর এক পদও অগ্রসর হইও না।"

"কেন হইব না; আমি রাজ-কাসেদ, হজরত মাবিয়ার পীড়ার সংবাদ লইয়া মদিনা শরীফে এমাম হাসান-হোসেনের নিকট যাইতেছি, কাহার সাধ্য আমার গতিরোধ করে ?"—এই বলিয়া মোস্‌লেম যাইতে অগ্রসর হইলেন। তাহারাও বাধা দিতে লাগিল। মোস্‌লেম অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, "কার সাধ্য ? কে মোস্‌লেমের পথরোধ করে ? গমনে কে বাধা দেয় ?"—এই বলিয়া মোস্‌লেম চলিলেন। এত দ্রুতবেগে মোস্‌লেমের তরবারি সঞ্চালিত হইতে লাগিল যে, পরিষ্কৃত অসির চাক্‌চিক্যে সকলের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া গেল, এক পদও আর মোস্‌লেমের দিকে কেহ অগ্রসর হইতে পারিল না। উহার মধ্য হইতে এক জন হঠাৎ মুখের বস্ত্র খুলিয়া বলিতে লাগিল, "মোস্‌লেম, তোমার চক্ষু কোথায় ?" মোস্‌লেমের চক্ষু যেমন তাহার মুখের প্রতি পড়িল, অমনি তিনি তরবারি হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। এজিদের আদেশে সঙ্গীরা মোস্‌লেমের অঙ্গ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইল। মাবিয়ার পত্রখানি এজিদ স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "যত দিন মাবিয়ার মৃত্যু না হয়, তত দিন তোমাকে বন্দী অবস্থায় নির্জ্জন কারাবাসে থাকিতে হইবে। তুমি ত বড় ঈশ্বরভক্ত, মাবিয়ার মৃত্যু-কামনাই তোমার আজ হইতে প্রার্থনার এক প্রধান অঙ্গ করিয়া দিলাম। যাও, ঐ লৌহশৃঙ্খল পরিয়া অনুচরদিগের সহিত মহানন্দে নাচিতে নাচিতে যেখানে উহারা লইয়া যায়, সেইখানে গমন কর।"

মোস্‌লেম কিছুই বলিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেন কাষ্ঠ-

পুত্তলিকার ন্যায় এজিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনুচরেরা লৌহশৃঙ্খলে মোস্‌লেমের হস্তপদ বন্ধন করিল, শেষে গলদেশে শিক বাঁধিয়া লইয়া চলিল—হায় রে স্বার্থ!

এজিদ বংশীবাদন করিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র একটি বৃহৎ বালুকাস্তূপের পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইল। এজিদ অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে চলিয়া আসিলেন। চারি জন প্রহরী মোস্‌লেমকে বন্দী করিয়া ঘিরিয়া লইয়া চলিল।

নবম প্রবাহ

দামেস্ক-রাজপুরীমধ্যে পুরবাসিগণ, দাসদাসীগণ মহা ব্যতিব্যস্ত! সকলেই বিষাদিত। মাবিয়ার জীবন সঙ্কটাপন্ন—বাক্‌রোধ হইয়াছে, চক্ষুতারা বিবর্ণ হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে, কথা কহিবার শক্তি নাই! এজিদের জননী নিকটে বসিয়া স্বামীর মুখে সরবত দিতেছেন, দাসদাসীগণ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, আত্মীয়স্বজনেরা মাবিয়ার দেহ বেষ্টন করিয়া একটু উচ্চস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। হঠাৎ মাবিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া "লা—এলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদর রসুলাল্লাহ্" এই শব্দ করিয়া উঠিলেন। সকলে গোলযোগ করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "এবার রক্ষা পাইলেন; এবার আল্লাহ্ রেহাই দিলেন।" আবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে ঐ কয়েকটি কথা ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইল। সেবার আর বিলম্ব হইল না। অমনি আবার ঐ কয়েকটি কথা পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিলেন। কেহ আর কিছুই দেখিলেন না। কেবল ওষ্ঠ দুইখানি একটু সঞ্চালিত হইল মাত্র। উর্দ্ধ-চক্ষু নীচে নামিল। নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষের পাতা অতি মৃদু-মৃদুভাবে আসিয়া চক্ষুর তারা ঢাকিয়া ফেলিল। নিশ্বাস বন্ধ হইল; এজিদের জননী মাবিয়ার বক্ষে হস্ত দিয়া স্পর্শ করিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই মাবিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। এজিদ অশ্ব হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন: মাবিয়ার চক্ষু নিমীলিত, বক্ষঃস্থল অস্পন্দ! একবার তাঁহার মস্তকে, একবার বক্ষে হাত

দিয়াই এজিদ চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেহই এজিদের চক্ষে জল দেখিতে পাইল না। এজিদ পিতার মৃতদেহ যথারীতি স্নান করাইয়া "কাফন" * দ্বারা শাস্ত্রানুসারে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া মৃতদেহের সদ্‌গতি উপাসনা (জানাজা) করাইতে তাবুতশায়ী † করাইয়া সাধারণের সম্মুখে আনয়ন করিলেন। বিনা আহ্বানে শত শত ধার্ম্মিক পুরুষ আসিয়া জানাজাক্ষেত্রে মাবিয়ার বস্ত্রাবৃত শবদেহের সমীপে ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই করুণাময় ভগবানের উদ্দেশে দুই হস্ত তুলিয়া মাবিয়ার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে "দাফন" (মৃত্তিকাপ্রোথিত) করিয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

মাবিয়ার জীবনের লীলাখেলা একেবারে শেষ হইল। ঘটনা এবং কার্য্য স্বপ্নবৎ কাহারও কাহারও মনে জাগিতে লাগিল। হাসান-হোসেন মদিনা হইতে দামেস্কের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াই মাবিয়ার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আর নগরে প্রবেশ করিলেন না। মাবিয়ার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার মদিনায় যাত্রা করিলেন। মাবিয়া জগতের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন; রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তথা হইতে আর ফিরিবেন না, এজিদের মুখও আর দেখিবেন না, এজিদকে পাপ-কার্য্য হইতে বিরত এবং হাসান-হোসেনের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করিতেও আর আসিবেন না, এজিদকে ভর্ৎসনাও আর করিবেন না—এজিদ মনে মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দামেস্ক রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। রাজমুকুট তাঁহার শিরে শোভা পাইতে লাগিল। সত্যবাদী, নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ, যাঁহারা হজরত মাবিয়ার স্বপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আমরাও বিষাদ-সিন্ধুর তটে আসিলাম। এজিদ এক্ষণে স্বাধীন রাজ্যের রাজা। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, ইহা ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল। রাজ-দরবার লোকে লোকারণ্য। পূর্ব্বদিন ঘোষণা করা হইয়াছে, যেন শহরের সম্ভ্রান্ত লোকমাত্রেই দরবারে উপস্থিত হন। অনেকের মনেই অনেক কথা উঠিল। কি করেন,

* কাফন—শবাচ্ছাদন-বসন

† তাবুত—শেষ শয়নাসন

রাজাজ্ঞা! নিয়মিত সময়ে সকলেই "আম" দরবারে উপস্থিত হইলেন। এজিদও উপযুক্ত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন। প্রধান মন্ত্রী মারওয়ান দরবারস্থ সমুদয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আজ আমাদের সুখের দিন, আজ আমরা এই দামেস্ক-সিংহাসনে নবীন রাজের অধিবেশন দেখিলাম। উপযুক্ত পাত্রেই আজ রাজসিংহাসন সুশোভিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ! আজ হইতে আপনাদের দুঃখ ঘুচিল। দামেস্ক রাজ্যে আজ হইতে যে সুখ-সূর্য্যের উদয় হইল, তাহা আর অস্তমিত হইবে না। আপনারা এই নবোদিত সূর্য্যকে কায়মনে পুনরায় অভিবাদন করুন!" সভাস্থ সকলেই নতশিরে এজিদকে অভিবাদন করিলেন। মারওয়ান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মহোদয়গণ! আমার একটি কথা আছে। আজ মহারাজ এজিদ সবেমাত্র রাজদণ্ড হস্তে করিয়াছেন, এবং আজই একটি গুরুতর বিচারভার ইঁহাকে বহন করিতে হইতেছে। আপনাদের সম্মুখেই রাজদ্রোহীর বিচার করিবেন বলিয়া তিনি আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।"

মারওয়ানের পূর্ব্ব আদেশানুসারে প্রহরীরা মোস্‌লেমকে বন্ধন অবস্থায় রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিল। সভাস্থ সকলে মোস্‌লেমের দুরবস্থা দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মাবিয়ার এত বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র এত সম্মানাস্পদ, এত স্নেহাস্পদ, সেই মোস্‌লেমের এই দুরবস্থা! কি আশ্চর্য্য! আজিও মাবিয়ার দেহ ভূগর্ভে বিলীন হয় নাই, অনেকেই আজ পর্য্যন্ত শোকবস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই, মাবিয়ার নাম এখনও সকলের জিহ্বাগ্রেই রহিয়াছে, আজ সেই মাবিয়ার প্রিয় বন্ধুর এই দুর্দ্দশা! কি সর্ব্বনাশ! এজিদের অসাধ্য কি আছে? অনেকেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আর মঙ্গল নাই। দামেস্ক রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। কি পাষাণহৃদয়! উঃ!! এজিদ কি পাষাণ-হৃদয়!! কিন্তু কাহারও মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিবার সাহস হইল না; সকলেই কেবল মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলেন। মোস্‌লেম চিন্তায় ও মনস্তাপে ক্ষীণকায় হইয়াছেন। এজিদ বলিয়াছেন—মাবিয়ার মৃত্যুতেই তাঁহার মুক্তি, কিন্তু মাবিয়া আছেন কি না, মোস্‌লেম তাহাও স্থির করিতে পারিলেন

না। কেহ কোন কথা তাঁহাকে বলিতে পারিবে না এবং তাঁহার কথাও কেহ জানিতে পারিবে না,—পূর্ব্ব হইতেই এজিদের এই আজ্ঞা ছিল। সুতরাং মোস্‌লেমকে কোন কথা বলে, কাহার সাধ্য?

নগরের প্রায় সমুদয় ভদ্রলোককে একত্র দেখিয়া মোস্‌লেম কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি মনে মনে জানেন: কোন অপরাধে তিনি অপরাধী নহেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন, ইহাতে যদি এজিদ অন্যায়াচরণ করেন, তবে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও তিনি কিছু বলিবেন না, মুক্তিলাভের প্রার্থনাও করিবেন না। তিনি মাবিয়ার আজ্ঞাক্রমেই হাসান-হোসেনের নিকট মদিনায় যাইতেছিলেন; ইহাই যদি অপরাধের কার্য্য হয়, আর সেই অপরাধেই যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি তিনি চিত্ত বিচলিত করিবেন না।—মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া মোস্‌লেম দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক মারওয়ান কহিলেন, "এই ব্যক্তি রাজদ্রোহী, আজ ইহারই বিচার হইবে। আমাদের নব দণ্ডধর আপনাদের সম্মুখে ইহার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।"

এজিদ বলিলেন, "এই কাসেম বিশ্বাসী নহে। যাহারা ইহাকে বিশ্বাসী বলিয়া স্থির করিয়াছে, এবং ইহার অনুকূলে যাহারা কিছু বলিবে, তাহারাও বিশ্বাসী নহে। আমার বিবেচনায় ইহার স্বপক্ষের লোকমাত্রেই অবিশ্বাসী, রাজদ্রোহী।"

সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভয়ে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। যাঁহারা মোস্‌লেমের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

এজিদ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন: "এই মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক আমার বিবাহ-পয়গাম লইয়া জয়নাবের নিকট গিয়াছিল। আমার পয়গাম গোপন করিয়া আমার চিরশত্রু হাসান,—যাহার নাম শুনিলে আমার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, সেই হাসানের পয়গাম জয়নাবের নিকট বলিয়া জয়নাবের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমার পয়গাম জয়নাবের কর্ণগোচর হয় নাই। আমার নাম শুনিলে জয়নাব কখনই হাসানকে 'কবুল'

করিত না। হাসানের অবস্থা সম্বন্ধে জয়নাবের অবিদিত কিছুই নাই। কেবল মিথ্যাবাদীর চক্রান্তে জয়নাব-রত্ন শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। আরও কথা আছে—এই মিথ্যাবাদী যাহা বলে, তাহাই যদি সত্য বিবেচনা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার অপরাধ আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। সে আমার চিরশত্রুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। হাসানের পয়গাম জয়নাবের নিকট লইয়া যাইতে আমি ইহাকে নিয়োজিত করি নাই। ইহার অপরাধের শাস্তি হওয়া আবশ্যক। সে না জানিয়া এই কার্য্য করিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। জয়নাব-লাভের জন্য আমি যাহা করিয়াছি, তাহা কে না জানে? মোস্‌লেম কি জানে না যে, জয়নাবের জন্য আমি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম? সেই জয়নাবের বিবাহে সে আমার পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া আসিল, ইহা অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা আর কি আছে? আরও একটি কথা—এই সকল কুকার্য্য করিয়াও এই ব্যক্তি ক্ষান্ত হয় নাই; আমারই সর্ব্বনাশের জন্য, আমাকেই রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত, আমাকেই পথের ভিখারী করিবার আশায় মাবিয়ার পত্র লইয়া হাসানের নিকট মদিনায় যাইতেছিল। অতএব আমার এই আজ্ঞা যে, অবিলম্বেই মোস্‌লেমের শিরশ্ছেদন করা হউক।” সরোষে কাঁপিতে কাঁপিতে এজিদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “সে দণ্ড বধ্যভূমিতে হইবে না, অন্য কোনও স্থানে হইবে না; এই সভাগৃহে—আমার সম্মুখেই আমার দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালিত হউক।”

মারওয়ান বলিলেন, “রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে দণ্ডবিধান রাজনীতির বিরুদ্ধ।”

এজিদ বলিলেন, “আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। যে ইহার বিরোধী হইবে তাহারও ঐ শাস্তি। মারওয়ান সাবধান!”

সকলের চক্ষু যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। এজিদের মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই হতভাগ্য মোস্‌লেমের ছিন্নশির ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। জিঞ্জিরাবদ্ধ দেহ শোণিতাক্ত হইয়া সভাস্থলে পড়িয়া সভ্যগণের মোহ ভঙ্গ করিল। তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন: মোস্‌লেম আর নাই। রক্তমাখা দেহ

মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। মোস্‌লেমের পবিত্র শোণিত-বিন্দুর পরমাণু অংশে দামেস্ক-রাজভবনের পবিত্রতা, সিংহাসনের পবিত্রতা, দরবারের পবিত্রতা, ধর্ম্মাসনের পবিত্রতা, মাবিয়া যাহা বহুকষ্টে সঞ্চয় করিয়াছিলেন সেই সমস্ত পবিত্রতা—আজ মোস্‌লেমের ঐ শোণিত-বিন্দুর প্রতি পরমাণুতে মিশিয়া বিকট অপবিত্রতার আসন পাতিয়া দিল। মোস্‌লেমের দেহবিনির্গত রক্তধারে "এজিদ! ইহার শেষ আছে!"—এই কথা কয়টি প্রথমে অঙ্কিত হইয়া রক্তস্রোত সভাস্থলে বহিয়া চলিল। এজিদ সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন, "অমাত্যগণ! প্রধান প্রধান সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষ-গণ! এবং সভাস্থ মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আমার আজ্ঞা যে কেহ অমান্য করিবে, যে কেহ অণুমাত্র অবহেলা করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মোস্‌লেমের ন্যায় শাস্তি ভোগ করিবে। আমার অভাব নাই। হাসান-হোসেনের যাহা আছে, তাহাও কাহার অজ্ঞাত নাই। সেই হাসানের এত বড় সাহস! এত বড় স্পর্দ্ধা! ভিখারিণীর পুত্র হইয়া রাজরাণীর পাণিগ্রহণ! যে জয়নাব রাজরাণী হইত, সে-ই ভিখারিণী-পুত্র তাহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছে! আমি উহার বিবাহের সাধ মিটাইয়া দিব। জয়নাবকে লইয়া সুখভোগ করিবার সমুচিত প্রতিফল দিব। কে রক্ষা করিবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? এজিদ জগতে থাকিতে জয়নাবকে লইয়া সে কখনই সুখী হইতে পারিবে না। এখনও আমার অন্তরে আশা আছে, যদিও সে আশায় একপ্রকার নিরাশ হইয়াছি। হাসান বাঁচিয়া থাকিতে জয়নাব-লাভ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। তথাপি মহা-আসক্তি আগুনে এজিদের অন্তর সর্ব্বদা জ্বলিতেছে। যদি আমি মাবিয়ার পুত্র হই, তবে হাসান-হোসেনের বংশ একেবারে নিপাত না করিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিব না। শুধু হাসানের মৃতদেহ দেখিয়াই যে, সে মহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে তাহা নহে, হাসান বংশের-সকলের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়াই যে এজিদ ক্ষান্ত হইবে তাহাও নহে; মোহাম্মদের বংশের একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিতে এজিদ ক্ষান্ত হইবে না; তাহার মনোবেদনাও মন হইতে বিদূরিত হইবে না। আমার অভাব কি? কাহারও সাহায্য চাহি না; হিতোপদেশ অথবা পরামর্শের প্রত্যাশা রাখি না।

যাহা করিব, তাহা মনেই থাকিল। তবে এইমাত্র বলি যে, হাসান-হোসেনের এবং তাঁহাদের বংশানুবংশ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি এজিদ যে দৌরাত্ম্য-অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে, যদি তাহা কখন নিবিয়া যায়, যাইতে পারে, কিন্তু সে তাপ 'রোজ-কেয়ামত' (জগতের শেষ দিন) পর্য্যন্ত মোহম্মদীয়গণের মনে একই ভাবে জাগরিত থাকিবে। আবার যাহারা হাসান-হোসেনের বেশী ভক্ত, তাহারা আজন্মকাল ছাতি পিটিয়া * 'হায় হাসান! হায় হোসেন!' বলিয়া কাঁদিতে থাকিবে।"

সভ্যগণকে এই সকল কথা বলিয়া এজিদ পুনরায় মারওয়ানকে বলিলেন, "হাসান-হোসেনের নিকট যে পত্র পাঠাইবে, সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া ইঁহাদিগকে একবার শুনাইয়া দাও, ইঁহাদিগের মধ্যে মোহাম্মদভক্ত অনেক আছেন।"

মারওয়ান পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"হাসান! হোসেন!

তোমরা কি এপর্য্যন্ত শুন নাই যে, মহারাজাধিরাজ এজিদ নামদার মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসম দামেস্ক সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন? অধীনস্থ রাজা-প্রজামাত্রেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া কেহ বা উপঢৌকন প্রেরণ, কেহ বা স্বয়ং আসিয়া অবনত শিরে চির-অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং আপন আপন রাজ্যের নির্দ্ধারিত দেয় করে দামেস্ক-রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। তোমাদের মক্কা-মদিনার খাজানা আজ পর্য্যন্ত না আসিবার কারণ কি? স্বয়ং মহারাজাধিরাজ দামেস্কাধিপতির আম-দরবারে উপস্থিত হইয়া নতশিরে ন্যূনতা স্বীকারে সিংহাসন চুম্বন কর। আর এই পত্র প্রাপ্তিমাত্রই এজিদ নামদারেরর নামে খোৎবা † পাঠ করিবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই রাজদ্রোহীর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

মারওয়ান
প্রধান মন্ত্রী"

---

* মহরমের সময়ে শিয়াগণকে অনেকেই বক্ষে করাঘাত করিতে দেখিয়াছেন, তাহাকেই 'ছাতিপেটা' কহে।

† ঈদলফেতর, ইহুজ্জোহা,—এই দুই ঈদ এবং জুমার নামাজ (উপাসনা) যাহা

পত্র পাঠ শেষ হইল। তখনি উপযুক্ত কাসেদের হস্তে পত্র দিয়া রাজা সভাভঙ্গের আজ্ঞা দিলেন। অনেকেই বিষাদপূর্ণনেত্রে অশ্রুপাত করিতে করিতে সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

দশম প্রবাহ

নূরনবী মোহাম্মদের রওজায় * অর্থাৎ সমাধি-প্রাঙ্গণে হাসান-হোসেন, সহচর আবদুল্লাহ, ওমর এবং রহমান একত্রে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। যখন কোন বিপদভার মস্তকে আসিয়া পড়ে, কোনরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, অথবা কোন অভাবনীয় চিন্তা সদ্‌যুক্তি সংপরামর্শ করিবার

প্রতি শুক্রবারে দুই প্রহরের পর হইয়া থাকে, ঐ তিন উপাসনার পর আরবী ভাষায় ঈশ্বরের গুণানুবাদের পর উপাসনা বর্ণনা, পরে স্বজাতীয় রাজার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু ও রাজ্যের স্থায়িত্ব কামনা করা হয়। ভারতীয় মুসলমানগণ পূর্ব্বে দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌গণের নামে খোৎবা পাঠ করিতেন।

* উক্ত হইয়াছে, হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিয়াল আউয়ল সোমবার দিবা ৭ম ঘটিকার সময় ৬৩ বৎসর বয়সে প্রভু মোহাম্মদ পবিত্র ভূমি মদিনায় মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্, মাতার নাম আমেনা খাতুন। প্রভুর দেহ-ত্যাগের পর কোথায় সমাধি হইবে, এই বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইলে, হজরত আবুবকর এই মীমাংসা করেন যে, পয়গম্বর সাহেব জীবিতাবস্থায় যে স্থানকে প্রিয় মনে করিতেন, সেই স্থানে সমাধি হওয়া আবশ্যক। সকলে ঐ মতের পোষকতা করায় বিবি আয়েশার ঘরে সমাধি দেওয়া সুস্থির হইল। বিবি আয়েশা হজরত আবুবকরের কন্যা এবং হজরত মোহাম্মদের সহধর্ম্মিণী। মোহাম্মদের সমাধিস্থানকে রওজা কহে। হজরত ওমর প্রথমতঃ কাঁচা ইটের দ্বারা রওজা গাঁথুনী করেন। তৎপরে অলিন্দ চতুঃসীমাবন্দী করিয়া নক্সাদার প্রস্তর দ্বারা উহা প্রস্তুত করেন। রওজার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। হিজরী ৫৫০ সালে ইস্পাহান নিবাসী জামালদ্দিন, চন্দন কাষ্ঠের ঝাজুরিদার রেল দ্বারা রওজার চতুর্দ্দিক আবদ্ধ করিয়া দেন। সেই সময়ে এবনে আবুয়ল হাজী শরীফ মিশরের বহুমূল্য শ্বেতবর্ণ চাদর আনাইয়া, উক্ত চাদরের উপরে লোহিতবর্ণ রেশমসূত্রে কোর-আণ শরীফের সুরা ইয়াসীন লিখাইয়া তদ্দ্বারা ঐ পবিত্র সমাধি আবৃত করেন, সেই সময় হইতে আবরণপ্রথা প্রতি বৎসর প্রচলিত হইয়াছে। যিনি মিশরের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন, তিনি বহুমূল্য নূতন বস্ত্র দ্বারা প্রতি বৎসর ঐ সমাধিমন্দির আবৃত করিয়া থাকেন। বিনা বাক্যব্যয়ে সেই প্রথা আজও

আবশ্যক হইয়া উঠিত, হাসান-হোসেন উভয়ে মাতামহের সমাধিপ্রাঙ্গণে আসিয়া যুক্তি, পরামর্শ এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে মত স্থির করিতেন। আজ কিসের মন্ত্রণা? কি বিপদ? বাহ্যিকভাবে, মুখের আকৃতিতে স্পষ্টই যেন কোন ভয়ানক চিন্তার চিত্র চিত্রিত। কি চিন্তা? পাঠক! ঐ দেখুন, সমাধিপ্রাঙ্গণে সীমানির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে কে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রভু মোহাম্মদের সমাধিপ্রাঙ্গণের সীমামধ্যে অন্য কাহারও যাইবার রীতি নাই। দর্শক, পূজক, আগন্তুক সকলের জন্যই চতুষ্পার্শ্বস্থ নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে থাকিয়া জেয়ারাত (ভক্তিভাবে দর্শন) করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

পাঠক! যে লোক দাঁড়াইয়া আছে, উহাকে কি কখনও দেখিয়াছেন? একটু স্মরণ করুন, অবশ্যই মনে পড়িবে। এই আগন্তুক দামেস্কের কাসেদ। আর হাসানের হস্তে ঐ যে কাগজ দেখিতেছেন, ঐখানি সেই পত্র—যাহা দামেস্কের রাজদরবারে মারওয়ান পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। ওমর বলিলেন, "কালে আরও কত হইবে। এজিদ মাবিয়ার পুত্র। যে মাবিয়া নূরনবী হজরত মোহাম্মদের প্রধান ভক্ত ছিলেন, দেহ-মন-প্রাণ সকলই আপনার মাতামহের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার পুত্র মক্কা-মদিনার খাজানা চাহিতেছে! এজিদের নামে খোৎবা পাঠ করিতে লিখিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! আরও কতই হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?"

আবদর রহমান বলিলেন, "এজিদ পাগল হইয়াছে! নিশ্চয়ই পাগল! পাগল ভিন্ন আর কি বলিব? এই অসীম জগতে এমন কেহই নাই যে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মক্কা-মদিনার কর চাহিতে পারে। এজিদ যে মুখে এই সকল কথা বলিয়াছে, সেই মুখের শাস্তি বিশেষ করিয়া দেওয়া উচিত।

পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ৬৭৮ হিজরীতে কালাউন সালেহীর রাজত্বকালে মদিনার মসজিদের ছাদ হইতে উচ্চ সবুজ রঙ্গের "কোব্বা" (চূড়া) সমাধি মন্দিরের উপর স্থাপিত হইয়াছে। সেই সুরঞ্জিত উচ্চ চূড়া আজও পর্য্যন্ত অক্ষয়ভাবে রহিয়াছে। হিজরী এক হাজার (১০০০) সালে সুলতান সোলেমান খাঁ রুম রওজা শরীফের প্রাঙ্গণ শ্বেতবর্ণ প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত করাইয়াছেন, ওমর এব্‌নে-আবদুল আজিজ খানের শাসন-কালের পর রওজা প্রাঙ্গণের মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যাত্রীরা চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিংয়ের বাহিরে থাকিয়া দর্শনলাভ করে। চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং বস্ত্রাবরণে সদাসর্ব্বদা আবৃত থাকে।

ইহাতে পরামর্শ আর কি ? আমার মতে কাসেদকে পত্রসহ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়াই সমুচিত বিধি। এ পাপপূর্ণ কথাঙ্কিত পত্র পুণ্যভূমি মদিনায় থাকিবার উপযুক্ত নহে।"

ওমর বলিলেন, "ভাই! তোমার কথা অবহেলা করিতে পারি না। দুরাত্মার কি সাহস! কোন্ মুখে এমন কথা উচ্চারণ করিল ? কি হিসাবে পত্র লিখিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া পাঠাইল ? উহার নিকটে কি কোন ভাল লোক নাই ? এক মাবিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামেস্ক হইতে কি সকলেই চলিয়া গিয়াছে ?"

আবদর রহমান বলিলেন, "পশুর নিকটে কি মানুষের আদর আছে ? হামান—নামে মাত্র মন্ত্রী। হামানের কোন কথাই এজিদ শুনিতে চায় না। মারওয়ানই আজকাল দামেস্কের প্রধান মন্ত্রী, সভাসদ, প্রধান মন্ত্রদাতা, এজিদের প্রধান গুরু; বুদ্ধি, বল, যাহা কিছু সকলই মারওয়ান—এই ত সকলের মুখে শুনিতে পাই!"

হাসান বলিলেন, "এ যে মারওয়ানের কার্য্য তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় এ পত্র ফিরাইয়া দেওয়াই উচিত।"

হজরত এমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হজরত হোসেন একটু রোষভরে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন, আর যাহাই বিবেচনা করুন, কেবলমাত্র পত্রখানা ফেরত দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। কম্‌জাৎ বাঁদীবাচ্ছা কী ভাবিয়াছে ? ওর এতদূর স্পর্দ্ধা যে, আমাদিগকে তার অধীনতা স্বীকার করিতে পত্র লিখে ? আমরা তাকে শাহান্‌শাহ (সম্রাট্) বলিয়া মান্য করিব ? যাহাদের পিতার নামে দামেস্ক-রাজ্য কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের আজ এতদূর অপমান! যাঁহার পদভরে দামেস্ক-রাজ্য দলিত হইয়া বক্ষে সিংহাসন পাতিয়া তাঁহাকে বসিবার স্থান দিয়াছে এবং নিয়মিতরূপে কর যোগাইয়াছে, আমরা তাঁহারই সন্তান—তাঁহারই উত্তরাধিকারী। আমরাই দামেস্কের রাজা, দামেস্কের সিংহাসন আমাদেরই বসিবার স্থান। কম্‌জাৎ কাফের সেই সিংহাসনে বসিয়া আমাদেরই নিকট মক্কা-মদিনার খাজানা চাহিয়াছে, ইহা কি সহ্য হয় ?"

হাসান বলিলেন, "ভ্রাতঃ! একটু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই ভাল। আমরা অগ্রে কিছুই বলিব না, এজিদ যাহা লিখিয়াছে, তাহার কোন উত্তর দিব না। দেখি সে কোন্ পথে যায়, কি উপায় অবলম্বন করে।"

আবদর রহমান বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বিষধর সর্প যখন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখনি তাহার মাথা চূর্ণ করা আবশ্যক; নতুবা সময় পাইলে সে নিশ্চয়ই দংশন করে। এজিদও কালসর্প। উহার মস্তক প্রথম উত্তোলনেই চূর্ণ করিয়া ফেলা বিধেয়, বিশেষতঃ আপনার প্রতিই উহার বেশী লক্ষ্য।"

গম্ভীরভাবে হাসান কহিলেন, "এখনও সে সময় হয় নাই, আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। এবারে নিরুত্তরই সদুত্তর মনে করিয়াছি।"

হোসেন বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু একেবারে নিরুত্তর হইয়া থাকা আমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নহে; আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিব না। আমি কাসেদকে বিদায় করিতেছি। পত্রখানা আমার হস্তে প্রদান করুন।"

হোসেনের হস্তে পত্র দিয়া হাসান রওজা হইতে নিকটস্থ উপাসনা মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কাসেদকে সম্বোধন করিয়া হোসেন বলিতে লাগিলেন, "কাসেদ! আজ আমি রাজনীতির মস্তকে শত পদাঘাত করিতাম, আজ আমি চিরপদ্ধতি, প্রাচীন নীতি উপেক্ষা করিয়া এই পত্রের সমুচিত উত্তর প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও ভ্রাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ জানিয়া তোমার প্রাণ তোমাকে অর্পণ করিলাম। কম্‌জাৎ এজিদ যে পত্র দিয়া তোমাকে মদিনায় পাঠাইয়াছে, ইহার প্রতি অক্ষরে শত শত বার পাদুকাঘাত করিলেও আমার ক্রোধের অণুমাত্র উপশম হয় না। কি করি, ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত ভাষার অক্ষর ইহাতে সন্নিবেশিত আছে বলিয়াই তাহা করিলাম না। ফিরিয়া গিয়া সেই কম্‌জাৎকে এই সকল কথা অবিকল বলিও এবং দেখাইও যে তাহার পত্রের উত্তর এই—

এই কথাগুলি বলিয়া পত্রখানি শত খণ্ড করিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া হোসেন আবার বলিলেন, "যাও!—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া যাও যে, আজ এই

উপস্থিত সন্ধ্যাতেই তোমার জীবনের শেষ সন্ধ্যা হইতে তুমি মুক্তি পাইলে।” হোসেন এই বলিয়া কাসেদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে সন্ধ্যাকালীন উপাসনার সময়ে আহ্বান-সূচক সুমধুরধ্বনি (আজান) ঘোষিত হইল; সকলেই উপাসনা করিতে গমন করিলেন। কাসেদের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই এজিদ সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যগণের পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্রের পারিপাট্য, আহার্য্য দ্রব্যের সংগ্রহ, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, বহনোপযোগী বাহন ও বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমস্তই প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানিয়াছিলেন যে, পত্র পাইয়া হাসান-হোসেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিবে। এমন কি, কাসেদের প্রাণ লইয়া দামেস্কে ফিরিয়া আসা সন্দেহ বিবেচনা করিয়া তিনি গুপ্তচরও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইবে, কেবলমাত্র সংবাদ-প্রাপ্তির অপেক্ষায় ছিলেন। এক দিন আপন সৈন্য-সামন্তগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ অশ্বারোহী সৈন্যদিগের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রচালনা দেখিয়া পরে পদাতিক সৈন্যের ব্যূহ-নির্ম্মাণের নৈপুণ্য, আত্মরক্ষা করিয়া বিপক্ষের প্রতি অস্ত্র-চালনার সুকৌশল এবং সমরপ্রাঙ্গণে পদচালনার চাতুর্য্য দেখিয়া এজিদ মহানন্দে বলিতে লাগিলেন, “আমার এই শিক্ষিত সৈন্যগণের অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়ায় এমন সুশিক্ষিত সাহসী সৈন্য কাহার আছে? ইহাদের নির্ম্মিত ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হওয়া কাহার সাধ্য? হাসান ত দূরের কথা, তাহাদের পিতা যে অত বড় যোদ্ধা ছিল, সেই আলীও যদি কবর হইতে উঠিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখীন হয়, তাহা হইলেও তাহার পরাজয় ভিন্ন জয়ের আশা নাই।”

এজিদ এইরূপ আত্মগৌরব ও আত্মপ্রশংসায় মত্ত ছিলেন, এমন সময় মদিনা হইতে কাসেদ ফিরিয়া আসিয়া সমুচিত অভিবাদনপূর্ব্বক এজিদের হস্তে সেই ছিন্ন পত্রটি দিয়া, হোসেন যাহা বলিয়াছিলেন, অবিকল তাহা বলিল।

এজিদ ক্রোধে অধীর হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—“সৈন্যগণ! তোমরা আমার দক্ষিণ বাহু, তোমরাই আমার একমাত্র ভরসা। আমি তোমাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়াছি। পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি, যে যেমন উপযুক্ত, তাহাকে সেই প্রকার

সম্মানে সম্মানিত করিয়াছি। এত দিন তোমাদিগকে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিয়াছি। আজ আমার এই আদেশ যে, এই সজ্জিত বেশ আর পরিত্যাগ করিও না, হস্তস্থিত অসিও আর কোষে রাখিও না। ধনুর্দ্ধরগণ! তোমরা আর তূণীরের দিকে লক্ষ্য করিও না। মদিনার সম্মুখে অগ্রসর ভিন্ন আর যেন পশ্চাতে ফিরিও না। এই বেশে এই যাত্রাই শুভযাত্রা জ্ঞান করিয়া হাসান-হোসেন-বধে এখনই যাত্রা কর। যত শীঘ্র পার, প্রথমে হাসানের মস্তক আনিয়া আমাকে দেখাও। লক্ষ টাকা পুরস্কার! আমি নিশ্চয়ই জানি, তোমরা মনোযোগী হইয়া একটু চেষ্টা করিলেই উভয়ের মস্তক তোমাদের হস্তেই দামেস্কে আনীত হইবে। আমার মন ডাকিয়া বলিতেছে, তোমাদের তরবারি সেই উভয় ভ্রাতার শোণিত পান করিতে লোলুপ হইয়াছে।"

সৈন্যগণকে ইহা বলিয়া মন্ত্রীকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই মারওয়ান! তুমি আমার বাল্যসহচর। আজ আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তোমাকেই এই বীরদলের অধিনায়ক হইতে হইবে। তোমাকেই সৈনাপত্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, হাসান-হোসেনের বধসাধনের জন্য সৈন্যদলকে মদিনায় পাঠাইতেছি। যদি এজিদের মানরক্ষা করিতে চাও, যদি এজিদের অন্তরাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চাও; যদি এজিদের মনের দুঃখ দূর, করিতে তাহার জয়নাব-লাভের আশাতরী বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও, আর পশ্চাতে ফিরিও না। পূর্ব্ব হইতে সকলই আমি সমুচিতরূপে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আজ এজিদের প্রাণ তোমারই হস্তে সমর্পিত হইল। যেদিন হাসান-হোসেনের মৃত্যুসংবাদ এই নগরে আসিবে, সেই দিন জানিও যে, এজিদ পুনর্জ্জীবিত হইয়া দামেস্ক রাজ-ভাণ্ডারের দ্বার অবারিত করিয়া দিবে; সংখ্যা করিয়া, কি হস্তে তুলিয়া দিবে না; সকলেই যথেচ্ছরূপে যথেচ্ছ পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিবে; কাহারও আদেশের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে না। মারওয়ান! সকল কার্য্যে ও সকল কথাতেই 'যদি' নামে একটি শব্দ আছে। জগতে আমি যদি কিছু ভয় করি, তবে ঐ 'যদি' শব্দেই সময়ে সময়ে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। যদি যুদ্ধে

পরাস্ত হও, নিরুৎসাহ হইও না, হাসান-হোসেনের বধ-সঙ্কল্প হইতে কখনই চ্যুত হইও না, দামেস্কেও ফিরিও না। মদিনার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিয়া তোমার চিরবন্ধুর চিরশত্রুর প্রাণসংহার করিতে যত্ন করিও। ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, কিংবা অর্থেই হউক, প্রথমে হাসানের জীবন-প্রদীপ তোমার হস্তে নির্ব্বাণ হওয়ার শুভ-সংবাদ আমি শুনিতে চাই। হাসানের প্রাণবিয়োগজনিত জয়নাবের পুনঃ বৈধব্যব্রত আমি সানন্দচিত্তে শুনিতে চাই। আর কি বলিব ? তোমার অজানা আর কি আছে ?"

সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মারওয়ান বলিতে লাগিলেন, "বীরগণ! তোমাদের প্রভুর আজ্ঞা সকলেই স্বকর্ণে শুনিলে। আমার আর বলিবার কিছুই নাই। ভ্রাতৃগণ! এখন একবার দামেস্ক-রাজের জয়নাদে আকাশ ফাটাইয়া, জগৎ কাঁপাইয়া, মনের আনন্দে দ্বিগুণ উৎসাহে এখনই যাত্রা কর। মারওয়ান ছায়ার ন্যায় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।"

সৈন্যগণ বীরদর্পে ঘোর নাদে বলিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ এজিদের জয়! জয় মহারাজ দামেস্করাজের জয়!"

কাড়া, নাকাড়া, ডঙ্কা গুড়্ গুড়্ শব্দে বাজিয়া যেন বিনামেঘে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অবিরত ধ্বনিত হইতে লাগিল। আজ অকস্মাৎ বিনা-মেঘে হৃদয়কম্পান, বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীমনাদ শ্রবণে নগরবাসীরা ভয়াকুল-চিত্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন: গগনে মেঘের সঞ্চারমাত্র নাই, কিন্তু রাজপথ প্রস্তররেণু ও বালুকাকণাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ; অসংখ্য সেনা রণবাদ্যে মাতিয়া শুভসূচক বিজয়-নিশান উড়াইয়া মদিনাভিমুখে চলিয়াছে। নগরবাসিগণের মধ্যে কাহারও মনে ব্যথা লাগিল, কাহারও চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, কেহ কেহ এজিদের জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দ অনুভব করিল।

এজিদ মহোৎসবে নগরের অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া মারওয়ান, সৈন্যগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষ অলীদের নিকটে বিদায় লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

মদিনাবাসীরা কিছু দিন এজিদের কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা করিলেন। সর্ব্বসাধারণের অন্তরেই এজিদের পত্রের প্রতি ছত্র, প্রতি

অক্ষর, সুতীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় বিঁধিয়াছিল। হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ যেরূপ অপমানসূচক কথা ব্যবহার করিয়াছে, তাহার শাস্তি কোথায় হইবে, ঈশ্বর যে কি শাস্তিপ্রদান করিবেন, তাঁহারা তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। প্রবীণেরা দিবারাত্র হাসান-হোসেনের মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরসমীপেও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পূর্ণবয়স্কেরা বলিতে লাগিলেন, "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কাহার সাধ্য যে, এমাম হাসান হোসেনের প্রতি দৌরাত্ম্য করে? আমরা বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম এমামের প্রতি অযথা ব্যবহার করিবে, তাহাকে শীঘ্রই নরকের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে হইবে।" নব্য যুবকেরা বলিতে লাগিলেন, "দামেস্কের কাসেদকে একবার দেখিতে পাইলে মদিনার খাজানা দিয়া বিদায় করিতাম। এত দিতাম যে, বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার শক্তি থাকিত না। দেহটি এখানে রাখিয়া শুধু প্রাণ লইয়া দামেস্কে ফিরিয়া যাইতে হইত।" স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই এজিদের নামে শত শত পাদুকাঘাত করিলেন। কিছু দিন গত হইলে, দামেস্কের আর কোন সংবাদ নাই। এজিদের সম্বন্ধে আন্দোলন ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিল।

মদিনাবাসীরা আপন গৃহে শুইয়া আছেন, নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সহসা নাকাড়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া অগ্রে নগর-প্রান্তের অধিবাসীরা জাগিয়া উঠিলেন, অসময়ে রণবাদ্যের কোন কারণই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। প্রভাত নিকটবর্ত্তী। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাজনাও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নগরের প্রায় সমস্ত লোকের কাণেই সেই তুমুল ঘোর রণবাদ্য প্রবেশ করিয়া দীর্ঘসূত্রীরও নিদ্রাভঙ্গ করিল। অনেকে নগরের বাহির হইয়া দেখিলেন যে, বহুসংখ্যক সৈন্য বীরদর্পে গম্যপথ অন্ধকার করিয়া নগর-অভিমুখে আসিতেছে। সূর্য্যদেব সহস্র কিরণে মদিনা-বাসীকে নিজমূর্ত্তি দেখাইয়া এজিদের চিহ্নিত পতাকা এবং সৈন্যদিগের নূতন সজ্জা দেখাইলেন। সকলেই স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে, হাসান-হোসেনকে নির্য্যাতন এবং তাঁহাদের প্রাণহরণ-মানসে এজিদ সসৈন্যে সমরে আসিতেছেন।

আবদর রহমান আর বিলম্ব করিলেন না। দ্রুত গমন করিয়া হাসান-

হোসেনের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন ; তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া এজিদের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্ম্মযুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মদিনার ঘরে ঘরে জেহাদ-রবের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। মোহাম্মদীয়গণ জেহাদের নাম শুনিয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন। বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেই শহীদ (ধর্ম্মযুদ্ধে শোণিতপাতে প্রাণত্যাগে মুক্ত) হয়, স্বর্গের দ্বার শহীদদিগের নিমিত্ত সর্ব্বদাই খোলা রহিয়াছে,—ধর্ম্মযুদ্ধে বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতের রক্ত-প্রবাহে মোহাম্মদীয়গণের সমুদয় পাপ বিধৌত হইয়া পবিত্রভাবে পুণ্যাত্মা রূপধারণে শহীদগণ নির্ব্বিচারে যে স্বর্গসুখে সুখী হন, ইহা মুসলমানমাত্রেরই অন্তরে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জাগিবে।

মদিনার বালক, বৃদ্ধ, পূর্ণবয়স্ক সকলেই রণবেশে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। নগরবাসীরা হাসান-হোসেনকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। ঘোষণা প্রচার হইতে না হইতেই সহস্রাধিক লোক কাহারও আদেশের অপেক্ষাও না করিয়া যাহার যে অস্ত্র আয়ত্তে ছিল, যাহার যে অস্ত্র সংগ্রহ ছিল, যে যাহা নিকটে পাইল, তাহাই লইয়া বেগে শত্রুর উদ্দেশে ধাইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে এজিদের সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইল না ; গমনে ক্ষান্ত দিয়া শিবির-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। নগরবাসীরাও শত্রুপক্ষকে নিরুদ্যম দেখিয়া আর অগ্রসর হইলেন না, নগরেও আর ফিরিলেন না ; বৃক্ষমূলে প্রস্তরোপরি স্ব স্ব সুবিধামত স্থান নির্ণয় করিয়া হজরত হাসানের অপেক্ষায় রহিলেন। এবং এজিদের সৈন্যগণ বহুমূল্য বস্ত্রাদি দ্বারা শিবির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ সংবাদ হোসেনের নিকট পাঠাইলেন।

হোসেন ও আবদর রহমান প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে রওজা মোবারকে যাইয়া, হাসান প্রথমেই ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন— "দয়াময়! আমার ধনবল, বুদ্ধিবল, সৈন্যবল কিছুই নাই। তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসানুদাস আমি। তুমি দয়া করিয়া এ দাসের অন্তরে যে বল দিয়াছ, সেই ধর্ম্মবলই আমার সাহস এবং উৎসাহ। দয়াময়! সেই বলের বলেই আমি এজিদকে—এক এজিদ কেন, শত শত এজিদকে

তোমার কৃপায় তুচ্ছ জ্ঞান করি। কেবল তোমার নাম ভরসা করিয়াই দুর্গম শত্রুপথে পা বাড়াইয়াছি। তুমিই সহায়, তুমিই রক্ষাকর্ত্তা।” সকলেই “আমিন—আমিন” বলিয়া, পরে নূরনবী মোহাম্মদের গুণানুবাদ করিয়া একে একে অশ্বারোহণে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগর-বাসীরা ব্যগ্রতাসহকারে তাঁহাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমরা বাঁচিয়া থাকিতে আপনাকে শত্রুসম্মুখে যাইতে দিব না। আমরা এই চলিলাম, পৃষ্ঠে আঘাত লইয়া আর ফিরিব না। আঘাতিত দেহ আর মদিনাবাসীকে দেখাইব না। হয় মারিব, নয় মরিব !!”

হাসান অশ্ব হইতে নামিয়া বলিলেন, “ভ্রাতৃগণ! ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন শেষ করাই জীবের কর্ত্তব্য। লোকে আমাকে মদিনার রাজা বলে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! তোমরা তাহা কখনই কর্ণে স্থান দিও না। এ জগতে কেহ কাহারও রাজা নহে, সকলেই সেই মহা-রাজাধিরাজ সর্ব্বরাজাধিরাজ ওয়াহ্‌দাহুলা শরীকালাহু (একমেবাদ্বিতীয়ম্) দয়াময়ের রাজ্যের প্রজা। সকলেই সেই মহান রাজার সৃষ্ট, তাঁহার শক্তি মহান্, আমরা সেই রাজার প্রজা। সাধ্যানুসারে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় মহারাজের ধর্ম্মরাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করাই আমাদের সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই ধর্ম্মরাজ্যের বিরোধী হইয়াও অনেক নরাধম অস্থায়ী রাজ্যে বাস করিতেছে। আজ তোমরা যে নরাধমের বিরুদ্ধে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইয়াছ, তাহার ধনবল, সৈন্যবল এত অধিক যে, মনে ধারণা করিতেও শঙ্কা বোধ হয়। যদিও আমাদের অর্থ নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, বাহ্য আড়ম্বর নাই, তথাপি আমাদের একমাত্র ভরসা—সেই অদ্বিতীয় ভগবান। তাঁহার নামই আমাদের আশ্রয়। সেই নাম অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা করিব। ভ্রাতৃগণ! যে পাপাত্মার সৈন্যগণ এই পবিত্রভূমি—আমাদের জন্মভূমি আক্রমণ করিবার আশায় নগরের বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিয়াছে, সেই বিধর্ম্মী এজিদ মদিনার খাজনা আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহার উত্তর দিই নাই; সেই আক্রোশে এবং

বিবি জয়নাব আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন, সেই ক্রোধে এজিদ আমার প্রাণবধ করিবে। তাহা হইলে এজিদের উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে; কারণ, আমার মদিনার সিংহাসন তাহারই অধিকৃত হইবে মনে করিয়াছে। সেই বিধর্ম্মী এজিদ নূরনবী হজরত মোহাম্মদের বিরোধী, ঈশ্বরের বিরোধী, পবিত্র কোর-আণের বিরোধী। নরাধম এমনই পাপী যে, ভ্রমে কখনও ঈশ্বরের নাম মুখে আনে না। ভাই সকল! আমরা যে রাজ্যে বাস করি, যে রাজা আমাদের সুবিধার জন্য কত উপকরণ, কত সুখসামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন—বিনা স্বার্থে, বিনা প্রত্যুপকারের আশায় যে রাজা অকাতরে কত কি দান করিয়াছেন, আমরা আজ পর্য্যন্ত সে দানের উদ্দেশ্যের কণামাত্রও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সেই অদ্বিতীয় রাজার বিরুদ্ধাচারী আজ পুণ্য-ভূমি মদিনা আক্রমণ করিতে—আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে,—ধর্ম্মপথে কাঁটা ছড়াইতে, মূল উদ্দেশ্য—আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভু জগৎপিতার নামে সে কত কলঙ্ক রটাইয়াছে! জগদীশ্বর মহান্, তাঁহার মহিমা অপার, তাঁহাতে ক্রোধ, বিরাগ, দুঃখ, অপমান কিছুই নাই। কিন্তু আমরা সহগুণবিহীন মানব,—আমাদের রিপু-সংযম অসাধ্য। যে কেহ ঈশ্বরের বিরোধী, আমরা তাহার বিরোধী। আমরা কি সেই বিরোধীর প্রতিবিধান করিব না? আমাদের অস্ত্র কি চিরকালই কোষে আবদ্ধ থাকিবে? বিধর্ম্মীর মুণ্ডপাত করিতে সেই অস্ত্র কি নিষ্কোষিত হইয়া কাফেরের রক্তে রঞ্জিত হইবে না? ঈশ্বরের প্রসাদে জয়-পরাজয় উভয়ই আমাদের মঙ্গল। যদি তাঁহার কৃপায় বিধর্ম্মীর রক্ত আজ মদিনা-প্রান্তরে বহাইতে পারি, ভাল, তাহা না হইলে ধর্ম্ম-রক্ষা, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বিধর্ম্মীর অস্ত্রে যদি আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও অক্ষয় স্বর্গলাভ। ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের এই স্থির প্রতিজ্ঞা যে, হয় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিব, না হয়, অকাতরে রক্তস্রোতে আমাদের এই অস্থায়ী দেহ খণ্ডে খণ্ডে ভাসাইয়া দিব।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই শ্রোতৃগণ সমস্বরে "আল্লাহো আকবর" বলিয়া

পাগলের ন্যায় কাফেরের মুণ্ডপাত করিতে ছুটিলেন। হাসান সকলকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইয়া সমরক্ষেত্রে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন; তাহা আর হইল না, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না।

হাসান-হোসেন এবং আবদর রহমান পুনরায় অশ্বারোহণে কিছু দূর গমন করিয়া যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে হাসান আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না; আবদর রহমানকে বলিলেন, "ভাই! তুমি যত শীঘ্র পার, হোসেনের সহিত যাইয়া মদিনাবাসীদের পৃষ্ঠপোষক হও। আমি অবলাগণকে বিদায় দিয়া আসিতেছি। ইঁহাদের এ বেশ আমার চক্ষে বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইঁহাদের হস্তে অস্ত্রসম্ভার দেখিতে হইল! ভাই! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখ কি? তোমরা যাও, আর অপেক্ষা করিও না।"

এই বলিয়া অশ্ব হইতে নামিয়াই এমাম হাসান অতি বিনীতভাবে নারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগ্নীগণ! নগরের প্রান্তভাগে মহাশত্রু! নগরবাসীরা আজ শত্রুবধে উন্মত্ত, জন্মভূমি রক্ষা করিতে মহাব্যস্ত। এই বিপদ সময়ে আপনারা এ বেশে কোথায় যাইতেছেন?"

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, "হজরত! আর কোথায় যাইব? আপনাদের এই মহাবিপদকালেও কি আমরা অবলাচারের বাধ্য হইয়া অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকিব? ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী, সকলকেই শত্রুমুখে পাঠাইয়াছি, ফিরিয়া আসিতে পাঠাই নাই—একেবারে চিরবিদায় প্রদান করিয়াছি।—আর আমাদের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? আপনার জন্য স্বামী, পুত্র ভ্রাতা যে পথে যাইবে, আমরাও সেই পথের অনুসরণ করিব; বিপদ সময়ে অবশ্যই কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারিব। আর তাহারাই যদি বিধর্ম্মীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া ধর্ম্মরক্ষা ও জন্মভূমি রক্ষা করিতে পারে, তবে আমরাই বা কাফেরের মাথা কাটিতে অস্ত্রগ্রহণ করিব না কেন? নূরনবী হজরত মোহাম্মদের পবিত্র দেহ যে মদিনা ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, রোজকেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে, সেই মদিনা এজিদ অধিকার করিবে? যে মদিনার পবিত্রতা গুণে জগতের চারিদিক হইতে কোটি কোটি ভক্ত কত কষ্ট স্বীকার

করিয়া শুধু একবার রওজা শরীফদর্শন করিতে আসিতেছে, সেই পবিত্র ভূমি কাফেরের পদস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে ? এ কথা শুনিয়া কে স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে ? আরও দেখুন—আমরা অবলা, পরাধীনা, যাহাদের মুখাপেক্ষী, তাহারাই যখন অস্ত্র-সম্মুখে, তখন আমরা শূন্যদেহ লইয়া কেন আর ঘরে থাকিব ?”

আর একটি স্ত্রীলোক কহিলেন, “হজরত ! আমরা যে কেবল সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করিতে শিখিয়াছি, তাহা মনে করিবেন না। এই হস্ত বিধর্ম্মীর মস্তক চূর্ণ করিতে সক্ষম, এই হস্তে কাফেরের মুণ্ডপাত করিতেও আমরা জানি। সামান্য রক্তবিন্দু দেখিলেই আমাদের মন কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ে বেদনা লাগে, কিন্তু কাফেরের লোহিত রক্ত-তরঙ্গের শোভা দর্শনে আনন্দে ও উৎসাহে আমাদের মন যেন নাচিতে থাকে।”

বিস্মিত হইয়া হাসান বলিলেন, “আমি আপনাদের অনুগত এবং আজ্ঞাবহ, আমি বাঁচিয়া থাকিতে বিধর্ম্মীবধে আপনাদিগকে অস্ত্র ধরিতে হইবে না। আমার বংশ বাঁচিয়া থাকিতে আপনাদিগকে এ বেশ পরিতে হইবে না। ভগ্নীগণ ! আপনারা ঘরে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্ম ও জন্মভূমির রক্ষার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করুন। আমরা অস্ত্রমুখে দাঁড়াইব। আপনারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আপনারা শত্রু-সম্মুখীন হইয়া আমার মনে বেদনা প্রদান করিবেন না।”

প্রথমা নারী সবিনয়ে বলিলেন, “আপনার আদেশ প্রতিপালন করিলাম ; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, মদিনার একটি অবলার দেহে প্রাণ থাকিতে এজিদ কদাপি নগরের সীমায় আসিতে পারিবে না।” এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকেরা দুই হস্ত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, —“এলাহি ! আজ আপনার নামের উপর নির্ভর করিয়া হাসানকে শত্রুসম্মুখে দিলাম। হাসানের প্রাণ, পবিত্র ভূমি, মদিনার স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মরক্ষা করিতে ভ্রাতা, পুত্র ও স্বামীহারা হইলেও আমরা কাতর হইব না। এলাহি ! স্বামী, পুত্র, ভ্রাতৃগণ বিধর্ম্মীর অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিলে আমাদের চক্ষে কখনই জল আসিবে না। কিন্তু মদিনা নগর কাফেরের

পদস্পৃষ্ট হইলেই আমরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। এলাহি! হাসানের প্রাণ আমাদের প্রার্থনীয়। সে প্রাণ রক্ষা হইলে সমস্তই রক্ষা হইবে। এলাহি! হাসানের প্রাণ রক্ষা কর; মদিনার পবিত্রতা রক্ষা কর; নূরনবী হজরত মোহাম্মদের রওজার পবিত্রতা রক্ষা কর!"

এই প্রকারে উপাসনা শেষ করিয়া নগরবাসিনী কামিনীগণ হাসানকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন,—"এলাহির অনুগ্রহ-কবচ আপনার শরীর রক্ষা করুক। বাহুবলে হজরত আলীর দৃষ্টিপাত হউক। বিবি ফাতেমা খাতুনে জেন্নাত আপনার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। শত্রুবিজয়ী হইয়া আপনি নির্ব্বিঘ্নে নগরে আগমন করুন।"

এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া কামিনীগণ স্ব স্ব নিকেতনে চলিয়া গেলেন। হাসানও বিস্মিল্লাহ্ বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে নগরপ্রান্তে আসিয়া ভীষণতর শব্দ শুনিতে পাইয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটস্থ হইলেন। দেখিলেন যে, বিষম বিক্রমে মদিনাবাসীরা বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধের রীতিনীতির প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। কেবল 'মার মার' অস্ত্রের ঝনঝন্ ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে "আল্লাহ" রবে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিতেছে, রণভূমিতে শোণিতের প্রবাহ ছুটিয়াছে। সেই অভাবনীয় ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া হাসান নিস্তব্ধভাবে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিলেন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন না।

মদিনাবাসীরা শত্রুদিগকে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। শত শত বিধর্ম্মীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া শেষে নিজে নিজে "শহীদ" হইতেছে। কেহ কাহারও কথা শুনিতেছে না, কাহাকেও কিছু বলিতেছে না, বা জিজ্ঞাসাও করিতেছে না। হোসেনের চালিত তরবারি বিদ্যুতের ন্যায় চমকিতেছে। শত্রুপক্ষীয়েরা যে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে, তাহারও উপায় নাই। তবে বহু দূর হইতে যাহারা সেই ঘূর্ণিত তরবারির চাকচিক্য দেখিয়াছিল, কেবল তাহারাই কেহ জঙ্গলে, কেহ পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

হোসেনের অশ্ব শ্বেত বর্ণ; তাঁহার শরীরও শ্বেত বসনে আবৃত। এক্ষণে বিধর্ম্মী বিপক্ষদের রক্তে তাহা একেবারে লোহিতবর্ণে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রাংশে আরও অধিক শোভা হইয়াছে।
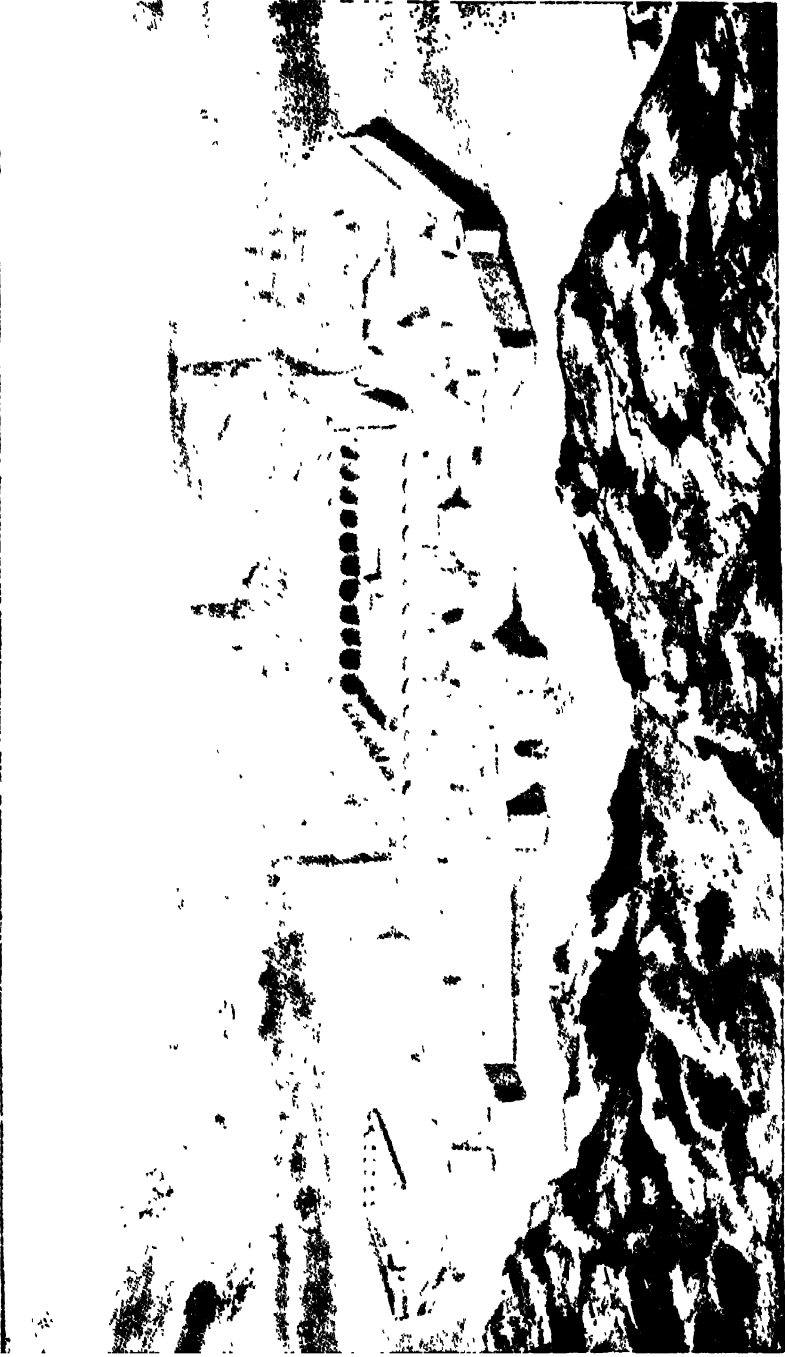
মদিনা শরীফের দৃশ্য

সেই শোভা বিধর্ম্মীর চক্ষে ভীষণভাবে প্রতিফলিত হইতেছে। অশ্বের পদ-নিক্ষিপ্ত রক্তমাখা বালুকার উৎক্ষিপ্ততা দেখিয়াই অনেকে ছিন্ন দেহের অন্তরালে লুকাইয়া হোসেনের তরবারি হইতে প্রাণ বাঁচাইতেছে। বামে দক্ষিণে হোসেনের দৃষ্টি নাই। যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, তাহাকেই নরকে পাঠাইতেছেন।

একাদশ প্রবাহ

হাসান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া ভীষণ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। হস্তপদ-খণ্ডিত অগণিত দেহ, শোণিত-প্রবাহে সম্পূর্ণ ডুবিয়া, কতক অর্দ্ধাংশ ডুবিয়া, রক্তস্রোতে নিম্নস্থানে গড়াইয়া যাইতেছে। মদিনাবাসীদের মুখে কেবল "মার! মার! কোথায় এজিদ? কোথায় মারওয়ান?" এই মাত্র রব। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার ভীষণতর কাতর স্বর হাসানের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীরা প্রথমে বিধর্ম্মীর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই; ক্রমে ক্রমে দুই একটি স্বজনের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। হোসেনও আবদর রহমান প্রভৃতিকে দেখিয়াছেন, অথচ কেহ কাহারও কোন সন্ধান লন নাই, কাহাকেও কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করেন নাই। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহাদের দৃষ্টিপথের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছিল, ঈশ্বর-কৃপায় তাহারা আর নাই, প্রায় সকলেই রক্তস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমে সকলেই একত্র হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হাসানেরও দেখা পাইলেন। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া জয়ধ্বনির সহিত "লাএ-লাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদর রসুলাল্লাহু" বলিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন। অনন্তর রক্তমাখা শরীরে, আহত অঙ্গে, মনের আনন্দে হাসানের সহিত সকলে আলিঙ্গন করিলেন। হাসানও সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা পথের দুই পার্শ্ব হইতে

ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতার উপাসনা (শোক্‌রাণা) করিয়া বিজয়ী বীরপুরুষ-গণকে মহানন্দে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। জাতীয় ধর্ম্ম ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বীরগণ বিজয়পতাকা উড়াইয়া গৃহে আসিতেছেন, সে সময়ে "বাগে এরামে"র (স্বর্গীয় উপবনের) পুষ্প তাঁহাদের মস্তকে বর্ষণ করিতে পারিলেও নগরবাসীর আশা মিটিত না। নগরবাসীরা কি করেন, মদিনাজাত যাহা তাঁহাদের পারিজাত পুষ্প, মনের আনন্দে মহা উৎসাহে সেই পুষ্পগুচ্ছ-বৃষ্টি করিয়া বিজয়ীদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরগণ একেবারে প্রভু মোহাম্মদের রওজা শরীফে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। শেষে হাসান-হোসেন ও আবদর রহমানের নিকট বিদায় লইয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে গমনপূর্ব্বক পরিবার-মধ্যে সাদরে গৃহীত হইলেন। মদিনার প্রতি গৃহ, প্রতি দ্বার, প্রতি পল্লী ও প্রতি পথ এককালে আনন্দময় হইয়া উঠিল।

মদিনাবাসীরা বিজয়-নিশান উড়াইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিলে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ-মধ্যে প্রাণের ভয়ে যাঁহারা লুকাইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন,—আর জনপ্রাণীমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নাই। সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র দেহ রক্তমাখা হইয়া বিকৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ অশ্বসহ দ্বিখণ্ড হইয়া অশ্বদেহে চাপা পড়িয়াছে; কাহারও খণ্ডিত হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, শরীরের চিহ্নমাত্র নাই। কোন কোন শরীরে হস্ত নাই, কাহারও জঙ্ঘা কাটিয়া কোথায় পড়িয়াছে, অপরাংশ কোন অশ্বের পশ্চাৎ পদের সহিত রক্তে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। অশ্বদেহে মনুষ্যমস্তক, মনুষ্যদেহে অশ্বমস্তক সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া হতাবশিষ্ট সেনাগণ কি করিবেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে দুইটি তিনটি করিয়া সকলে একত্র হইলেন। পর্ব্বতগুহায় যাঁহারা লুকাইয়াছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রের নীরব নিস্তব্ধ ভাব বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে বাহির হইলেন। তন্মধ্যে মারওয়ান ও ওৎবে অলীদ উভয়েই ছিলেন। সঙ্গীদিগের এই হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা আদৌ দুঃখিত হইলেন না। কেবল মারওয়ান বলিলেন, "ভাই অলীদ! মদিনাবাসীর অস্ত্রে এত তেজ, হোসেনের এত পরাক্রম, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, গত বিষয়ের

চিন্তায় আর ফল কি ? পুনরায় চেষ্টা কর ! মহারাজ এজিদের আজ্ঞা মনে কর। যে-'যদি' শব্দে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই যদি সফল হইল, তবে ইহা ত নূতন ঘটনা নহে। মহারাজের আজ্ঞা শেষ পর্য্যন্ত পালন করিয়া যাইব,—জীবন লইয়া আর দামেস্কে ফিরিব না; এ মুখ আর দামেস্কবাসীকে দেখাইব না। পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহ করিব, পুনরায় হাসান-বধের চেষ্টা করিব। মহারাজ এজিদের অভাব কিসের ? সৈন্যগণ! তোমরা একজন এখনই দামেস্ক নগরে যাত্রা কর। যাহা স্বচক্ষে দেখিলে, ভাগ্যবলে মুখে বলিতেও সময় পাইলে, অবিকল মহারাজ-সমীপে সেই মহাযুদ্ধের অবস্থা মহারাজকে বলিও। আরও বলিও যে, মারওয়ান মরে নাই, হাসানের প্রাণ-সংহার না করিয়া সে মদিনা পরিত্যাগ করিবে না। আরও বলিও যে, মহারাজের শেষ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই সে এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। যত শীঘ্র হয়, পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনায় প্রেরণ করুন। আর যাহা স্বচক্ষে দেখিলে, কিছুই গোপন করিও না, তৎসমস্তই তুমি অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিও।" মারওয়ানের আজ্ঞামাত্র এম্‌রান নামক এক ব্যক্তি দামেস্ক যাত্রা করিলেন। মারওয়ান ছদ্মবেশে নগরের কোন গুপ্ত স্থানে অলীদের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর আর সঙ্গীরা নিকটস্থ পর্ব্বতগুহায় মারওয়ানের আদেশক্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

দ্বাদশ প্রবাহ

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ ও শত্রুর শেষ থাকিলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ ! পুনরায় তাহা বর্দ্ধিত হইলে আর শেষ করা যায় না। রাত্রি দুই প্রহর। মদিনাবাসীরা সকলেই নিদ্রিত। মারওয়ান ছদ্মবেশে নগরভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন। কতই সন্ধান, কতই গুপ্ত মন্ত্রণা অবধারণ করিতেছেন ! কাহারও নিকট মনের কথা ভাঙ্গিতে সাহস পান না ! মদিনা তন্ন তন্ন করিয়াও আজ পর্য্যন্ত তিনি মনোমত লোক খুঁজিয়া পান নাই। কেবল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত কথায় কথায় অনেক কথার আলাপ করিয়াছেন; আকার

ইঙ্গিতে তাহাকে লোভও দেখাইয়াছেন। কিন্তু কোথায় তাঁহার নিবাস, কোথায় অবস্থিতি, কিছুই তাহাকে বলেন নাই। অথচ বৃদ্ধার বাড়ী-ঘর তিনি গোপনভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ অনুসন্ধানে বৃদ্ধার সাংসারিক অবস্থাও অনেক জানিতে পারিয়াছেন। আজ নিশীথ সময়ে বৃদ্ধার সহিত নগরপ্রান্তে নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহার নিকট দেখা হইবে, এরূপ কথা স্থির আছে। মারওয়ান নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বৃদ্ধার বাটীর নিকট গোপনভাবে যাইয়া সমুদয় অবস্থা জানিয়া বুঝিয়াছেন যে, বৃদ্ধার কথায় কোনরূপ সন্দেহ আছে কি না। সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছেন; নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আবার গিরিগুহার নিকট যাইয়া বৃদ্ধার অপেক্ষায় থাকিবেন।

সেই স্ত্রীলোকটির নাম মায়মুনা। মায়মুনার কেশপাশ শুভ্র বলিয়াই লেখক তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মায়মুনা বাস্তবিক বৃদ্ধা নহে। মারওয়ান চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই একটি স্ত্রীলোক স্বদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করিতে করিতে রাজপথ দিয়া যাইতেছিল; আব্রুহ অনাবৃত। ক্ষণে ক্ষণে আকাশে লক্ষ্য করিয়া সেই স্ত্রীলোক চন্দ্র ও "আদম সুরাতের" (নরাকার নক্ষত্রপুঞ্জের) প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহার আর কোন অর্থ নাই,—বোধ হয়, নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা। অর্থলোভে পাপকার্য্যে রত হইবে, তাহাই আলোচনা করিয়া অন্যমনস্কভাবে যাইতেছে! তারাদল এক একবার চক্ষু বুজিয়া ইঙ্গিতে যেন তাহাকে নিষেধ করিতেছে! প্রকৃতি স্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্য হইতেও যেন "না—না" শব্দে তাহাকে বারণ করিতেছে! মায়মুনার কর্ণ টাকার সংখ্যা শুনিতে ব্যস্ত। সে বারণ শুনিবে কেন? মন সেই নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহার নিকট; এ সকল নিবারণের প্রতি তাহার মন কি আকৃষ্ট হইতে পারে? নগরের বাহির হইয়া সে একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট গিরিগুহার নিকটে মারওয়ান অপেক্ষা করিতেছিলেন, মায়মুনাকে দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইল। উভয়ে একত্র হইলেন, কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

মায়মুনা বলিলেন, "আপনার কথাবার্ত্তার ভাবে আমি অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, তবে আগে একটি কথা বলি।"

মারওয়ান কহিলেন, "তোমাকে বিশ্বাস না করিলে মনের কথা ভাঙ্গিব কেন? তোমার কথাক্রমে এই নিশীথসময়ে জনশূন্য পর্ব্বতগুহার নিকটেই বা আসিব কেন? তোমার যাহা ইচ্ছা বল।"

মায়মুনা কহিল, "কার্য্য শেষ করিলে ত দিবেনই, কিন্তু অগ্রে কিছু দিতে হইবে। দেখুন, অর্থই সব। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, আপনার এই কার্য্যটি সহজ নহে। কত দিনে যে শেষ করিতে পারিব, তাহার ঠিক নাই। এই কার্য্যের জন্যই আমাকে সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতে হইবে। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ে একেবারে হস্তসঙ্কোচ করিতে হইবে। দিবারাত্র কেবল এই মন্ত্রণা, এই কথা লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। আপনিই বিবেচনা করুন, ইহার কোন্‌টি অযথা বলিলাম?"

কথার ভাব বুঝিয়া কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মায়মুনার হস্তে দিয়া মারওয়ান বলিলেন, "যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, সহস্র সুবর্ণ মোহর তোমার জন্য ধরা রহিল।"

মোহরগুলি রুমালে বাঁধিয়া মায়মুনা বলিল, "দেখুন! যার দুই তিনটি স্ত্রী, তাহার প্রাণবধ করিতে কতক্ষণ লাগে? সে ত 'আজ-রাইল'কে (যমদূতকে) সর্ব্বদা নিকটে বসাইয়া রাখিয়াছে। তার প্রাণরক্ষা হওয়াই আশ্চর্য্য, মরণ আশ্চর্য্য নয়।"

মারওয়ান কহিলেন, "তাহা নয় বটে, কিন্তু লোকটি আবার কেমন? যেমন লোক, স্ত্রীরাও তেমনি। দুই তিনটি স্ত্রী হওয়ায় তাহার আর ভয়ের কারণ কি?"

মায়মুনা কহিল, "ও কথা বলিবেন না। পয়গম্বরই হউন, এমামই হউন, ধার্ম্মিক পুরুষই হউন, আর রাজাই হউন, এক প্রাণ কয়জনকে দেওয়া যায়? ভাগী জুটিলেই নানা কথা, নানা গোলযোগ। সপত্নীবাদ না আছে, এমন স্ত্রী জগতে নাই। সপত্নীর মনে ব্যথা দিতে কোন্ সপত্নীর ইচ্ছা নাই? আমি সে কথা এখন কিছু বলিব না; আপনার প্রতিজ্ঞা যেন ঠিক থাকে।"

মারওয়ান বলিলেন, "এখানে তুমি আর আমি ভিন্ন কেহই নাই,—এ প্রতিজ্ঞার সাক্ষী কাহাকে করি? ঐ অনন্ত আকাশ, ঐ অসংখ্য তারকারাজি, ঐ পূর্ণচন্দ্র, এই গিরিগুহা, আর এই রজনী দেবীকেই সাক্ষী রাখিলাম; হাসানের প্রাণবধ করিতে পারিলেই আমি তোমাকে সহস্র মোহর পুরস্কার দিব। তৎসম্বন্ধে তুমি যখন যাহা বলিবে, সকলই আমি প্রতিপালন করিব। আর একটি কথা, এই বিষয় তুমি ও আমি ভিন্ন জগতে আর কেহই যেন জানিতে না পারে।"

মায়মুনা বলিল, "আমি এ কথায় সম্মত হইতে পারি না। কেহ জানিতে না পারিলে কার্য্য উদ্ধার হইবে কি প্রকারে? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আসল কথাটি আর এক জনের কর্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় জনের কর্ণে প্রবেশ করিবে না।"

"সে তোমার বিশ্বাস। কার্য্য উদ্ধারের জন্য যদি কাহারও নিকট কিছু বলিতে হয় বলিও; কিন্তু তিন জন ভিন্ন আর একটি প্রাণীও যেন জানিতে না পারে।"

মায়মুনা বলিল, "হজরত! আমাকে নিতান্ত সামান্যা স্ত্রীলোক মনে করিবেন না! দেখুন, রাজমন্ত্রীরা রাজ্য রক্ষা করে, যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধির মন্ত্রণা দেয়, নির্জ্জনে বসিয়া কত প্রকারে বুদ্ধির চালনা করে। আমার এ কার্য্য সেই রাজকার্য্যের অপেক্ষা কম নহে। যেখানে অস্ত্রের বল নাই, মহাবীরের বীরত্ব নাই, সাহস নাই, সাধ্য নাই, সেইখানেই এই মায়মুনা শত অর্গলযুক্ত দ্বারও অতি সহজে খুলিয়া থাকে। যেখানে বায়ুর গতিবিধি নাই, সেখানেও আমি অনায়াসে গমন করি। যে যোদ্ধার অন্তর পাষাণে গঠিত, তাহার মন গলাইয়া মোমে পরিণত করিতে পারি। যে কুলবধূ সূর্য্যের মুখ কখনও দেখে নাই, চেষ্টা করিলে তাহার সঙ্গেও দু'টা কথা কহিয়া আসিতে পারি। নিশ্চয় জানিবেন, পাপশূন্য দেহ নাই, লোকশূন্য জগৎ নাই। যেখানে যাহা খুঁজিবেন তাহাই পাইবেন।"

মারওয়ান কহিলেন, "মুখে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকে, কার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সিদ্ধ হইলেও জগতে অ-সুখের কারণ থাকিত না,

অভাবের নামও কেহ মুখে আনিত না। তোমার কথাও রহিল, আমার কথাও থাকিল। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঐ দেখ শুকতারা পূর্ব্ব গগনে দেখা দিয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র নগরমধ্যে যাওয়াই উচিত। আমি তোমার বাটীর সন্ধান লইয়াছি। আবশ্যক মত যাইব এবং গুপ্ত পরামর্শ আবশ্যক হইলে, নিশীথসময়ে উভয়ে এই গিরিগুহার সন্নিকটে আসিয়া সমুদয় কথাবার্ত্তা কহিব ও শুনিব।"

এই বলিয়া মারওয়ান বিদায় লইলেন। মায়মুনাও বাটিতে ফিরিল। গৃহমধ্যে শয্যার উপর বসিয়া মোহরগুলি দীপালোকে এক এক করিয়া গণিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—

"হাসান আমার কে ? হাসানকে মারিতে আর আমার দুঃখ কি ? আর ইহাও এক কথা, আমি ত নিজে মারিব না ; আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। আমার পাপ কি ?" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে মায়মুনা শয়ন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। নগরস্থ উপাসনা-মন্দিরে প্রভাতী উপাসনার জন্য ভক্তবৃন্দ সুস্বরে আহ্বান করিতেছে ; "নিদ্রাপেক্ষা ধর্ম্মালোচনা অতি উৎকৃষ্ট" আরব্য ভাষায় এ কথার ঘোষণা করিতেছে। ক্রমে সকলেই জাগিয়া উঠিল। নিত্যক্রিয়াদি সমাধা হইবার পর সকলের মুখেই শত সহস্র প্রকারে ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি যুবতী, সকলেই ঈশ্বরের গুণগাণ করিয়া বিশ্রামদায়িনী বিভাবরীকে বিদায় দান করিলেন। সকলেই যেন ঈশ্বরের নামে তৎপর, ঈশ্বরের প্রেমে উৎসাহী !

মদিনাবাসী মাত্রেই ঈশ্বরের উপাসনায় ব্যতিব্যস্ত; কেবল মায়মুনা ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। এইমাত্র শয়ন করিয়াছে, উপাসনার সময়ে উঠিতে পারে নাই। নিদ্রাভঙ্গের পরেই তাহাকে যে ভয়ানক পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে,—যে সাংঘাতিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়। অর্থলোভে পুণ্যাত্মা হাসানের প্রাণবিনাশে হস্ত প্রসারণ করিবে ! ওঃ! পাষাণীর প্রাণ কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন ! নিরপরাধে পবিত্র দেহের সংহার করিবে, এ পাপ কি একটুও তাহার মনে হইতেছে না !

অকাতরে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে! কি আশ্চর্য্য! রমণীর প্রাণ কি এতই কঠিন হইতে পারে?

মায়মুনা নিদ্রিত অবস্থাতেই শয্যোপরিস্থ উপাধান চাপিয়া ধরিয়া গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে বলিতে লাগিল, "আমি নহি, আমি নহি! মারওয়ান—এজিদের প্রধান উজির মারওয়ান।" দুই তিন বার মারওয়ানের নাম করিয়া মায়মুনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রিত অবস্থায় কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কি কারণে ভয় পাইয়াছিল, কি কষ্টে পড়িয়াছিল, কে কি বলিল, মায়মুনার মনই তাহা জানে। মায়মুনা নিস্তব্ধ অবস্থায় শয্যোপরি বসিয়া রহিল। একদৃষ্টে কি দেখিল, কি ভাবিল,—নিজেই জানিল; শেষে বলিয়া উঠিল, "স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা। বুদ্ধিহীন মূর্খেরাই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহাই আমার কপালে থাকুক, আমি স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, সে ভয়ে হাজার মোহরের লোভ কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এ কি কম কথা! একটা নয়, দুইটা নয়, দশ শত মোহর! প্রস্তরাঘাতে মারিবে!—যে দিবে সে-ই মারিবে! এ কি কথা!"—এই বলিয়াই অন্য গৃহে গমন করিল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে নূতন আকারে, নূতন বেশে, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ময়মুনা এখন ধীরা, নম্রস্বভাবা, সর্ব্বাঙ্গে "বোর্‌কা" *। বোর্‌কা ব্যবহার না করিয়া স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য রাজপথে গমনাগমন করিলে রাজ-বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সেই জন্য মায়মুনা বোর্‌কা ব্যবহার করিয়া বহির্গত হইল।

ত্রয়োদশ প্রবাহ

মায়মুনা আজ কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে বহির্গত,—কোথায় যাইতেছে, তাহা পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। মায়মুনা এমাম হাসানের অন্তঃপুরে প্রায়ই যাতায়াত করিত; হাস্‌নেবানুর নিকট তাহার আদর ছিল না। হাস্‌নেবানুকে দেখিলেই সে ভয়ে জড়সড় হইত। জয়নাবের

* আপাদ মস্তক আবরণ বস্ত্র

নিকটেও কয়েক দিন চক্ষের জল ফেলিয়া সে সপত্নীর নিন্দাবাদ করিয়াছিল। হাস্‌নেবানু থাকিতে কাহারও সুখ নাই, এই প্রকার আরও দুই একটা মানভাঙ্গান-মন্ত্রও আওড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সুফল ফলে নাই। বরং যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে জয়নাবের নিকট চক্ষের জল ফেলিতে আর সাহস করিত না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে জয়নাবের নিকটে আর যাইতও না। জাএদার সহিত তাহার পুরাতন ভালবাসা। জাএদার সঙ্গেই বেশী আলাপ, বেশী কথা, বেশী কান্না। মায়মুনাকে পাইলেই জাএদা মনের কপাট খুলিয়া বসিতেন। পূর্ব্ব কথা, জয়নাব অসিবার পূর্ব্বে হাসানের ভালবাসা, হাসানের আদর-যত্ন, আর এখনকার অবস্থা বলিতে বলিতে জাএদা দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেন, মায়মুনাও সেই কান্নায় যোগ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইত। জাএদা ভাবিয়াছিলেন, মদিনার মধ্যে যদি কেহ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হয়, তবে সে মায়মুনা। দুইটা মুখের কথা কহিয়া সান্ত্বনা দেওয়ার যদি কেহ থাকে, তবে সে মায়মুনা। কাহারও কাছে কোনরূপ উপকারের আসা থাকিলেও সে মায়মুনা। মায়মুনা ভিন্ন সে সময়ে আপন বলিতে জাএদা আর কাহাকেও চক্ষে দেখেন নাই। মায়মুনাকে দেখিয়াই তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়মুনা! এ কয়েক দিন দেখি নাই কেন?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "তোমার কাজ না করিয়া কেবল যাওয়া আসায় লাভ কি? তুমি ত বলিয়াই মনের ভার পাতলা করিয়াছ; এখন ভোগ আমার, কষ্ট আমার, মেহনত আমার। তা বোন্! তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়, দীন-দুনিয়ার খারাবী হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপি যাহাতে হয়, আমি তোমার উপকার করিবই করিব; আমি ভুলি নাই।"

জাএদা কহিলেন, "সে সকল কথা আর আমার মনে নাই। পাগলের মত একদিন কি বলিয়াছিলাম, তুমি তাই মনে করিয়া রাখিয়াছ; যাক্, ও কথা থাক্, ও তুমি আর কখনই মনে করিও না; তার জন্য আর কোন চেষ্টা করিও না। আমার মাথা খাও, আর ও-কথা মুখে আনিও না। কৌশলে স্বামী-

বশ, মন্ত্রের গুণে স্বামীর মন ফিরান, মন্ত্রে ভালবাসা, ঔষধের গুণে স্বামী বশে আনা,—এ সকল বড় লজ্জার কথা। স্বাভাবিক মনে যে আমার হইল না, তাহার জন্য আর ও-সব কেন? সকলই অদৃষ্টের লেখা। আমি যত্ন করিলে আর কি হইবে? জয়নাবকে মারিয়াই বা কেন পাপের বোঝা মাথায় করি? ঈশ্বর তাহাকে স্বামীসোহাগিনী করিয়াছেন, তাহাতে যে বাধা দিবে, সেই-ই অধঃপাতে যাইবে। আমি সমুদয় বুঝিয়া একেবারে নিরস্ত হইয়াছি। যে আমার হইল না, আমার মুখের দিকে যে ফিরিয়া তাকাইল না, তাঁহাকে ঔষধের বশ করিয়া লাভ কি বোন! সে বশ কয় দিনের? সে ভালবাসা কয় মুহূর্ত্তের? যদি মন্ত্রের গুণ থাকে, যদি ঔষধের ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও সে কি আর যথার্থ ভালবাসার মত হয়? ধ'রে বেঁধে, আর মনের ইচ্ছায়, যে কত প্রভেদ তাহা বুঝিতে পার। মানিলাম, ঔষধে মন ফিরাইবে, নূতন ভালবাসার সহিত শত্রুভাব জন্মাইয়া দিবে; কিন্তু আমাকে যে ভালবাসিবে, তাহার ঔষধ কি? তাহাও যেন হইল,—কারণ, আমি হাতে করিয়া খাওয়াইব, আমাকেই ভালবাসার ভার সহিতে হইবে; কিন্তু ঔষধ ত আর চিরকাল পেটে থাকিবে না। ক্রমেই ঔষধের গুণ কমিতে থাকিবে,—শেষে আমার যে সেই—বরং জ্বালা বাড়িবারই বেশী সম্ভাবনা।"

ব্যঙ্গচ্ছলে মায়মুনা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আপোষ হইয়াছে, না ভাগ-বণ্টন, বিলি-ব্যবস্থা করিয়া ভাগাভাগী করিয়া লইয়াছ?—কিংবা মনের মোকর্দ্দমার শালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে?"

জাএদা উত্তর করিলেন, "ভাগ-বণ্টন করি নাই, আপোষও করি নাই, মিটমাটও করি নাই, এ জীবনে তাহা হইবেও না; জাএদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবেও না। মনের খেদে আর কি করি বোন্! দেখে শুনে একেবারে আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছি—স্বামীর নাম আর করিব না, স্বামীর কথাও আর মুখে আনিব না। যাহাদের স্বামী, যাহাদের ঘরকন্না, তাহারাই থাকুক—তাহারাই সুখভোগ করুক। জাএদা আজও যে ভিখারিণী, কালও সেই ভিখারিণী।"

মায়মুনা কহিল, "এত উদাস হইও না। যাহা কর, বুদ্ধি স্থির করিয়া

আগুপিছু বিবেচনা করিয়া করিও। তোমার শত্রু অনেক, মিত্রও অনেক। মনে করিলে তুমি রাজরাণী, আবার মনে না করিলে তুমি পথের ভিখারিণী। আর বোন্! আমি ত দেখিতেছি,—বড় এমাম যে চক্ষে জয়নাবকে দেখেন, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আবার সেই চক্ষে হাস্‌নেবানুকেও দেখিয়া থাকেন। কোন বিষয়েই ত ভিন্ন ভাব দেখিতে পাই না। শুনিতে পাই, জয়নাবকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, কিন্তু কৈ? আমি ত তাহার কিছুই দেখিতে পাই না; বরং দেখিতে পাই, তোমার প্রতি তাহার টান অধিক।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া জাএদা কহিলেন "তুমি কি বুঝিবে? প্রকাশ্যে কিছু ইতরবিশেষ দেখিতে পাও না, তাহা ঠিক। ভিতরে যে কি আছে, তাহা কে বুঝিবে? লোকের নিন্দা, ধর্ম্মের ভয়, কাহার না আছে? বিশেষতঃ ইহারা এমাম। প্রকাশ্যে সকল স্ত্রীকে সমান দেখেন। কিন্তু দেখাও অনেক প্রকার আছে। ধর্ম্মরক্ষা, লোকের মনে প্রবোধ, আমাদের মন বুঝান—অনায়াসেই হয়; কিন্তু উহার মধ্যে যে একটু গুহ্য ভাব আছে, তাহা আমি মুখে বলিতে পারিব না। উপমার কোন সামগ্রী সম্মুখেও নাই যে, তাহা দেখাইয়া তোমাকে বুঝাইব। এখন তিনি কথা কহেন, কিন্তু পূর্ব্বেকার সে স্বর নাই, সে মিষ্টতা নাই। ভালবাসেন, কিন্তু তাহাতে রস নাই। আদর করেন, কিন্তু সে আদরে মন গলে না; বরং বিরক্তিই জন্মে। আগে জাএদার নিকট সময়ের দীর্ঘতা আশা করিতেন; এখন যত কম হয় ততই মঙ্গল—তাহাই ইচ্ছা। পূর্ব্বে কথাবার্ত্তাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তবুও সে কথার ইতি হয় নাই,—মনের কথাও ফুরায় নাই; এখন জাএদার শয্যায় শয়ন করিলে ডাকিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। প্রভাতী উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। জয়নাবের বেলা আলাদা; ঊষাকালে একত্র শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু উপাসনায় ব্যাঘাত নাই! ঘরের কথা, মনের কথা, কে বুঝিবে বল দেখি? আমার দুঃখ অপরে কি বুঝিবে বল দেখি? কাহাকেই বা বলিব? জগতে আমার,—আমার বলিবার কেহই নাই। মনে কোন আশাও নাই। এখন শীঘ্র শীঘ্র মরণ হইলেই আমি নিস্তার পাই।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়মুনা বলিতে লাগিল, "জাএদা! তুমি কেন মরিতে চাও? তুমি মনে করিলে কি না করিতে পার? ইচ্ছা করিলেই তোমার দুঃখ দূর হয়; তুমি মনে করিলেই তোমার শত্রুর মুখে ছাই পড়ে। আমি ত আগেই বলিয়াছি, তোমার মনই সব। মনে করিলেই তুমি রাজরাণী, মনে না করিলেই তুমি ভিখারিণী।"

জাএদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনে করিলেই যদি মনের দুঃখ যায়, তবে জগতে কে না মনে করে?"

মায়মুনা উত্তর করিল "আমি ত আর দশ টাকা লাভের জন্য তোমার মনোমত কথা বলিতেছি না। যাহা বলি, মন ঠিক করিয়া একবার মনে কর দেখি, তোমার মনের দুঃখ কোথায় থাকে?"

জাএদা কহিলেন, "তোমার কোন্ কথাটা আমি মনের সহিত শুনি নাই, মায়মুনা? তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। যাহা বলিবে, তাহার অন্যথা কিছুতেই করিব না।"

মায়মুনা কহিল, "যদি মনে না লাগে, তবে করিও না। কিন্তু মন হইতে কখনও মুখে আনিতে পারিবে না! ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আমার নিকটে প্রতিজ্ঞা কর, এখনই বলিতেছি।"

জাএদা কহিলেন, "প্রতিজ্ঞা আর কি, তোমারই মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি, যাহা বলিবে, তাহাই করিব; সে কথা কাহারও নিকট ভাঙ্গিব না।"

উত্তম সুযোগ পাইয়া মায়মুনা অতি মৃদুমৃদু স্বরে মনের অনেক কথা বলিল। জাএদাও মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতে শুনিতে শেষের একটি কথায় চমকিয়া উঠিলেন,—চমকিতভাবে একদৃষ্টে মায়মুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! ভয়ে থতমত খাইয়া বলিলেন, "শেষের কাজটি জাএদার প্রাণ থাকিতে হইবে না। এই দুঃখে যদি মরিয়াও যাই, যদি আরও শত শত প্রকার দুঃখ ভোগ করি, সপত্নী-বিষম-বিষে আরও যদি জর্জ্জরিত হই, পরমায়ুর শেষ পর্য্যন্তও যদি এই দুঃখের শেষ না হয়, তথাপি উহা পারিব না। আমার স্বামী আর আমি—আমার প্রাণের প্রাণ—কলিজার টুক্‌রা আর আমি—"

শেষ কথাটি শেষ করিতে না দিয়াই মায়মুনা কহিল, "শেষের কার্য্যটি না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। কথাটা আগে ভাল করিয়া বিবেচনা কর, তাহার পর যাহা বলিতে হয়—বলিও। যে রাজরাণী জয়নাব হইত, সেই-ই রাজরাণী,—আবার প্রথমেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার! সকলই সুখের জন্য। জগতে যদি চিরকাল দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হয়, তবে মনুষ্যকুলে জন্মলাভে কি ফল? এমন সুযোগ কি আর হইবে? এ সময় কি চিরকালই এমনি থাকিবে? সময়ে সুযোগ পাইলে হাতের ধন পায়ে ঠেলিতে নাই। তোমার ভাগ্যে আছে বলিয়াই জয়নাব তোমার সপত্নী হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দেখিয়াও কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? আমার কথা কয়টি বড় মূল্যবান। ইহার এক একটি করিয়া সফল করিতে না পারিলে পরিশ্রম, যত্ন সকলই বৃথা। এক একটি কার্য্যের এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের অভাবে অন্যটা সাধিত হইতে পারে না। এই পুরীমধ্যে তোমার কে আছে? বল ত, তোমাকে আপন বলিয়া কে আদর করে? তুমিই না বলিয়াছ, সকলই আছে, অথচ তাহার মাঝে কি যেন নাই, তাহা আমি মুখে বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তোমার মনই তাহার প্রমাণ। আজ আমি আর বেশী কিছু বলিব না।"—এই বলিয়া মায়মুনা জাএদার নিকট হইতে বিদায় লইল।

জাএদা মলিনমুখী হইয়া উঠিয়া গেলেন। যেখানে গেলেন, সেখানেও স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না। পুনরায় নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। এক দিকে রাজভোগের লোভ, অপর স্বামীর প্রণয়, এই দুইটি ক্রমে ক্রমে তুলনা করিতে লাগিলেন। যদি জাএদা হাসানের পত্নী না হইতেন, যদি জাএদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন, তবে কি আজ জাএদা বিবেচনা-তুলাদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পত্তি সুখ সমুদয়—এক দিকে, আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ—ভিন্ন দিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন? কখনই নহে! কতবার তিনি পরিবর্ত্তন করিলেন, দুরাশা-পাষাণ ভাঙ্গিয়া তুলাদণ্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম দুঃখ-ভার চাপাইয়া দিলেন, তথাপি স্বামীর প্রাণের দিকই বেশী ভারী হইল। কিন্তু জয়নাবের নাম

মনে পড়িবামাত্রই পরিমাণদণ্ডের যে দিকে স্বামীর প্রাণ, সেই দিক একেবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল। হঠাৎ এক দিকের লঘুতাপ্রযুক্ত রাজভোগ, ও ধনলাভস্পৃহার পরিমাণ একেবারে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া জাএদার মন ভারী করিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বিবেচনা -তুলাদণ্ডে স্বামীর প্রাণের দিক আর নীচে নামাইতে পারিলেন না। মায়মুনার শেষ কথাটাও মনে পড়িল। "তোমার কেহই নাই, তুমি কাহারও নও।"—"এ সংসারে আমার কেহই নাই, আমি কাহারও নহি," বলিতে বলিতে জাএদা শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"আমার কেহ নাই, আমি কাহারও নহি। জাএদাই যদি বঞ্চিত হইল, জাএদাই যদি মনের আগুনে পুড়িতে থাকিল, তবে তাহার চক্ষের উপর জয়নাব সুখভোগ করিবে, তাহা কখনই হইবে না! প্রথম শত্রুর প্রতি হিংসা, শত্রুর মনে ব্যথা দেওয়া, পরিণামে একের অভাব বটে! কিন্তু মনের ও অর্থের সুখ অসীম। আমার উভয় পক্ষেই সুখ। মায়মুনার কথার কেন অবাধ্য হইব?"

জাএদা মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দর্পণে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বোর্কা পরিধানপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্দ্দশ প্রবাহ

স্ত্রীলোকমাত্রেই সেখানে বোর্কা ব্যবহার করিয়া যথেচ্ছা বেড়াইতে পারে। ভারতের ন্যায় তথায় পাল্কী বেহারা নাই। লক্ষপতি হউন, রাজ-ললনাই হউন, ভদ্রমহিলাই হউন, তিনি বোর্কা ব্যবহার করিয়া যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। দূরদেশে যাইতে হইলে উষ্ট্রের বা অশ্বের আশ্রয় লইতে হয়।

মায়মুনার গৃহ বেশী দূর নহে। জাএদা মায়মুনার গৃহে উপস্থিত হইয়া বোরকা মোচনপূর্ব্বক তাহার শয়নকক্ষে যাইয়া বসিলেন। মায়মুনাও নিকটে আসিয়া বসিলেন। আজ জাএদা মনের কথা অকপটে ভাঙ্গিলেন। কথায় কথায়, কথার ছলনায়, কথায় ভর দিয়া, কথা

কাটাইয়া, কথার ফাঁক দিয়া কথার বিপক্ষতা করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল দিকে যাইয়া আজ মায়মুনা জাএদার মনের কথা পাইল। মায়মুনার মোহমন্ত্রে জাএদা যেন উন্মাদিনী!

সপত্নীনাগিনীর বিষদন্তে যে অবলা একবার দংশিত হইয়াছে, তাহার মন ফিরিতে কতক্ষণ? চিরভালবাসা, চিরপ্রণয়ী পতির মমতা বিসর্জ্জন করিতে তাহার দুঃখ কি? এক প্রাণ, এক আত্মা স্বামীই সব—একথা প্রায় স্ত্রীরই মনে আছে, স্ত্রীরই মনে থাকে, কিন্তু সপত্নীর নাম শুনিলেই মনের আগুণ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণভাবে জ্বলিয়া উঠে। সে আগুন বাহির হইবার পথ পায় না বলিয়াই অন্তর ভালবাসা, প্রণয়, মায়ামমতা একেবারে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে।

মায়মুনার সমুদয় কথাতেই জাএদা সম্মত হইলেন। মায়মুনা মহা-সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল "বোন্! এতদিনে যে বুঝিয়াছ, সেই ভাল! আর বিলম্ব নাই, কোন্ সময়ে কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে কে বলিতে পারে? যত বিলম্ব হইবে ততই তোমার অমঙ্গলের ভাগ বেশী হইবে। যাহা করিতে বসিলে, তাহার উপর আর কথা কি আছে? শুভ-কার্য্যে আর বিলম্ব কেন? ধর এই ঔষধ লও।"

এই বলিয়া মায়মুনা শয্যার পার্শ্ব হইতে খর্জ্জুরপত্র-নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র পাত্র বাহির করিল। তন্মধ্য হইতে অতি ক্ষুদ্র একটি কৌটা জাএদার হস্তে দিয়া বলিল, "বোন্! খুব সাবধান! এই কৌটাটি গোপনে লইয়া যাও, সুযোগমত ব্যবহার করিও,—মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, জয়নাবের সুখতরী ডুবিবে; এই কৌটার গুণে তুমি সকলই পাইবে। যাহা মনে করিবে তাহাই হইবে।"

জাএদা কহিলেন, "মায়মুনা! তোমার উপদেশেই আমি সকল মায়া পরিত্যাগ করিলাম! জয়নাবের সুখস্বপ্ন আজ ভাঙ্গিব, জয়নাবের অঙ্গের আভরণ আজ অঙ্গ হইতে খসাইব, সেই আশাতেই সকলই স্বীকার করিলাম। আমার দশার দিকে ফিরিয়াও চাহিলাম না। জয়নাবের যে দশা ঘটিবে, আমারও সেই দশা। ইহা জানিয়াও কেবল সপত্নীর মনে

কষ্ট দিতে স্বামী-বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখ বোন্, আমাকে অকুল-সাগরে ভাসাইও না। আমার সর্ব্বনাশ করিতে আমিই ত দাঁড়াইলাম, তাহাতে দুঃখ নাই! জয়নাবের সর্ব্বনাশ করিতে আমার সর্ব্বনাশ! এখন ইহাও সর্ব্বমঙ্গল, সর্ব্বসুখ মনে করিতেছি। কিন্তু বোন্, তুমি আমাকে নিরাশ্রয় করিয়া বিষাদ-সমুদ্রে ভাসাইও না।"

ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলিয়া জাএদা বিদায় লইলেন। মায়মুনাও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইল।

জাএদা গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে হস্ত কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু মায়মুনার উপদেশক্রমে সে ভয় বেশীক্ষণ রহিল না। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সেই কৌটাটির বস্তু মিশাইবেন, ইহাই মায়মুনার উপদেশ। সে সময় তিনি আর কিছু পাইলেন না, একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ মধু ছিল, তাহাতেই সেই বস্তুর কিঞ্চিৎ মাত্র মিশাইয়া রাখিলেন। কৌটাটিও অতি যত্নে সংগোপনে রাখিয়া দিলেন।

হজরত হাসান প্রতিদিনই একবার জাএদার গৃহে আসিয়া দুই এক দণ্ড নানাপ্রকার আলাপ করিতেন। কয়েকদিন আসিবার সময় পান নাই; সেই দিন মহাব্যস্তে জাএদার ঘরে আসিয়া বসিলেন। জাএদা পূর্ব্বমত স্বামীর পদসেবা করিয়া ব্যস্তসমস্তে জলযোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

হাসান ভাবিয়াছিলেন, জাএদার ঘরে কয়েকদিন যাই নাই, না জানি, জাএদা আজ কতই অভিমান করিয়া রহিয়াছে! কিন্তু ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। জাএদা পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে সরলতা শিখিয়াছে, মানসের পূর্ণানন্দে পরিপূরিত রহিয়াছে—এই ভাব দেখিয়া হাসান আজ জাএদার গৃহেই বাস করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। জাএদাও নানা প্রকার হাবভাব প্রদর্শনে স্বামীর মন হরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ হরণ করিতে বসিলেন।

ঈশ্বরভক্তই হউন, মহামহিম ধার্ম্মিক প্রবরই হউন, মহাবলশালী বীর-

পুরুষই হউন, কি মহাপ্রাজ্ঞ সুপণ্ডিতই হউন, স্ত্রীজাতির মায়াজাল ভেদ করা বড় কঠিন। নারীবুদ্ধির অন্ত পাওয়া সহজ নহে। জাএদা এক পাত্রে মধু ও অন্য পাত্রে জল আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিলেন।

সকৌতুকে হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসময়ে মধু?"

মায়াপূর্ণ আঁখিতে হাসানের দিকে একবার তাকাইয়া জাএদা উত্তর করিলেন, "আপনার জন্য আজ আট দিন এই মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, পান করিয়া দেখুন, খুব ভাল মধু।"

মধুর পেয়ালা হস্তে তুলিয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "আমার জন্য আট দিন যত্ন করিয়া রাখিয়াছ? ধন্য তোমার যত্ন ও মায়া! আমি এখনই খাইতেছি।" হাসান সহর্ষে এই কথা বলিয়া মধুর পাত্র হস্তে তুলিয়া মধু পান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই বিষের কার্য্য আরম্ভ হইল। শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও চিত্তের অস্থিরতাপ্রযুক্ত পিপাসার আধিক্য হইল। ক্রমে কণ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল, চক্ষু লোহিতবর্ণ হইয়া শেষে দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। তিনি যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জাএদাকে বলিলেন, "জাএদা! এ কি হইল? এ কেমন মধু? এত জল পান করিলাম, পিপাসার শান্তি হইল না। ক্রমেই শরীর অবশ হইতেছে, পেটের মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ কি? কিসে এমন হইল?"

জাএদা বায়ুব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মস্তকে শীতল জল ঢালিতে লাগিলেন। কিছুতেই হাসান সুস্থির হইলেন না। ক্রমেই শরীরের জ্বালা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পেটের বেদনার ক্রমশঃই বৃদ্ধি! হাসান অত্যন্ত কাতর হইয়া অবশেষে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাএদা, এ কিসের মধু? মধুতে এমন আগুন? মধুর এমন জ্বালা? উঃ! আর সহ্য হয় না! আমার প্রাণ গেল। জাএদা! উঃ! আর আমি সহ্য করিতে পারি না।"

জাএদা যেন অবাক! মুখে কথা নাই! অনেকক্ষণ পরে কেবলমাত্র

এই কথা বলিলেন, "সকলই আমার কপালের দোষ। মধুতে এমন হইবে তাহা কে জানে? দেখি দেখি, আমিও একটু খাইয়া দেখি।"

হাসান সেই অবস্থাতেই নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জাএদা, আমার কথা রাখ। ও মধু তুমি খাইও না। আমার মাথা খাও, ও মধু মুখে দিও না, ছুঁইও না। জাএদা! ও মধু নয়, কখনই ও মধু নয়! তুমি—খোদার দোহাই, ও মধু তুমি ছুঁইও না। আমি যে যাতনা ভোগ করিতেছি তাহা আমিই জানি। জাএদা, ঈশ্বরের নাম কর।"

পত্নীকে এই কথা বলিয়াই হাসান ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। কাহাকেও সংবাদ দিলেন না। জাএদার ঘরেই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলেন। পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র মুখেই দয়াময়ের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বিষের বিষম যাতনা নামের গুণে কতক পরিমাণে অল্প বোধ হইতে লাগিল। জাএদা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। প্রভাতী উপাসনার সময়ে হাসান অতি কষ্টে জাএদার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রভু মোহাম্মদের সমাধি-মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া বিনীত-ভাবে ঈশ্বরের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যাঁহার কৃপাবলে অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পর্ব্বত সাগরে মিশিয়াছে, বিজন বন নগরে পরিণত হইয়াছে, জনপূর্ণ মহানগরী নিবিড় অরণ্য হইয়া যাইতেছে, সেই সর্ব্বেশ্বরের অসাধ্য কি আছে! প্রভু মোহাম্মদের সমাধি-মন্দিরের পবিত্রতা গুণে, ঈশ্বরের মহিমায় হাসান আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই প্রথম বিষপান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত (চল্লিশ দিন) প্রায়ই কোন না কোন প্রকারে শরীরের গ্লানি ছিল। এ কথা (প্রথম বিষ-পান ও আরোগ্য-লাভ) অতি গোপনে রাখিলেন। কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

প্রণয়ী, বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া নিতান্ত কঠিন। চিরশত্রুর হস্ত হইতে অনেকেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু মিত্র যদি শত্রু হয়, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার আশা

কিছুতেই থাকে না। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি শত্রুতাসাধনে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, প্রাণ থাকিতে তাহা শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। জাএদা ক্ষান্ত হইবেন কেন? জাএদার পশ্চাতে লোক আছে। জাএদা একটু নিরুৎসাহ হইলে, মায়মুনা তাহাকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিয়া নূতন-ভাবে উত্তেজিত করিত। একবার বিফল হইলে দ্বিতীয়বারে অবশ্যই সুফল ফলিবে, এ কথাও জাএদার কর্ণে মধ্যে মধ্যে ফুৎকারের ন্যায় বাজিত।

এদিকে মায়মুনা ভাবিতেছিল ঃ—যাহা দিয়াছি, তাহাতে আর রক্ষা নাই। একবার গলাধঃকরণ হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। হাসান জাএদার গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন, মধুপানে আত্মবিকার উপস্থিত হইয়াছে,—গোপনে ইহা সন্ধান লইয়া সে একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, কোন্ সময়ে হাসানের পুরী হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিবে, নিজেও কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া পুরবাসিগণের সহিত হাসানের বিয়োগজনিত ক্রন্দনে যোগ দিবে—এইরূপ আলোচনায় সারা নিশি বসিয়া বসিয়াই কাটাইল। প্রভাত হইয়া আসিল, তবুও ক্রন্দনশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। দুই এক পা করিয়া সে জাএদার গৃহ পর্য্যন্ত আসিল, জাএদার মুখে সমুদয় ঘটনা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল ; জিজ্ঞাসা করিল, "তবে উপায় কি ?"

জাএদা উত্তর করিল, "উপায় অনেক আছে। তুমি বাজার হইতে আমাকে কিছু মিষ্ট খেজুর আনিয়া দাও। এবারে দেখিও, কিছুতেই রক্ষা পাইবে না"

"খেজুরে কি হইবে ?"

"মধুতে যাহা হইয়াছিল, তাহাই হইবে ?"

"তিনি কি তোমার ঘরে আর আসিবেন ?"

"কেন আসিবেন না ?"

"যদি জানিয়া থাকেন—ঘুণাক্ষরেও যদি টের পাইয়া থাকেন, তবে তোমার ঘরে আসা দূরে থাক্, তিনি তোমার মুখও দেখিবেন না।"

"বোন্! তুমি আমার বয়সে বড়, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াও

থাকিবে, কিন্তু তোমার ভ্রমও অনেক। স্ত্রীজাতির এমনই একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, পুরুষের মন অতি কঠিন হইলেও সহজে নোয়াইতে পারে, ঘুরাইতে পারে, ফিরাইতে পারে। তবে অন্যের প্রণয়ে মজিলে একটু কথা আছে বটে। কিন্তু হাতে পাইয়া নির্জ্জনে বসাইতে পারিলে, কাছে ঘেঁসিয়া মোহিনী মন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে আওড়াইতে পারিলে, অবশ্য কিছু না কিছু ফল ফলাইতে পারিবেই পারিবে। এ যে না পারে সে নারী নহে ;—আর আমি তাঁহাকে বিষপান করাইব, এ কথা ত তিনি জানেন না, কেহ ত তাঁহাকে সে কথা বলে নাই ; তিনিও ত সর্ব্বজ্ঞ নহেন যে, জয়নাবের ঘরে বসিয়া জাএদার মনের খবর জানিতে পারিবেন ? যে পথে দাঁড়াইয়াছি—আর ফিরিব না, যাহা করিতে হয় আমিই করিব।"

মায়মুনা মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনেই বলিল, "মানুষের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইতে ক্ষণকাল বিলম্ব হয় না!"—প্রকাশ্যে কহিল, "আমি খেজুর লইয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"

মায়মুনা বিদায় লইল। জাএদা অবশিষ্ট মধু, যাহা পাত্রে ছিল তাহা আনিয়া, দেখিয়া দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন : "যেমন মধু তেমনি আছে, ইহার চারিভাগের এক ভাগও যদি উদরস্থ হইত, তবে আজ এতক্ষণ জয়নাবের সুখতরী ডুবিয়া যাইত, সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া একেবারে দুঃখের সাগরে ডুবিত, স্বামীসোহাগিনীর সাধ মিটিয়া যাইত! এই সুমধুর মধুতেই জাএদার আশা পরিপূর্ণ হইত। প্রথমে যে ভাব হইয়াছিল ; আর কিছুক্ষণ সেই ভাব থাকিলে আজ জয়নাবের আর হাসিমুখ দেখিতাম না; আমারও অন্তর জ্বলিত না। দুইবার তিনবার,- -যতবার হয় চেষ্টা করিব ; চেষ্টার অসাধ্য কি আছে!"

মায়মুনা খেজুর লইয়া উপস্থিত হইল ; বলিল, "সাবধান! আর আমি বিলম্ব করিব না ; যদি আবশ্যক হয়, সময় বুঝিয়া আমার বাটীতে যাইও।" এই কথা বলিয়া মায়মুনা চলিয়া গেল। জাএদা সেই খেজুর-গুলি বাছিয়া দুই ভাগ করিলেন। এক ভাগের প্রত্যেক খেজুরে এমন একটি চিহ্ন দিলেন যে, তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও চক্ষে তাহা পড়িবার

সম্ভাবনা রহিল না। অবশিষ্ট অচিহ্নিত খেজুরগুলিতে সেই কৌটার সাঙ্ঘাতিক বিষ মিশ্রিত করিয়া, উভয় খেজুর একত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন।

হাসান জয়নাবকে বলিয়াছিলেন, "গত রাত্রে জাএদার গৃহে বাস করিব ইচ্ছা ছিল, দৈববশে এমনি ঘটনা ঘটিল যে, সমস্ত রাত্রি পেটের বেদনায় শরীরের জ্বালায় অস্থির ছিলাম। মুহূর্ত্তকালের জন্যও সুস্থির হইতে পারি নাই। ভাবনায় চিন্তায় জাএদাও কোন কথা মুখে আনিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বলিয়াছিল 'সকলই আমার কপাল।' তা' যাহাই হউক, আজও জাএদার গৃহে যাইতেছি।"

জয়নাব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া হাসানকে বিদায় দান করিলেন। জয়নাবের ইচ্ছা যে,—কাহারও মনে যেন দুঃখ না হয়, স্বামীধনে কেহই যেন বঞ্চিত না হয়। সে ধনের সকলেই অধিকারিণী ও প্রত্যাশিনী।

হাসানেরও শরীর সম্যক্ সুস্থ হয় নাই; বিষের তেজ শরীর হইতে একেবারে যে নির্দ্দোষভাবে অপসৃত হইয়াছে—তাহাও নহে। শরীরের গ্লানি ও দুর্ব্বলতা এবং উদরের জড়তা এখনও অনেক আছে। এ সকল থাকা সত্ত্বেও তিনি জাএদার গৃহে উপস্থিত হইয়া গত রাত্রির ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই মধুর কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন। জাএদা উত্তর করিলেন, "যে মধুতে এত যন্ত্রণা, এত ক্লেশ, সেই মধু আমি আবার গৃহে রাখিব? পাত্রসমেত তাহা আমি তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।"

জাএদার ব্যবহারে হাসান যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। সুযোগ পাইয়া জাএদা সেই খর্জ্জুরের পাত্র এমাম হাসানের সম্মুখে রাখিয়া নিকটে বসিয়া তাঁহাকে খর্জ্জুর ভক্ষণে অনুরোধ করিলেন। হাসান স্বভাবতঃই খর্জ্জুর ভালবাসিতেন; কিন্তু গত রজনীতে মধু পান করিয়া যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। চতুরা জাএদা স্বামীর অগ্রেই চিহ্নিত খেজুরগুলি খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেখাদেখি এমাম হাসানও চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত উভয়াবধ খেজুর একটি একটি করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। ঊর্দ্ধসংখ্যা সাতটি উদরস্থ হইলেই

বিষের কার্য্য আরম্ভ হইল। হাসান সন্দেহপ্রযুক্ত আর খাইলেন না, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না; নিতান্ত দুঃখিতভাবে প্রাণের অনুজ হোসেনের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। এবারও কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কিছুক্ষণ ভ্রাতৃগৃহে অবস্থিতি করিলেন। নিদারুণ বিষের যন্ত্রণা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। পুনরায় তিনি প্রভু মোহাম্মদের 'রওজা মোবারকে' (পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্রে) যাইয়া ঈশ্বরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়াময় এবারেও হাসানকে আরোগ্য দান করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

জাএদার আচরণ এবার হাসান কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তিনি সে কথা মুখে আনিলেন না; কাহারও নিকট প্রকাশও করিলেন না; কিন্তু মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "স্ত্রী দুঃখের ভাগিনী, সুখের ভাগিনী। আর আমার স্ত্রী যাহা —ঈশ্বরই জানেন! আমি জ্ঞানপূর্ব্বক জাএদার কোন অনিষ্ট করি নাই, কোন প্রকার কষ্টও তাহাকে দিই নাই। জয়নাবকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়াই কি জাএদা আমার প্রাণ লইতে সঙ্কল্প করিয়াছে? স্বহস্তে পতিবধে প্রবৃত্ত হইয়াছে? সপত্নী-সম্বন্ধ তাহার নূতন নহে। হাস্‌নেবানুও তাহার সপত্নী। যে জাএদা আমার জন্য সর্ব্বদা মহাব্যস্ত থাকিত—কিসে আমি সন্তুষ্ট থাকিব, তাহারই অনুসন্ধান করিত, আজ সেই জাএদা আমার প্রাণবিনাশের জন্য বিষ হস্তে করিয়াছে! না, না—এ কথা আর কাহাকেও বলিব না। এ বাটীতেও আর থাকিব না। মায়াময় সংসার ঘৃণার্হ স্থান। নিশ্চয় জাএদার মন অন্য কোন লোভে আক্রান্ত হইয়াছে। অবশ্যই জাএদা কোন আশায় ভুলিয়াছে, কুহকে মজিয়াছে। সপত্নীবাদে সে আমাকে বিষ দিবে কেন? এ বিষ ত জয়নাবকে দেওয়াই সম্ভব। জয়নাবের প্রাণেই তাহার অনাদর হইতে পারে, আমার প্রাণে অনাদর হইলে তাহার আর সুখ কি? স্ত্রী হইয়া যখন স্বামী-বধে অগ্রসর হইয়াছে, তখন আর আমার নিস্তার নাই! এ পুরীতে আর থাকিব না।

স্ত্রী-পরিজনের মুখ আর দেখিব না; এই পুরীতে আমার জীবন-বিনাশের প্রধান ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কিছুতেই এখানে থাকা আর উচিত নহে। বাহিরের শক্র হইতে রক্ষা পাওয়া বরং সহজ, কিন্তু ঘরের শক্র হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর! শক্র দূরে থাকিলেও সর্ব্বদা আতঙ্ক! কোন্ সময়ে কি ঘটে, কোন্ সূত্রে, কোন্ সুযোগে, কি উপায়ে, কোন্ পথে, কাহার সাহায্যে, শক্র আসিয়া কি কৌশলে শক্রতা সাধন করে, এই ভাবনায় ও এই ভয়েই সর্ব্বদা আকুল থাকিতে হয়। কিন্তু আমার ঘরেই শক্র! আমার প্রাণই আমার শক্র! নিজ দেহই আমার ঘাতক! নিজ হস্তই আমার বিনাশক! নিজ আত্মাই আমার বিসর্জ্জক! উঃ, কি দারুণ কথা! মুখে আনিতেও কষ্টবোধ হয়। স্ত্রী ও স্বামীর দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু আমি ত আর-কিছুই ভিন্ন দেখি না। স্বামী ও স্ত্রী এক দেহ হইতে পারে না বলিয়াই ভিন্ন ভাবে থাকে; কিন্তু আত্মা এক, মন এক, মায়ামমতা এক, আশা এক, ভরসা এক, প্রাণ এক—সকলই এক। কিন্তু কি দুঃখ! কি ভয়ানক কথা! হা অদৃষ্ট! আমারও সেই এক-আত্মা এক-প্রাণ স্ত্রী—তাহার হস্তেই স্বামী-বিনাশের বিষ! কি পরিতাপ! সেই কোমল হস্ত স্বামীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণের জন্য প্রসারিত! আর এ স্থানে থাকিব না। বনে বনে পশুপক্ষীদিগের সহবাসে থাকাই ভাল। এ পুরীতে আর থাকিব না।”

এইরূপে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া হাসান আপন প্রধান মন্ত্রী আব্বাস্ ও কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে মদিনার নিকটস্থ মুসাল নগরে গমন করিলেন। মুসালবাসীরা হজরত এমাম হাসানের শুভাগমনে যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া অতি সমাদরে বিশেষ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন বিশ্রাম ঘটিল না।

পঞ্চদশ প্রবাহ

কপাল মন্দ হইলে তাহার ফলাফল ফিরাইতে কাহারও সাধ্য নাই! মুসাল নগরে আসিয়া হাসান কয়েক দিন থাকিলেন। তিনি জাএদার ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু অদৃষ্টলিপি যাহা, তাহাই রহিয়া গেল। যখন কপাল টলিয়া যায়, দুঃখ-পথের পথিক হইতে হয়, তখন কিছুতেই আর নিস্তার থাকে না। এক জাএদার ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া মুসাল নগরে আসিলেন, কিন্তু সেরূপ কত জাএদা শত্রুতা সাধনের জন্য তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন? এই বিশ্ব-সংসারে শত্রুসংখ্যা যদি আমরা জানিতে পারি, বাহ্যিক আকারে শত্রুমিত্র যদি চিনিতে পারি, তবে কি আর বিপদের সম্ভাবনা থাকে? চিনিতে পারিলে কি আর শত্রুরা শত্রুতা সাধন করিতে পারে? তাহা হইলে সতর্কতা কাহার জন্য? এমাম হাসানের ভাগ্যে সুখ নাই। যে দিন জয়নাবকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, যে দিন জয়নাবকে নিজ পুরীমধ্যে আনিয়া জাএদার সহিত রাখিয়াছিলেন, সেই দিনই তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই দিনই তাঁহার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। জয়নাবের জন্যই জাএদা আজ তাঁহার পরম শত্রু। সেই শত্রুর যন্ত্রনায় অস্থির হইয়াই আজ তিনি গৃহত্যাগী। সেই গৃহত্যাগেই আর এক শত্রুর শত্রুতা সাধনের সুযোগ! আবার জয়নাবই জাএদার সুখের কণ্টক! সকলের মূলেই জয়নাব!

মদিনার সংবাদ দামেস্কে যাইতেছে, দামেস্কের সংবাদ মদিনায় আসিতেছে। এমাম হাসান মদিনা ছাড়িয়া মুসাল নগরে আসিয়াছেন, এ কথাও এজিদের কর্ণে উঠিয়াছে, অপর সাধারণেও শুনিয়াছে। ঐ নগরের একচক্ষু-বিহীন জনৈক বৃদ্ধের, প্রভু মোহাম্মদের প্রতি জাতক্রোধ ছিল। শেষে সেই ক্রোধ, সেই শত্রুতা তাঁহার সন্তানসন্ততি,—পরিশেষে হাসান-হোসেনের প্রতি আসিয়াছিল। সেই বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সুযোগ পাইলেই মোহা-

স্মদের বংশমধ্যে যাহাকে সে হাতে পাইবে, তাহারই প্রাণ সংহার করিবে। মদিনা পরিত্যাগ করিয়া হাসানের মুসাল নগরে আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া সেই ব্যক্তি বিশেষ যত্নে হলাহলসংযুক্ত এক সুতীক্ষ্ণ বর্ষা প্রস্তুত করিয়া শত্রুতা সাধনোদ্দেশ্যে মুসাল নগরে যাত্রা করিল। কয়েকদিন অবিশ্রান্তে পথ চলিবার পর মুসাল নগরে যাইয়া সে সন্ধানে জানিল যে, এমাম হাসান ঐ নগরস্থ উপাসনা-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন এবং ঐ স্থানে অব্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ উল্লিখিত উপাসনা-মন্দিরের সীমাবর্ত্তী গুপ্তস্থানে বর্শা লুকাইয়া রাখিয়া একেবারে হাসানের নিকটস্থ হইল। এমাম হাসানের দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িবামাত্র ধূর্ত্ত বৃদ্ধ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন। আমি এতদিন শয়তানের কুহকে পড়িয়া পবিত্র মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বর-কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃপ্রভাবে মনের অন্ধকার দূর হইয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, এমাম হাসান মদিনা হইতে মুসাল নগরে আসিয়াছেন। সেই স্বপ্নেই কে যেন আমায় বলিল যে, শীঘ্র এমাম হাসানের নিকট যাইয়া সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হও, পূর্ব্ব পাপ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, ভবিষ্যৎ পাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কর। এই মহার্থপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া আমি ঐ শ্রীপাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছি, যাহা অভিমত হয় আজ্ঞা করুন।"

দয়ার্দ্রচিত্ত হাসান আগন্তুক বৃদ্ধকে অনেক আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে মোহাম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে এখনই প্রস্তুত আছি।" এই কথা বলিয়াই এমাম হাসান তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া তাহাকে "বায়েত" (মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত) করিলেন। বৃদ্ধও যথারীতি মোহাম্মদীয় ধর্ম্মে "ঈমান" (মুখে স্বীকার এবং বিশ্বাস) আনিয়া হাসানের পদধুলি গ্রহণ করিল। বিধর্ম্মীকে সৎপথে আনিলে মহাপুণ্য! বৃদ্ধও এই প্রাচীন বয়সে আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী-পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলনান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মাননীয় হাসানের বিশেষ অনুগৃহীত ও বিশ্বাসভাজন হইল।

দুষ্টবুদ্ধি, স্বার্থপর, নরপিশাচ কেবল কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্তই, চির-মনোরথ পরিপূর্ণ করিবার আশাতেই—চিরবৈরনির্য্যাতন মানসেই অকপটভাবে হাসানের শরণাগত হইল; ইহা সরলস্বভাব হাসানের বুদ্ধির অগোচর। বৃদ্ধ প্রকাশ্যে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবার অবসর ও সুযোগ অন্বেষণে সর্ব্বদাই সমুৎসুক রহিল। আগন্তুককে বিশ্বাস করিতে নাই, এ কথা যে হাসান না জানিতেন, তাহা নহে; কিন্তু সেই মহাশক্তি—সেই সুকৌশলসম্পন্ন ঈশ্বরের লীলা সম্পন্ন হইবার জন্যই অনেক সময়ে অনেক লোকে অনেক জানিয়াও সব ভুলিয়া যায়, অনেক চিনিয়াও কিছুই চেনে না!

উপাসনা-মন্দিরের সম্মুখে হাসান এবং এবনে আব্বাস্ বসিয়া আছেন। নূতন শিষ্য কার্য্যান্তরে গিয়াছে। এবনে আব্বাস্ বলিলেন, "এই যে দামেস্ক হইতে আগত একচক্ষু-বিহীন পাপস্বীকারকারী বৃদ্ধ—আপনার বিশ্বাসভাজন নব শিষ্য, ইহার প্রতি আমার সন্দেহ হয়।"

"কি সন্দেহ?"

"আমি চিন্তা করিয়াছি,—অনেক ভাবিয়াও দেখিয়াছি, এই বৃদ্ধ শুদ্ধমাত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আসে নাই। আমার বোধ হয়, কোন দুরভিসন্ধি সাধন মানসে কিংবা কোন গুপ্ত সন্ধান লইবার জন্য আমাদের অনুসন্ধানে আসিয়াছে।"

"অসম্ভব! তাহা হইলে ভক্তিভাবে মোহাম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে কেন? সাধারণভাবে এখানে অনায়াসেই থাকিতে পারিত, সন্ধানও লইতে পারিত।"

"পারিত সত্য—পারিয়াছেও তা';—কিন্তু বিধর্ম্মী, নারকী, দুষ্ট খল শত্রু কেবল কার্য্য উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মের ভাণ করিয়া গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আসিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য বা কি?"

"ভ্রাতঃ! ও কোন কথাই নয়। তিন কাল কাটিয়া শেষে কি এই বৃদ্ধকালে সে বাহ্যিক ধর্ম্মপরিচ্ছদে কপটবেশে পাপকার্য্যে লিপ্ত হইবে? জগৎ কি চিরস্থায়ী? শেষের দিনের ভাবনা, বল ত কার না আছে? এই বৃদ্ধ

বয়সেও যদি উহার মনের মলিনতা দূর না হইয়া থাকে, পাপজনিত আত্মগ্লানি যদি এখনও উপস্থিত না হইয়া থাকে, কৃত পাপের জন্য এখনও যদি অনুতাপ না হইয়া থাকে, তবে আর কবে হইবে? চিরকাল পাপ-পঙ্কে জড়িত থাকিলে শেষ দশায় অবশ্যই স্বকৃত পাপের জন্য বিশেষ অনুতাপিত হইতে হয়। অনেকেই গুপ্ত পাপ নিজ মুখে স্বীকার করে। যে পাপ স্বীকারে প্রাণবিনাশ হইতে পারে, ঈশ্বরের এমনই মহিমা যে, সে পাপও পাপী লোকে নিজ মুখে স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকে। পাপ কিছুতেই গোপন থাকিবার নহে,—আবার মন সরল না হইলেও ধর্ম্মে মতি হয় না, ঈশ্বরেও ভক্তি হয় না। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-সুধা পিপাসু হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কত পরিশ্রমে দামেস্ক হইতে মুসাল নগরে এতদূর আসিয়াছে, তাহার কি চাতুরী থাকিতে পারে? মন যে দিকে ফিরাও সেদিকেই যায়। ভাল কার্য্যকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধি চালনা কর,—চিন্তাশক্তির ক্ষমতা বিচার কর, কি দেখিবে? পদে পদে দোষ—পদে পদে বিপদ! ঐ চিন্তা আবার ভাল দিকে ফিরাও—কি দেখিবে? সুফল, মঙ্গল ও ও সৎ। এই আগন্তুক যদি সরলভাবে ধর্ম্ম-পিপাসু হইয়া আসিয়া থাকে তবে দেখ দেখি, উহার মন কত প্রশস্ত? ধর্ম্মের জন্য কত লালায়িত? বল দেখি স্বর্গ কাহার জন্য? এই ব্যক্তিই ত জান্নাতের যথার্থ অধিকারী।"

এবনে আব্বাস আর কোন উত্তর করিলেন না। অন্য কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আগন্তুক বৃদ্ধও তখন মন্দিরের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার লুক্কায়িত বর্শার ফলকটি বিশেষ মনসংযোগ সহকারে দেখিতেছে এবং মৃদুস্বরে বলিতেছে, "এই ত আমার সময়, এক আঘাতেই মারিয়া ফেলিতে পারিব। আর যে বিষ ইহাতে সংযুক্ত করিয়াছি, রক্তের সহিত একটু মিশ্রিত হইলে, কাহার সাধ্য হাসানকে রক্ষা করে? উপাসনার সময়ই উপযুক্ত সময়! যেমন 'ছেজ্‌দা' (দণ্ডবৎ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম) দিবে, আমিও সেই সময় বর্শার আঘাত করিব। পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ না হইলে আর ছাড়িব না। কিন্তু উপাসনা-মন্দিরে হাসানকে একা পাইবার সুযোগ অতি কম। দেখি, চেষ্টার অসাধ্য কি

আছে ?" এব্‌নে আব্বাসের অলক্ষিতে পাপিষ্ঠ অনেকক্ষণ তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কোনক্রমেই,—কোন সময়েই বর্শা নিক্ষেপের সুযোগ পাইল না।

মন্দিরের দুই পার্শ্বে সে কয়েকবার বর্শাহস্তে ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু একবারও লোকশূন্য দেখিল না। বৃদ্ধ পুনরায় মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল "কি ভ্রম! উপাসনার সময় ত আরও অধিক লোকের সমাগম হইবে! এমামই সকলের অগ্রে থাকিবে। বর্শার আঘাত করিলেই শত্রু শেষ হইবে। এক্ষণে হাসান যে ভাবে বসিয়া আছে, পৃষ্ঠে আঘাত করিলে বক্ষঃস্থল পার হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এব্‌নে আব্বাস্ আমাকে কখনই ছাড়িবে না। সে যে রকম চতুর, নিশ্চয়ই তাহার হাতে আমার প্রাণ যাইবে। আব্বাস্ বড়ই চতুর! এই ত হাসানের সহিত কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি চতুর্দ্দিকেই আছে। কি করি, কতক্ষণ অপেক্ষা করিব, সুযোগ সময়ই বা কত খুঁজিব? বর্শার পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া সজোরে হাসানকে বিদ্ধ করিলে ত কথাই নাই, দূর হইতে তাহার পৃষ্ঠসন্ধানে নিক্ষেপ করিলেও যে উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইবে, ইহাই বা কে বলে?"

বৃদ্ধ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া হাসানের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতেই বর্শাসন্ধান করিল। এব্‌নে আব্বাসের চক্ষু—চারিদিকে। তিনি এক স্থানে বসিয়া কথা কহিতেন, অথচ মনে, চক্ষে চারিদিকে সন্ধান রাখিতে পারিতেন। হঠাৎ আগন্তুক-বৃদ্ধের বর্শাসন্ধান তাহার চক্ষে পড়িল। তিনি হাসানের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া উঠাইলেন এবং ধূর্ত্তের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পিশাচ! তোর এই কীর্ত্তি!"

এদিকে বর্শাও আসিয়া পড়িয়াছে। নিক্ষেপকারীর সন্ধান ব্যর্থ হইবার নহে। বর্শানিক্ষেপে সেই ব্যক্তি সবিশেষ শিক্ষিত ও সিদ্ধহস্ত; কেবল এব্‌নে আব্বাসের সতর্কতা কৌশলেই হাসান পরিত্রাণ পাইলেন!—বর্শাটা তাঁহার পৃষ্ঠে না লাগিয়া পদতলে বিদ্ধ হইল। এব্‌নে আব্বাস্ কি করেন, —দুরাত্মাকে ধরিতে যান, কি এদিকে আঘাতিত হাসানকে ধরেন! এমাম হাসান বর্শার আঘাতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন, এব্‌নে আব্বাস্ সেদিকে লক্ষ্য না

করিয়া অতি ত্রস্তে যাইয়া বৃদ্ধকে ধরিলেন। ঐ বর্শার দ্বারাই তিনি সেই বৃদ্ধের বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় এমাম হাসান অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, প্রিয় আব্বাস্! যাহা হইবার হইয়াছে, ক্ষমা কর। ভাই! বিচারের ভার নিজ হস্তে লইও না। সর্ব্ববিচারকের প্রতি বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বিচারের ভার দিয়া বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দাও, এই আমার প্রার্থনা।"

হাসানের কথায় এব্‌নে আব্বাস্ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিয়া হাসানকে বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, আগন্তুকের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের এই ফল!"

শোণিতের ধারা বহিতেছে। উপাসনা-মন্দির রক্তে রঞ্জিত হইয়া যেন লিখিয়া যাইতেছে,—'আগন্তুককে কখনও বিশ্বাস করিও না।' প্রকৃত ধার্ম্মিক জগতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্শার আঘাতে হাসান অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; তথাপি বলিতে লাগিলেন, "আব্বাস্ তোমার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ! তোমার চক্ষুকেও সহস্র প্রশংসা দিই। মানুষের বাহ্যিক আকৃতি দর্শন করিয়া, অস্থিমাংস ভেদ করিয়া, মর্ম্ম পর্য্যন্তও দেখিবার শক্তি, ভাই, আমি ত আর কাহারও দেখি নাই! আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না, আমি কাহারও মন্দ করি নাই, তথাপি আমার শত্রুর শেষ নাই। পদে পদে, স্থানে স্থানে, নগরে নগরে আমার শত্রু আছে, ইহা আগে জানিতাম না। কি আশ্চর্য্য! সকলেই আমার প্রাণবধে অগ্রসর, সকলেই সেই অবসরের প্রত্যাশী! এখন কোথায় যাই? যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই হন্তা, সেই দিকেই আমারই প্রাণনাশক শত্রু! যে প্রাণের দায়ে মদিনা পরিত্যাগ করিলাম, এখানেও সেই প্রাণ সঙ্কটাপন্ন। কিছুতেই শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলাম না। আমি ভাবিয়াছিলাম, জাএদাই আমার পরম শত্রু, এখন দেখি, জগৎময় আমার শত্রু!"

হাসান ক্রমেই অস্থির হইতে লাগিলেন। অস্ত্রের আঘাত, তৎসহ বিষের যন্ত্রণা তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিল। তিনি কাতর স্বরে এব্‌নে আব্বাস্‌কে বলিলেন, "যত শীঘ্র পার, আমাকে মাতামহের 'রওজা শরীফে'

লইয়া চল। যদি বাঁচি, তবে আর কখনও 'রওজা মোবারক' হইতে অন্য স্থানে যাইব না। ভ্রমেই লোকের সর্ব্বনাশ হয়, ভ্রমেই লোক মহাবিপদগ্রস্থ হয়, ভ্রমে পড়িয়াই লোক কষ্টভোগ করে, প্রাণও হারায়। ইচ্ছা করিয়া কেহই বিপদভার মাথায় তুলিয়া লয় না, দুঃখীও হইতে চাহে না। আমি মুসাল নগরে না আসিয়া যদি মাতামহের রওজা শরীফে থাকিতাম, তাহা হইলে কোন বিপদেই পতিত হইতাম না। কপট ধর্ম্ম-পিপাসুর কথায় ভুলিয়া বর্শাঘাতে আহতও হইতাম না। ভাই, যে উপায়েই হউক, শীঘ্র আমাকে মদিনায় লইয়া চল। অতি অল্প সময়ের জন্যও আর মুসাল নগরে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যদি এই আঘাতেই প্রাণ যায়, কি করিব, কোন উপায় নাই! কিন্তু মাতামহের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে প্রাণবিয়োগ হইবে, তাঁহার পদপ্রান্তেই পড়িয়া থাকিব, এই আমার শেষ ইচ্ছা। আর ভাই! সেই পবিত্র স্থানে প্রাণ বাহির হইলে, সেই সময়ের নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইব। আজ্‌রাইলের (যমদূতের) কঠিন ব্যবহার হইতেও বাঁচিতে পারিব।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাসান পুনর্ব্বার ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভাই! অবশ্যই আমার আশা-ভরসা সকলই শেষ হইয়াছে। পদে পদে ভ্রম, পদে পদে বিপদ, ঘরে বাহিরে শত্রু সকলেই প্রাণ লইতে উদ্যত। আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল; কথা কহিতে কস্ট হইতেছে। যত শীঘ্র হয়, আমাকে মদিনায় লইয়া চল।"

মুসাল নগরবাসী অনেকেই হাসানের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেনঃ "তাঁহাকে মদিনায় পাঠাইয়া দেওয়াই সাব্যস্ত হইল।" এব্‌নে আব্বাস্‌ হাসানকে লইয়া মদিনায় যাত্রা করিলেন।

যেখানে যমদূতের দৌরাত্ম্য নাই, হিংসাবৃত্তিতে হিংস্র লোকের এবং হিংস্র জন্তুর প্রবৃত্তি নাই, খাদ্যখাদকের বৈরীভাব নাই, নিয়মিত সময়ে হাসান সেই পবিত্র 'রওজা মোবারকে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সর্ব্বাঙ্গে রওজার ধূলা মাখিয়া ঈশ্বরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে বিষের যন্ত্রণা অনেক লাঘব হইল। কিন্তু আঘাতের বেদনা—

যাতনা তেমনিই রহিয়া গেল। ইহার অর্থ কে বুঝিবে? সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। ক্ষতস্থান দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জ্বালা-যন্ত্রণাও বাড়িতে লাগিল। এমাম হাসানও শেষে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন হোসেন আসিয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! এই রওজা মোবারকে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মানুষের শরীর অপবিত্র; বিশেষ আপনার যে ব্যাধি, তাহাতে আরও সন্দেহ হয়। পবিত্র স্থানে পবিত্র অবস্থায় না থাকিতে পারিলে স্থানের অবমাননা করা হয়। ক্ষতস্থান কেমন ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছে; বাটীতে চলুন; আমরা সকলে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিব। জগতে জননীর স্নেহ নিঃস্বার্থ, সন্তানের সাংঘাতিক পীড়ায় মায়ের অন্তরে যেরূপ বেদনা লাগে, এমন আর কাহারও লাগে না। যদিও ভাগ্যদোষে সে স্নেহ-মমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি আজ্ঞাবহ কিঙ্কর বর্ত্তমান আছে। সেই মাতার গর্ভে আমিও জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার সাধ্যমত আমি আপনার সেবা করিব।"

এমাম হাসান আর বাক্যব্যয় করিলেন না। হোসেন ও আবুল্ল কাসেমের স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া অতিকষ্টে বাটীতে পৌঁছিলেন। হাস্নেবানু, জয়নাব অথবা জাএদা এই তিন স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রীর ঘরেই তিনি যাইলেন না; প্রিয় পাত্র হোসেনের গৃহেই আবাস গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় রত হইল।

এক জাএদার প্রতি সন্দেহ করিয়া হাসান যেন সকলের প্রতিই সন্দেহ করিলেন। কিন্তু সেই মানসিক ভাব প্রকাশ্যে কাহাকেও কিছু বুঝিতে দিলেন না। তবে ভাবগতিক দেখিয়া বাহ্য-ব্যবহারে সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, পরিজনবর্গের—বিশেষতঃ নিজ স্ত্রীগণের প্রতি হাসান মহাবিরক্ত। হাস্নেবানু ও জয়নাবের প্রতি তাঁহার কেবল একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইত, কিন্তু জাএদাকে তিনি দেখিয়া ভয় করিতেন।

হাস্নেবানুর সেবা-শুশ্রূষায় এমাম হাসানের বিরক্তিভাব কেহই দেখিতে পায় নাই। জয়নাব আসিয়া নিকটে বসিলেও তিনি কিছু বলিতেন না, কিন্তু

জাএদাকে দেখিলেই চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিতেন। দুই চার দিনে সকলেই জানিল যে, এমাম হাসান বোধ হয়, জাএদাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ অনুসন্ধানেও ত্রুটী হইল না। শেষে সাব্যস্ত হইল যে, জাএদার ঘরে গেলেই বিপদগ্রস্ত হন, অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হন—এই সকল কারণেই বোধ হয়, জাএদার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ হইয়া থাকিবে। কেহ এই প্রকার—কেহ অন্যপ্রকার—কেহ কেহ বা অন্য নানা প্রকার কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। এমাম হাসানের ভাবগতিক কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া হোসেন তাঁহার আহারীয় সামগ্রীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। ভ্রাতার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য হাসানের সম্মুখে হাসনেবানু ও জয়নাবকে বলিলেন, "আপনারা ইঁহার আহারীয় দ্রব্যাদি বিশেষ যত্নে রক্ষা করিবেন।"

হাসনেবানু কহিলেন, "আমি সাহস করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলি যে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে খাদ্যসামগ্রীর কোন দোষে আর পীড়া বৃদ্ধি হইবে না। আমি বিশেষ সতর্ক হইয়াছি। আমি অগ্রে না খাইয়া ইঁহাকে আর কিছুই খাইতে দিই না। যত পীড়া, যত অপকার, সকলই আমি মাথায় করিয়া লইয়াছি, খোদার কৃপায় এক্ষণে উনি আরোগ্য লাভ করিলেই সকল কথা বলিব।"

হাসনেবানুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক এমাম হাসান বলিলেন, "অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই! তোমার যাহাতে সন্দেহ দূর হয়, তুমি সেই প্রকারে আমার আহারীয় ও পানীয় সমুদয় সাবধানে ও যত্নে রাখিও।"

হাসনেবানু পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন, স্বামীর কথায় একটু আভাস পাইয়া আরও যথাসাধ্য সাবধান ও সতর্ক হইলেন। আহারীয় সামগ্রী বিশেষ যত্নে রক্ষিত হইতে লাগিল। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া হাসনেবানু রোগীর পথ্য ইত্যাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। জলের সোরাহীর উপর পরিষ্কার বস্ত্র আবৃত করিয়া একেবারে শীলমোহরে বন্ধ করিলেন; অপর কেহ হাসানের ব্যাধিগৃহে আসিতে না পারে, কৌশলে তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রকাশ্যে কাহাকেও বারণ করিলেন না। হোসেনও সতর্ক রহিলেন। হাসনেবানুও সদাসর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে লাগিলেন।

জাএদাও মাঝে মাঝে স্বামীকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু জয়নাবকে স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিলে আর ঘরেই প্রবেশ করিতেন না। জয়নাবের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই—জাএদার মুখের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইত, বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিত, সপত্নীহিংসা বলবতী হইত, সপত্নী-সৃষ্টিকারীর প্রতি প্রতিহিংসার আগুনে দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিত। স্বামী-স্নেহ, স্বামী-মমতা তাঁহার অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া যাইত। অধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্তি জন্মিত। কোমল হৃদয় পাষাণে পরিণত হইত। হাসানের আকৃতি বিষবৎ লক্ষিত হইত। ইচ্ছা হইত যে তখনি—সেই মুহূর্ত্তেই হয় নিজের প্রাণ—নয় জয়নাবের, না হয় যিনি ইহার মূল তাঁহার—

রোগীর রোগশয্যা দেখিতে কাহারও নিষেধ নাই। পীড়িত ব্যক্তিকে কেহ তত্ত্বাবধান ও সেবাশুশ্রূষা করিতে, কি দেখিতে আসিলে তাহা নিবারণ করা শাস্ত্র-বহির্ভূত। একদিন জাএদার সহিত মায়মুনাও হজরত হাসানকে দেখিতে আসিল। শয্যার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে জাএদা, তৎপার্শ্বেই মায়মুনা। তাঁহাদের নিকট অপরাপর সকলে শয্যার প্রায় চতুপার্শ্ব ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। মায়মুনা প্রতিবেশিনী, আর সকলেই জানিত যে, মায়মুনা এমাম-দ্বয়ের বড় ভক্ত। বাল্যকাল হইতেই মায়মুনা উভয়কে ভালবাসে; এমামদ্বয়ের জন্মদিবসে সে কতই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল! জান্নাতবাসিনী জগজ্জননী বিবি ফাতেমাও মায়মুনাকে ভালবাসিতেন। মায়মুনাও তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভালবাসিত। হাসান-হোসেনও মাতার ভালবাসার পাত্রী বলিয়া মায়মুনাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। মায়মুনা এতকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সুখদুঃখের ভাগিনী বলিয়াই পরিচিতা ছিল। মায়মুনার মন যে কালকূট বিষম বিষে পরিপূর্ণ, তাহা জাএদা ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে নাই। হাসনেবানু মায়মুনাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না—সেটি তাঁহার স্বভাব। মায়মুনাও হাসনেবানুর প্রতি কথায় কাঁদিয়া মাটি ভিজাইত না, সেটিও মায়মুনার স্বভাব। হাসনেবানু মুখ ফুটিয়া কোন দিন মায়মুনাকে কোন মন্দ কথা বলেন নাই,—অথচ তাঁহাকে দেখিয়া মায়মুনা হাড়ে হাড়ে কাঁপিত।

এমাম হাসানের পীড়িত অবস্থা দেখিয়া মায়মুনার চক্ষে জল আসিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "আহা! কোলে-কাঁধে করিয়া মানুষ করিয়াছে, ও-আর কাঁদিবে না!"—মায়মুনার চক্ষের জল গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। মায়মুনা গৃহমধ্যস্থিত সকলের দিকেই এক একবার তাকাইয়া চক্ষের জল দেখাইল। মায়মুনা যে শুধু চক্ষের জলই সকলকে দেখাইতেছে, তাহা নহে; আরও উদ্দেশ্য আছে। ঘরের মধ্যে যেখানে যেখানে যে যে জিনিষ-পত্র রক্ষিত আছে, তাহা সকলই সে মনসংযোগ করিয়া জলপূর্ণ নয়নে বিশেষরূপে দেখিতেছিল।

হাসানের জলপিপাসা হইয়াছে। তিনি সঙ্কেতে হাসনেবানুকে জলপানেচ্ছা জানাইলেন। তিনি মহাব্যস্তে "আব্‌খোরা" পরিষ্কার করিয়া সোরাহীর শীল ভগ্ন করিলেন, এবং সোরাহীর জলে আব্‌খোরা পূর্ণ করিয়া হাসানের সম্মুখে ধরিলেন। জলপানে তৃপ্তিলাভ করিয়া হাসান পুনরায় শয্যাশায়ী হইলেন। হাসানের আব্‌খোরা যথাস্থানে রাখিয়া, পূর্ব্ববৎ বস্ত্রের দ্বারা মুখবন্ধ ও শীলমোহর করিয়া হাসনেবানু সোরাহীটি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

যে যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, সে তাহার নামও শুনিতে ভালবাসে না। জগতে এমন অনেক লোক আছে যাহারা স্বভাবতঃই এক এক জনকে দেখিতে ভালবাসে না। অন্য-পক্ষে—পরিচয় নাই, শত্রুতা নাই, মিত্রতা নাই, অলাপ নাই, বন্ধুত্ব নাই, স্বার্থ নাই,—কিছুই নাই, তথাপি যেন কাহারও মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা করে! এমন মুখও জগতে অনেক আছে, পরিচয়ে পরিচিত না হইলেও সেই মুখখানি যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবারই সুখবোধ হয়!

হাসনেবানু জলের সোরাহী যথাস্থানে রাখিয়া ঈষৎ বিরক্তির সহিত মায়মুনার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে সকলেই নীরব। সকলের মুখাকৃতিই মলিন। মায়মুনার মুখ ফুটিল:—

"আহা! এ নরাধম জাহান্নমী কে? আহা! এমন সোণার শরীরে কে এমন নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিয়াছে? আহা! জান্নাতবাসিনী বিবি ফাতেমার হৃদয়ের ধন, নূরনবীর চক্ষের পুত্তলী যে হাসান, সেই হাসানের প্রতি এতদূর

নিষ্ঠুর অত্যাচার কে করিয়াছে? সে পাপীর পাপ-শরীরে রক্ত-মাংসের লেশমাত্র কি নাই? নিশ্চয়ই সে হৃদয় দুর্জ্জয় পাষাণে গঠিত। হায় হায়! চাঁদমুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে।"—এইরূপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়মুনা আরও কিছু বলিতে অগ্রসর হইতেছিল, হাসানের বিরক্তিভাব ও কাসেমের নিবারণে তাহার সে চেষ্টা থামিয়া গেল।—চক্ষের জলও আর সে ফেলিতে পারিল না; মুখের কথা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। চোখের জল অলক্ষিতে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িয়া আপনিই আবার শুষ্ক হইল।

রোগীর পথ্য লইয়া জয়নাব সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জাএদা আড়নয়নে বিষদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া গেলেন। মায়মুনাও হাসনেবানুর আসিবার সাড়া পাইয়া আস্তে আস্তে গৃহত্যাগ করিল।

ষোড়শ প্রবাহ

মায়মুনার সহিত জাএদার কথোপকথন হইতেছে। জাএদা বলিতেছেন, "ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই। মানুষের পেটে,—বিষ হজম হয়; একবার নয়, কয়েকবার! আমি কেন জয়নাবের সুখের তরী ডুবাইতে বসিয়াছি? আমি কেন জয়নাবের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া আপন হাতে স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিতে দাঁড়াইয়াছি? যে চক্ষু সর্ব্বদাই যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, জয়নাবের চক্ষু পড়িয়া অবধি সেই চক্ষু আর তাহাকে দেখিতে চায় না! সেই প্রিয় বস্তুকে একেবারে চক্ষের অন্তর করিতে—জগৎ-চক্ষুর অন্তর করিতে—কতই যত্ন, কতই চেষ্টা করিতেছি! যে হস্তে কতই সুখাদ্য দ্রব্য খাইতে দিয়াছি, এখন সেই হস্তে বিষ দিতেও একটু আগুপাছু চাহিতেছি না!—কিন্তু কাহার জন্য? যে স্বামীর একটু অসুখ হইলে যে জাএদার প্রাণ কাঁদিত, এখন সেই স্বামীর প্রাণ হরণ করিতে না পারিয়া সেই জাএদা আজ বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছে!—কিন্তু কাহার জন্য? মায়মুনা! আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, হাসানের মরণ নাই! জাএদারও আর সুখ নাই।"

মায়মুনা কহিল, "চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। একবার, দুবার,

তিনবার, না হয় চারবার,—পাঁচবারের বারে আর কিছুতেই রক্ষা নাই। হতাশ হও কেন? এই দেখ, এজিদ্ এই সকল কথা শুনিয়াই এই ঔষধ পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহাতে আর নিস্তার নাই।"—এই কথা বলিয়াই মায়মুনা আপন কটিদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি বাহির করিয়া জাএদাকে দেখাইল। জাএদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?"

"মহাবিষ।"

"মহাবিষ কি?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "এ সর্পবিষ নয়, অন্য কোন বিষও নয়,—লোকে ইহা মূল্যবান জ্ঞানে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মূল্য অধিক, দেখিতেও অতি উজ্জ্বল। আকার পরিবর্ত্তনে অণুমাত্র পেটে পড়িলেই মানুষের পরমায়ু শেষ করে।"

"কি প্রকারে খাওয়াইতে হয়?"

মায়মুনা কহিল, "খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইয়া দিতে পারিলেই হইল। পানিতে মিশাইয়া খাওয়াইতে পারিলে ত আর কথাই নাই। অন্য অন্য বিষ পরিপাক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা পাকযন্ত্রের নাই। এ একটি চূর্ণমাত্র। পেটের মধ্যে যেখানে পড়িবে নাড়ী, পাকযন্ত্র, কলিজা, সমস্তই কাটিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে।"

"এ-ত—বড় ভয়ানক বিষ! ছুঁইতেও যে ভয় হয়!"

"ছুঁইলে কিছু হয় না। হাতে করিয়া রগড়াইলেও কিছু হয় না, হুড়কমের (অন্ননালীর) নীচে না নামিলে কোন ভয় নাই। এ-ত অন্য বিষ নয়, এ হীরক-চূর্ণ"

"হীরার গুঁড়া?—আচ্ছা, দাও।"

মায়মুনা তখনি জাএদার হাতে পুঁটুলি দিল। পুঁটুলি হাতে লইয়া জাএদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার ঘরে যে, আর আসিবেন,—সে আশা আর নাই। যেরূপ সতর্কতা, সাবধানতা দেখিলাম, তাহাতে খাদ্য-সামগ্রীর সহিত মিশাইবার সুবিধা পাইব কোথায়?—হাসনেবানু কিম্বা জয়নাব, দু'য়ের একজন না মিশাইলে আর কাহারও সাধ্য নাই!"

"সাধ্য নাই কি কথা? সুযোগ পাইলে আমিই মিশাইয়া দিতাম। খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইতে পারিব না, তাহা আমি বুঝিয়াছি, অন্য আর একটি উপায় আছে।"

"কি উপায়?"

"ঐ সোরাহীর জলে।"

"কি প্রকারে?—সেই সোরাহী যে প্রকারে শীলমোহর-বাঁধা, তাহা খুলিতে সাধ্য কার?"

"খুলিতে হইবে কেন? সোরাহীর উপরে যে কাপড় বাঁধা আছে, ঐ কাপড়ের উপরে এই গুঁড়া অতি অল্প পরিমাণে ঘসিয়া দিলেই আর কথা নাই! যেমন সোরাহী তেমনি থাকিবে; যেমন শীলমোহর, তেমনি থাকিবে, পানির রং বদল হইবে না, কেহ কোন প্রকারে সন্দেহ করিতে পারিবে না।"

"তাহা যেন পারিবে না, কিন্তু ঘরের মধ্যে যাওয়া ত চাই? যদি কেহ দেখে?"

"দেখিলেই বা। ঘরের মধ্যে যাওয়া ত আর দোষের কথা নয়! তুমি কেন গেলে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যদি ঘরের মধ্যে যাইতে কোন বাধা না থাকে, তবে দেখিবে সুযোগ আছে কি না। যদি সুযোগ পাও, সোরাহীর কাপড়ের উপরে ইহা ঘসিয়া দিও। এইমাত্র আসিয়াছ, এখন যাওয়ার আবশ্যকতা নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হউক, রোগীও নিদ্রাবশে শয়ন করুক। যাহারা সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে, তাহারাও বিশ্রামের অবসর পাক। একটু রাত্রি হইলেই যাওয়া ভাল।"

মায়মুনা তখন জাএদার গৃহেই থাকিল। জাএদা গোপনে সন্ধান লইতে লাগিলেন। হাসানের নিকট কে কে রহিয়াছে, কে কে যাইতেছে, কে কে আসিতেছে, কে কি করিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই জাএদা গুপ্তভাবে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। সন্ধান ও পরামর্শ করিতে করিতে অনেক সময় উত্তীর্ণ হইল। জাএদা আজ অত্যন্ত অস্থির! একবার আপন ঘরে মায়মুনার নিকটে, আবার বাহিরে! আবার সামান্য কার্য্যের ছল করিয়া হোসেনের

গৃহসমীপে বা হাসনেবানুর গৃহের নিকটে, অথবা জয়নাবের গৃহের দ্বারে। কে কোথায় কি বলিতেছে, কি করিতেছে, সমুদয় তিনি সন্ধান লইতে লাগিলেন। বাড়ীর লোক—বিশেষতঃ হাসানের স্ত্রী, শত শত বার আনাগোনা করিলেও কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কিন্তু হাসনেবানুর চক্ষে পড়িলে অবশ্যই তিনি সতর্ক হইতেন। স্বামীর সেবাশুশ্রূষায় হাসনেবানু সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, আহার-নিদ্রা একেবারে ছাড়িয়াছেন। জীবনে নামাজ (উপাসনা) কাজা* করিয়াছেন কি না সন্দেহ, সে নামাজ এখন আর সময়মত হইতেছে না। নানা প্রকার সন্দেহ ও চিন্তায় হাসনেবানু একেবারে বিহ্বলপ্রায় হইয়াছেন। স্বামীর কাতর শব্দে, প্রতি বাক্যে তাঁহার অন্তরের গ্রন্থিসকল ছিঁড়িয়া যাইতেছে। যখনই অবসর পাইতেছেন, তখনই তিনি ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বামীর আরোগ্য কামনা করিতেছেন। জয়নাব মনের দুঃখ মনেই রাখিতেন; হাসনেবানুর কথাক্রমেই তিনি দিবানিশি খাটিতেন। বিনাকার্য্যে তিলার্দ্ধকালও স্বামীপদ-ছাড়া হইতেন না। নিজ প্রাণ ও নিজ শরীরের প্রতি তাঁহার মায়া-মমতা নাই। হাসানের চিন্তাতেই বাড়ীর সকলেই (জাএদা ছাড়া) মহাচিন্তিত ও মহাব্যস্ত!

জাএদার চিন্তায় জাএদা ব্যস্ত। জাএদা কেবল সময় অনুসন্ধান করিতেছেন, সুযোগের পথ খুঁজিতেছেন। ক্রমে ক্রমে রাত্রিও অধিক হইয়া আসিল। সকলেই আপন আপন স্থানে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিলেন। হাসনেবানু প্রতি নিশিতেই প্রভু মোহাম্মদের "রওজা শরীফে" যাইয়া ঈশ্বরের নিকট স্বামীর আরোগ্য কামনা করিতেন। আজও নিয়মিত সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে তসবীহ্ হস্তে করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। জাএদা জাগিয়াছিলেন বলিয়াই দেখিলেন যে, হাসনেবানু রওজা মোবারকের দিকে যাইতেছেন। গোপনে গোপনে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া আরও দেখিলেন যে, হাসনেবানুর ঈশ্বরের উপাসনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিয়া আসিয়াই তিনি মায়মুনাকে বলিলেন, "মায়মুনা! বোধ হয়, এই-ই উত্তম সুযোগ। হাসনেবানু এখন ঘরে নাই, রওজা হইতে

* কাজা—নিয়মিত সময়ের অতিক্রম

ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব আছে। এখন একবার যাইয়া দেখি, যদি সুযোগ পাই, তবে এই-ই উপযুক্ত সময়।”

জাএদা বিষের পুঁটুলি লইয়া চলিলেন। মায়মুনাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে পাছে চলিল। অন্ধকার রজনী,—চান্দ্রমাস রবিয়ল আওয়ালের প্রথম তারিখ। চন্দ্র উঠিয়াই অমনি অস্ত গিয়াছে। ঘোর অন্ধকার। জাএদা সাবধানে সাবধানে পা ফেলিয়া ফেলিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামীর শয়ন-গৃহের দ্বারের নিকটে যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া, গৃহমধ্যস্থিত সকলে জাগরিত কি নিদ্রিত, তাহা পরীক্ষা করিলেন। গৃহদ্বার যে বন্ধ নাই, তাহা তিনি পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। কারণ, হাসনেবানু স্বামীর আরোগ্য-লাভার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়াই জাএদার গৃহপ্রবেশের সুবিধা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গায়ের ভর গায়ে রাখিয়া, হাতের জোর হাতে রাখিয়া, অল্পে অল্পে দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাএদা দেখিলেন—দীপ জ্বলিতেছে। এমাম হাসান শয্যায় শায়িত,—জয়নাব বিমর্ষ বদনে হাসানের পা-দুখানি আপন বক্ষে রাখিয়া শুইয়া আছেন। অন্যান্য পরিজনেরা শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। নিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন সে গৃহে তখন আর কোন শব্দই নাই।

দীপের আলোতে জয়নাবের মুখখানি জাএদা আজ ভাল করিয়া দেখিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বাভাবিক আকৃতির শোভা যেরূপ দেখায়—জাগ্রত অবস্থায় বোধ হয় তেমন শোভা কখনই দেখা যায় না। কারণ, জাগ্রত অবস্থায় কৃত্রিমতার ভাগ অনেক অংশে বেশী হইয়া পড়ে। জাএদা গৃহের মধ্যস্থ শায়িত ব্যক্তি ও দ্রব্যসমূহের প্রতি একে একে কটাক্ষপাত করিলেন। সোরাহীর প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্রই তিনি সোরাহীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া, ক্ষণেক দাঁড়াইয়া, পশ্চাতে ও অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সোরাহীর নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন। আবার গৃহমধ্যস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া, এমামের মুখের দিকে চক্ষু ফেলিলেন। তাহার পর বিষের

পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। খুলিতে খুলিতে ক্ষান্ত দিয়া, কি আবার ভাবিয়া, আর খুলিলেন না! হাসানের মুখের দিকে আবার চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার মুখ, বক্ষ, উরু ও পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু পড়িলে জাএদার আর সে ভাব থাকিল না। তাড়াতাড়ি বিষের পুঁটুলি লইয়া তিনি সোরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরকচূর্ণ ঢালিয়া দিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে সোরাহীর মুখবন্ধ বস্ত্রের উপর বিষ ঘসিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই বার বার বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন; স্বামীর মুখপানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। সমুদয় চূর্ণ জলে প্রবেশ করিলে তিনি ত্রস্তভাবে ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময়, স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া পা ফেলিতেই দ্বারে আঘাত লাগিয়া একটু শব্দ হইল। ঐ শব্দে এমাম হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু চক্ষের পাতা খুলিল না। দ্বার পূর্ব্বমত রাখিয়া জাএদা অতি ত্রস্তে গৃহের বাহিরে আসিয়া কিঞ্চিৎ ভীতা হইলেন। শেষে দেখিলেন, আর কেহ নহে—মায়মুনা! জাএদার হাত ধরিয়া লইয়া মায়মুনা অতি চঞ্চলপদে ব্যস্তভাবে জাএদার গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বারে জাএদার পদাঘাত-শব্দে এমাম হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ঐ শব্দের প্রকৃত কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহমধ্যে সকলেই নিদ্রিত;—দীপ পূর্ব্বমত জ্বলিতেছে যেখানে যাহা ছিল, সমস্তই ঠিক রহিয়াছে। হঠাৎ শব্দে তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাই কেবল আক্ষেপের কারণ হইল। তিনি জয়নাবকে ডাকিতে লাগিলেন। জয়নাব জাগিবামাত্রই হাসান তাঁহাকে বলিলেন, "জয়নাব! শীঘ্র শীঘ্র আমাকে পানি দাও। অজু (উপাসনার পূর্ব্বে হস্তপদমুখাদি বিধিমতে ধৌত) করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিব। এইমাত্র পিতামাতা এবং মাতামহকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহারা যেন আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। একটু জল পান করিব,—পিপাসা অত্যন্ত হইয়াছে।"

জল আনিতে জয়নাব বাহিরে গেলেন। হাসনেবানু তস্‌বীহ্ হাতে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এমাম হাসানকে

জাগরিত দেখিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রেই তিনি নিজেই হাসনেবানুকে স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন, এবং "অত্যন্ত জলপিপাসা হইয়াছে এক পেয়ালা পানি দাও" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। স্বপ্নবিবরণ শুনিবামাত্রই হাসনেবানুর চিত্ত আরও অস্থির হইল; বিবেচনা-শক্তির লাঘব হইয়া গেল, মস্তক ঘুরিয়া পড়িল। সোরাহীর বস্ত্রের প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন, তাহা আর দেখিবার তাঁহার ক্ষমতা থাকিল না। হাসনেবানু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে বস্ত্রের উপরিস্থ হীরকচূর্ণ ঘর্ষণের কোন না কোন চিহ্ন অবশ্যই তাঁহার চক্ষে পড়িত, কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি এমনি বিহ্বল হইয়াছেন যে, সোরাহীর মুখ বন্ধ না থাকিলেও তিনি নিঃসন্দেহে জল ঢালিয়া স্বামীকে পান করিতে দিতেন! এক্ষণে তিনি অন্যমনস্কে সোরাহী হইতে জল ঢালিয়া পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এমাম হাসানের এই শেষ পিপাসা;—হাসনেবানুর হস্তে এই শেষ জলপান। তিনি প্রাণ ভরিয়া জল পান করিলেন। জয়নাবও পূর্ব্ব আদেশমত জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। হাসান হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন; বসিয়া বসিয়া জীবনের শেষ-উপাসনা,—ইহজগতের শেষ আরাধনা আজ শেষ হইল; অন্তরও জ্বলিয়া উঠিল!

কাতর হইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "আজ আবার কি হইল! জাএদার ঘরে যে প্রকার শরীরে জ্বালা উপস্থিত হইয়া প্রাণ অস্থির করিয়াছিল, এ সেরূপ নয়! কালিজা, হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত কি এক প্রকারের বেদনা, যাহা মুখে বলিতে শক্তি নাই! ঈশ্বর একি করিলেন! আবার বুঝি বিষ! এ-ত আর জাএদার ঘর নহে! তবে এ কি!—এ কি যন্ত্রণা! উঃ!—কি যন্ত্রণা!"

বেদনায় হাসান অত্যন্ত কাতর হইলেন;—জাএদার ঘরে যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার চতুর্গুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ব্যগ্রভাবে তিনি কাসেমকে কহিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র হোসেনকে ডাকিয়া আন। আমি নিতান্তই অস্থির হইয়াছি। আমার হৃদয়, অন্তর, শরীর,—সমুদয় যেন অগ্নিসংযোগে জ্বলিতেছে, সহস্র সূচিকার দ্বারা যেন বিদ্ধ

হইতেছে! অন্তরস্থিত প্রত্যেক শিরা যেন, সহস্র সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে!”

অতি ত্রস্তে কাসেম পিতৃব্য হোসেনের সহিত পুনরায় সেই গৃহমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর আর আর সকলে আসিয়া জুটিলেন। সকলের সহিত আসিয়া জাএদাও এক পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হোসেনকে দেখিয়া হাসান অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, “ভাই, আর নিস্তার নাই। আর সহ্য হয় না! আমার বোধ হইতেছে যে, কে যেন আমার অন্তরমধ্যে বসিয়া আঘাতে বক্ষঃ, উদর এবং শরীরমধ্যস্থ মাংসপেশী, সমস্তই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে। ভাই! আমি এইমাত্র মাতামহ, মাতা এবং পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। মাতামহ আমার হস্ত ধরিয়া স্বর্গীয় উদ্যানে বেড়াইতেছেন। মাতামহ ও মাতা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, ‘হাসান! তুমি তুষ্ট হও যে, শীঘ্রই পার্থিব শত্রুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলে।’ এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি নিদ্রাভঙ্গের সহিত স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। অত্যন্ত জলপিপাসা হইয়াছিল, সোরাহীর জল যেমন পান করিয়াছি, মুহূর্ত্ত না যাইতেই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এত বেদনা, এত কষ্ট, আমি কখনই ভোগ করি নাই!”

হোসেন দুঃখিত এবং কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন “আমি সকলই বুঝিয়াছি। আমি আপনার নিকট আর কিছুই চাহি না। আমার এই ভিক্ষা যে, ঐ সোরাহীর জল পান করিতে আমায় অনুমতি করুন। দেখি, জলে কি আছে।” হাসান পীড়িত অবস্থাতেই শশব্যস্তে “ও-কি কর? হোসেন ও-কি কর?”—এই কথা বলিতে বলিতে শয্যা হইতে উঠিলেন,—অনুজের হস্ত হইতে সোরাহী কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সোরাহী শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

হস্তে ধরিয়া নিজের অনুজকে শয্যার উপর বসাইয়া মুখে বার বার চুম্বন দিয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, “ভাই! আমি যে কষ্ট পাইতেছি, তাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। পূর্ব্বের আঘাত, পূর্ব্ব পীড়া, এই উপস্থিত

যন্ত্রণায় সকলই ভুলিয়াছি। ভাই! দেখ ত,—আমার মুখের বর্ণ কি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ?”

ভ্রাতার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া হোসেন কাঁদিতে লাগিলেন। আর আর সকলে বলিতে লাগিল, “আহা!—জোতির্ম্ময় চন্দ্রবদনে বিষাদ-নীলিমা-রেখা পড়িয়াছে।”

এই কথা শুনিয়া হাসান অনুজকে বলিলেন, “ভাই! বৃথা কাঁদিয়া লাভ কি ? আমার আর বেশী বিলম্ব নাই, চিরবিদায়ের সময় অতি নিকট। মাতামহ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাই! মাতামহ সশরীরে ঈশ্বরের আদেশে একবার ঈশ্বরের স্থানে নীত হইয়াছিলেন। সেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি অতি রমণীয় দুইটি ঘর সুসজ্জিত দেখিলেন। একটি সবুজ বর্ণ, আর একটি লোহিত বর্ণ। কাহার ঘর, প্রহরীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী উত্তর করিল, ‘আপনার অন্তরের নিধি, হৃদয়ের ধন এবং নয়নের পুত্তলী হাসান-হোসেনের জন্য এই দুইটি প্রস্তুত হইয়াছে।’ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রহরী চোখের জল ফেলিয়া নতশির হইল, কোন উত্তর করিল না। জিব্‌রাইল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনিই মাতামহকে বলিলেন, ‘অয়ে মোহাম্মদ! দ্বারবান কারণ প্রকাশে লজ্জিত হইতেছে, আমি প্রকাশ করিব! আজ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহাই বলিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি। নিদারুণ গুপ্তকথা হইলেও আজ আমি আপনার নিকট তাহা ব্যক্ত করিব। ঐ দুইটি ঘর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইবার কারণ কি, উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুনঃ—সবুজ বর্ণ গৃহ কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অবর্ত্তমানে একদল পিশাচ শত্রুতা সাধন করিয়া হাসানকে বিষপান করাইবে এবং মৃত্যুর সময় হাসানের মুখ সবুজ বর্ণ হইবে; তন্নিমিত্তই ঐ গৃহটি সবুজবর্ণ। ঐ শত্রুগণ অস্ত্র দ্বারা আপনার কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের মস্তকচ্ছেদন করিবে। ঐ রক্তমাখা মুখের চিহ্নই লোহিত বর্ণের কারণ।’—মাতামহের বাক্য আজ সফল হইল। আমার মুখের বর্ণ যখন বিবর্ণ হইয়াছে, তখন পরমায়ুও আজ শেষ

হইয়াছে। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। ভাই! ঈশ্বরের কার্য্যও অখণ্ডনীয়।”

সবিষাদে এবং সরোষে হোসেন বলিতে লাগিলেন, “আমি আপনার চির আজ্ঞাবহ দাস, বিশেষ স্নেহের পাত্র, এবং চির-আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষী—মিনতি করিয়া বলিতেছি, বলুন ত, আপনাকে এ বিষ কে দিয়াছে?”

“ভাই তুমি কি জন্য বিষদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কি ইহার প্রতিশোধ লইবে?”

হোসেন শয্যা হইতে উঠিয়া অতিশয় রোষভরে দুঃখিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমার প্রাণের পূজনীয় ভ্রাতাকে,—এক মাতার উদরে যে ভ্রাতা অগ্রে জন্মিয়াছে, সেই ভ্রাতাকে—আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম বিষপান করাইয়াছে—সে কি অমনি বাঁচিয়া যাইবে? আমি কি এমনি দুর্ব্বল, আমি কি এমনি নিঃসাহসী, আমি কি এমনি ক্ষীণকায়, আমি কি এমনি কাপুরুষ, আমার হৃদয়ে কি রক্ত নাই, ভ্রাতৃস্নেহ নাই যে, ভ্রাতার প্রাণনাশক বিষ-প্রদায়কের প্রতিশোধ লইতে পারি না? যে আজ আমার একটি বাহু ভগ্ন করিল, অমূল্য ধন সহোদর-রত্ন হইতে যে আজ আমাকে বঞ্চিত করিল, যে পাপিষ্ঠ আজ তিনটি সতী স্ত্রীকে অকালে বিধবা করিল, আমি কি তার কিছুই করিব না? যদি সে নরাধমের কোন সন্ধান জানিয়া থাকেন, যদি তাহাকে চিনিয়া থাকেন, যদি অনুমানে কিছু অনুভব করিয়া থাকেন, এ আজ্ঞাবহ চির-কিঙ্করকে বলুন, আমি এখনই আপনার সম্মুখে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। সেই পাপাত্মা বিজন বনে, পর্ব্বতগুহায়, অতলজলে, সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানেই থাকুক, হোসেনের হস্তে তাহার পরিত্রাণ নাই। হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।”

অনুজকে হস্তে ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, “ভাই! স্থির হও! আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। সে আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, আমি সমুদয় জানিতে পারিয়াছি। ঈশ্বরই তাহার বিচার করিবেন। আমার কেবল এইমাত্র আক্ষেপ যে, বিনা কারণে সে আমাকে নির্য্যাতন করিল। আমার ন্যায় অনুগত স্নেহশীল বন্ধুকে বধ করিয়া সে

কি সুখ লাভ করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে কারণেই হউক, যে লোভেই হউক, যে আশায়-ই হউক, নিরপরাধে সে আমাকে নির্য্যাতন করিয়া চিরবন্ধুর প্রাণবধ করিল, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার আশা কখনই পূর্ণ করিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, সে আমাকে চিনিতে পারিল না। যাহা হউক, ভাই! তাহার নাম আমি কখনই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ, হিংসা, দ্বেষ—কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত করাইতে না পারি, সে পর্য্যন্ত স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না। ভাই! ক্রমেই আমার বাক্‌শক্তি রোধ হইতেছে। কত কথা মনে ছিল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক যেন আমি অন্ধকারময় দেখিতেছি।" আবুয়ল কাসেমের হস্ত হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে হাসান কাতরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "ভাই! ঈশ্বরের দোহাই, আমার অনুরোধ,—তোমার কন্যা সখিনার সহিত কাসেমের বিবাহ দিও। আর ভাই! আমার বিষদাতার যদি সন্ধান পাও, কিম্বা কোন সূত্রে সে যদি ধরা পড়ে,—তবে তাহাকে কিছু বলিও না;—ঈশ্বরের দোহাই তাহাকে ক্ষমা করিও।"—যন্ত্রণাকুল এমাম ব্যাকুলভাবে অনুজকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া সস্নেহে কাসেমকে বলিলেন, "কাসেম! বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। আর বাপ! এই কবচটি সর্ব্বদা হস্তে বাঁধিয়া রাখিও। যদি কখনও বিপদগ্রস্ত হও, সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যদি নিজ বুদ্ধিতে কিছুই স্থির করিতে না পার, তবে এই কবচের অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্য করিও; যাহা লেখা দেখিবে, সেইরূপ কার্য্য করিবে। সাবধান! তাহার অন্যথা করিও না।"

পরে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া উপর্য্যুপরি তিন চারিটি নিশ্বাস ফেলিয়া হোসেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক মুমূর্ষু হাসান পুনরায় কহিলেন, "ভাই, ক্ষণকালের জন্য তোমরা সকলে একবার বাহিরে যাও; কেবল জাএদা একাকিনী এখানে উপস্থিত থাকুক। জাএদার সহিত নির্জ্জনে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।"

সকলেই আজ্ঞা পালন করিলেন। শয্যার নিকটে জাএদাকে ডাকিয়া

হাসান চুপিচুপি বলিতে লাগিলেন, "জাএদা! তোমার চক্ষু হইতে হাসান এখন চিরদিনের জন্য দূর হইতেছে—আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক। তুমি যে কার্য্য করিলে, সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিতাম, বড়ই ভালবাসিতাম,—তাহার উপযুক্ত কার্য্যই তুমি করিয়াছ। ভাল! সুখে থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। হোসেনকেও ক্ষমা করিতে বলিয়াছি, তাহাও তুমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ।—ভিতরের নিগূঢ় কথা যদি আমি হোসেনকে বলিতাম, তাহা হইলে যে কি অনর্থ সংঘটিত হইত, তাহা ত তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। যাহা হউক আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যিনি সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বময়, সর্ব্বক্ষমার অধীশ্বর, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন কি না বলিতে পারি না। তথাপি তোমার মুক্তির জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে আমি সেই মুক্তি-দাতার নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিব।—যে পর্য্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।"

জাএদা অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। একটিও কথা কহিলেন না। সময়োচিত সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণে হোসেনের সহিত আর আর সকলেই সেই গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। হাসান একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন, হাসনেবানু ও জয়নাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজকৃত অপরাধের মার্জ্জনা চাহিলেন। শেষে হোসেনকে তিনি কহিলেন, "হোসেন এস ভাই! জন্মের মত তোমার সহিত আলিঙ্গন করি।"—এই বলিয়া অনুজের গলা ধরিয়া সাশ্রুনয়নে আবার বলিতে লাগিলেন, "ভাই, সময় হইয়াছে! মাতামহ স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া ঐ ডাকিতেছেন! চলিলাম!" এই শেষ কথা করিয়াই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দয়াময় এমাম হাসান সর্ব্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন। যে দিন এমাম হাসান মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করেন, সেইদিন হিজরী ৫০ সনের ১লা রবিয়ল আউওল তারিখ। হাসনেবানু, জয়নাব, কাসেম ও আর আর সকলে হাসানের পদলুণ্ঠিত হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জাএদা কাঁদিয়াছিলেন কি না, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

সপ্তদশ প্রবাহ

মদিনাবাসীরা হাসানের শোকে বড়ই কাতর হইলেন। পরিজনেরা দশ দিবস পর্য্যন্ত কে কোথায় রহিল, কে কোথায় পড়িয়া কাঁদিল, কে কোথায় চলিয়া গেল, কেহই তাহার সন্ধান লইলেন না; সকলেই হাসানের শোকে দিবারাত্র অজ্ঞান! পবিত্র দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতে না হইতেই নৃশংস মন্ত্রী মারওয়ান দামেস্ক নগরে এজিদের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন: তাঁহার সমুদয় কার্য্য শেষ হয় নাই, সেই জন্য স্বয়ং দামেস্ক যাত্রা করিতে পারিলেন না। এমাম-বংশ একেবারে ধ্বংস করিবার মানসে ছদ্মবেশে তিনি মদিনায় রহিয়াছেন। দামেস্ক হইতে ক্রমে ক্রমে সৈন্য আসিয়া পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতপ্রান্তস্থ গুপ্তস্থানে জুটিতেছে। হাসানের প্রাণ বিয়োগের পর পরিজনেরা,—হাসনেবানু, জয়নাব, শাহরেবানু (হোসেনের স্ত্রী) ও সখিনা (হোসেনের কন্যা) প্রভৃতি শোকে এবং দুঃখে অবসন্ন হইয়া প্রায় মৃতবৎ হইয়া আছেন। হোসেন ও আবুয়ল কাসেম ঈশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়া উপস্থিত শোকতাপ হইতে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। জাএদা নিজ চিন্তায় চিন্তিত ও ব্যতিব্যস্ত; কি করিবেন, হঠাৎ গৃহত্যাগ করিবেন কি-না, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। মায়মুনার উপদেশে তিনি এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন; এক্ষণে তাহার কথাই বেশী মূল্যবান বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইল, আবার মায়মুনার শেষ কথা কয়টি এক্ষণে তাঁহার আরও ভাল লাগিল। কারণ, এখন তিনি বিধবা।

পূর্ব্বে গড়াপেটা সকলই হইয়া গিয়াছিল, কেবল উত্তেজনা- রসায়নের সংযোগটির অপেক্ষা ছিল মাত্র! মায়মুনা পূর্ব্বেই মারওয়ানের সহিত সমুদয় কথাবার্ত্তা সুস্থির করিয়াছে, মারওয়ানও সমুদয় সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল জাএদার অভিমতের অপেক্ষা! জাএদা আজকাল করিয়া তিন দিবস কাটাইয়াছেন; আজ আবার কি বলিবেন, কি করিবেন, নির্জ্জনে বসিয়া তাহাই

তিনি ভাবিতেছেন ; আপন কৃতকার্য্যের ফলাফল ভাবিতেছেন ; অদৃষ্টফলকে লিখিত লিপির প্রতি নির্ভর করিয়া সমুদয় চিন্তা দূর করিতেছেন। পতির চিরবিচ্ছেদে তাঁহার দুঃখ নাই, ভবিষ্যৎ আশায় এবং জয়নাবের প্রতিহিংসায় কৃতকার্য্য হইয়াও সুখ নাই! অন্তরে শান্তির নামও নাই! সর্ব্বদাই তিনি নিতান্ত অস্থির!

মায়মুনা ঐ নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বলিতে লাগিল, "তিন দিন ত গিয়াছে, আজ আবার কি বলিবে?"

"আর কি বলিব? এখন সকলই তোমার উপর নির্ভর। আমার আশা, ভরসা, প্রাণ সকলই তোমার হাতে।"

"কথা কখনই গোপন থাকিবে না। পাড়া-প্রতিবেশীরা এখনই কানাঘুষা আরম্ভ করিয়াছে। যে যাহাকে বলিতেছে, সেই-ই তাহাকে অপরের নিকট বলিতে বারণ করিতেছে। ধরিতে গেলে অনেকেই জানিয়াছে, কেবল মুখে 'রৈ রৈ হৈ হৈ' হয় নাই। হোসেন ভ্রাতৃশোকে পাগল, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র ঈশ্বরের উপাসনায় নিরত ; আজ পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে কোন কথা কর্ণে প্রবেশ করে নাই। শোকের একটু উপশম হইলেই এ কথা তাহার কর্ণে উঠিবে। এ সাংঘাতিক সংবাদ শুনিতে কি আর তাহার বাকী থাকিবে? তোমার পক্ষ হইয়া কে দুটা কথা বলিবে বল ত?"

"আমি যে তাহা না ভাবিয়াছি, তাহা নহে ; আমার আশা আছে, সন্তোষ-সুখ ভোগের বাসনা আছে। যাহা করিব, পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এই ত —রাত্রি অধিক হয় নাই, একটু অপেক্ষা কর, এখনই আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। এই একটি বড় দুঃখ মনে রহিল যে, এখানে থাকিয়া জয়নাবের চির-কান্না শুনিতে পাইলাম না!—তাহার বৈধব্যব্রত দেখিয়া চক্ষের সাধ মিটাইতে পারিলাম না।"

"খোদা যদি সে দিন দেন, তবে জয়নাবকে হাতে আনা কতক্ষণের কাজ? জয়নাব কি আজ সেই জয়নাব আছে? এখন ত সে পথের ভিখারিণী, যে ইচ্ছা করিবে, সেই-ই তাহাকে হস্তগত করিতে পারিবে। দেখ দেখি, শীঘ্র শীঘ্র সকল কাজ শেষ হইলে কত প্রকার মঙ্গলের আশা! জয়নাবকে পাইতে

কতক্ষণ লাগিবে? আবার বিবেচনা কর, বিলম্বে কত দোষের সম্ভাবনা। মানুষের মন ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল। তাহার উপর এজিদের একটু আসক্তির ভাবও পূর্ব্ব হইতেই আছে। বাধা-প্রতিবন্ধক সকলই শেষ হইয়াছে। জয়নাবও যে, আপন ভালমন্দ চিন্তা না করিতেছে, তাহাও মনে করিও না;—ওদিকে আসক্তির আকর্ষণ, এদিকেও নিরুপায় অবস্থা। এখন স্বেচ্ছার বশীভূত হইয়া এজিদের শরণাগত হইলে জয়নাব যে, স্থান পাইবে না, সে যে আদৃতা হইবে না, তাহাতে বিশ্বাস কি? শত্রুনির্য্যাতনে মনের কষ্টের প্রতিশোধ লইতেই তোমার সঙ্গে এত কথা;—এমন প্রতিজ্ঞা। জয়নাবই যদি অগ্রে যাইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে ত তোমার সকল আশাই এই পর্য্যন্ত শেষ হইল! এদিকেও মজাইলে, ওদিকেও হারাইলে!”

“না—না,—আমি যে আজ কাল করিয়া কয়েকদিন কাটাইয়াছি, তাহার অনেক কারণ আছে। আমি আজ আর কিছুতেই থাকিব না। লোকের কাছে কি বলিয়া মুখ দেখাইব?—হাস্‌নেবানু, জয়নাব, শাহ্‌রেবানু, এই তিন জনই আজ আমার নাম করিয়া অনেক কথা কহিয়াছে। দূর হইতে তাহাদের অঙ্গভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়াই আমি জানিয়াছি যে, সকলেই সকল কথা জানিয়াছে। কেবল হোসেনের কাণে উঠিতেই বাকী! সঙ্গে আমি কিছুই লইব না। যেখানে যাহা আছে, সকলই রহিল, এই বেশেই চলিয়া যাইব।”

এই বলিয়াই জাএদা উঠিলেন। সেই সঙ্গে মায়মুনাও উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হইল। রাত্রি বেশী হয় নাই, অথচ হোসেনের অন্তঃপুর ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথের ন্যায় বোধ হইতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ। দুঃখিত অন্তরে কেহ কেহ বা বসিয়া আছেন। আকাশ তারাদলে পরিশোভিত, কিন্তু হাসান-বিরহে যেন মলিন মলিন বোধ হইতেছে। সে বোধ,—বোধ হয়, মদিনাবাসীদিগের চক্ষেই ঠেকিতেছে। বাড়ী-ঘর সকলই পড়িয়া রহিয়াছে, যে স্থানে তিনি যে কার্য্য করিতেন, তাহা কেবল কথাতেই আছে, পরিজনের মনেই আছে, কিন্তু মানুষ নাই! চন্দ্রমাও যেন মদিনাবাসীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, হাসানের পরিজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া—মলিনভাবে অস্তাচলে চলিয়া গেলেন। জাএদাও যাহার অপেক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলেন, সে অপেক্ষা আর নাই—মনের আশা পূর্ণ

হইল! এখন অন্ধকার। মায়মুনার সহিত জাএদা বিবি চুপি চুপি বাড়ীর বাহির হইলেন। কাহারও সহিত দেখা হইল না। কেবল একটি স্ত্রীলোকের ক্রন্দন-স্বর জাএদার কর্ণে প্রবেশ করিল। জাএদা দাঁড়াইলেন; বিশেষ মনো-যোগের সহিত শুনিয়া আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "তোকে কাঁদাতেই এই কাজ করিয়াছি। যদি স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকিস্, তবে আজ কেন,— চিরকালই কাঁদিবি। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, দিবা, নিশা সকলেই তোর কান্না শুনিবে! কিন্তু তাহা হইলেই কি তোর দুঃখ শেষ হইবে? তাহা মনে করিস্ না। যদি জাএদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস্ জাএদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত? শুধু কাঁদাইয়াই ছাড়িবে না—আরও অনেক আছে। এই ত আজ তোর জন্য,—পাপীয়সি! কেবল তোরই জন্য জাএদা আজ স্বামীঘাতিনী বলিয়া পরিচিতা হইল; আজ আবার তোরই জন্য জাএদা এই স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।"

তীব্রস্বরে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে মায়মুনার সহিত দ্রুতপদে জাএদা বাড়ীর বাহির হইলেন; বাহির হইয়াই দেখিলেন: কয়েকজন সৈনিক পুরুষ অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গমনোপযোগী বাহনাদির সম্মুখে উপস্থিত। কেহ কোন কথা বলিল না। সৈনিক পুরুষ মায়মুনার ইঙ্গিতে জাএদাকে অভি-বাদন করিয়া বিশেষ মান্যের সহিত একটি উষ্ট্রে আরোহণ করাইল। মায়মুনাও উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। কিছু দূর যাইবার পর ছদ্মবেশী মারওয়ান তাঁহাদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইলেন। নগরপ্রান্তের সেই নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বত-গুহারসন্নিকটে আসিয়া মায়মুনার সহিত মারওয়ানের শিষ্টাচার সম্মত অনেক কথোপকথন হইল। অনন্তর মারওয়ান আরও বিংশতি জন সৈন্য সজ্জিত করিয়া জাএদার সহিত দিয়া তাঁহাকে দামেস্কে পাঠাইয়া দিলেন।

রজনী প্রভাতে হোসেনের পরিজনেরা দেখিলেন: জাএদা গৃহে নাই। শেষে হোসেনও সেই কথা শুনিলেন। তিনি অনেক সন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই জাএদার সন্ধান পাওয়া গেল না। জাএদা কেন গৃহত্যাগিনী হইলেন, সে কথা বুঝাইয়া বলিতে, কি বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। সকলেই বলিতে লাগিল, "কোন্ প্রাণে জাএদা আপন হাতে বিষ পান করাইয়া প্রাণের প্রিয়তম

স্বামীর প্রাণ হরণ করিল? উহার জায়গা কোথায় আছে? জগৎ কি পাপভার বহনে এতই সহনশীল হইয়াছে যে, মহাপাপে আক্রান্ত জাএদার ভারও অকাতরে সহ্য করিবে?—স্বামীঘাতিনীর স্থান কি ইহলোকে কোন স্থানে হইবে?—নরক কাহার জন্য? বোধ হয় নরকেও জাএদার ন্যায় মহাপাপিনীর স্থান নাই!"

অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, যাহা ঘটে নাই তাহাও রটাইলেন। জাএদা, যাহা কখনও মনে ভাবে নাই, তাহাও কেহ কেহ রটাইয়া দিলেন। হোসেন চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নূরনবী মোহাম্মদ মোস্তাফার রওজা মোবারকের দিকে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতার নিকটে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—বিষদাতার সন্ধান জানিলেও তাহাকে কিছুই বলিবেন না, তাহার প্রতি কোনরূপ দৌরাত্ম্যও করিবেন না! জাএদা মদিনায় নাই, থাকিলেও কিন্তু হোসেন অবশ্যই ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। এখনও তাহাই মনে করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাদশ প্রবাহ

এজিদ যে দিবস হাসানের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন, মনের আনন্দে সেই দিন হইতে অকাতরে ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। দিবারাত্র আমোদআহ্লাদ! স্বদেশজাত "মা-আল্ আনব" নামক চিত্ত-উত্তেজক মদ্য সর্ব্বদাই পান করিতে-ছেন! সুখের সীমা নাই! রাজপ্রাসাদে দিবারাত্র সন্তোষসূচক 'সাদিয়ানা' বাদ্য বাজিতেছে। পূর্ব্বেই সংবাদ আসিয়াছে, মায়মুনার সঙ্গে জাএদা দামেস্কে আসিতেছেন; আজই আসিবার সম্ভাবনা—এ চিন্তাও এজিদের মনে রহিয়াছে। স্বামীহন্তা জাএদাকে দেখিতে এজিদের বড়ই সাধ হইয়াছে। জাএদাকে তিনি অঙ্গীকৃত অর্থ দান করিবেন, আপনার প্রতিজ্ঞাটিও পালন করিবেন! মায়-মুনাকে কি প্রকারে পুরস্কৃত করিবেন, নরপতি এজিদ তাহাও চিন্তা করিতেছেন। পূর্ব্বেই তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, "আমার পরম শত্রুর মধ্যে এক জনকে মার-ওয়ানই কৌশল করিয়া বধ করিয়াছে, দামেস্কের ঘরে ঘরে সকলে আমোদ-

আহ্লাদে প্রবৃত্ত হউক। অর্থের অনটন হইলে, তজ্জন্য রাজভাণ্ডার অবারিত-ভাবে খোলা রহিল। সপ্তাহকাল রাজকার্য্য বন্ধ থাকিবে—দিবারাত্র কেবল আনন্দস্রোত বহিবে। যে ব্যক্তি হাসানের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইবে, কিংবা শোকাশ্রু বিনির্গত করিবে, কিংবা কোন প্রকার শোকচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিবে, তাহার গর্দ্দান কাটা যাইবে। যদি প্রকাশ পায় যে, এই সপ্তাহকাল মধ্যে কেহ কোন কারণে দুঃখের সহিত এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছে, তাহার শরীর হইতে সহস্রাধিক শোণিতবিন্দু বহির্গত করা হইবে।" অনেকেই মহাহর্ষে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; কেহ কেহ প্রাণের ভয়ে আমোদে মাতিয়াছে!

সুসজ্জিতা এবং প্রহরিবেষ্টিতা হইয়া মায়মুনার সহিত জাএদা দামেস্ক নগরে উপস্থিত হইলেন। জাএদার আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে কি অনুধ্যান-পূর্ব্বক এজিদ বলিলেন, "আজ আমার শরীর কিছু অসুস্থ। জাএদা ও মায়মুনাকে বিশেষ অভ্যর্থনার সহিত আমার উদ্যানস্থ প্রমোদভবনে স্থান দান কর। যথাযোগ্য আদরে তাহাদিগকে গ্রহণ কর। কোন বিষয়ে যেন অমর্য্যাদা কিংবা কোন ত্রুটি না হয়। আগামী কল্য প্রথমেই প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাদের সহিত আমার দেখা হইবে। পরে অন্য কথা।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া রাজা এজিদ তদর্থে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। এজিদের আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার উপদেশমতে সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। জাএদা ও মায়মুনা যথাযোগ্য সমাদরে প্রমোদভবনে স্থান পাইলেন। পরিচারক, পরিচারিকা, রক্ষক, প্রহরী—সকলই নিয়োজিত হইল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। নিশা যে কি জিনিস, আর ইহার ক্ষমতা যে কি—তাহা, বোধ হয়, আজ পর্য্যন্ত অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। সমস্ত দিন মহা দুঃখে কাটাইয়া কুহকিনী নিশার আগমনে নিদ্রায় অভিভূত হইলে সেই দুঃখের কথা কাহার মনে থাকে? সূর্য্য উদয় হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ-বিয়োগ হইবে, একথা জানিয়াও যদি কেহ রাত্রে নিদ্রাভিভূত হয়, তাহা হইলে তখন প্রভাতের ভাবী ঘটনার কথা কি সেই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অভাগার মনে পড়ে? দিবসে কাহারও সন্তান বিয়োগ হইয়াছে! কুহকিনী নিশা আসিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিল, ক্রমে জগৎ নিস্তব্ধ করিল, সকলের অজ্ঞাতসারে নিদ্রাকে

আহ্বান করিল, সন্তানের বিয়োগজনিত দুঃখ কি তখন সেই সন্তান-বিয়োগীর মনে থাকে ?—জাএদা প্রমোদ ভবনে পরিচারিকা বেষ্টিতা হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে স্বর্ণপালঙ্কে কোমল শয্যায় শুইয়া আছেন! কত কি ভাবিতেছেন! তাহার তরঙ্গ অনেক! প্রথমতঃ, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা! তারপর রাজরাণী! এই প্রথম নিশাতেই তিনি সুখ-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। প্রভাত হইলেই রাজদরবারে নীত হইবেন, সুখের প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিবেন, তৎপরেই গৃহপ্রবেশ! পরমায়ুর শেষ পর্য্যন্ত সেই সুখ-নিকেতনে তিনি বাস করিবেন! মায়মুনা রাজরাণী হইবে না,—কেবল স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে মাত্র!

জাএদার শয্যার পার্শ্বেই নিম্নতর আর একটি শয্যায় মায়মুনা শয়ন করিয়া আছে। তাহার মনে কি কোন চিন্তা নাই ?—আছে। মারওয়ানের স্বীকৃত অর্থ মদিনায় বসিয়াই সে পাইতে পারিত, এতদূর আসিবার কারণ—কিছু বেশীর প্রত্যাশা। উভয়েই আপন আপন চিন্তায় চিন্তিত, উভয়েই নীরব। এদিকে নিশার কার্য্যও নিশা ভুলে নাই। ক্রমে ক্রমে উভয়েই নিদ্রার কোলে অচেতন হইলেন। একবার এই সময়ে এজিদের শয়নগৃহটি দেখিয়া আসা আবশ্যক! আজ এজিদের মনের ভাব কিরূপ ? এত আশা এবং এত সুখকামনার মধ্যেও আবার কিসের মনঃ-পীড়া ?

এজিদ আজ মনের মত মনতোষিণী সুরা পান করিয়া বসিয়া আছেন, এখনও শয়ন করেন নাই। তাঁহার সম্মুখে পানপাত্র, পেয়ালা এবং মদিরাপূর্ণ-সোরাহী ধরা রহিয়াছে। রজত-প্রদীপে সুগন্ধি তৈলে আলো জ্বলিতেছে। জনপ্রাণী মাত্র সে গৃহে নাই। গৃহের দ্বারের কিঞ্চিৎ দূরে নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রহরী সতর্কিতভাবে পাহারা দিতেছে। মদ্যপানে অজ্ঞানতা জন্মে, সাধ্যাতীত কিছু করিতে গেলে মানব-প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। মানুষ তখন পশু হইতেও নীচ হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধ্য-সমতার অতীত না হইলে, বোধ হয়, অতি জঘন্য হৃদয়েও অনেক উৎকৃষ্ট ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এজিদ আজ একা একা অনেক কথা বলিতেছেন। বোধ হয়, সুরাদেবীর প্রসাদে তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্য একে একে স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। প্রথম

জয়নাবকে দর্শন, তাহার পর পিতার নিকট মনোগত ভাব-প্রকাশ, তাহার পর মাবিয়ার রোষ—পরে আশ্বাস প্রাপ্তি, আবদুল জব্বারের জয়নাবকে পরিত্যাগ, বিবাহের জন্য কাসেদ-প্রেরণ—বিফলমনোরথ কাসেদের প্রত্যাগমন,—পীড়িত পিতার উপদেশ, শরনিক্ষেপে প্রথম কাসেদের প্রাণসংহার, মোস্‌লেমকে কৌশলে কারারুদ্ধ করা, পিতার মৃত্যু, নিরপরাধে মোস্‌লেমের প্রাণদণ্ড, হাসানের সহিত যুদ্ধঘোষণা,—যুদ্ধে পরাজয়ের পর নূতন মন্ত্রনা, মায়মুনা এবং জাএদার সাহায্যে হাসানের প্রাণবিনাশ, মারওয়ানের প্রভুভক্তি, জাএদা ও মায়মুনার দামেস্কে আগমন,—প্রমোদভবনে তাহাদের স্থান-নির্দ্দেশ—এজিদ ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেন। সুরাপ্রভাবে তাঁহার মনের কপটতা দূর হইয়াছে; হিংসা, দ্বেষ শত্রুতা ঐ সময়ে অন্তর হইতে অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে! আজ এজিদের চক্ষে জল পড়িল। কেন পড়িল, কে বলিবে? পাষাণময় অন্তর আজ কেন কাঁদিল? কে জানিবে? কি আশ্চর্য্য! যদি সুরার প্রভাবে এখন এজিদের চিরকলুষিত পাপময় কুটিল অন্তরে সরলভাবের পবিত্রতা আসিয়া থাকে, তবে হে সুরে! তোমাকে শত শত বার নমস্কার! শত শত বার ধন্যবাদ! জগতে যদি কিছু মূল্যবান বস্তু থাকে, সেই মূল্যবান বস্তুই তবে তুমি! হে সুরেশ্বরি! পুনর্ব্বার আমি ভক্তিভরে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি! এজিদ আর এক পাত্র সুরা পান করিলেন, কোন কথা কহিলেন না; তারপর ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রমোদ ভবনে জাএদা ও মায়মুনা নিদ্রিতা, রাজপ্রাসাদে এজিদ নিদ্রিত; মদিনায় হাসানের অন্তঃপুরে হাস্‌নেবানু নিদ্রিতা। জয়নাবও বোধ হয় নিদ্রিতা। এই কয়েকটি লোকের মনোভাব পৃথক পৃথক রূপে পর্য্যালোচনা করিলে, ঈশ্বরের অপার মহিমার একটি অপরিসীম দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ইঁহারা সকলেই নিদ্রিতাবস্থায় আপন আপন মনোমত ভাবের ফলানুযায়ী স্বপ্নে মাতিয়া থাকেন, তবে কে কি দেখিতেছেন? বোধ হয় জয়নাব আলুলায়িত মলিন বসনে উপাধান শূন্য মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিয়া,—হাসানের জীবিত-কেশে

কালের কার্য্যকলাপ অর্থাৎ বিবাহের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী,—যাহা তাঁহার অন্তরে চিরনিহিত রহিয়াছে, তাহারই কোন না কোন অংশ লইয়া স্বপ্নে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। হাসনেবানুও স্বপ্নযোগে স্বামীর জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র দেহের কান্তি দেখিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন! স্বর্গের অপরিসীম সুখ-ভোগে লালায়িতা হইয়া ইহজীবন ত্যাগে স্বামী-পদপ্রান্তে থাকিতে যেন ঈশ্বরের নিকট কতই আরাধনা করিতেছেন! জাএদা, বোধ হয়, এক এক বার ভীষণ মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিয়া নিদারুণ আতঙ্কে জড়সড় হইতেছেন, ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন না, পলাইবার উপযুক্ত স্থানও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। স্বপ্নকুহকে ত্রস্তপদে যাইবারও শক্তি তাঁহার নাই, মনে মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কতই মিনতি করিতেছেন! আবার সে-সকলই যেন কোথায় মিশিয়া গেল! জাএদা যেন রাজরাণী, শত শত দাসী-সেবিতা, এজিদের পাটরাণী, সর্ব্বময় গৃহিণী! আবার তাহাও কোথায় মিশিয়া গেল! জাএদা যেন স্বামীর বন্দিনী, প্রাণবিনাশিনী বলিয়া অপরাধিনী;—ধর্ম্মাসনে এজিদ যেন বিচারপতি! মায়মুনা টাকার ভার আর বহিতে ও সহিতে পারিতেছে না! এত টাকা লইয়া কি করিবে? কোথায় রাখিবে? আবার যেন ঐ টাকা কে কাড়িয়া লইল! মায়মুনা কাঁদিতেছে। টাকা-অপহারক বলিতেছে—"রে পাপীয়সি! এই নে! তোর এ পাপপূর্ণ টাকা লইয়া আমি কি করিব?" এই বলিয়া টাকা নিক্ষেপ করিয়া সে মায়মুনার শিরে যেন আঘাত করিতে লাগিল। মায়মুনা কাঁদিয়াই অস্থির! তাহার কান্নার রবে জাএদার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এজিদের বিচার হইতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন!

যে শয়ন গৃহে জাএদা ও মায়মুনা শুইয়াছিলেন, সেই গৃহে আর আর সকলে নিদ্রিত; কেবল তাঁহারা দুইজনে জাগিয়া আছেন, উভয়ে পরস্পর অনেক কথাই কহিতে লাগিলেন।

এজিদ সুরাপ্রভাবে ঘোর নিদ্রাভিভূত। অনেক দিবসের পর আজ, বোধ হয়, পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমাকে রক্ষা করুন। আমি আর কখনই হাসানের অনিষ্ট করিব না।"

ক্রমে ক্রমে এজিদের মাদকতার অনেক লাঘব হইয়াছে; কিন্তু পিপাসা

ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শয়নকক্ষে সুশীতল জলপূর্ণ স্বর্ণসোরাহী ছিল, এজিদ জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। এবং শুকতারার উদয় দেখিয়া আর ঘুমাইলেন না, প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। এদিকে জগৎ-লোচন রবিদেব সহস্র কর বিস্তার করিয়া আসিতেছেন,—কাহার সাধ্য, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়? শুকতারার অন্তর্দ্ধান, ঊষার আগমন ও প্রস্থান, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেবের অধিষ্ঠান! এজিদের প্রকাশ্য দরবার দেখিবার আশায় যেন পূর্ব্বাকাশপতি লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন, দামেস্ক নগরীকে জাগরিত করিলেন। স্বামীহন্তা জাএদাকে এজিদ পুরস্কৃত করিবেন, সাহায্য-কারিণী মায়মুনাকে অর্থদান করিবেন, জাএদাকে মারওয়ানের স্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, অধিকন্তু জাএদাকে পাটরাণীরূপে গ্রহণ করিবারও ইচ্ছা তাঁহার আছে! সূর্য্যদেব প্রতি ঘরে ঘরে স্বকীয় কিরণ-বিকীরণের সহিত ঐ কথাগুলি যেন ঘোষণা করিয়া দিলেন। রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া মহারাজ এজিদ খাস্-দরবারে বার দিলেন। প্রহরিগণ সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অমাত্যগণ এবং পূর্ব্বাহূত নগরস্থ প্রধান প্রধান মাননীয় মহোদয়গণ স্ব স্ব স্থান পূর্ণ করিয়া দরবারের শোভা সংবর্দ্ধন করিলেন। মায়মুনা ও জাএদা পূর্ব্ব আদেশ-অনুসারে পূর্ব্বেই দরবারে নীত হইয়াছিলেন। শাহী তক্তের বাম পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীলোক। জাএদা রজতাসনে আসীনা, মায়মুনা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা,—জাএদার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাঁহারা জাএদার কৃত কার্য্য বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত, অথচ এমাম হাসানের প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহারা জাএদার সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত ললাট, বিস্ফারিত লোচন ও আয়ত ভ্রূযুগলের প্রতি ঘন ঘন সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এজিদ বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, হাসান আমার চিরশত্রু ছিল, সে নানা প্রকারে আমায় কষ্ট দিয়াছে। আমি কৌশল করিয়া এই সিংহাসন রক্ষা করিয়াছি; সেই চিরশত্রু হাসান কোন বিষয়েই আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না; তথাপি তাহার বংশগৌরব এত প্রবল ছিল যে, নানা প্রকার অযথা কটুক্তির দ্বারা সর্ব্বদাই আমার মনে সে ব্যথা দিয়াছে।

আমি সে দিকে লক্ষ্য করি নাই। রাজ্যবিস্তারই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। বিশেষতঃ, মদিনারাজ্যের শাসনভার নিঃসহায় নির্ধন ভিখারীর হস্তে থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ কাসেদের দ্বারা তাহাদিগকে আমার বশ্যতা স্বীকার করিবার আদেশ করা হইয়াছিল। সে কথা তাহারা অবহেলা করিয়া, দামেস্ক-সিংহাসনের অবমাননা করিয়া কাসেদকে বিশেষ তিরস্কারের সহিত আমার লিখিত পত্রটি শতখণ্ডে খণ্ডিত করিয়া, উত্তর-স্বরূপ তাহাই কাসেদের হস্তে পুনঃ প্রেরণ করিয়াছিল। সেই কারণেই আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি; প্রিয় মন্ত্রী মারওয়ানকে সেই যুদ্ধে "সেপাহ্-সালার" (প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ) পদে বরণ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসহ হাসানকে বাঁধিয়া আনিতে মদিনায় প্রেরণ করি। আমার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হাসানের পক্ষে মিলিত হয় এবং দামেস্কের অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করে। কি করি, চিরশত্রু দমন না করিলেও নহে, এ দিকে সৈন্যদিগের কূট চক্রে বাধ্য হইয়া হাসানের প্রাণ কৌশলে গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচিত হয়। এই যে কাষ্ঠাসনোপরি উপবিষ্টা বিবি মায়মুনাকে দেখিতেছেন, ইহার কল্যাণে—আর এই রজতাসনে উপবিষ্টা বিবি জাএদার সাহায্যে আমার চিরশত্রু বিনষ্ট হইয়াছে। বিবি জাএদা আমার জন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। কয়েকবার স্বহস্তে আপন স্বামী হাসানকে বিষপান করাইয়াছিলেন, শেষে হীরক-চূর্ণ জলে মিশাইয়া তাহাকে পান করাইলেন। তাহাতেই চিরশত্রু—আমার চিরশত্রু ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি এই মহোদয়ার কৃপাতেই শত্রুবিহীন হইয়াছি। এই গুণবতী রমণীর অনুগ্রহেই আমি প্রাণে বাঁচিয়া আছি, এই সদাশয়া ললনার কৌশলেই আজ আমার মন কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছে। বহু চেষ্টা ও বহু পরিশ্রমের ফল এই মহামতি যুবতীর দ্বারাই সুপক্ক হইয়া ফলিয়াছে। আর এই বিবি মায়মুনা, ইহার সহিত এই কথা ছিল যে, যে কোন কৌশলে, যে কোন কুহকেই হউক, হাসানকে প্রাণে মারিতে পারিলে ইনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।"

ইঙ্গিতমাত্র কোষাধ্যক্ষ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপরিপূর্ণ থলিয়া আনিয়া বিবি মায়মুনার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে পূর্ব্বস্থানে পূর্ব্ববৎ কড়জোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

এজিদ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "রজতাসন-পরিশোভিতা এই বিবি জাএদার সহিত এই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, যদি ইনি স্বীয় প্রিয়তম পতির প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন, তবে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, মূল্যবান বস্ত্র ও মণিময় অলঙ্কার দান করিয়া ইঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইব।" সঙ্কেতমাত্র কোষাধ্যক্ষ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূরিত কয়েকটি রেশম বস্ত্রের থলিয়া, রত্নময় অলঙ্কার এবং কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র বসন আনিয়া জাএদার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া এজিদ আবার বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, তবে বিবি জাএদা এই সিংহাসনে আমার বাম পার্শ্বে আসিয়া বসুন।—বিবি জাএদা! আপনি আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন, এখন আমিও আমার অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করি।"

জাএদা মনে মনে ভাবিলেন : বস্ত্র, অলঙ্কার ও মোহর সকলই ত পাইয়াছি; এক রাজরাণী হওয়াই বাকী ছিল, রাজা যখন নিজেই তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিতে আদেশ করিতেছেন, তখন সে আশাও পূর্ণ হইল। বিবাহ না হয় পরেই হইবে। রাজরাণী করিয়া আর আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না! এই ভাবিয়া বুদ্ধিমতী জাএদা সন্তুষ্ট হৃদয়ে রজতাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ-সিংহাসনে এজিদের বাম পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এজিদ বলিলেন, "আমার আশা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আমার কয়েকটি কথা আছে, আপনারা সকলেই মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।" এই কথা বলিয়া এজিদ সিংহাসন ছাড়িয়া একেবারে নীচে নামিলেন। জাএদা আর তখন কি বলিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, সলজ্জভাবে অতি ত্রস্তে তিনিও সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সভাস্থলে এজিদের পার্শ্বদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এজিদের বাক্যস্রোত বন্ধ হইল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। জাএদাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া—ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার শত্রুকে এই বিবি জাএদা বিনাশ করিয়াছেন, আমি ইঁহার নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ থাকিলাম। কিন্তু সামান্য অর্থ লাভে এমন প্রিয়তম নির্দ্দোষ পতির প্রাণ যে রাক্ষসী বিনাশ করিয়াছে,

তাহাকে আমি কি বলিয়া, কোন্ বিশ্বাসে আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী-পদে বরণ করিয়া লইব, আমার প্রলোভনে ভুলিয়া যে পিশাচী এক স্বামীর প্রাণবিনাশ করিল, অন্য কাহারও প্রলোভনে ভুলিয়া সেই পিশাচী আমার প্রাণও ত অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে? যে স্ত্রী স্বামীঘাতিনী, স্বহস্তে স্বামীর প্রাণ বধ করিতে, যে একবার নয়, দুই বার নয়, কয়েকবার বিষ দিয়া শেষবারে কৃতকার্য্য হইল,—আমি দণ্ডধর রাজা, তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করা কি আমার কর্ত্তব্য নহে? ইহার ভার আমি আর কাহারও হস্তে দিব না, পাপীয়সীর শাস্তি—আমি গত রাত্রে আমার শয়নমন্দিরে বসিয়া যাহা সাব্যস্ত করিয়াছি, তাহাই পালন করিব।" এই কথা বলিয়াই কটীবন্ধ সংযুক্ত দোলায়মান অসি-কোষ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি রোষভরে নিষ্কোষিত করিয়া জাএদার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পাপীয়সি! স্ত্রী হইয়া স্বামীবধের প্রতিফল ভোগ কর্! প্রিয় পতির প্রাণহরণের প্রতিফল!" এই বলিয়াই কথার সঙ্গে সঙ্গেই এজিদ স্বহস্তে এক আঘাতে পাপিনী জাএদাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। শোণিতের ধারা ছুটিল। এজিদের অসি জাএদার রক্তে রঞ্জিত হইল। কি আশ্চর্য্য!

অসিহস্তে গম্ভীরস্বরে এজিদ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ঐ কুহকিনী মায়মুনার শাস্তি আমি স্বহস্তে বিধান করিব না! আমার আজ্ঞায়, উহার অর্দ্ধ-শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া প্রস্তর-নিক্ষেপে মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেল।" আজ্ঞামাত্র প্রহরীগণ মায়মুনাকে হস্তে ধরিয়া দরবারের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল; মাটিতে তাহার অর্দ্ধদেহ পুঁতিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে মস্তক চূর্ণ করিল। মায়মুনার স্বপ্ন আজ সত্যই সত্য ফলিয়া গেল। সভাস্থ সকলেই "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল" বলিতে বলিতে সভাভঙ্গের বাদ্যের সহিত সভাভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। এজিদ হাসান-বধ শেষ করিয়া হোসেন-বধে প্রবৃত্ত হইলেন! আমরাও এই উপযুক্ত অবসরে দামেস্ক নগর পরিত্যাগ করিয়া মদিনার অভি-মুখে যাত্রা করিলাম।

ঊনবিংশ প্রবাহ

মারওয়ান ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নগরীর প্রান্তভাগে যে স্থানে পূর্ব্বে শিবির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুনরায় সৈন্যাবাস রচনা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে পরিমাণ সৈন্য দামেস্ক হইতে ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে, তাহার সহায়ে হোসেনের তরবারির সম্মুখে যাইতে তিনি কিছুতেই সাহসী হইলেন না। দামেস্ক হইতে আর কোন সংবাদ আসিতেছে না। তিনি জাএদা ও ময়মুনাকে সেই নিশীথ সময়ে কয়েকজন প্রহরী সমভিব্যাহারে দামেস্ক পাঠাইয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত তাহার আর কোন সংবাদ পাইতেছেন না! তাঁহারা নির্বিবঘ্নে পৌঁছিলেন কি না, তাঁহার অঙ্গীকৃত স্বর্ণমুদ্রা জাএদা ও মায়মুনা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না, জাএদাকে অতিরিক্তরূপে বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত রত্নময় বসন-ভূষণ প্রদানে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা জাএদা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না—মনে তাঁহার এই ভাবনা!—আর একটি কথা, জাএদা পাটরাণী হইয়া এজিদের ক্রোড় শোভা করিতেছেন কি না, তাহাও তিনি জানিতে পারিতেছেন না! এও এক বিষম ভাবনা! এমরানকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "ভাই এমরান! তুমি সৈন্যসামন্তের তত্ত্বাবধান-কার্য্যে সর্ব্বদা সতর্ক থাক। আমি ছদ্মবেশে যে সকল সন্ধান, সে সকল গুপ্ত বিবরণ নগরের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া প্রায় প্রতি দিন জানিয়া আসিতেছি, ওত্‌বে অলীদ আমার পরিবর্ত্তে সেই কার্য্য করিবেন। আমি কয়েকদিনের জন্য দামেস্ক যাইতেছি। এখন আমার যাইবার উপযুক্ত সময় নয়, কিন্তু কি করিব বাধ্য হইয়া যাইতে হইতেছে। তোমরা সাবধানে থাকিও। কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। আমি দামেস্ক হইতে ফিরিয়া আসিয়াই হোসেন-বধে প্রবৃত্ত হইব।" এই বলিয়া মারওয়ান দামেস্ক-যাত্রা করিলেন।

নিয়মিত সময়ে মারওয়ান দামেস্কে যাইয়াই—জাএদা ও মায়মুনার বিচার শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কি করিবেন? আর কোন উপায় নাই!

সময়মত তিনি এজিদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, মদিনার উপস্থিত বিবরণ সমুদয় এজিদের গোচর করিয়া পুনরায় মদিনা ফিরিবার কথা পাড়িলেন। প্রধান মন্ত্রী হামান যুদ্ধে অমত প্রকাশ করিয়া কয়েকদিন মারওয়ানকে মদিনা-গমনে ক্ষান্ত রাখিলেন।

সভামণ্ডপে সকলেই উপস্থিত আছেন। মারওয়ানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ বলিতে লাগিলেন, "মারওয়ান! আমার আশা-লতার কেবলমাত্র বীজ বপন হইয়াছে; কতকালে যে প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া মনের আনন্দে নয়নের প্রীতি জন্মিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এখন বিশ্রামের সময় নয়, আমোদ-আহ্লাদের সময় নয়, নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবারও কার্য্য নয়। অনেক কাজ রহিয়াছে;—এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। একটি নরসিংহের বধ করা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তত্তুল্য আরও একটি সিংহ বর্ত্তমান। সিংহশাবকগুলি বড় ভয়ানক! এখন আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল জ্ঞান করিতে হইবে। এ সমুদয়কে শেষ না করিতে পারিলে আমার মনের আশা কখনই পূর্ণ হইবে না। হোসেনের রোষাগ্নি ও কাসেমের ক্রোধ-বহ্নি হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নহে। আলি আকবর, আলি আসগার, আবদুল্লা আকবর, জয়নাল আবেদিন—ইহারা যদিও শিশু, কিন্তু পিতৃব্যবিয়োগজনিত দুঃখে কাতর না হইয়াছে, এমন মনে করিও না। ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইতে হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে যে, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জাএদার দ্বারা এই সাংঘাতিক কার্য্য করান হইয়াছে। জাএদা বাঁচিয়া থাকিলে—হাসানবংশের ক্রোধানলের কিঞ্চিৎ অংশ হইতে বাঁচিতে পারিতে, কিন্তু এখন তাহা আর হয় না। সে ক্রোধানল সম্যক্‌রূপে এক্ষণে আমাদের শিরে পড়িয়া আমাদিগকে দগ্ধীভূত করিবে।—পূর্ব্ব হইতেই সে আগুন নির্ব্বাণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহারা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আর কয়দিন নিরস্ত থাকিবে? মহাবীর কাসেম চিরবৈরী বিনাশ করিতে, পিতার দাদ উদ্ধার করিতে একেবারে জলন্ত অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে। তখন কি রক্ষা থাকিবে? আর সময় দেওয়া উচিত নহে। যত শীঘ্র হয়, হাসান-হোসেনের বংশবিনাশে যাত্রা কর। উহাদের একটিও যদি জগতে বাঁচিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই জানিও, এজিদের

মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবেই—তোমাদের শোণিতে হাসান পুত্রের তরবারি রঞ্জিত হইয়া সকলের পরমায়ু শেষ করিবেই। ঐ সকল সিংহশাবককে যুদ্ধে, কৌশলে, ছলে যে কোন উপায়ে হউক, জগৎ হইতে অন্তর না করিলে কাহারও অন্তরে আর কোন আশা নাই,—নিশ্চয় জানিবে, কাহারও নিস্তার নাই।"

এই সকল কথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী হামান গাত্রোত্থানপূর্ব্বক করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "রাজাজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য! কিন্তু আমার কয়েকটি কথা আছে। অভয় দান করিলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

এজিদ বলিলেন, "তোমার কথাতেই ত কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াছি। যদি তুমি আমার ঐ সকল চিরশত্রু বিনাশে আমার অপেক্ষা আর কোন ভাল উপায় উদ্ভাবনা করিতে পার, কিংবা আমার বিবেচনার ত্রুটি, চিন্তার ভুল, বা যুক্তিতে দোষ বিবেচনা কর, তবে অবশ্যই বলিতে পার"

করপুটে হামান বলিলেন, "বাদশাহ্-নামদার! অপরাধ মার্জ্জনা হউক। যে হাসান আপনার মনোবেদনার কারণ—যে হাসান আপনার মনোকষ্টের মুল, যে হাসান আপনার প্রথম বয়সের প্রণয়সুখ-ভোগের সরল পথের বিষম কণ্টক, যে হাসান আপনার নবপ্রণয়ের বাহ্যিক বিরোধের পাত্র, যে হাসান আপনার অন্তরের ভালবাসা-প্রস্ফুটিত জয়নাব-কুসুমের বিধিসঙ্গত অপহারী, যে হাসান আপনার শত্রু—সে ত এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই! আপনার ব্যথিত হৃদয়ে ব্যথা দিয়া জয়নাব-রত্ন লাভকারী সেই হাসান ত আর ইহজগতে নাই! জয়নাবের হৃদয়ের ধন, অমূল্য নিধি, সুখ-পুষ্পের আশালতা, সেই হাসান ত আর বাহ্যজগতে জীবিত নাই! তবে আর কেন? প্রতিশোধের কিছু বাকী আছে কি? জয়নাব যেমন আপনার মনে ব্যথা দিয়া হাসানকে পতিত্বে বরণ করিয়া সুখী হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ যাতনা—তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ মনোবেদনা সে এক্ষণে ভোগ করিতেছে। তাহার সুখতরী বিষাদ-সিন্ধুতে বিনা তুফানে আজ কয়েক দিন হইল ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার মনোবাঞ্ছিত—স্বেচ্ছাবরিত পতিধন হইতে সে ত একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে! তবে আর কেন?

পূর্ব্বস্বামী হইতে পরিত্যক্তা হইয়া সে যেমন অনাথিনী হইয়াছিল, আপনাকে স্বামীত্বে বরণ না করিয়া আজিও সেই জয়নাব সেইরূপ পথের কাঙ্গালিনী ও পথের ভিখারিণী। বাদশাহ্-নামদার! জগৎ কয়দিনের? সুখ কয় মুহূর্ত্তের? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি,—নিরপেক্ষভাবে একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, হাসান কি আপনার শত্রু? হাসান আপনার রাজ্য আক্রমণ করে নাই, আপনার প্রাণবধে অগ্রসর হয় নাই, জয়নাবকে কৌশলেও হস্তগত করে নাই,—এ সকলই আপনি বিদিত আছেন। হইতে পারে, একটি ভালবাসার জিনিষের দুইটি গ্রাহক হইলে পরস্পরের অন্তরে জাতক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে ঘটনায় হাসানের অপরাধ কি? সে মীমাংসা স্বয়ং জয়নাবই ত করিয়াছে। তাহার শাস্তিও হইল। অধিক হইয়াছে! এক্ষণে হোসেনের প্রাণবধ করা, কি হাসানের পুত্রের প্রাণ হরণ করা মানুষের কার্য্য নহে। বলুন ত, কি অপরাধে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবেন? এখনও পর্য্যন্ত হোসেনের ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। পিতৃহীন হইলে যে কি মহাকষ্ট, তাহা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। কাসেম এত অল্প সময়ে কি তাহা ভুলিয়াছে? আজও পর্য্যন্ত হাসনেবানুর উদরে অন্ন নাই, চক্ষের জল নিবারণ হয় নাই, তাঁহার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইতেছে! জয়নাবের কথা আর বলিলাম না! মদিনার আবালবৃদ্ধ, এমন কি পশুপক্ষীরাও 'হায় হাসান!' 'হায় হাসান!!' করিয়া কাঁদিতেছে। বোধ হয় বক্ষে করাঘাতে কাহারও কাহারও বক্ষ ফাটিয়া শোণিতের ধারা বহিতেছে! তথাপি 'হায় হাসান'! 'হায় হাসান!!' রবে জগৎ কাঁপাইতেছে। যে শুনিতেছে, সেই-ই মুখে বলিতেছে, 'হায় হাসান!' 'হায় হাসান!!' এ অবস্থায় কি আর যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসর হইতে আছে? এই ঘটনায় কি আর ভ্রাতৃবিয়োগীর প্রতি তরবারি ধরিতে আছে? এই দুঃখের সময় কি অনাথা পতিহীনা স্ত্রীগণের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে আছে? হায়! হায়!! সেই পিতৃহীন, পিতৃব্যহীন বালকদিগের মুখের প্রতি চাহিয়া কি কেহ কাঁদিবে না? এখন তাহারা শোকে দুঃখে আচ্ছন্ন, অসীম কাতর; এ সময় আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। শত্রু-পরিবার

আপন পরিবার মধ্যে পরিগণিত,—ইহাই রাজনীতি এবং ইহাই রাজপদ্ধতি। এই অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ী জগতের প্রতি অকিঞ্চিৎরূপে দৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের মহিমা অপার। তিনি বিজন বনে নগর বসাইতেছেন, মনোহর নগরকে বনে পরিণত করিতেছেন; কাহাকেও হাসাইতেছেন, কাহাকেও কাঁদাইতেছেন, কাহাকেও মনের আনন্দে, মনের সুখে রাখিতেছেন, মুহূর্ত্ত সময় অতীত হইতে না হইতে আবার তদ্বিপরীত করিতেছেন, মাতঙ্গ-মস্তকে পতঙ্গের দ্বারা পদাঘাত করাইতেছেন। আজ যে অতুল ধনের অধিকারী কাল সে পথের ভিখারী।—সেই—"

এজিদ নিস্তব্ধভাবে মনোনিবেশপূর্ব্বক সকল কথা শুনিতেছিলেন। দুষ্ট মারওয়ান প্রধান মন্ত্রী হামানের কথা শেষ হইতে না হইতেই রোষভরে বলিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধ হইলে মানুষের যে বুদ্ধিশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাহা সত্য। ইহাতে যে একটু সন্দেহ ছিল, তাহা আজ আমাদের প্রধান উজীরের কথায় একেবারে দূর হইল। মহাশয়! ধন্য আপনার বক্তৃতা! ধন্য আপনার বুদ্ধি! ধন্য আপনার ভবিষ্যৎ-চিন্তা! ধন্য আপনার রাজনীতিজ্ঞতা! ধন্য আপনার বহুদর্শিতা! ধন্য আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব! এক ভ্রাতা শত্রু, দ্বিতীয় ভ্রাতা মিত্র,—ইহা কি কখনও সম্ভব? কোন্ পাগলে একথা না বুঝিবে? সময় পাইলেই তাহারা প্রতিশোধ লইবে। এক্ষণে তাহারা কেবল সময় আর অবসর খুঁজিতেছে। যে জয়নাবের সুখের তরী ডুবিয়া গিয়াছে বলিতেছেন, সে জয়নাবকেও কম মনে করিবেন না! আমাদের কিছু জানিতে বাকী নাই! জাএদা আমাদের পরামর্শ মত হাসানকে বিষপান করাইয়াছে। এই উপযুক্ত সময়ে যদি উহাদিগকে একেবারে সমূলে বিনাশ করা না যায়, তবে কোন না কোন সময়ে আমাদিগকে ইহার ফল ভুগিতেই হইবে। আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি, না হয় আপনি স্মরণার্থে লিখিয়া রাখুন—হাসানের বিষপানজনিত তাহাদের রোষানল শত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া একে একে দামেস্কের সকল লোককে দগ্ধীভূত করিবে। কার সাধ্য হোসেনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়? কার সাধ্য কাসেমের তরবারি হইতে প্রাণরক্ষা করে? এ সিংহাসন কাসেমের উপবেশনের জন্য পরিষ্কৃত থাকিবে। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম,

আপনার বুদ্ধির অনেক ভ্রম হইয়াছে। পরকাল ভাবিয়া জগতের অস্থায়িত্ব বুঝিয়া, নশ্বর মানব-শরীর চিরস্থায়ী নহে স্মরণ করিয়া, রাজ্যবিস্তারে বিমুখ, শত্রুদমনে শিথিল ও পাপভয়ে রাজকার্য্যে ক্ষান্ত হওয়া নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য। আপনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া হাসানের বংশের সহিত সখ্যভাব সৃজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন; আমি বলিতেছি, তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করাই উচিত এবং কর্ত্তব্য। এমন শুভ অবসর আর পাওয়া যাইবে না। শত্রুকে সময় দিলেই দশ গুণ বল দান করা হয়, একথা কি আপনি ভুলিয়াছেন? যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া মদিনা হইতে সৈন্যগণকে উঠাইয়া আনিলে কত পরিমাণ বলের লাঘব হইবে? নায়কবিহীন হইলে তাহার পশ্চাদবর্ত্তী নেতৃদলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে কতক্ষণ লাগে?"

হাসানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ বলিলেন, "মারওয়ান যাহা বলিতেছেন, তাহাই যুক্তিসঙ্গত! যত বিলম্ব ততই অমঙ্গল! এই যুদ্ধের প্রধান নায়কই মারওয়ান। মারওয়ানের মতই আমার মনোনীত। শত্রুকে অবসর দিতে নাই, দিবও না। মারওয়ান! আর কোন কথাই নাই; যে পরিমাণ সৈন্য মদিনায় প্রেরিত হইয়াছে, আমি তাহার আর চতুর্গুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এখানে রাখিয়াছি। যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, লইয়া মদিনায় যাত্রা কর; আমি এক্ষণে হোসেনের মস্তক দেখিতে উৎসুক রহিলাম। প্রথমে হোসেনের মস্তক দামেস্কে পাঠাইবে, তাহার পর জয়নাব ও হাস্‌নেবানু প্রভৃতি সকলকে কারারুদ্ধ করিয়া আনিবে।" এই আজ্ঞা করিয়াই পাষাণে গঠিত নির্দ্দয়হৃদয় এজিদ সভা ভঙ্গ করিলেন। মারওয়ান রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হইয়া এজিদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

বিংশ প্রবাহ

মারওয়ান সৈন্যসহ মদিনায় আসিলেন। ওত্‌বে অলীদের মুখে তিনি সবিস্তারে সমস্ত শুনিলেন। হাসানের মৃত্যুর পর হোসেন অহোরাত্র রওজা শরীফে বাস করিতেছেন, এ কথায় মারওয়ান অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পবিত্র রওজায় যুদ্ধ করা নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য; সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে সাহস হয় না! যুদ্ধে আহ্বান করিলেও হোসেন কখনই তাঁহার মাতামহের সমাধিস্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবে না। মারওয়ান বিশেষরূপে এই সকল কথার আন্দোলন করিয়া অলীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই ইহার উপায় কি? আমার প্রথম কার্য্য হোসেনের মুণ্ড-লাভ, শেষ কার্য্য তাহার পরিবারকে বন্দী করিয়া দামেস্ক নগরে প্রেরণ। হোসেনের মস্তক হস্তগত না করিলে শেষ কার্য্যটি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব!"—কি উপায়ে হোসেনকে মোহাম্মদের সমাধিক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিবেন, এই চিন্তাই তখন তাঁহাদের প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা, ও বহু কৌশল করিয়াও তাঁহারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এক দিন মারওয়ান ওত্‌বে অলীদের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া উভয়েই ছদ্মবেশে নিশীথ সময়ে পবিত্র রওজায় উপস্থিত হইলেন; রওজামধ্যে প্রবেশের কোন পথ দেখিলেন না; বিশেষতঃ প্রবেশের অনুমতিরও ব্যবস্থা নাই! রওজার চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানির্দ্দিষ্ট রেল ধরিয়া তাঁহারা হোসেনের তত্ত্ব ও সন্ধান জানিতে লাগিলেন। হোসেন ঈশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করিয়া আছেন! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই ঐ অবস্থাতেই রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপাসনা সমাধা হইবামাত্রই ছদ্মবেশী মারওয়ান বলিলেন, "হজরত! আমরা কোন বিশেষ গোপনীয় তত্ত্ব জানাইতে এই নিশীথ সময়ে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

হোসেন বলিলেন, "হে হিতার্থী ভ্রাতৃদ্বয়! কি গোপনীয় তত্ত্ব দিতে আসিয়াছেন? জগতে ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন আমার আর কোন আশা

নাই। গোপন তত্ত্বে আমার কি ফল হইবে? আমি কোন গোপনীয় তত্ত্ব জানিতে চাহি না!”

ছদ্মবেশী মারওয়ান বলিলেন, “আপনি সেই তত্ত্বের সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাতে কোনরূপ ফল আছে কি না।”

হোসেন আগন্তুকদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নিকটে যাইয়া বলিলেন, “ভ্রাতৃদ্বয়! নিশীথ সময়ে অপরিচিত আগন্তুকের রওজার মধ্যে আসিবার নিয়ম নাই, আপনারা বাহিরে থাকিয়াই যাহা বলার ইচ্ছা হয় বলুন।”

ছদ্মবেশী মারওয়ান বলিলেন, “আপনি আমাদের কথায় যদি প্রত্যয় করেন, তবে মনের কথা অকপটে বলি। আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই আমরা ছদ্মবেশে নিশীথ সময়ে আপনার নিকটে আসিয়াছি। এজিদের চক্রান্তে জাএদা যে, কৌশলে এমাম হাসানকে বিষপান করাইয়াছেন, তাহার কোন অংশই আমাদের অজানা নাই। কি করি,—কর্ণে শুনি, মনের দুঃখ মনেই রাখি, গোপনে চক্ষের জল অতি কষ্টে সম্বরণ করি! হাসানের বিষপান-বিষয় মনে হইলেই হৃদয় ফাটিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার বোধ হয়! এজিদের হৃদয় লৌহনির্ম্মিত, দেহ পাষাণে গঠিত; তাহার দুঃখ কি? আমরা তাহার চাকর, কিন্তু নূরনবী মোহাম্মদের শিষ্য, আপনার ভক্ত। এই যে নিশীথ সময়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া এতদূর আসিয়াছি, ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থ নাই, কোন প্রকার লাভের আশা করিয়াও আমরা আসি নাই;—এজিদ কৌশলে আপনার প্রাণ লইবে, ইহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য। আমাদের অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে বলিয়াই আসিয়াছি।”

হোসেন বলিলেন, “ভ্রাতা—প্রাণের একাংশ, বিশেষ অগ্রগণ্য অংশ। সেই ভ্রাতাকে তাঁহারই স্ত্রীর সহায়তায় এজিদ বিষপান করাইয়া কৌশলে মারিয়াছে। ইহার উপরে আর কি কষ্ট আছে? আমার প্রাণের জন্য আমি ভয় করি না।”

মারওয়ান বলিলেন, “প্রাণের জন্য আপনার যে কিছুমাত্র ভয় নাই, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনার প্রাণ গেলে আপনার পুত্র, কন্যা, পরিবার, হাসানের পরিবার, ইহাদের কি অবস্থা ঘটিবে, ভাবুন দেখি? দুরন্ত

জালেম এজিদ! সে যে কি করিবে, তাহার মনই তাহা জানে! আর বেশী বিলম্ব করিতে পারি না। আমরা যে গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছি, এ কথার অণুমাত্র প্রকাশ হইলে আমাদের দেহ ও মস্তক কখনই একত্র থাকিবে না। আজ ওত্‌বে অলীদ এবং মারওয়ান এজিদের আদেশ মতে এই স্থির করিয়াছে যে, এই রাত্রেই রওজা মোবারক ঘেরাও করিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে। পরিশেষে হাস্‌নেবানু, জয়নাব এবং আপনার পরিবারস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোককে বন্ধন করিয়া বিশেষ অপমানের সহিত এজিদ-সমীপে লইয়া যাইবে।"

হোসেন একটু রোষপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রকাশ্যভাবে যদি আমার মস্তক লইতে আসে, আমি তাহাতে দুঃখিত নই। আর ভাই, ইহাও নিশ্চয় জানিও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ঈশ্বর-কৃপায় আমার পরিবারের প্রতি—মদিনার কোন একটি স্ত্রীলোকের প্রতি কোন নরাধম নারকী জব্‌রাণে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

মারওয়ান বলিলেন, "সেই জন্যই ত আপনার শিরশ্ছেদন অগ্রে করাই এজিদের একান্ত ইচ্ছা। এজিদও জানিয়াছেন যে, হোসেন বাঁচিয়া থাকিতে আর কিছুই হইবে না। আপনি আজ রাত্রে এখানে কখনই থাকিবেন না। হাজার বলবান ও হাজার ক্ষমতাবান হইলেও পাঁচ হাজার যোদ্ধার মধ্যে আপনি একা, এক প্রাণী—কি করিবেন? আপনি এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন করুন। মারওয়ান গুপ্ত সন্ধানে জানিয়াছে যে, আপনি এই রওজা ছাড়িয়া কোনখানেই গমন করেন না; রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল, আর অধিক বিলম্ব নাই। বোধ হয়, এখনই তাহারা আক্রমণ করিবে। দেখুন! আপনার পরিবারগণের কুল, মান, মর্য্যাদা, শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত একা আপনার প্রাণের উপর নির্ভর করিতেছে। আর বিলম্ব করিবেন না, আমরাও শিবিরাভিমুখে যাই, আপনি অন্য কোন স্থানে যাইয়া আজিকার যামিনীর মত প্রাণ রক্ষা করুন।"

হাস্য করিয়া হোসেন বলিলেন, "ভাই রে! ব্যস্ত হইও না! তোমাদের এই ব্যবহারে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তোমরা এজিদের পক্ষীয়

লোক হইয়া গোপনে আমাকে এমন গুপ্ত সন্ধান জানাইলে,—আশীর্ব্বাদ করি, পরলোকে ঈশ্বর তোমাদিগকে জান্নাতবাসী করিবেন। ভাই রে! আমার মরণের জন্য তোমরা ব্যাকুল হইও না, কোন চিন্তা করিও না। আমি মাতামহের নিকট শুনিয়াছি, দামেস্ক কিংবা মদিনায় কখনই কাহারও হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না। আমার মৃত্যুর নির্দ্দিস্ট স্থান, 'দাস্ত-কারবালা' নামক মহাপ্রান্তর। যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর আমাকে কারবালা-প্রান্তরে না লইয়া যাইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই কোন প্রকারে আমার মরণ নাই।"

মারওয়ান বলিলেন, "দেখুন! আপনার সৈন্যবল, অর্থবল কিছুই নাই; এজিদের সৈন্যগণ আজ নিশ্চয়ই আক্রমণ করিবে। আপনি প্রাণে মারা না যাইতে পারেন, কিন্তু আপনাকে বন্দী হইতেই হইবে! তাহাতে আর কথাটি নাই। 'দাস্ত কারবালা' না হইলে আপনার প্রাণবিয়োগ হইবে না, এ কথা সত্য—কিন্তু এজিদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবেন কিসে? আপনার জন্যই মদিনা আক্রান্ত হইবে। মদিনাবাসীরা নানা প্রকারে ক্লেশ পাইবে। যদিও তাহারা এজিদের সৈন্যদিগকে একবার শেষ করিয়াছে, কিন্তু মারওয়ান এবার একেবারে চতুর্গুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দামেস্ক হইতে আসিয়াছে। আপনি যদি শত্রুহস্তে বন্দী হন, তাহা হইলে জীয়ন্তে মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে হইবে। আর বেশী বিলম্ব করিতে পারি না, প্রণাম করি; আমরা চলিলাম। যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন!"

তাহারা চলিয়া গেল। হোসেন ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আজ পর্য্যন্ত এজিদের ক্রোধ উপশম হয় নাই। সবই ঈশ্বরের লীলা। ঐ লোক দুইটি যথার্থই মোমেন। এই নিশীথ সময় প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া পরহিতসাধনে নিঃস্বার্থভাবে এত দূর আসিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! বাস্তবিক ইহারাই যথার্থ পরহিতৈষী। মারওয়ান পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনায় আসিয়াছে। কি করি—আমি যুদ্ধসজ্জা করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলে মদিনাবাসীরা কখনই নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না, নিশ্চয়ই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আমার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইবে। এখনও তাহারা শোক-

বস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই; দিবারাত্র হাসান-বিরহে দুঃখিত মনে হা হুতাশে সময় অতিবাহিত করিতেছে। এ সময় তাহাদের হৃদয় পূর্ব্ববৎ সমুৎসাহিত, জন্মভূমি রক্ষায় সুদৃঢ় পণে শত্রু-নিধনে সমুৎসুক ও সমুত্তেজিত হইবে কি না সন্দেহ হইতেছে। কারণ দুঃখিত মনে, দগ্ধীভূত হৃদয়ে কোন প্রকার আশাই স্থায়ীরূপে বদ্ধমূল হয় না। যত দিন তাহারা জীবিত থাকিবে, তত দিন এমামের শোক ভুলিতে পারিবে না। এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সেই স্নেহকাতর ভ্রাতৃগণকে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইব? কিছুদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াই আমার উচিত। আমি যদি কিছু দিনের জন্য মদিনা পরিত্যাগ করি, তাহাতে ক্ষতি কি? এজিদের সৈন্য আজ রাত্রেই রওজা আক্রমণ করিয়া আমার প্রাণবধ করিবে, ইহা বিশ্বাস্যই নহে। এখানে কাহারও দৌরাত্ম্য করিবার ক্ষমতা নাই। শুধু এজিদের সৈন্য কেন; জগতের সমস্ত সৈন্য একত্রিত হইয়া আক্রমণ করিলেও এই পবিত্র রওজায় আমার ভয়ের কোন কারণ নাই; তথাপি, মনে হয়, কিছু দিনের জন্য স্থান পরিত্যাগ করাই সুপরামর্শ। আপাততঃ কুফা নগরে যাইয়া আবদুল্লাহ্ জেয়াদের নিকট কিছু দিন অবস্থিতি করি। জেয়াদ আমার পরম বন্ধু। আরব দেশে যদি প্রকৃত বন্ধু কেহ থাকে, তবে সেই কুফার অধীশ্বর প্রিয়তম বন্ধুবৎসল জেয়াদ! যদি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই উচিত বিবেচনা হয়, তবে সপরিবারে কিছু দিনের জন্য কুফা নগরে গমন করাই যুক্তিসিদ্ধ। আজ রাত্রের ও-কথা কিছুই নহে।" এইরূপ ভাবিয়া হোসেন পুনরায় ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ওত্‌বে অলীদ এবং মারওয়ান উভয়ে শিবিরে গিয়া বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলেন। অনেক কথার পর মারওয়ান বলিলেন, "মোহাম্মদের রওজায় হোসেনের মৃত্যু নাই। আমরা এমন কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারি নাই যে, তাহাতে নিশ্চয়ই হোসেন রওজা হইতে বহির্গত হইয়া মদিনা পরিত্যাগ করিবেন। এইটি যাহা হইল, ইহাও মন্দ নহে, ইহার উপরে আরও একটি ছিল, কিন্তু সে আমাদের ক্ষমতার অতীত। তদ্বিস্তারিত তথ্য কাসেদ গিয়া মুখে প্রকাশ

করিবে। তাহার উপায় কৌশল, সমুদয়ই কাসেদকে বিশেষরূপে বলিয়া দিলাম।”

ওত্‌বে অলীদ বলিলেন, “আর বেশী বিস্তারের আবশ্যক নাই, শীঘ্র পত্র লিখিয়া কাসেদকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।”

লিখিবার উপকরণ লইয়া মারওয়ান লিখিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ওত্‌বে অলীদ আবার বলিলেন, “একটি কথাও যেন ভুল না হয়, অথচ গোপন থাকে, এই ভাবে পত্র লেখা উচিত।”

মারওয়ান পত্র লিখিতে লাগিলেন। এক জন সৈনিকপুরুষের সহিত এক জন কাসেদ আসিয়া যাথারীতি নমস্কার করিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল। মারওয়ান পত্র রাখিয়া কাসেদকে গোপনে লইয়া গিয়া তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। অনন্তর মারওয়ান পত্রখানি শেষ করিতে বসিলেন। কাসেদ করজোড়ে কহিতে লাগিল, “ঈশ্বরপ্রসাদে এই কার্য্য করিতে করিতেই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, যাহা বলিবেন, অবিকল তাহাই বলিব। কেবল সহরের নামটি আর একবার ভাল করিয়া বলুন, কুফার না কুফা?” মারওয়ান রীতি মত পত্র লেখা শেষ করিয়া কাসেদের হস্তে পত্র দিয়া বলিলেন, “কুফা”।

কাসেদ বিদায় লইল। মারওয়ান এবং অলীদ উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

একবিংশ প্রবাহ

দিনরাত অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিয়া কয়েকদিন পরে মারওয়ান-প্রেরিত মদিনার কাসেদ দামেস্ক নগরে পৌঁছিল। এজিদ যথাসময়ে কাসেদের আগমন সংবাদ পাইলেন;—সভাভঙ্গ করিয়া কাসেদকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া সমুদয় অবস্থা শুনিলেন। মারওয়ানের পত্রপাঠে অনেক চিন্তা করিয়া মহারাজ এজিদ তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ জেয়াদকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্র শেষ করিয়া কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন,—তিন লক্ষ টাকা, তদুপযোগী বাহন এবং ঐ অর্থ রক্ষার্থে কয়েকজন সৈনিকপুরুষ, এই কাসেদ সমভিব্যাহারে

দিয়া এখনই কুফা নগরে পাঠাইতে প্রধান কার্য্যকারককে আমার আদেশ জানাও।” কোষাধ্যক্ষকে এই কথা বলিয়া কাসেদকে বলিলেন, “তুমি এই উপস্থিত কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। কুফা নগরে যাইয়া আবদুল্লাহ্ জোয়াদকে বলিও—“আশার অতিরিক্ত ফল পাইবেন, কুফারাজ্য একচ্ছত্ররূপে আপনারই অধিকৃত হইবে। দামেস্ক-রাজ আর কখনই আপনাকে অধীন রাজা বলিয়া মনে করিবেন না; আপনি মিত্র রাজা বলিয়াই আখ্যা পাইবেন। সেই মিত্রতা জগতে চন্দ্র সূর্য্য থাকা পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে।” দামেস্ক-পতি এই বলিয়া কাসেদকে বিদায় দিলেন। কাসেদ অভিবাদন করিয়া বিদায় লইল।

সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত দামেস্কের দূত বিংশতি দিবসে কুফা নগরে উপস্থিত হইল। দামেস্ক হইতে রাজদূত বিস্তর অর্থের সহিত সৈন্যসহ রাজসমীপে উপস্থিত হইবে, এই কথা আবদুল্লাহ জোয়াদের কর্ণগোচর হইলে তিনি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।—“মহারাজ এজিদ আমার নিকট অর্থ, সৈন্য এবং কাসেদকে পাঠাইবেন, এ কি!” আবদুল্লাহ্ জেয়াদ এই রূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, “দামেস্ক হইতে কয়েকটি লোক কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, কাহারও নিকট কিছুই বলে না, তাহাদের ইচ্ছা যে, একেবারে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করে। দামেস্করাজের প্রেরিত, কি কাহার প্রেরিত,—তাহা তাহারা কিছুই বলিল না। আমরা যাহাকে কাসেদ বলিয়া অনুমান করিতেছি, সে লোকটি বিশেষ চতুর এবং বিশেষ বিচক্ষণ। তাহার সঙ্গে তাহার রক্ষকস্বরূপ কয়েকজন প্রহরী এবং প্রচুর অর্থ আছে।”

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ বলিলেন, “তাহাকে সমুচিত আদর করিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থান দাও। সময়মত আহ্বান করিয়া তাহাদের কথা শুনিব।” যথাযোগ্য প্রণিপাত করিয়া প্রতিহারী বিদায় হইল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ অনেক চিন্তা করিলেন; কি কারণে কে পাঠাইল, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, এইরূপ নানা প্রকার দূর-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। তারপর নিতান্ত উৎসুক হইয়া অনতিবিলম্বেই সেই কাসেদকে আহ্বান করিলেন। কাসেদ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এজিদের আদেশমত সমুদয় বৃত্তান্ত একে একে বর্ণনা করিল।

এজিদের স্বহস্তে লিখিত পত্রখানিও সে জেয়াদের সম্মুখে রাখিয়া দিল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ সহস্রবার পত্র-চুম্বন করিয়া ভক্তির সহিত পত্র পাঠ করিলেন। কাসেদকে বলিলেন, "তোমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বিশ্রাম কর, অদ্যই বিদায় করিব।"

দ্বাবিংশ প্রবাহ

প্রণয়, স্ত্রী, রাজ্য, ধন এই কয়েকটি বিষয়ের লোভ বড় ভয়ানক। এই লোভে লোকের ধর্ম্ম, পুণ্য, সাধুতা, পবিত্রতা,—সমস্তই একেবারে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতি কষ্টে উপার্জ্জিত বন্ধুত্ব-রত্নটিও ঐ লোভে অনেকেই অনায়াসে বিসর্জ্জন দেয়। মানুষ ঐ লোভে অনায়াসেই যথেচ্ছ ব্যবহারে অগ্রসর হইতে পারে। এজিদ দামেস্কের রাজা, কুফা তাঁহার অধীন রাজ্য। হোসেনের সহিত আবদুল্লাহ্ জেয়াদের কেবলমাত্র বন্ধুত্ব-ভাব সম্বন্ধ। উপরোক্ত চারিপ্রকার লোভের নিকট বন্ধুত্বভাব সর্ব্বত্র অকৃত্রিম থাকা অসম্ভব। অধিকন্তু আবদুল্লাহ্ জেয়াদের নিকটে তাহার আশা করাও যাইতে পারে না। কারণ, আদুল্লাহ্ জোয়াদ মুর্খ ও অর্থলোভী। মুর্খের প্রণয়েও বিশ্বাস নাই, কার্য্যেও বিশ্বাস নাই,—লোভীও তদ্রূপ।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ সেই রাত্রেই দামেস্কের দূতকে বিদায় দিলেন। তিনি শয়নগৃহে শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হোসেনের প্রণয়ে লাভ কি? শুধু মুখের প্রণয়ে কি হইতে পারে?"—এইরূপ অনেক আন্দোলন করিয়া তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন।

প্রধান অমাত্য, সভাসদ্ ও রাজসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ কেহই এই নিগূঢ় তত্ত্বের কারণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। কি উদ্দেশ্যে উহারা দামেস্ক হইতে আসিয়াছিল, এক দিবস অতীত না হইতেই কেনই বা পুনরায় ফিরিয়া গেল, এই বিষয় লইয়া সকলে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সমুদয় সভাসদগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "গত রজনীতে

আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণবর্ণ আষা (যষ্টি), শিরে উষ্ণীষ, অঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুভ্র পিরহান! আমার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আবদুল্লাহ্ জেয়াদ, তোমাকে একটি কার্য্য করিতে হইবে।' আমি স্বপ্নযোগে সেই পবিত্র পদচুম্বন করিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলাম। নূরনবী দুঃখিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হাসান ভ্রাতৃহীন হইয়া আমার সমাধিক্ষেত্রে পড়িয়া নিঃসহায়রূপে দিবারাত্র ক্রন্দন করিতেছে। তুমি তাহার পক্ষ অবলম্বন কর। তুমি সাধ্যানুসারে তাহার সহায়তা কর। সৈন্যসামন্ত, ধন-জন দ্বারা হোসেনের উপকার কর।' এই কথা বলিয়াই পবিত্র মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন। আমারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বর্গীয় সৌরভে সমুদয় ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে আমার মনে যে অনুপম আনন্দ ও ভক্তিভাব উদয় হইল, তাহা এক্ষণে মুখে প্রকাশ করিতে আমার সাধ্য হইতেছে না। আর নিদ্রাও হইল না। তখনই কায়মনে হজরত এমাম হোসেনের প্রতি আত্মসমর্পণ করিলাম। এই রাজ্য, এই সৈন্য-সামন্ত, এই ভাণ্ডারস্থ ধন-রত্ন ও মণি-মুক্তা সকলই হোসেনের, এই সিংহাসন আজ হইতে হোসেনের নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহাকেই ইহার যথার্থ অধিকারী করিলাম। আপনারা আজ হইতে মহামান্য এমাম হোসেনের অধীন হইলেন। আজ হইতে আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর মাত্র থাকিলাম। অমাত্যগণ! এখনই আপনারা নগরের ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া দিন যে, এ রাজ্য আজ হইতে এমাম হোসেনের অধিকৃত হইল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিলেন। অধীন রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজসংস্রবী,—যিনি যেখানে আছেন কিংবা রাজ্য শাসন করিতেছেন, অদ্যই তাঁহাদের নিকট এই শুভ-সংবাদ অগৌণে জ্ঞাপন করা হউক। আর অদ্যই আমার স্বপ্নবিবরণসহ রাজ্য-পরিত্যাগের সংবাদ এমাম হোসেনের গোচর করণের জন্য মদিনায় কাসেদ প্রেরণ করা হউক। রাজা বিহনে রাজ্য শাসন হওয়া নিতান্তই কঠিন, রাজসিংহাসন শূন্য থাকাও অযৌক্তিক। যত শীঘ্র হয়, এমাম হোসেন কুফা নগরে আসিয়া রাজপাট অধিকার এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইহাও জানাইও,—যত দিন

এমাম হোসেন এই রাজসিংহাসনে উপবেশন না করিতেছেন, তত দিন প্রধান উজীর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। আমার সহিত রাজ্যের কোন সংস্রব রহিল না।"

প্রধান উজীর নতশিরে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। সকলেই হোসেনের নামে রাজভক্তির পরিচয় দিয়া শত শত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ্ জেয়াদকেও একবার সকলে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "এমন সাহসী, ধর্ম্মপরায়ণ, সরলহৃদয় ধার্ম্মিক জগতে কেহ হয় নাই, হইবেও না। এমন পুণ্যকার্য্য এ পর্য্যন্ত কেহ কোন দেশেই করে নাই। এ কথা সত্য যে, যিনি ইহকাল পরকালের রাজা, প্রাণ দিয়া তাঁহার উপকার করা সকল মুসলমানের কর্ত্তব্য। এজিদের চক্রান্তে এমাম ভ্রাতৃহারা, রাজ্যহারা—একে একে তিনি সর্ব্বহারা হইবার উপক্রম হইয়াছেন, এ সময় যিনি যত প্রকারে তাঁহার উপকার করিবেন, ঈশ্বর তাঁহাকে কোটি কোটি গুণে পুণ্যময় করিয়া পরকালের প্রধান স্বর্গে তাঁহার স্থান নির্ণয় করিয়া রাখিবেন। আপনি সৈন্যসামন্ত সহ রাজ্য-ধন এমামকে দান করিলেন, আমরা চিরকাল হইতে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী দাসানুদাস আছি। আজ হইতে জীবন, ধন, সমস্তই হোসেনের নামে উৎসর্গ করিলাম।"

প্রধান উজীর রাজাজ্ঞানুসারে সমুদয় কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। এবং আবদুল্লাহ্ জেয়াদের স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া, রাজ্যদান সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া হোসেন-সমীপে কাসেদ প্রেরণ করিলেন।

ক্রমে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল যে, কুফাধিপতি আবদুল্লাহ্ জেয়াদ তাঁহার সমুদয় রাজ্য হোসনকে অর্পণ করিয়াছেন। এজিদের স্বপক্ষীয়েরা ব্যতীত সকলেই একবাক্যে আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বর সমীপে হোসেনের দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বমঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। ক্রমে মদিনা পর্য্যন্ত এই সংবাদ রটিয়া গেল।

হোসেন পূর্ব্ব হইতে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া কুফা নগরে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কর্ত্তৃক আদৃত না হইয়া তথায়

গমন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। লোকমুখে জেয়াদের বদান্যতা, বিপদ-সময়ে সাহায্য এবং অকাতরে রাজ্য পর্য্যন্ত দানের বিষয় শুনিয়া তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত উপাসনা করিলেন। কিন্তু জেয়াদ-প্রেরিত নিশ্চিত সংবাদ না পাইয়া অন্য কাহাকেও তিনি কিছু বলিলেন না।

মারওয়ান আজ মদিনা আক্রমণ করিবে, রওজা আক্রমণ করিবে, হোসেনের প্রাণ হনন করিবে,—সর্ব্বসাধারণের মুখে এই সকল কথার আন্দোলন হইতেছিল। মদিনাবাসীরা সকলেই হোসেনের পক্ষ হইয়া এজিদের সৈন্যের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবে, প্রাণ থাকিতে হোসেনের পরিজনদিগকে বন্দী করিয়া দামেস্ক লইয়া যাইতে দিবে না, এ কথাও রাষ্ট্র হইয়াছে। 'আজ যুদ্ধ হয়', কি 'কাল যুদ্ধ হয়', কেবল এই কথারই তর্ক-বিতর্ক। এজিদের সৈন্যগণ মদিনা আক্রমণ না করিলেও নিজেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে কি না, এই বিষয় লইয়াই—এই চিন্তাতেই এমাম-বংশের চিরহিতৈষী মদিনাবাসীরা সকলেই মহা ব্যতিব্যস্ত। দিবারাত্র কাহারও যেন আর আহার-নিদ্রা নাই।

কয়েক দিন যায়। শেষে সাব্যস্ত হইল যে, শত্রুগণ নগরের প্রান্তভাগে প্রান্তরের শেষ সীমায় শিবির নির্ম্মাণ করিয়া যে প্রকার শান্তভাবে রহিয়াছে, তাহাতে আশু বিরোধের সম্ভাবনা কি? কোন বিষয়ে অনৈক্য, কোন কার্য্যে বাধা দান কিংবা কোন কথার প্রসঙ্গে অযথা উত্তর না করিলে, কি প্রকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? এই বিবেচনা করিয়া সকলেই যুদ্ধের অপেক্ষায় বিবাদের সূচনায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় একদিন কুফা নগরের কাসেদ মদিনায় দেখা দিল। মদিনাবাসীরা জেয়াদের বদান্যতার বিষয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। নিশ্চিত সংবাদ না পাইয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছিলেন, আজ সে সন্দেহ দূর হইল। এক মুখে বলিতে শত শত মুখে জিজ্ঞাসিত হইল, "কুফার সংবাদ কি?"

কাসেদ উত্তর করিল, "কুফাধিপতি মাননীয় আবতুল্লাহ্ জেয়াদ তাঁহার সিংহাসন, রাজ্য, ধন, সৈন্যসামন্ত সমস্তই হজরত এমাম হোসেনের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম হোসেন কুফা-সিংহাসনে উপবেশন না করা পর্য্যন্ত প্রধান উজীরের হস্তে

রাজকার্য্য পরিচালনার ভার রহিয়াছে। এমাম হোসেন কোথায় আছেন আপনারা বলুন, আমি তাঁহার নিকট যাইয়া এ সংবাদ দিব।" এক এক জন বলিতে বলিতে শত শত লোক কাসেদের অগ্র-পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কেহ আবদুল্লাহ্ জেয়াদের প্রশংসা, কেহ কেহ হোসেনের কুফাগমনজনিত দুঃখ, কেহ এজিদের দৌরাত্ম্যে হোসেন দেশত্যাগী,—এই সব কথার শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া পরস্পর বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে হজরতের রওজায় উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান লোকেরা কাসেদের বৃত্তান্ত এমামের নিকট বিবৃত করিলেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদের পত্র পাঠ করিয়া হোসেন সেই পত্রহস্তে কাসেদ সমভিব্যাহারে নিজ ভবনের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া মদিনাবাসীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! আপনারা কেন আর কষ্ট পাইতেছেন? যদি কুফার অন্নজল ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, তবে আপনারা আমার কৃত দোষ মার্জ্জনা করিবেন। সময়ে আমি আপনাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এক্ষণে এত ব্যস্ত হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না।"

মদিনাবাসীরা সকলেই একবাক্যে হোসেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

জেয়াদের পত্র লইয়া হোসেন মাননীয়া বিবি সালেমার হোজ্‌রা (নির্জ্জন স্থান) সমীপে গমন করিলেন। সংবাদ পাইয়া বিবি সালেমা হোজ্‌রা হইতে বহির্গত হইলেন। এমাম হোসেন মাতামহীর* পদধূলি গ্রহণ করিয়া জেয়াদের পত্রবিবরণ প্রকাশ ও কুফা নগরে গমনপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

রওজা হইতে হোসেনের আগমন-বৃত্তান্ত শুনিয়া পরিজন, আত্মীয়, বন্ধু অনেকেই বিবি সালেমার হোজ্‌রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হোসেন সকলের নিকটেই কুফা-গমনের সঙ্কল্প প্রকাশ ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় কেহই কোন উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ রহিলেন। বিবি সালেমা গম্ভীর-

* হজরত হোসেনের আপন-মাতামহী বিবি খদিজা। বিবি সালেমা হজরত মোহাম্মদের অন্য স্ত্রী।

স্বরে বলিতে লাগিলেন : আবদুল্লাহ্ জেয়াদ যাহাই লিখুক, আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কখনই কুফায় গমন করিও না,—হজরতের রওজা ছাড়িয়া কোন স্থানে যাইও না। হজরত আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, 'হোসেন আমার রওজা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে অনেক প্রকার বিপদের আশঙ্কা'। আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কখনও রওজা হইতে বাহির হইও না। এখানে কাহারও ভয় নাই, কোন প্রকারে শত্রুতা সাধন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তভাবে রওজায় বসিয়া থাক।"

হোসেন বলিলেন, "কতকাল এইভাবে বসিয়া থাকিব? কাফেরগণ ক্রমশঃই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মদিনার নিকটে একত্রিত হইতেছে। আমি কি করিয়া কতদিন এই প্রকারে বসিয়া কাটাইব? একা আমার প্রাণের জন্য কত লোকের জীবন যাইবে? তাহা অপেক্ষা আমি কিছুদিন স্থানান্তরে বাস করি, তাহাতে দোষ কি? বিশেষতঃ কুফানগরের সমুদয় লোক মুসলমান, ধর্ম্মপরায়ণ, সেখানে যাইতে আর বাধা কি?"

সালেমা বিবি বিরক্তভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার কথা তোমার গ্রাহ্য হইবে কেন? এখন যাহা ইচ্ছা হয় কর।" এই বলিয়া তিনি হোজ্‌রামধ্যে চলিয়া গেলেন। তৎপরে হোসেনের মাতার সহোদরা ভগ্নী ওম্মে কুলসুম্ হোসেনের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হোসেন! সকলের গুরুজন যিনি, প্রথমেই তিনি নিষেধ করিতেছেন, তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়া নিতান্তই অনুচিত। বিশেষ আমিও বলিতেছি, তুমি কুফার নাম পর্য্যন্তও করিও না। কুফার নাম শুনিলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে! তোমার কি স্মরণ হয় না যে, তোমার পিতা কুফায় যাইয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন? কুফানগরবাসীরা তাঁহাকে কতই যন্ত্রণা দিয়াছিল, সে কথা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? কুফায় যাইবার বাসনা অন্তর হইতে একেবারে দূর কর। নিশ্চিন্তভাবে রওজায় বসিয়া থাক, আমি সাহসের সহিত বলিতেছি,—জগতে এমন কেহই নাই যে, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে।"

হোসেন বলিলেন, "আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, তিলার্দ্ধ কালও

মদিনায় থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আপনারা আর আমায় বাধা দিবেন না। মিনতি করিয়া বলিতেছি, অনুমতি করুন, যাহাতে শীঘ্রই কুফায় যাত্রা করিতে পারি।"

ওম্মে কুলসুম্ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "ঈশ্বর অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

হোসেনের বন্ধুবান্ধব একমত হইয়া সকলেই তাঁহাকে কুফাগমনে নিষেধ করিলেন। প্রতিবেশিগণের মধ্যে একজন বলিলেন : মদিনার মায়া একেবারে অন্তর হইতে অন্তর করিবেন না। এজিদের ভয়ে মদিনা পরিত্যাগ নিতান্ত পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়। তাহারা প্রকাশ্য যুদ্ধে কি করিবে? মদিনাবাসীগণের একজনেরও দেহে প্রাণ থাকিতে শত্রুগণ কি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে? কাহার সাধ্য? আমাদের স্বাধীনতা, স্বদেশের গৌরব-রক্ষা—ইহা ত আছেই, তাহা ছাড়া আপনার প্রাণের জন্য এজিদের সৈন্যের সম্মুখীন হইতে আমরা কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। আমরা শিক্ষিত নহি তাহা স্বীকার করি; কিন্তু আপনার প্রাণরক্ষার জন্য আমাদের প্রাণ শত্রুহস্তে অর্পণ করিতে শিক্ষার আবশ্যক কি? আমরাও যদি শত্রুহস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হই, তথাপি মদিনার একটি স্ত্রীলোকও জীবিত থাকিতে এজিদ আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া কখনও মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারিবে না। আপনি কাহার ভয়ে, কোন্ শত্রুর শত্রুতায় মদিনা পরিত্যাগ করিবেন? আমাদের জীবন থাকিতে আমরা আপনাকে যাইতে দিব না। অবশ্য আপনার আজ্ঞার প্রতিবন্ধকতা করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। যদি আপনি মদিনা পরিত্যাগ করিতে নিতান্তই কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, করুন; কিন্তু মদিনাবাসীরা আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। যেখানে আপনি যাইবেন, তাহারাও আপনার সঙ্গে সেইখানেই যাইবে।"

হোসেন বলিতে লাগিলেন "ভাই সকল! এজিদের জীবনের প্রথম কার্য্যই আমাদের বংশ বিনাশ করা। যে উপায়ে হউক এজিদ আমার প্রাণবিনাশ করিবে। যখন দুই ভ্রাতা ছিলাম, তখন এজিদের সৈন্যেরা

সাহস করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় নাই। তাহারা কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে এবং আপনারাও দেখিয়াছেন। এক্ষণে আমার সাহস, বল, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির অনেক লাঘব হইয়াছে। কারণ, ভ্রাতৃশোকে আমি যে প্রকার দুঃখিত ও কাতর আছি, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। যে হৃদয় কখনও ভয়ের নাম জানিত না, শত্রুনাশে যে হৃদয় কদাপি আতঙ্কিত হইত না, সেই ভয়শূন্য হৃদয় আজ ভ্রাতৃবিয়োগ-দুঃখে সামান্য যুদ্ধের নামে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমার নিজের মনই যদি নিরুৎসাহ থাকিল, শত্রুভয়ে কম্পবান থাকিল, তখন কাহার উৎসাহে—কাহার উত্তেজনায় আপনারা সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুর অস্ত্রসম্মুখে—অসংখ্য সেনার অসংখ্য অস্ত্রসম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন ? বলুন ত, কাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বিধর্ম্মীর অস্ত্রাঘাতের জন্য বক্ষ বিস্তার করিয়া দিবেন ? শিক্ষিত সৈন্যের তরবারির গতি কাহার প্রদত্ত উৎসাহবাক্যে প্রতিরোধ করিবেন ? আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, এক্ষণে মদিনা পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং মদিনাবাসীর পক্ষেও মঙ্গল। আমার জন্য আমি আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতে বাসনা করি না। এজিদের হস্তে কিংবা তাহার সৈন্যের হস্তে বিধি যদি আমার জীবননাশের বিধি করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। যেখানেই কেন যাই না, আমার প্রাণহন্তা সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হইবে। কারণ জগদীশ্বরের কার্য্য অনিবার্য্য। আমার স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য মদিনাবাসীরা ত এজিদের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবে। তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গল।"

প্রতিবেশিগণের মধ্যে একজন প্রাচীন ছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্য অনিবার্য্য—এ কথা কে না স্বীকার করিবে ? কিন্তু আবদুল্লাহ্ জেয়াদ হঠাৎ এইভাবে এত বড় রাজ্য আপনাকে অযাচিতে ছাড়িয়া দিল, ইহার কারণ কি ? একথাও রাষ্ট্র হইয়াছে যে, এজিদপক্ষীয় কাসেদ তিনলক্ষ টাকা লইয়া কুফা নগরে জেয়াদের নিকট গিয়াছিল। জেয়াদও দামেস্কের কাসেদকে এবং তৎসমভিব্যাহারী সৈন্য-চতুষ্টয়কে বিশেষ পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিয়াছেন। তাহার পর দিবসেই তিনি

স্বপ্নবিবরণ সভায় প্রকাশ করিয়া রাজসিংহাসন ও রাজ্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। ইহারই বা কারণ কি? যদি এজিদের মন্ত্রণায় সে অসম্মত হইবে, কি এজিদের আদেশ প্রতিপালনে অনিচ্ছুক হইবে, তবে নিঃস্বার্থ বন্ধুর চিরশত্রু-প্রেরিত কাসেদকে কেন পুরস্কৃত করিবে? কেন তাহার প্রদত্ত অর্থ নিজ ভাণ্ডারে রক্ষা করিবে? যে রাজ্য আপনার পিতা বহু পরিশ্রম করিয়াও নিষ্কণ্টকে হস্তগত করিতে পারেন নাই; কয়েকবার তাঁহাকে কুফার নগরবাসীরা যে প্রকার কষ্টে নিপাতিত করিয়াছিল—তাহা বোধ হয় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। এইক্ষণে কুফাধিপতি জেয়াদ হঠাৎ নূরনবী মোহাম্মদের স্বপ্নাদেশে সেই রাজ্য অকাতরে আপনাকে দান করিল, ইহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।”

হোসেন বলিলেন, “এমন কথা মুখে আনিবেন না। আবদুল্লাহ্ জেয়াদের ন্যায় আমার প্রকৃত বন্ধু মদিনা ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই নাই। তাঁহার গুণের কথা কত বলিব? তিনি আমার জন্য এজিদের মুণ্ডপাত করিতেও বোধ হয় কখনও কুণ্ঠিত হইবেন না। জেয়াদের বাক্যে ও কার্য্যে আমার কিছুমাত্র সংশয় হয় নাই।”

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “জেয়াদের বাক্যে ও কার্য্যে আপনার কোন সংশয় হয় নাই, অবশ্য না হইতে পারে। কিন্তু আমি বলি, মানুষের মনের গতি কোন্ সময় কি হয়, তাহা যাহার মন সেও জানিতে পারে না। একটু চিন্তা করিয়া কার্য্য করায় ক্ষতি কি? আমার বিবেচনায় অগ্রে জনৈক বিশ্বাসী ও সাহসী লোককে কুফা নগরে প্রেরণ করা হউক, কুফাবাসীরা যদি কোনরূপ চক্রান্ত করিয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই প্রকাশ হইবে। গুপ্ত মন্ত্রণা কয়দিন গোপন থাকিবে? একটু সন্ধান করিলে সকলই জানা যাইবে। আর জেয়াদের রাজ্যদান-সঙ্কল্প যদি যথার্থ ই হয়, তবে আপনার গমনে আমি কোন বাধা দিব না।”

হোসেন বলিলেন, “একথা মন্দ নয়, কিন্তু অনর্থক সময় নষ্ট এবং বৃথা বিলম্ব। যাহা হউক, আপনার কথা বারবার লঙ্ঘন করিব না। অগ্রে কুফায় পাঠাইতে কাহাকে মনস্থ করিয়াছেন? এমন সাহসী বিশ্বাস-পাত্র কে আছে?”

দ্বিতীয় মোস্‌লেম নামক জনৈক বীর পুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া কর-জোড়ে কহিতে লাগিলেন, "হজরত এমামের যদি অনুমতি হয়, তবে এ দাসই কুফা নগরে যাইতে প্রস্তুত আছে। আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি কুফায় যাইয়া যথার্থ তত্ত্ব জানিয়া আসি; যদি আবদুল্লাহ্ জেয়াদ সরলভাবে রাজ্যদান করিয়া থাকেন, তবে মোস্‌লেম আনন্দের সহিত শুভসংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আর যদি ইহার মধ্যে ষড়যন্ত্র থাকে, তবে বুঝিবেন, মোস্‌লেমের এই শেষ বিদায়। আপনার কার্য্যে মোস্‌লেমের প্রাণের মায়া, সংসারের আশা, সুখ-দুঃখের চিন্তা ও স্ত্রী-পরিবারের স্নেহবর্দ্ধনের বাসনা কিছুমাত্র মনে থাকিবে না। আজ মোস্‌লেম আপনার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিল। এই মূহূর্ত্তেই সে কুফায় যাত্রা করিবে। এখানে অনেকেই আছেন, যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন! মোস্‌লেম সে কথার অন্যথা কিছুতেই করিবে না।"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "মোস্‌লেম ত যাইতেই প্রস্তুত। মোস্‌লেমের প্রতি আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাসই হয়, কিন্তু একা মোস্‌লেমকে প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষিত হউক, কি অশিক্ষিত হউক, সৈন্যনামধারী কতিপয় লোককে মোস্‌লেমের সঙ্গে দিতে হইবে।" বৃদ্ধের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত আগ্রহের সহিত অনেকেই যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। অতি অল্প সময় মধ্যে এক হাজার লোক মোস্‌লেমের সঙ্গী হইতে সমুৎসুক হইল। কুফার রহস্যভেদ—ষড়যন্ত্রের মূলচ্ছেদ করিতে তাঁহারা যেন প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইল। অতঃপর সমুদয় কথা সাব্যস্ত হইয়া গেলে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া মোস্‌লেম এক হাজার সৈন্য লইয়া কুফা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরবরের দুই পুত্রও পিতার সঙ্গে চলিল।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

স্বার্থপ্রসবিনী গর্ভবতী আশা যত দিন সন্তান প্রসব না করে, তত দিন আশাজীবী লোকের সংশিত মানসাকাশে ইষ্টচন্দ্রের উদয় হয় না। রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিতে লাগিল। এই রকমে দিবা-রজনীর যাতায়াত! জেয়াদের মানসাকাশে ততদিন শান্তি-চন্দ্রের উদয় হয় নাই! সর্ব্বদাই তিনি অন্যমনস্ক! সর্ব্বদাই যেন দুশ্চিন্তাতে নিমগ্ন! ইহা এক প্রকার মোহ! জেয়াদ দিন দিন, দিন গণনা করিতেছেন,ক্রমে গণনার দিন পরিপূর্ণ হইল, মদিনা হইতে কাসেদ ফিরিয়া আসিল। কুফা আগমনে হোসে-নের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতদিন না আসিবার কারণ কি? দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সূর্য্যের পর চন্দ্র আসিতে লাগিল। বিনা চন্দ্রে নক্ষত্রের উদয় সম্ভব! সে দিনও ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইল, নিশ্চয় যে দিন হোসেন আসিবেন সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাও গত হইয়া গেল। তাহার পর পরিজন লইয়া একত্র আসিতে যে বিলম্ব সম্ভব, তাহাও গণনা করিয়া দেখা হইল! কিন্তু হোসেন আসিলেন না। জেয়াদ এই বার বড়ই ভাবিত হইলেন, দিবারাত্রই চিন্তা করিতে লাগিলেন! কি কৌশলে হোসেনকে হস্তগত করিয়া বন্দীভাবে এজিদের হাতে অর্পণ করিবেন, সেই চিন্তাই মহাপ্রবল হইল। পুনরায় মদিনায় সংবাদ পাঠাইতে মনস্থ করিয়া ভাবিলেন, "হোসেন যে বংশের সন্তান, তাহাতে তাঁহার অন্তর্য্যামী হইতেই বা আশ্চর্য্য কি? আমার অব্যক্ত মনোগত ভাব বোধ হয় তিনি জানিতে পারিয়াছেন। আবার সংবাদ দিয়া কি নূতন বিপদে নিপতিত হইব?" পরামর্শ স্থির হইল না। তিনি নানা প্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময় নূতন সংবাদ আসিল, মদিনা হইতে হোসেনের প্রেরিত সহস্র সৈন্যসহ মোস্‌লেম নগরে আসিয়া উপস্থিত; রাজ-দরবারে আসিতে ইচ্ছুক। পরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়া জেয়াদ আরও চিন্তিত হইলেন। "হোসেন স্বয়ং না আসিয়া দূত পাঠাইবার কারণ কি?

হইতে পারে এটি আমার প্রথম পরীক্ষা। আমার মনোগত ভাব জানিবার জন্যই হয় ত তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছেন।"—মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, সাদরে মোস্‌লেমকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাগৃহে আনিতে তিনি প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন।

মোস্‌লেম সভায় উপস্থিত হইলে জেয়াদ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "দূতবর! বোধ হয়, প্রভু হোসেনের আজ্ঞাক্রমেই আপনার আগমন হইয়াছে! প্রভুর না আসিবার কারণ কি? এ সিংহাসন তাঁহার জন্য শূন্য আছে; রাজ-কার্য্য বহুদিন হইতে বন্ধ রহিয়াছে। প্রজাগণ, সভাসদগণ প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিয়াছে! আমি যে চিরকিঙ্কর, দাসানুদাসেরও অনুপযুক্ত, আমিও সেই পবিত্র পদসেবা করিবার আশায় এতদিন সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছি! কি দোষে প্রভু আমাদিগকে বঞ্চিত করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

মোস্‌লম বলিলেন, "এমাম হোসেন শীঘ্রই মদিনা পরিত্যাগ করিবেন। মদিনাবাসীরা অনেক প্রতিবন্ধকতা করায় তিনি শীঘ্র শীঘ্র আসিতে পারেন নাই। আপনাকে সান্ত্বনা করিয়া আশ্বস্ত করিবার জন্যই অগ্রে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই আসিবেন।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ পূর্ব্ববৎ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "আপনি প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছেন, আমরা আপনাকে প্রভুর ন্যায় গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া মোস্‌লেমকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আবদুল্লাহ্ জেয়াদ ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ, সভাসদগণ, রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই রীত্যনুসারে উপঢৌকনের সহিত নতশিরে, ভক্তিসহকারে রাজদূতকে 'রাজা' বলিয়া মান্য করিলেন। ক্রমে অধীন রাজগণও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নূন্যতা স্বীকারে নতশিরে প্রণিপাত করিলেন।

মোস্‌লেম কিছু দিন নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য চালাইলেন, অধীন সর্ব্বসাধারণ তাঁহার নিরপেক্ষ বিচারে আশার অতিরিক্ত সুখী হইলেন, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাকারী। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ সদাসর্ব্বদা আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় উপস্থিত থাকিয়া মোস্‌লেমের আদেশ প্রতিপালনে ভক্তির প্রাধান্য

দেখাইলেন। মোস্‌লেমের মনে সন্দেহের নামমাত্রও রহিল না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন প্রকারের কপট ভাব, বা লক্ষণ, ষড়যন্ত্রের কু-অভিসন্ধি, এজিদের সহিত যোগাযোগ, কুমন্ত্রণা, এজিদের পক্ষ হইয়া বাহ্যিক প্রণয়াভাব এবং অন্তরে তদ্বিপরীত, ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। জেয়াদের প্রাণের কথা দুই কর্ণ হইলে ত সন্ধানের অঙ্কুর পাইবেন? যাহা আছে, তাহা জেয়াদের অন্তরেই রহিয়াছে। কুফা নগরে জেয়াদের অন্তর ভিন্ন হোসেন-সম্বন্ধীয় নিগূঢ় কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। এমন কি, জেয়াদ অন্তর হইতে সে কথা আপন মুখে আনিতেও এত সতর্কভাব অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহা অপরের কর্ণে যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। মোস্‌লেম পরাস্ত হইলেন। তাঁহার সন্ধান ব্যর্থ হইল, চতুরতা ভাসিয়া গেল। বাধ্য হইয়া তিনি কুফার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ মদিনায় লিখিয়া পাঠাইলেন,—

"হজরত! নির্ব্বিঘ্নে আমি কুফায় আসিয়াছি। রাজা জেয়াদ সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কপটতা জানিতে পারি নাই। নগরবাসীরা এমামের নামে চিরবিশ্বস্ত এবং এমামের চিরভক্ত, লক্ষণে তাহাও বুঝিলাম! এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।

বশম্বদ—

মোস্‌লেম"

হোসেন পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পুত্র, কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃবধূদ্বয় প্রভৃতির সহিত ঈশ্বরের নাম করিয়া কুফায় যাত্রা করিলেন। ষষ্টি সহস্র লোক মদিনা পরিত্যাগ করিয়া হোসেনের অনুগামী হইল। এমাম হোসেন সকলের সহিত একত্র কুফাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু এজিদের কথা মনে হইলেই তাঁহার মুখ সর্ব্বদা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিত। হজরতের রওজা-আশ্রয়ে থাকার সময় কোন দিন কোন মুহূর্ত্তে অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। এক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে এই আশঙ্কা যে, এজিদের সৈন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আক্রমণ করিলে আর নিস্তার নাই। ক্রমে দিন অতীত হইল, এগার দিনের পর হোসেনের অন্তর হইতে এজিদের ভয় ক্রমে ক্রমে দূর হইতে

লাগিল। মনে সাহস এই যে, কুফা অতি নিকট, সেখানে এজিদের ক্ষমতা কি ? তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ্ জেয়াদের গুপ্তচরগণ চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, হোসেন মদিনা পরিত্যাগ করিয়া এ পর্য্যন্ত যেদিন যে প্রকারে যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, যেখানে যাইতেছেন, সকল সংবাদ প্রতিদিন দামেস্ক এবং কুফায় যাইতেছে। কুফা নগরে মোস্লেমকে প্রকাশ্য রাজসিংহাসনে জেয়াদ বিশেষ ভক্তিসহকারেই বসাইয়াছেন। মোস্লেম প্রকাশ্যে রাজা, কিন্তু জেয়াদের মতে তিনি এক প্রকার বন্দী। সহস্র সৈন্যের সহিত মোস্লেম কুফায় বন্দী। জেয়াদ এমন কৌশলে তাঁহাকে রাখিয়াছেন এবং মোস্লেমের আদেশানুসারে কার্য্য করিতেছেন যে, মোস্লেম জেয়াদ-চক্রে বাস্তবিক সৈন্যসহ বন্দী, তাহা তিনি কিছুতেই জানিতে পারিতেছেন না, কেবল হোসেনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই! একটি সামান্য বৃক্ষপত্রেও তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে! একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকেও তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য্য বিভাসিত হইতেছে! অনন্ত বালুকারাশির একটি ক্ষুদ্র বালুকণাতেও তাঁহার অনন্ত করুণা আঁকা রহিয়াছে! তুমি আমি সে করুণা হয়ত জানিতে পারিতেছি না; কিন্তু তাঁহার লীলাখেলার মাধুর্য্য, কীর্ত্তিকলাপের বৈচিত্র্য, বিশ্বরঙ্গভূমির বিশ্বক্রীড়া একবার পর্য্যালোচনা করিলে ক্ষুদ্র 'মানব-বুদ্ধি বিচেতন হয়। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুমাত্রও বুঝিবার ক্ষমতা মানব-বুদ্ধিতে সুদুর্লভ! সেই অব্যর্থ কৌশলীর কৌশলচক্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য ? ভবিষ্যৎ-গর্ভে কি নিহিত আছে, কে বলিতে পারে ? কোন্ বুদ্ধিমান বলিতে পারেন যে, মুহূর্ত্ত অন্তে তিনি কি ঘটাইবেন ?' কোন্ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁহার কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া তদ্বিপরীত কার্য্যে সক্ষম হইতে পারেন ? জগতে সকলেই বুদ্ধির আয়ত্তাধীন; কিন্তু ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে বুদ্ধি অচল, অক্ষম, অস্ফুট এবং অতি তুচ্ছ। ষষ্টি সহস্র লোক হোসেনের সঙ্গে কুফায় যাইতেছে,—সূর্য্যদেব পথ দেখাইতেছেন,—তরু, পর্ব্বত, নির্ঝরিণী পথের চিহ্ন দেখাইয়া যাইতেছে। কুফার পথ পরিচিত,

কত লোক তন্মধ্যে রহিয়াছে, কত লোক সেই পথে যাইতেছে ; চক্ষু বন্ধ করিয়া তাঁহারাও কুফা নগরে যাইতে অসমর্থ নহে। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ-কৌশলীর কৌশলে আজ সকলেই অন্ধ, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ! তাঁহার যে আজ্ঞা, সেই কার্য্য ; এক দিন তিনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার আর বৈলক্ষণ্য নাই, বিপর্য্যয় নাই, ভ্রা নাই! একবার মনোনিবেশপূর্ব্বক অনন্ত আকাশে, অনন্ত জগতে, অনন্ত প্রকৃতিতে বাহ্যিক নয়ন একেবারে নিক্ষেপ করিয়া যথার্থ নয়নে দৃষ্টিপাত কর, সেই মহাশক্তির কিঞ্চিৎ শক্তি বুঝিতে পারিবে। যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, তাহা দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইতে হয়! তাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, বাক্য অব্যর্থ। হোসেন মহানন্দে কুফায় যাইতেছেন,—ভাবিতেছেনঃ কুফায় যাইতেছি। কিন্তু ঈশ্বর যে, তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া বিজন বন 'কারবালার' পথে লইয়া যাইতেছেন, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। কেবল তিনি কেন, ষষ্টি সহস্র লোক চক্ষু থাকিতেও যেন অন্ধ!

আবদুল্লাহ্ জেয়াদের সন্ধানী অনুচর গোপনে তাঁহার নিকট যাইয়া সংবাদ দিল যে, এমাম হোসেন মদিনা হইতে ষষ্টি সহস্র সৈন্য সঙ্গে করিয়া কুফায় আসিতেছিলেন, পথ ভুলিয়া ঘোর প্রান্তর কারবালাভিমুখে যাইতেছেন। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ মহাসন্তুষ্ট হইয়া শুভসংবাদবাহী আগন্তুক চরকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করিয়া বলিলেন, "তোমাকেই আজ কাসেদ-পদে বরণ করিয়া দামেস্কে পাঠাইতেছি।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ এজিদের নিকট পত্র লিখিলেন, "বাদশাহের অনুগ্রহে দাসের প্রাণদান হউক! আমি কৌশল করিয়া মোহাম্মদের রওজা হইতে এমাম হোসেনকে বাহির করিয়াছি। বিশ্বস্ত গুপ্ত সন্ধানী অনুচর-মুখে সন্ধান পাইলাম যে, এমাম হোসেন কুফা নগরের পথ ভুলিয়া 'দাস্ত কারবালা' অভিমুখে যাইতেছেন। তাঁহার পূর্ব্ব-প্রেরিত সাহসী মহাবীর মোস্‌লেমকে কৌশলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। এই অবসরে হোসেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি ভাল ভাল সৈন্য প্রেরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। ওত্‌বে অলীদকে কুফার দিকে সৈন্যসহ পাঠাইলে, তাহারা প্রথমে মোস্‌লেমকে মারিয়া, পরে হোসেনের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া

তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। প্রথমে মোস্‌লেমকে মারিতে পারিলে হোসেনের মস্তক দামেস্কে পাঠাইতে আর কোন বিঘ্ন হইবে না, ক্ষণকাল বিলম্বও হইবে না।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ স্বহস্তে পত্র লিখিয়া গুপ্তসন্ধানী অনুচরকে কাসেদ-পদে নিযুক্ত করিয়া দামেস্কে পাঠাইলেন; এদিকে মোস্‌লেমের নিকট দিন দিন আরও নূন্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার যথোচিত সেবা করিতেও লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে হোসেনের আগমনের বিলম্বজনিত বাহ্যিক দুঃখে নানাপ্রকার দুঃখ প্রকাশ করিয়া মোস্‌লেমকে নিশ্চিন্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ প্রেরিত কাসেদ পুরস্কার লোভে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া দামেস্কে পৌঁছিলেন। দামেস্কাধিপতি এজিদ কাসেদের পরিচয় পাইয়া—সমুদয় বৃত্তান্ত নির্জ্জনে অবগত হইয়া, মহানন্দে কাসেদকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া, প্রধান প্রধান সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "এত দিনের পর আমার পরিশ্রমের ফল ফলিয়াছে। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কৌশল করিয়া হোসেনকে মদিনা হইতে বাহির করিয়াছেন, তোমরা এখনই প্রস্তুত হইয়া হোসেনের অনুসরণ কর। মরুস্থল কারবালার পথে যাইলে, পলাতক হোসেনের দেখা পাইবে। যদি পথের মধ্যে আক্রমণ করিবার সুযোগ না হয়, তবে একেবারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অগ্রে ফোরাত নদীর পূর্ব্বকূল বন্ধ করিবে। মদিনা হইতে কূফা পর্য্যন্ত গমনোপযোগী জল সর্ব্বদা সংগ্রহ করা সহজ মনে করিয়া হোসেন মদিনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গেও ষষ্টি-সহস্র লোক। ইহাদের পানোপযোগী জল সর্ব্বদা সংগ্রহ করা সহজ কথা নহে। তোমাদের প্রথম কার্য্যই হইল, কারবালার ফোরাত নদীর কূল আবদ্ধ করিয়া রাখা। হোসেন পক্ষীয় একটা প্রাণীও যেন ফোরাতকূলে আসিতে না পারে, ইহার বিশেষ উপায় করিতে হইবে। দিবারাত্র সদা-সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকিবে, যেন কোন সময়ে, কোন সুযোগে, এক পাত্র জলও হোসেনের, কি তৎসঙ্গীয় কোন লোকের, আশু প্রাপ্য না হয়। বারি-রোধ করিতে পারিলেই তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হোসেনের মস্তক যে ব্যক্তি এই দামেস্কে আনিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিব এবং বিজয়ী সৈন্যদিগের নিমিত্ত দামেস্কের রাজভাণ্ডার

খুলিয়া রাখিব। যাহার যত ইচ্ছা, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে না।" প্রধান প্রধান সৈন্যগণ, ওমর, সীমার প্রভৃতি বলিয়া উঠিল, "মহারাজ এবারে হোসেনের মস্তক না লইয়া আর ফিরিব না।" সীমার অতি দর্পে বলিতে লাগিল—"আর কেহই পারিবে না, আমিই হোসেনের মাথা কাটিব, কাটিব—নিশ্চয় কাটিব, পুরস্কার আমিই লইব, আর কেহই পারিবে না। হোসেনের মাথা না লইয়া সীমার এ নগরে আর ফিরিবে না। এই-ই সীমারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"

এজিদ বলিলেন, "পুরস্কারও তোমার জন্য ধরা রহিল।"—এই বলিয়া আবদুল্লাহ ও সীমারকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া বিদায় করিলেন।

পাঠকগণ! এত দিন আপনাদের সঙ্গে আসিতেছি, কোন দিন মনের কথা বলি নাই। বিষাদ-সিন্ধুতে হাস-রহস্যের কোন কথা নাই, তন্নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত হাসি নাই। কাঁদিবার অনেক কথা আছে, তথাপি নিজে কাঁদিয়া আপনাদিগকে কাঁদাই নাই। আজ মন কাঁপিয়া উঠিল, সীমার হোসেনের মস্তক না লইয়া আর দামেস্কে ফিরিবে না—প্রতিজ্ঞা করিল। সীমার কে? পরিচয় এখনও প্রকাশ পায় নাই—কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার পরিচয় অপ্রকাশ থাকিবে না। সীমারের নামে কেন যে হৃদয়ে আঘাত লাগিতেছে, জানি না। সীমারের রূপ কোন লেখকই বর্ণনা করেন নাই, আমিও করিব না। কল্পনা-তুলি হস্তে তুলিয়া আজ আমি এখন সেই সীমারের রূপ-বর্ণনে অক্ষম হইলাম। কারণ, বিষাদ-সিন্ধুর সমুদয় অঙ্গই ধর্ম্মকাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। বর্ণনায় কোন প্রকার ন্যূনাধিক হইলে প্রথমতঃ পাপের ভয়, দ্বিতীয়তঃ মহাকবিদিগের মূল গ্রন্থের অবমাননা ভয়ে তাঁহাদেরই বর্ণনায় যোগ দিলাম। সীমারের বিশাল ধবল বক্ষে লোমের চিহ্নমাত্র নাই; মুখাকৃতি দেখিলেই নির্দ্দয় পাষাণহৃদয় বলিয়া বোধ হইত—দন্তরাজি দীর্ঘ ও বক্রভাবে জড়িত—প্রাচীন কবির এই-মাত্র আভাষ এবং আমারও এইমাত্র বলিবার অধিকার,—নাম সীমার।

এজিদ সৈন্যদিগকে নগরের বাহির করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং আবদুল্লাহ জেয়াদের লিখন অনুসারে মারওয়ানকে সসৈন্যে মদিনা পরিত্যাগ

করিয়া কুফা নগরে মোস্‌লেমকে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সংবাদবাহক সংবাদ লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই ওতবে অলীদ ও মারওয়ান সৈন্য-সহ হোসেনকে অনুসরণ করিতে কুফার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে দামেস্কের কাসেদ-মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অলীদ এবং মারওয়ান অবি-শ্রান্তভাবে কুফাভিমুখে সৈন্য-সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিলেন। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধির অগম্য, চিন্তার বহির্ভূত—অল্প সময়ের মধ্যে কুফার নিকটবর্ত্তী হইলে জেয়াদের অনুচরেরা তাঁহার নিকট সংবাদ দিল, "মহারাজ এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ মারওয়ান ও ওত্‌বে অলীদ সৈন্যসহ নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন,—কি কর্ত্তব্য ?"

জেয়াদ এতৎ সংবাদে মহাসন্তুষ্ট হইয়া মোস্‌লেম-সমীপে যাইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "বাদশাহ্-নামদার ! এজিদের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবীর মারওয়ান এবং ওত্‌বে অলীদ কুফার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বোধ হয়, অদ্যই নগর আক্রমণ করিবে। প্রভু হোসেনের আশায় এত দিন রহিলাম, তিনি ত আসিলেন না ; শত্রুপক্ষ নগরর-সীমার নিকটবর্ত্তী, এক্ষণে কি আদেশ হয় ?"

মোস্‌লেম বলিলেন, "আমরা এমন কাপুরুষ নহি যে, শত্রুর অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিয়া নগর রক্ষা করিব। আমি এখনই আমার সঙ্গী সৈন্য লইয়া মার-ওয়ানের গতিরোধ করিব এবং নগর আক্রমণে বাধা দিয়া তাহাদিগকেই আক্র-মণ করিব। আপনি যত শীঘ্র পারেন, কুফার সৈন্য লইয়া আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হউন। সৈন্যসহ আপনি আমার পশ্চাদ্-রক্ষক থাকিলে ঈশ্বরের কৃপায় আমি সহস্র মারওয়ানকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি।" এই কথা বলিয়াই মোস্‌লেম মদিনার সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে অনুমতি-সঙ্কেত করিলেন। মদিনাবাসীরা এজিদ ও এজিদের সৈন্য-শোণিতে তরবারি রঞ্জিত করিতে সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত ! মোস্‌লেমের সাঙ্কেতিক অনুমতি, মারওয়ানের সহিত যুদ্ধের অনুমাত্র প্রসঙ্গ পাইয়াই সৈন্যগণ "মার মার" শব্দে শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক মোস্‌লেমের সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইল। সৈন্যদিগের উৎসাহ দেখিয়া মোস্‌লেম দ্বিগুণ উৎসাহে অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সৈন্যশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক নগরের বাহির

হইলেন। কুফার সৈন্যগণও অত্যল্প সময়মধ্যে সুসজ্জিত হইয়া পূর্ব্বতন প্রভু জেয়াদের সহিত সমরে চলিলেন। মোস্‌লেম নগরের বাহির হইয়াই দেখিলেন যে, এজিদের চিহ্নিত পতাকাশ্রেণী বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যুদ্ধবাদ্য মহাঘোর রবে বাদিত হইতেছে। মোস্‌লেম সৈন্যগণকে বলিলেন, "ভাই সকল! যে এজিদ, যে মারওয়ান, যে ওত্‌বে অলীদের ভয়ে হোসেন মদিনাবাসীদের জন্য, মদিনাবাসীদিগকে বিপদ-উপদ্রব হইতে রক্ষার জন্য কুফায় আসিতে মনস্থ করিয়া অগ্রে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, সেই বিধর্ম্মী কাফের তাঁহারই উদ্দেশ্যে, কিংবা আমাদের প্রাণ লইতে, কিংবা আমাদিগকে যে এত সাহায্য করিতেছে, সেই জেয়াদের প্রাণ বিনাশ করিতে আসিয়াছে। কুফার সৈন্য আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব। সময় পাইলেই শত্রুর বল চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। আর অপেক্ষা নাই, কুফার সৈন্য আসিবে, একত্রে যাইব, ইহা বলিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। এস, আমরাই অগ্রে গিয়া শত্রুপক্ষকে বাধা দিয়া আক্রমণ করি।" মোস্‌লেম সহস্র সৈন্য লইয়া একেবারে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইলেন; উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

জেয়াদ কুফার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোস্‌লেমের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। নগরের অন্ত-সীমার শেষ তোরণ পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন, নগরের অন্ত সীমায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সৈন্যগণ অবাক্ হইল। সকলেই, পূর্ব্ব প্রভুর আজ্ঞা হঠাৎ লঙ্ঘন করা বিবেচনাসিদ্ধ নহে, এই বলিয়া বিরতভাবে দণ্ডায়-মান রহিল।

আবদুল্লাহ জেয়াদ্ বলিতে লাগিলেন, "আমি এত দিন মনের কথা তোমাদিগকে কিছুই বলি নাই, আজ বলিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই এক্ষণে বলিতেছি! হোসেনকে রাজ্যদান আমার চাতুরী মাত্র। আমি মহারাজ এজিদের আজ্ঞাবহ, অনুগৃহীত, আশ্রিত এবং দামেস্কাধিপতি আমার এক-মাত্র পূজ্য। কারণ আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা। তাঁহার দেশে হোসেনকে কৌশল করিয়া বন্দী করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘটনাক্রমে তাহা হইল না। মোস্‌লেমকে যে উদ্দেশ্যে সিংহাসনে বসাইয়াছিলাম, তাহা এক প্রকার সম্পূর্ণ হইল; কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল না। মহারাজ এজিদের সৈন্য আসিয়াছে,

কৌশলে মোস্‌লেমকেও নগরের বাহির করিয়া মহারাজ এজিদের সৈন্যের সম্মুখীন করিয়া দিলাম, রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। আমাদের নগরের বাহিরে কোন প্রয়োজন নাই। আমরা যুদ্ধে যাইব না, মোস্‌লেমের সহায়তাও করিব না। নগরতোরণ আবদ্ধ কর,—বলবান সাহসী সৈনিক পুরুষ নগর-তোরণ রক্ষা করুক। মোস্‌লেমের বাঁচিবার সাধ্য নাই। ওত্‌বে অলীদের অস্ত্রের সম্মুখীন হইলেই মোস্‌লেমকে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তথাপি যদি মোস্‌লেম যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য নগরে আশ্রয় লইতে নগরদ্বারে উপস্থিত হয়, কিছুতেই নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না!” সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্যগণ আবদুল্লাহ্ জেয়াদের বাক্যে একেবারে অবাক হইয়া রহিল! জেয়াদের মনে এত চাতুরী, এত ছলনা, এত প্রতারণা! ইহাতে তাহারা—আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু কি করিবে, নগর-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানেই সৈন্যগণের সহিত সকলেই একত্র হইয়া রহিল।

ওত্‌বে অলীদ মোস্‌লেমকে দেখাইয়া সৈন্যগণকে বেগে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। মোস্‌লেম ওত্‌বে অলীদের আক্রমণে বাধা দিয়া বিশেষ পারদর্শিতার সহিত ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুসম্মুখে সৈন্যদিগকে দণ্ডায়মান করাইলেন। কিন্তু আক্রমণ করিতে আর সাহসী হইলেন না, আত্মরক্ষাই আবশ্যক মনে করিলেন। কুফার সৈন্য কত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহা দেখিতে পশ্চাতে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে মোস্‌লেমের মস্তক ঘুরিয়া গেল। জনপ্রাণী মাত্র নাই, তথাপি নগরতোরণ বদ্ধ—মোস্‌লেম একেবারে হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া নগরের দিকে বার বার চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বপ্রকারেই নগরদ্বার বদ্ধ রহিয়াছে। তখন নিশ্চয়ই তিনি মনে মনে জানিলেন যে, এ সকল জেয়াদের চাতুরী! চতুরতা করিয়া সে তাঁহাকে নগরের বাহির করিয়াছে! এখন তিনি নিশ্চয়ই জানিলেন যে, জেয়াদের মনে নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি ছিল; হোসেনবধের জন্যই এই মায়াজাল বিস্তার,—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ‘ভালই হইয়াছে, কুফায় আসিলে হজরত যে প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইতেন, তাহা আমার ভাগ্যেই ঘটিল। মোস্‌লেমের প্রাণ যাইয়াও যদি হোসেনের প্রাণ রক্ষা হয় তাহাও মোস্‌লেমের পক্ষে সার্থক!’—মনে মনে তিনি এই কথা বলিলেন।

মোস্‌লেম হতাশ হইলেন না; কিন্তু তাঁহাকে নূতন প্রকার চিন্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। নিজ সৈন্য এবং কুফার সৈন্যের সাহায্যে যে যে প্রকারে যুদ্ধের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনি তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতনরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ওদিকে ওত্‌বে অলীদ কি মনে করিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। আপন আয়ত্তাধীনে সম্ভবমত দূরে থাকিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ করিবার অভিপ্রায়ে মহাবীর ওত্‌বে অলীদ গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মোস্‌লেম! যদি নিতান্তই যুদ্ধসাধ হইয়া থাকে, তবে আইস, আমরা উভয়ে যুদ্ধ করি; জয়-পরাজয় আমাদের উভয়ের উপরই নির্ভর। অনর্থক অন্য অন্য প্রাণ বিনষ্ট করিবার আবশ্যকতা কি?"

মোস্‌লেম সে কথার উত্তর না দিয়া কতক সৈন্যসহ ওত্‌বে অলীদকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ওত্‌বে অলীদ আবার বলিলেন, "মোস্‌লেম! এই কি যুদ্ধের রীতি, না বীরপুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য? কে তোমাকে বীর-আখ্যা দিয়াছিল? কহ মহারথি! একি মহারথী-প্রথা?"

মোস্‌লেম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ! বিধর্ম্মীর হস্তে মৃত্যুতে বড়ই পুণ্য। প্রভু মোহাম্মদের দৌহিত্রগণকে যাহারা, যে পাপাত্মারা, যে নরপিশাচেরা শত্রু মনে করে—তাহাদের প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়া তাহাদের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে পারিলে, তাহা অপেক্ষা ইহজগতে আর কি অধিকতর সুখ আছে? এক দিন মরিব বলিয়াই জন্মিয়াছি। যে মরণে সুখ,—সহস্র সহস্র পাপ থাকিলেও স্বর্গসুখ ভোগের অধিকারী, এমন মরণে কে না সুখী হয়? আমরা যুদ্ধে জয়ী হইব না, ইহার আশাও করি না। তবে বিধর্ম্মীর হস্তস্থিত তরবারি ইস্‌লাম-শোণিতে রঞ্জিত হইয়া পরিণামে আমাদিগকে স্বর্গসুখের অধিকারী করিবে, এই-ই আমাদের আশা। জয়ের আশা আর মনে আনিও না, আজই যুদ্ধের শেষ, আজই আমাদের জীবনের শেষ।" মোস্‌লেম এই বলিয়া ওত্‌বে অলীদের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মারওয়ান দেখিলেন যেন, অলীদের পরমায়ু শেষ হইল, সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া মোস্‌লেম আক্রমণ করিয়াছে; ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া মারওয়ান সমুদয় সৈন্যসহ মোস্‌লেমকে

আক্রমণ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোস্‌লেমের জীবনের আশা নাই, তাঁহার সৈন্যগণ বিধর্ম্মীর হস্তে মরিবে—সেই আশায় তিনি কেবল মারিতেই লাগিলেন; ভবিষ্যৎ জ্ঞান, পশ্চাৎ লক্ষ্য, পার্শ্বে দৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি কিছুই লক্ষ্য রাখিলেন না। মহাবীর মোস্‌লেম দুই হস্তে তরবারি ধরিলেন, অশ্ববল্গা দন্তে ধারণ করিলেন এবং শত্রুসৈন্য অকাতরে কাটিয়া চলিলেন। মধ্যে মধ্যে "আল্লাহো আকবর" নিনাদে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিলেন। ওত্‌বে অলীদ ও মারওয়ান বহু পরিশ্রম ও বহু চেষ্টা করিয়াও মোস্‌লেমের লঘুহস্তচালিত চপলবৎ তরবারির সম্মুখে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল মধ্যে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া দিগ্বিদিক পলাইতে লাগিল। মোস্‌লেমের সৈন্যগণও ঐ পলায়িত শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া দেহ হইতে বিধর্ম্মীর মস্তক মৃত্তিকাশায়ী করিতে লাগিল।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ নগরতোরণের উপরিস্থ অতি উচ্চ মঞ্চে উঠিয়া উভয় দলের যুদ্ধ দেখিতেছিলেন; দেখিতেছিলেন, মোস্‌লেমের তরবারীর সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! বহুতর সৈন্য মৃত্তিকাশায়ী হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে তাহারাও প্রাণভয়ে দিশাহারা হইয়া পলাইতেছে। জেয়াদ মঞ্চ হইতে নামিয়াই দ্বাররক্ষককে বলিলেন, "দ্বার খুলিয়া দাও"; সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, "আমার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া মোস্‌লেমকে আক্রমণ কর, আমরা সাহায্য না করিলে ওত্‌বে অলীদের প্রাণ কখনই রক্ষা হইবে না।"

রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রই লক্ষাধিক সৈন্য জয়নাদে তুমুল শব্দ করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে মোস্‌লেমকে আক্রমণ করিল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছেন, মোস্‌লেমের সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই, কেবল অশ্ববল্গা দন্তে ধারণ করিয়া দুই হস্তে বিধর্ম্মী নিপাত করিতেছেন। তিনি যাহাকে যে অবস্থায় পাইতেছেন, সেই অবস্থায়ই তাহার দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিতেছেন; কাহাকেও বা অশ্ব সহিত একচোটে দ্বিখণ্ডিত করিয়া জন্মশোধ তাহার যুদ্ধের সাধ মিটাইতেছেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ পশ্চাদ্দিক হইতে মোস্‌লেমকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেই ওত্‌বে অলীদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মোস্‌লেম! ঈশ্বরের

নাম মনে কর ; তোমার সাহায্যের জন্য আবদুল্লাহ্ জেয়াদ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া আসিতেছেন !”

মোস্‌লেম জেয়াদের নাম শুনিয়া চমকিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর কিছুই বলিলেন না ; কেবলমাত্র বলিলেন “বিধর্ম্মীর কথায় যে বিশ্বাস করিবে, কাফেরের ভক্তিতে যে মুসলমান ভুলিবে, তাহার দশাই এইরূপ ঘটিবে !” মোস্‌লেম ভীত হইলেন না, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াও পরাজয় স্বীকার করিলেন না, পূর্ব্বমত বিধর্ম্মী-শোণিতে মৃত্তিকা রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। চতুর্দ্দিক হইতে অবিশ্রান্তভাবে মোস্‌লেমের শরীরে শর বিদ্ধ হইতে লাগিল ; সর্ব্বাঙ্গে শোণিত-ধারা ছুটিল। অশ্বপদতলে বিধর্ম্মীর রক্তস্রোত বহিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্র মনুষ্য-দেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে, শোণিতসিক্ত মৃত্তিকায় ক্ষিপ্রগামী মোস্‌লেম শত্রুক্ষয় করিতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। শত্রুসৈন্য এত মারিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার শেষ হইতেছে না। দিন মণিও সমস্ত দিনএই ঘোরতর যুদ্ধ দেখিয়া লোহিতবর্ণে অস্তমিত হইলেন। তৎসঙ্গেই ইস্‌লামগৌরব-রবি মহাবীর মোস্‌লেমও লোহিত বসনে আবৃত হইয়া জগৎ অন্ধকার করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গবাসী হইলেন। মদিনার একটি প্রাণীও আর বিধর্ম্মীর অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইল না।

যুদ্ধাবসানে নরপতি জেয়াদ দর্পের সহিত বলিতে লাগিলেন,—“মদিনার শত্রুকুল,—মহারাজ এজিদ-নামদারের নামের বলেই এরূপে নির্ম্মূল হইবে। যেরূপ চিন্তা করিয়া কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাতে বাদশাহ নামদারের মহাশত্রু আজ সবংশে বিনষ্ট হইত, দৈববিপাকে তাহা হইল না। মোস্‌লেমের যে দশা ঘটিল, প্রধান শত্রু হোসেনকেই সেই দশায় পতিত হইতে হইত। দামেস্ক ও কুফার সৈন্যের তরবারিধারে হোসেন-মস্তক নিশ্চয়ই দেহবিচ্ছিন্ন হইত। পরিবার, পরিজন, সঙ্গীরাও আজ কুফার সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ প্রান্তরে রক্তমাখা হইয়া গড়াগড়ি যাইত। ভাগ্যক্রমে হোসেন ষষ্টি সহস্র লোকজনসহ কুফার পথ ভুলিয়া কারবালার পথে গিয়াছে ; জেয়াদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাংশে যশঃ লাভ করিতে পারিলাম

না; ইহাই আমার নিদারুণ আক্ষেপ, মদিনার একটি প্রাণীও আজ কুফার সৈন্যগণের হস্তে রক্ষা পায় নাই, সমুদয় শেষ হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছে। একটি প্রাণীও পলাইতে পারে নাই। ধন্য কুফার সৈন্য!"

গুপ্তচর, গুপ্তসন্ধানীগণ মধ্য হইতে একজন বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! মোস্‌লেমের দুই পুত্র মারা যায় নাই, ধরা পড়িয়া বন্দীও হয় নাই। তাহারা যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অতি ত্রস্তপদে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কি কৌশলে যে তাহারা কুফার সৈন্যগণের চক্ষে ধূলি দিয়া প্রাণ বাঁচাইল,— আর এ পর্য্যন্ত যে জীবিত আছে,—ইহাই আশ্চর্য্য! মহারাজ!—তাহারা দুই ভ্রাতা এই নগরেই আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। আমরা বিশেষ সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাহারা নগরের বাহিরে যায় নাই;—যাইতে পারে নাই।"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ অতি ব্যস্তভাবে বলিতে লাগিলেন,—"সে কি কথা! মোস্‌লেমের পুত্রদ্বয় জীবিত আছে?" অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "ওহে! এ কি ভয়ানক কথা? ভুজঙ্গ হইতে ভুজঙ্গশিশুর বিষ যে অত্যধিক মারাত্মক তাহা কি তোমরা জান না? এখনই ডঙ্কা বাজাইয়া ঘোষণা প্রচার কর। নগরের প্রতি রাজপথে, ক্ষুদ্র পথে, প্রকাশ্য স্থানে, নগরবাসীর প্রতি দ্বারে ডঙ্কা, দুন্দুভি, ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিয়া দাও,—যে ব্যক্তি মোস্‌লেমের পুত্রদ্বয়কে ধরিয়া আমার নিকট আনিতে পারিবে, সে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তৎক্ষণাৎ পারিতোষিক পাইবে। আর যে ব্যক্তি মোস্‌লেমের পুত্রদ্বয়কে আশ্রয় দিয়া গোপনে রাখিবে—প্রকাশমাত্র, বিচার নাই—কোন কথা জিজ্ঞাস্য নাই, দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই,—শূলদণ্ডই হইবেতাহার জীবনের সহচর। শূলদণ্ডকেই চির আলিঙ্গন করিয়া—প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া মজ্জাভেদে তাহাকে মরিতে হইবে।"

আদেশমত তখনই ঘোষণা প্রচার হইল—নগরময় ঘোষণা প্রচার হইল। কত লোক অর্থলোভে পিতৃহীন বালকদ্বয়ের অন্বেষণে ছুটিল, নানা স্থানে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, মাঠ, ঘাট চারিদিকে সন্ধান করিয়া ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মোস্‌লেমের পুত্রদ্বয় ঘোষণা প্রচারের পূর্ব্বেই এক ভদ্রলোকের আশ্রয়-

বাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ভদ্রলোকটি কুফা নগরের বিচারপতি (কাজী); তিনি বালকদ্বয়ের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে পরিতোষরূপে আহার করাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর মোস্‌লেমের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন! ইতিমধ্যে ঘোষণার বিবরণ শুনিয়া কাজী সাহেব নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। কি করেন! কি উপায়ে পিতৃহীন বালক দুইটির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, তিনি তাহারই সুযোগ-সুবিধা খুঁজিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন! বহু চিন্তার পর সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আসাদ'কে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "প্রাণাধিক পুত্র! দেখ—এই পিতৃহীন বালক দুইটির প্রাণ রক্ষার উপায় করিতে হইবে। ঘোষণার বিষয় ত শুনিয়াছ। সাবধানে সতর্কে নিশীথ সময়ে বালকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া নগরের প্রবেশদ্বার পার হইবে। কিছুক্ষণ মদিনার পথে দাঁড়াইলেই মদিনার যাত্রীদল অবশ্যই দেখিতে পাইবে। বহু যাত্রীদলই প্রতি রাত্রে গমন করে, অদ্যও করিবে, তাহাদের কোন এক দলের সহিত বালকদ্বয়কে সঙ্গী করিয়া দিলেই' 'কাফেলা'য় মিশিয়া নিরাপদে উহারা মদিনায় যাইতে পারিবে। বালক দুইটিরও প্রাণ রক্ষা হইবে, আমরাও নরপতি জেয়াদের ঘোষণা হইতে রক্ষা পাইব।"

কাজী সাহেব এই কথা বলিয়াই প্রতি ভ্রাতার কোমরে পঞ্চাশটি করিয়া মোহর বাঁধিয়া দিলেন এবং খাদ্য-সামগ্রী পরিমাণ মত যাহা তাহারা অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে, উভয় ভ্রাতার সঙ্গে তাহাও দিয়া দিলেন।

কাজী সাহেবের পুত্র আসাদ, পিতৃহীন বালকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া নিশীথ সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সাবধানে সতর্কে নগরের সিংহদ্বার পার হইয়া দেখিলেন, একদল যাত্রী মদিনাভিমুখে যাইতেছে, কিন্তু তাহারা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পড়িয়াছে।

আসাদ বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! দেখিতেছ? ঐ মদিনার যাত্রীদল যাইতেছে, এমন সুযোগ-সুবিধা আর না-ও পাওয়া যাইতে পারে। ঐ যে যাত্রীদল যাইতেছে, তোমরা খোদার নাম করিয়া ঐ দলে মিশিয়া চলিয়া যাও। ঐ যাত্রীদলে মিশিতে পারিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না।

তোমাদিগকে এলাহীর হস্তে সঁপিলাম। যাও ভাই! আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র যাও। ভাই সালাম!"—আসাদ বিদায় লইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ত্রস্তপদে মদিনার যাত্রীদলের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। রজনী ঘোর অন্ধকার। বালুকাময় পথ। তদুপরি প্রাণের ভয়, দুই ভাই একত্রে দৌড়াইতে লাগিলেন,—অগ্রগামী কাফেলার দিক লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন।

জগৎকারণ জগদীশ্বরের মহিমার অন্ত নাই! ভ্রাতৃদ্বয় দৌড়াইতে দৌড়াইতে মদিনার পথ ভুলিয়া পুনরায় নগরের দিকে—কুফা নগরের দিকেই আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, যাত্রীদল বেশী দূর যায় নাই, এখনই তাহাদের সঙ্গে যাইয়া দলে মিশিতে পারিবেন। কিন্তু আশা করিলে কি হয়? মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় কি? অদৃষ্টফেরে পথ ভুলিয়া অন্য পথে কুফা নগরের দিকেই যে আসিতেছেন, দুই ভাই এ দৈব ঘটনার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। ত্রস্তপদে যাইতে যাইতে তাঁহারা সম্মুখে দেখিলেন,—মশালের আলো। তাঁহারা আলো লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইলেন; সেখানে যাইয়া দেখেন—যাত্রীদল নহে, রাজকীয় প্রহরীদল অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত, প্রত্যেকের হস্তেই জ্বলন্ত মশাল। প্রহরীদিগের সম্মুখে পড়িতেই তাহারা বালকদ্বয়কে দেখিয়াই, আকার-প্রকারে তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়াই, যাহা বুঝিবার বুঝিয়া লইল। আর কি যাইবার সাধ্য আছে? তাহারা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল এবং পুরস্কার-লোভে অগ্রে শহর-কোটালের নিকট লইয়া উপস্থিত করিল। নগরপাল কোটাল উভয় ভ্রাতার আকার-প্রকার দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন—এই বালকদ্বয়ই বীরবর মোসলেমের হৃদয়ের সার, প্রিয় আত্মজ। নগরপাল ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপলাবণ্য দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে আপন গৃহে রাখিলেন এবং অতি প্রত্যূষে তাহাদিগকে মহারাজ জেয়াদের দরবারে উপস্থিত করিলেন।

কুফাধিপতি মোসলেমের তনয়দ্বয়ের রূপলাবণ্য, মুখশ্রী, কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ কেশের নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়া "শিরশ্ছেদ কর"—এ কথাটি আর মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না; মায়াবশে বশীভূত হইয়া বলিলেন—"এই বালকদ্বয়কে দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্দীখানায় রাখিতে বল। কারাধ্যক্ষকে আদেশ জানাও যে, ইহারা রাজকীয় বন্দী; কোন প্রকারে যেন কষ্ট না পায়,

বন্দীগৃহ হইতে যেন বহির্গত হইতে না পারে; কোন প্রকার অসম্মান, অবমাননা যেন না হয়।”

দুই ভ্রাতা করজোড়ে সবিনয়ে তাঁহাদের মনের কথা মুখে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইতেই এদিকে প্রহরীদল উভয়কে লইয়া কারাগৃহের প্রধান কার্য্য-কারকের নিকটে চলিয়া গেল। তাঁহারা আবদুল্লাহ জেয়াদের নিকট একটি কথা বলিতেও সুযোগ পাইলেন না। কারাগৃহে নীত হইলে কারাধ্যক্ষ—(নাম মাস্কুর), উভয় ভ্রাতার রূপমাধুরী দেখিয়া এবং ইঁহারাই বীর-শ্রেষ্ঠ মোস্‌-লেমের হৃদয়ের ধন ভাবিয়া সাদরে ও সযত্নে তাঁহাদিগকে স্থান দিলেন। বন্দীগৃহে না রাখিয়া স্বীয় ভবনে উভয় ভ্রাতাকে লইয়া আহারাদি করাইলেন। তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “কি করি, রাত্রি প্রভাতেই হউক, দুইদিন পরেই হউক, নরপতি নিশ্চয়ই ইহাদের শিরশ্ছেদ আজ্ঞা প্রদান করিবেন! দুইটি ভাইকে রক্ষা করি কি প্রকারে?”—অনেক চিন্তার পর অর্দ্ধ নিশা অতীত হইলে দুই ভ্রাতাকে জাগাইয়া বলিলেন, “তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস। কোন চিন্তা নাই! আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, হইবে। আইস, আমার সঙ্গে আইস।” মোস্‌লেম-পুত্রদ্বয় কারাধ্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নগরের বাহির হইয়া কারাধ্যক্ষ কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া গিয়া দুই ভ্রাতাকে বলিলেন, “শুন, তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন। এই যে পথের উপর দাঁড়াইয়া আছি—এই পথ ধরিয়া কুদ্‌সীয়া নগরে যাইবে। এই পথ ধরিয়া একটু দ্রুতপদে চলিয়া গেলে রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই কুদ্‌সীয়া নগরে যাইতে পারিবে। ঐ নগরে আমার ভাই আছেন,—তাঁহার নাম এই—,নামটি মনে রাখিও। নাম করিলেই তাঁহার বাসস্থান লোকে দেখাইয়া দিবে। আমি যে তোমাকে পাঠাইতেছি, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ আমার এই অঙ্গুরীয় দিতেছি। সাবধানে রাখিও। কিছু বলিতে হইবে না। এই অঙ্গুরী আমার ভ্রাতাকে দিলেই তিনি তোমাদিগকে তোমাদের গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তোমরা মদিনার নাম করিও। যে উপায়ে হউক—যে কোন কৌশলেই হউক, তিনি তোমাদিগকে মদিনায় পাঠাইয়া দিবেন। এই অঙ্গুরী লও, খোদার হাতে

তোমাদিগকে সঁপিয়া দিলাম। শীঘ্রই এই পথ ধরিয়া চলিয়া যাও। কোন ভয়ের কারণ নাই।—সর্ব্ববিপদহর জয় জগদীশ তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অঙ্গুরী লইয়া বিদায় হইলেন।—এবং কুদসীয়ার পথে যাইতে লাগিলেন।

দয়াময় এলাহীর অভিপ্রেত কার্য্যে বাধা দিতে সাধ্য কার? কার ক্ষমতা তাঁহার বিধানের বিপর্য্যয় করে? ভ্রাতৃদ্বয় সারা নিশা ত্রস্তপদে হাঁটিয়া বড়ই ক্লান্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ বলিলেন "ভাই, বহু দূরে আসিয়াছি। কুফা হইতে বহু দূরে কুদ্‌সীয়া নগর—এই সেই কুদ্‌সীয়া।" রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল। একটু স্থির হইয়া বসিতেই চতুর্দ্দিকে ঊষার আলোক নয়নফলকে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃদ্বয় এখনও নির্ভয়ে বসিয়া আছেন, প্রকৃতির কল্যাণে ঘটনাচক্রে কি সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়াছে,—তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। অদৃষ্টলিপি খণ্ডাইতে মানুষের সাধ্য কি? ভ্রাতৃদ্বয় সারাটি রাত্রি ত্রস্তপদে হাঁটিয়াছেন সত্য;—মনে মনে স্থির করিয়াছেন—বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছেন; এস্থানে আর আবদুল্লাহ্ জেয়াদের ভয়ে ভাবিতে হইবে না। হা অদৃষ্ট! তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল! কুদ্‌সীয়ার পথ ভুলিয়া তাঁহারা সারাটি রাত্রি কুফা নগরের মধ্যেই ঘুরিয়াছেন! এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল। চক্ষুর ধাঁধা ছুটিয়া গেল। প্রাণ চমকিয়া উঠিল!—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "ভাই, আমাদের কপাল মন্দ! হায়! হায়! কি করিলাম! প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সারা রাত হাঁটিলাম, কি কপাল! এই ত সেই স্থান, আমাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া মাস্কুর কুদ্‌সীয়ার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, এই ত সেই স্থান।" কনিষ্ঠ ভ্রাতাও চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ ভাই! ঠিক কথা! যে স্থান হইতে তিনি বিদায় লইয়াছিলেন, এই-ই সেই পথ—সেই পথিপার্শ্বের দৃশ্য!"

ঘটিয়াছেও তাহাই। কারাধ্যক্ষ মাস্কুর যে স্থানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সারা নিশা ঘুরিয়া প্রভাতে আবার তাঁহারা সেই স্থানেই আসিয়াছেন।

ভ্রাতৃদ্বয় সে সময় আকুল প্রাণে কথা বলিতে লাগিলেন।—মোহাম্মদ জ্যেষ্ঠ, এব্রাহিম কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ বলিতেছেন,—"ভাই! এখন উপায়? প্রাণের ভাই

এব্রাহিম ! এবারে আর বাঁচিবার উপায় নাই ! এখন উপায় কি ? একবার নয়, দুইবার এইরূপ ভুল ! আর আশা কি ? ভ্রাতঃ ! এইবারে রাজা জেয়াদ আমাদিগকে জীবন্তে ছাড়িবে না।"

এব্রাহিম বলিলেন,—"নিরাশ হইয়া এই স্থানে বসিয়া থাকা কাজের কথাই নহে। সূর্য্যোদয় হইলেই আমরা প্রকাশ্য পথছাড়িয়া সম্মুখের ঐ খোর্মা প্রভৃতি ফলের বাগানমধ্যে লুকাইয়া থাকিব। কোন প্রকারে দিনটা কাটাইতে পারিলেই বোধ হয় বাঁচিতে পারি। সন্ধ্যা ঘোর হইলে আমরা মদিনার পথ ধরিব।"

মোহাম্মদ বলিলেন,—"ভাই তবে উঠ, আর বিলম্ব নাই।"

কনিষ্ঠের হস্ত ধরিয়া জ্যেষ্ঠ অতি ত্রস্তপদে নিকটস্থ খোরমার বাগানে যাইয়া দেখিলেন,—ছোট বড় বহু বৃক্ষপূর্ণ বিস্তৃত ফলের বাগান, বাগানের মধ্যে জলের নহর বহিয়া যাইতেছে। ভ্রাতৃদ্বয় এ-গাছ সে-গাছ সন্ধান করিয়া নহরের ধারে পুরাতন একটি বৃক্ষের কোটরে দুই দেহ জড়সড়ভাবে এক করিয়া সাধ্যানুসারে আত্মগোপন করিলেন; কিন্তু এক দিকে যে ফাঁক রহিল, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি রহিল না। সে সকল বৃক্ষের ছায়া নহরের জলে পড়িয়া ভাসিতেছে; মৃদুমন্দ বায়ুর আঘাতে সেই ছায়াসকল কখনও কাঁপিতেছে, কখনও বা ক্ষুদ্র বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া জলের মধ্যে যেন ছুটিয়া যাইতেছে। জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সহিত বৃক্ষসকলের ছায়াও হেলিয়া দুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ভ্রাতৃদ্বয় যে বৃক্ষকোটরে গাত্রের সহিত গাত্র মিশাইয়া বসিয়া আছেন, কোটরে প্রবেশ-অংশের স্থান অনাবৃত থাকায় তাঁহাদের ছায়া জলে পতিত হইয়া বৃক্ষছায়ার সহিত কম্পিত ও সঙ্কুচিত হইতেছিল এবং প্রশস্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ প্রভৃতি নানা প্রকার আকার ধারণ করিতেছিল।

বাগানের এক পার্শ্বে এক ভদ্রলোকের আবাসস্থান। সেই ভদ্রলোকের বাটীর পরিচারিকা নহরের জল লইতে আসিয়া জলে ঢেউ দিয়া কলসী পূর্ণ করিতে করিতে হঠাৎ বৃক্ষছায়ার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। বৃক্ষকোটরের ছায়ার মধ্যে অন্য এক প্রকার ছায়া দেখিয়া পরিচারিকা কলসী জলে ডুবাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল: বৃক্ষকোটরে এ কিসের ছায়া—ঠিক যেন

দুইটি জোড়া-মানুষের মত বোধ হইতেছে। কান, ঘাড়, পিঠ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—কি ব্যাপার! ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। জলপূর্ণ কলসী ডাঙ্গায় রাখিয়া যে বৃক্ষের ছায়ামধ্যে ঐ অপরূপ ছায়া দেখিতেছিল, এক পা দুই পা করিয়া পরিচারিকা সেই বৃক্ষের নিকট যাইয়া দেখিল যে, দুইটি বালক উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া যেন এক-দেহ হইয়া রহিয়াছে। পরি-চারিকা বালকদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তাহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিল,—সে মুখে বলিল,—"আহা! আহা!! তোমরা কাহার কোলের ধন, বাছা রে! দুই জনে এরূপভাবে এই পুরাতন বৃক্ষের কোটরে লুকাইয়া রহিয়াছ কেন বাছা? আমাকে দেখিয়া এত ভয় করিতেছ কেন বাপ? আহা বাছা, তোমাদের কি প্রাণের মায়া নাই? ওরে বাপধন! ঐ কোটরে সাপ বিচ্ছুর অভাব নাই। কার ভয়ে তোরা এ ভাবে গলাগলি করিয়া নীরবে কাঁদিতেছিস্? বল্, আমার নিকটে মনের কথা বল্, কোন ভয় নাই। বাপ্! তোরা পেটের সন্তান তুল্য। তোদের দুইখানি মুখ যেন দুইখানি চাঁদ। —বাবা! তোরা কি দুই ভাই? মুখের গড়ন, হাত পায়ের গঠন দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে। তোরা দুটি ভাই, এক মায়ের পেটে জন্মিয়াছিস্ বাপ? কোন্ দুঃখিনীর সন্তান তোরা? বল্, বাবা শীঘ্র বল্, কার ভয়ে, তোরা লুকাইয়া আছিস?"

ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে কোন কথা নাই। দুই ভাই হাত আরও শক্ত করিয়া গলাগলি করিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। পরিচারিকা নিকটে যাইয়া মৃদু মৃদু স্বরে সজল চক্ষে বলিতে লাগিল,—

"হ্যাঁ বাবা! তোরা কি সেই মদিনার মহাবীর মোসলেমের নয়নের পুত্তলী, হৃদয়ের ধন, জোড়া-মাণিক? তাই বুঝি হবে! তাহা না হইলে এত রূপ 'কুফায়' কোন ছেলেরই নাই! আহা! আহা!—যেন দুইটি ননীর পুতুল, সোনার চাঁদ, জোড়া-মাণিক। বাবা! তোদের কোন ভয় নাই—আমি অতি সাবধানে রাখিব। রাজবাড়ীর ঢেঁড়রা শুনিয়াছি। সে জন্য কোন ভয় করি না। আমি তোদের কথা কাহারও নিকটে বলিব না। তোরা আমার পেটের সন্তান—আয় বাবা! আমার অঞ্চলের মধ্যে আয়, প্রাণের মাঝে রাখিব।"

ভ্রাতৃদ্বয় কোটর হইতে সজলনয়নে বাহির হইয়া পরিচারিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। দয়াবতী নারী বালকদ্বয়কে গাত্রবস্ত্রের আবরণে ঢাকিয়া আপন কর্ত্রীর নিকটে লইয়া গেলেন।

বালকদ্বয়ের কথা কুফা নগরে গোপন নাই। দ্বারে দ্বারে ঢেঁড়রা দেওয়া হইয়াছে—ধরিয়া দিতে পারিলেই পাঁচ সহস্র মোহর পুরস্কার, আশ্রয় দিলে তখনই শূলের অগ্রভাগে আশ্রয়দাতার প্রাণের শেষ,—তাহাতে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই। গৃহকর্ত্রী এসকল জানা সত্ত্বেও দুই ভাইয়ের মস্তকে চুমা দিয়া অঞ্চল দ্বারা তাহাদের চক্ষুজল মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! তোরা 'এতিম'। তোদের প্রতি যে দয়া করিবে, তাহার ভাল ভিন্ন কখনই মন্দ হইবে না। আয় বাবা, আয়! আমি তোদের মা, মায়ের কোল থেকে কেউ তোদের ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। তোদের এই মায়ের প্রাণ দেহে থাকিতে তোদের দুইজনকে কেহ লইতে পারিবে না। আয়! তোদের খুব নির্জ্জন গৃহে লইয়া রাখি। খোদা তোদের রক্ষক।" গৃহিণী দুই ভ্রাতাকেই বিশেষ যত্নে এক নির্জ্জন গৃহে রাখিলেন, বিছানা পাতিয়া দিয়া তাহাদিগকে কিছু আহার করাইলেন। প্রাণের ভয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিলেও খায় কে? গৃহকর্ত্রী আপন পেটের সন্তানের অনিচ্ছায় যেমন মুখে তুলিয়া দিয়া আহার করান, সেইরূপে খাদ্যসামগ্রী হাতে তুলিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে দিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে বলিলেন, "বাবা! তোমরা কথাবার্ত্তা বলিও না। চুপ করিয়া এই বিছানায় শুইয়া ঘুমাও। পুনঃ আহারের সময় উপস্থিত হইলে আমি আসিয়া তোমাদিগকে জাগাইয়া খাওয়াইব। তোমরা ঘুমাও, সারা রাত জাগিয়াছ, আর কত হাঁটাই হাঁটিয়াছ—ঘুমাও, কোন চিন্তা করিও না।"

যে বাড়ীর কর্ত্রী দয়াবতী, পরিচারিকাগণও প্রায় তাঁহারই অনুরূপ হইয়া থাকে। দেখা গেল—বালকদ্বয়ের কথা কর্ত্রী আর পরিচারিকা ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না।

বাটীর কর্ত্তার নাম হারেস্। কর্ত্তা বাটীতে ছিলেন না; কার্য্যবশতঃ প্রত্যুষেই নগরমধ্যে গমন করিয়াছিলেন। দিন গত করিয়া রাত্রি এক প্রহর পরে, তিনি আধমরার মত হইয়া বাটীতে আসিলেন। গৃহিণী বিলম্বের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে কর্ত্তা বলিলেন, "সে কথা আর কি বলিব! আমার কপাল মন্দ, আমার চক্ষে পড়িবে কেন? সারাটি দিন আর এই রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত কত গলি-পথে, কত বড় বড় রাস্তায় দোধারী ঘরের কোণের আড়াল-মধ্যে, কত ভাঙ্গা বাড়ীর বাহিরে ভিতরে, কত স্থানে খুঁজিলাম! আমার এ পোড়া অদৃষ্টে তাহা ঘটিবে কেন? আমি হতভাগ্য, চিরকাল দুঃখকষ্টের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা,—আমার চক্ষে পড়িবে কেন? অনটন আমার অঙ্গের ভূষণ, অলক্ষ্মী আমার সংসার ঘিরিয়া বসিয়াছে, শয়তান আমার হিতৈষী বন্ধু সাজিয়াছে, আমি দেখা পাইব কেন? আমার চক্ষে পড়িবে কেন? এত পরিশ্রম বৃথা হইল! সারাটি দিন উপবাস, না খাইয়া কত স্থানেই যে ঘুরিয়াছি, সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? হায় হায়! আমার কপাল! এক জনের চক্ষে অবশ্যই পড়িবে, সে লালে লাল হইবে!"

গৃহিণী বলিলেন, 'আসল কথা ত কিছুই শুনিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত বিলম্ব হইল কেন?' তুমি সাত গ্রাম বেড় দিয়া ভাগ্যলিপি—অদৃষ্ট মন্দ, এই সকল খামখেয়ালী কথা তুলিয়া বসিলে! সারাটি দিন, আর রাত্রিও প্রায় দেড় প্রহর—এত সময় কোথায় ছিলে? কি করিলে? তাহাই শুনিতে চাই। আর একটি কথা, আজ তুমি যেমন দুঃখের সহিত আক্ষেপ করিতেছ,—অদৃষ্টের দোষ দিতেছ—এরূপ আক্ষেপ, এরূপ কপালদোষের কথা ত আর কখনও তোমার মুখে শুনি নাই?'

হারেস দুঃখিতভাবে নাকীসুরে ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"তোমায় আর কি বলিব? আমাদের বাদশাহ্ জেয়াদ, মদিনার হজরত হোসেনকে প্রাণে মারিবার যোগাড় করিয়া, মিথ্যা স্বপ্ন, মিথ্যা রাজ্যদান ভাণ করিয়া হজরত হোসেনকে—"

গৃহিণী বলিলেন, "সে সকল কথা আমরা জানি। হজরত হোসেনের অগ্রে মোস্‌লেম আসিলেন, মোস্‌লেমকে কৌশল করিয়া মারিবার কথাও জানি।"

"তবে ত তুমি সকলই জান। সেই মোস্‌লেমের দুই পুত্র পলাইয়াছে। তাহাদের জন্য রাজসরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—ধরিয়া দিতে

পারিলেই এক হাজার মোহর পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রথম, তাহারা শহর-কোতোয়ালের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। বাদশাহ্-নামদারের দরবারে হাজির করিলে আমাদের বাদশাহ্ ছেলে দুইটির মুখের ভাব, সুশ্রী সুন্দর মুখ দুখানি ও দেহের গঠন দেখিয়া 'মাথা-কাটা'র আদেশ দিতে পারিলেন না; বন্দীখানায় কয়েদ করিতে অনুমতি করিলেন। বন্দীখানার প্রধান কর্ম্মচারী মস্কুর ছেলে দুইটির রূপে মোহিত হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। বাদশাহ্-নামদার পর্য্যন্ত সেই সংবাদ পৌঁছিলে, মস্কুরের শিরশ্ছেদ হইল। আজ আবার নূতন ঘোষণা জারী হইয়াছে, যে সেই পলায়িত ছেলে দুইটিকে ধরিয়া দিবে, তাহাকে পাঁচ হাজার মোহর পুরস্কার দেওয়া হইবে। যে আশ্রয় দিয়া গোপনে রাখিবে, মস্কুরের ন্যায় সেই দণ্ডেই তাহার শিরশ্ছেদ হইবে। আমি মোসলেমের ছেলে দুইটির জন্য আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া কোথায় না সন্ধান করিয়াছি! ধরিয়া বাদশাহের দরবারে হাজির করিতে পারিলেই পাঁচ হাজার মোহর! যে পাইবে, সে কতকাল বসিয়া খাইতে পারিবে, বুঝিয়া চলিলে হয় ত মহাধনী হইয়া কত পুরুষ পর্য্যন্ত সুখে থাকিতে পারিবে! এত সন্ধান করিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না। আজ বেশী টাকার লোভে হাজার হাজার লোক পাহাড় জঙ্গল, যেখানে যাহার সন্দেহ্ হইতেছে সেখানেই খুঁজিতেছে। আমি বহুদূরে গিয়াছিলাম। কোথাও কিছু না পাইয়া শেষে খোর্মার বাগান খুঁজিয়া তন্ন তন্ন করিলাম, প্রতি বৃক্ষের গোড়ায়, কোটরে খুঁজিলাম, কোথাও কিছুই পাইলাম না। তাহাতেই বলিতেছিলাম আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন! হতভাগার চক্ষে তাহারা ধরা পড়িবে কেন!"

গৃহিণী বলিলেন, "হায়! হায়! সেই পিতৃহীন অনাথ বালক দুইটিকে ধরিয়া দুরন্ত জালেম বাদশাহের নিকটে দিলে পাঁচ হাজার মোহর পাইবে তাহা সত্য, কিন্তু আর একটি হৃদয়-বিদারক মর্ম্মান্তিক সাংঘাতিক কথা কি তোমার মনে উদয় হয় নাই? নিরপরাধ দুইটি এতিমকে বাদশাহের হাতে দিলে, সে নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রাণ শাহ্ জেয়াদ কি তাহাদিগকে স্নেহ করিয়া যত্নে রাখিবে? না তাহাদের চির-দুঃখিনী জননীর নিকট মদিনায় পাঠাইয়া দিবে? হাতে পাইবামাত্র শিরশ্ছেদ—উহুঃ! বালক দুইটির শিরশ্ছেদের হুকুম প্রদান

করিবে! তাহা হইলে হইল কি? তুমিই বালক দুইটির বধের উপস্থিত কারণ হইলে। তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি মোহর পাইবে সত্য—আচ্ছা বল ত, সে মোহর তোমার কত দিন থাকিবে? এখন যে অবস্থায় আছ, দয়াময় দাতা অনুগ্রহকারী ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হও। তোমার সমশ্রেণীর লোক কত স্থানে কত প্রকার কষ্টভোগ করিতেছে। তোমার অপেক্ষা কত উচ্চ শ্রেণীর লোক তোমার হইতেও মন্দ অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। তুমি সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত—মহাসুখী। ইহার উপরেও তোমার লোভের অন্ত নাই। বিচারকর্ত্তা অদ্বিতীয় এলাহীর প্রতিও তোমার ভক্তি নাই, ভয়ও নাই। তিনি সর্ব্বদর্শী, তাহাও যেন তোমার মনে নাই। হায় হায়!! তোমার মত পাষাণপ্রাণ পাথরের দেহ ত আমি কাহারও দেখি নাই। পিতৃ-হীন নিরপরাধ বালকদ্বয়ের দেহরক্তের মূল্যই নরপতি জেয়াদের চক্ষে পাঁচ হাজার মোহর! হইতে পারে—তাঁহার চক্ষে অন্য রূপ! হউক পাঁচ হাজার মোহর! তুমি সে রক্তমাখা মোহরের জন্য এত লালায়িত কেন? তুমি কি বোঝ নাই যে, ঐ দুই বালকের শরীরের রক্তের মূল্য পাঁচ হাজার মোহর? তুমি রক্তমাখা মোহরলোভে বালক দুইটির অমূল্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের বিষময় অস্থায়ী সুখের প্রতি দৃষ্টি করিতেছ! আর এক কথা, সেও দিবে, আর তুমিও পাইবে! পাঁচ হাজার মোহরই তোমার লক্ষ্য, অন্তরেও এই কথাই জাগিতেছে—'বালক দুইটিকে যদি ধরিতে পারি, পাঁচটি হাজার খাঁটী সোণার মোহর! হা অদৃষ্ট!—আমার কপালে কি তাহা আছে?' মনে মনে এই ভাবের কথাই ত ভাবিতেছ? বার বার সেই নররক্তমাখা কদর্য্য মোহরগুলির প্রতিই অন্তর-চক্ষুতেই কল্পনায় সাজান দেখিতেছ? মোহরের জন্য প্রকাশ্যে আক্ষেপও করিতেছ! বালক দুইটির জীবনের মূল্য হইতে মোহরের মূল্যই অধিক স্থির করিয়াছ! জানিলাম, তোমার মনে দয়া-মায়ার একটি পরমাণুও নাই; এক ফোঁটা রক্তও নাই। তোমার হৃদয়ে সাধারণ রক্তও নাই,—পাথর চোয়াইয়া রস ঝরিতে পারে? তোমার হৃদয় পাষাণ, দেহটা পোড়া মাটির, অস্থিমজ্জাসমুদয় কঙ্করে পূর্ণ। ইহাতে আর আশা কি?"

"তুমি বুঝিবে কি? যাহাদের শরীর কিছুতেই সমানভাবে ঢাকে না—হাজার ঢাক, হাজার বেড় দেও —অসমান থাকিবেই থাকিবে, তাহারা জগৎ সংসারের কি বুঝিবে? তুমি বোঝ—প্রথম, অলঙ্কার,—তাহার পর টাকা-পয়সা, তাহার পর স্বামীকে একহাতে রাখা। আর কি বোঝ? মোস্‌-লেমের ছেলে দুইটির—মাথা কাটিবে রাজা জেয়াদ! তাহাতে তোমার চক্ষে জল আসে কেন? পরের ছেলের মাথা পরে কাটিবে, আমাদের কি? রাজা জেয়াদ মোস্‌লেমকে প্রাণে মারিয়াছে, তাহার ছেলে দুইটিকেও মারিয়া ফেলুক, ছেলের মাকে ধরিয়া আনিয়া হয় প্রাণে মারুক—না হয় ভালবাসিয়া রাণী করিয়া অন্তঃপুরে রাখুক,—তোমার আমার কি? মাঝখানে আমার পাঁচটি হাজার মোহর লাভ হইবে। এ কার্য্যে চেষ্টা করিব না? তোমার অঞ্চল ধরিয়া—চেনা নাই, জানা মাই, মোস্‌লেমের জন্য—তাহার দুইটি পুত্রের জন্য কাঁদিতে থাকিব? এরূপ বুদ্ধি আমার হইলে আর চাই কি?—সংসার টন্‌টনে —খাসা!—একেবারে কাবার! শুন কথাঃ ছেলে দুইটি যাহার চক্ষে পড়িবে, সেই-ই ধরিবে। ধরিলেও নিশ্চিন্ত নহে। বাধা বিঘ্ন অনেক। কত লোক ছুটাছুটি করিতেছে। কত গুণ্ডা ঐ গোঁজে বাহির হইতেছে। কাহার হাত হইতে কে কাড়িয়া লইয়া বাদশাহের দরবারে দাখিল করিবে—তাহা কে জানে? ধরিতে পারিলেও সাফল্যের আশা অতি কম! যাহা হউক, শুন আমার মনের কথাঃ যদি ছেলে দুইটিকে হাতে পাই—আর নিরাপদে জেয়াদ-দরবারে লইয়া যাইতে পারি —আর তোমার ভাল হউক—যদি পাঁচ হাজার মোহর পাই, তিন হাজার মোহর ভাঙ্গিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, আবার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ডবল পেঁচে সোণা দিয়া তোমার এই সুন্দর দেহখানি একেবারে মোড়াইয়া দিব। দেখ ত, এখন লাভ কত?"

গৃহিণী অতিশয় বিষণ্ণভাবে স্বামীর মুখ-চোখপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখ! আমি তোমার কথায় বাদ-প্রতিবাদ করিব না। বাধা দিতেও চাহি না!—তোমাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতাও আমার নাই। আমি তোমার নিকট মিনতি করিয়া বলিতেছি, সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি মোস্‌লেমের সেই ছেলে দুইটির সন্ধানে আর যাইও না—ইহাই প্রার্থনা।

আমি তোমার নিকট রতি-পরিমাণ সোণাও চাহি না এবং ও-রক্তমাখা মোহরের জন্য লালায়িত নই। পিতৃহীন বালকদ্বয়ের শোণিতরঞ্জিত মোহর চক্ষেও দেখিতে ইচ্ছা করি না। ছুঁইতেও পারিব না! জীবন কয় দিনের? ঈশ্বরের নিকট কি উত্তর দিবে? আমি তোমার দুইখানি হাত ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, আমার মাথার দিব্বি দিয়া বলিতেছি, তুমি লোভের বশীভূত হইয়া এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।”

হারেস্ স্ত্রীরত্নের কথায় ক্রোধে আগুন হইয়া রক্তলোচনে আঁখি ঘুরাইয়া বলিলেন,—“চুপ্! চুপ্! নারীজাতির মুখে ধর্ম্মকথা আমি শুনি না। এখন খাইবার কি আছে, শীঘ্র শীঘ্র আন। একটু বিশ্রাম করিয়া এই রাত্রেই আবার সন্ধানে বাহির হইব। দেখি কপালে কি আছে! তোর ও-মিছরীমাখা কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।”

হারেসের স্ত্রী আর কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। হারেস মনে মনে নানা চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কে আহার করিলেন এবং হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তখনি শয়ন করিলেন। এত পরিশ্রমেও তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই। কোথায় ছেলে দুইটিকে পাইবেন, কোন্ পথে, কোথায় কোন্ স্থানে গেলে তাহাদের দেখা পাইবেন, দেখা পাইয়া কি প্রকারে ধরিয়া রাজদরবারে লইয়া যাইবেন, এইসকল চিন্তাই তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। বালক দুইটির দেখা পাওয়া—পাঁচ হাজার সোণার টাকা, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বহুক্ষণ পরে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী দেখিলেন,—স্বামী ঘোর নিদ্রায় অচেতন। কি উপায়ে ছেলে দুইটিকে রক্ষা করিবেন, এই চিন্তা করিয়া পরামর্শে বসিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি ও পরিচারিকা ভিন্ন বাড়ীর অন্য কেহও বালকদ্বয়ের কথা জানেন নাই। এখন বাধ্য হইয়া স্বামীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া, তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া দয়াবতী স্নেহময়ী রমণী অস্থির হইয়াছেন। কি উপায়ে পিতৃহীন বালকদ্বয়কে রক্ষা করিবেন? স্বামীর অদ্যকার মনের ভাবে—ভয়ের কারণই অধিক, আর আশ্রয়ের স্থানই বা কোথা? সত্য প্রকাশ পাইলে ছেলে দুইটির মাথা যায়! এমন কি, নিজের প্রাণের আশাও অতি সঙ্কীর্ণ! স্বামী পুরস্কার-লোভে

স্ত্রীর বিরোধী হইতে পারেন! আর একটি গোলের কথা, স্বামীর সঙ্গে বালক দুইটি লইয়া কথান্তর হইলে পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই জানিবে। ভাল করিতে কেহ আগে বাড়িতে চাহে না, কিন্তু মন্দ করিতে কোমর বাঁধিয়া দৌড়াইতে থাকে। রাজদরবারে যাইয়া বলিলেই হইল—অমুকের ঘরে ছিল—অমুক স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে ছিল! আর প্রাণের আশা কি!—এই সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি আরও দুইটি লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করাই স্থির করিলেন।

এক জন তাঁহার গর্ভজাত পুত্র;—বুদ্ধিমান বিচক্ষণ—দয়ার শরীর। সে শরীরে পিতার গুণ অল্প ছিল, মাতর গুণ অধিক। সেই এক জন, আর একজন, তাঁহার গর্ভজাত পুত্র নহে,—পালিত পুত্র। শৈশবকাল হইতে আপন স্তন্য পান করাইয়া তিনি তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। সেই পালিত পুত্র তাঁহার সম্পূর্ণ গুণের অধিকারী হইয়াছে। সেই-ই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আপন গর্ভজাত পুত্র তাহার পিতা হারেসের কথা অমান্য করিতে পারে না। অন্যায় কার্য্য হইলেও প্রতিবাদ করে না,—চুপ করিয়া নীরব থাকে। পালিত পুত্রটি তাহা নহে। সে জননীর অনুগত—বাধ্য। হারেসের কথা সে শুনে না। হারেস কোন অন্যায় কথা বলিলে, সে অকপটে নির্ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করে। তাহার মনের ধারণাই এই,—'যাঁহার শরীরের শোণিতে আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, দেহ বৃদ্ধি হইয়াছে, যাঁহার স্নেহ-মমতা, অনুগ্রহে আমি এত বড় হইয়াছি, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব—তিনিই আমার পূজনীয়া। তিনিই আমার মুক্তিদাত্রী মাতা—মাতাই আমার সম্বল—মাতাই আমার বল।'

হারেস-জায়া নিশীথ সময়ে দুই পুত্রকেই চুপি চুপি ডাকিলেন; অন্য কক্ষে আনিয়া অতি নির্জ্জন স্থানে তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া বসিলেন।

পালিত পুত্রকে বলিলেন, "বাবা! তুই আমার পেটে না জন্মিলেও আমি তোকে আমার বুকের দুধ দিয়া প্রতিপালন করিয়াছি। কত মল-মুত্র এই হাতে পরিষ্কার করিয়া তোকে বাঁচাইয়াছি। বাবা! তুই আমার শরীরের সার অংশ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিস। আমার শরীরের রক্ত-মাংসে তোর দেহপুষ্টি হইয়াছে।" পরে আপন গর্ভজাত সন্তানের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা!

তোতে আর এতে ভিন্ন কি ? অতি সামান্য ! সেই সামান্য অংশটুকু ছাড়িয়া দিলে—তুইও যেমন, (পালিত পুত্রের হস্ত ধরিয়া)—এও তেমনি। পরিচারিকাকে যে কথা বলিতে বলিয়াছিলাম তোমাদের দুইজনকে একত্রে বসাইয়া সে তাহা বলিয়াছে। তোমরা সকলই শুনিয়াছ। এখন সেই বালক দুইটির রক্ষার উপায় কি ? আমি ভাবিয়াছিলাম—তোমাদের পিতা বাটী আসিলে ছেলে দুইটির কথা বলিব। তিনি কতই দুঃখ করিবেন, ছেলে দুইটির রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন ! এখন দেখিতেছি, তিনিই তাহাদের সংহারক, তিনিই তাহাদের প্রাণনাশক প্রধান শত্রু। মোহরের লোভে তিনি ঐ বালক দুইটিকে ধরিবার জন্য বহু চেষ্টা, বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া এই রাত্রেই পুনরায় তাহাদের অন্বেষণে ছুটিবেন। তিনি যদি বালক দুইটির সন্ধান পান, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কিছুতেই তাহারা দুরন্ত বাঘের মুখ হইতে রক্ষা পাইবে না—বাঁচিবে না। এক্ষণে তোমরাই আমার সহায়-সম্বল-বল, তোমরা দুই ভাই যদি আমার সহায়তা কর, তোমরা দুই ভাই যদি আমার পক্ষে থাকিয়া পিতৃহীন বালক দুইটির রক্ষার জন্য চেষ্টা কর, তবে তাহারা বাঁচিতে পারে। তোমাদের পিতার চক্ষে পড়িলে কিন্তু কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।”

দুই ভাই বলিল,—“মা ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমরা সকলই শুনিয়াছি,—বালকদ্বয়ের অবস্থা সকলই জানিয়াছি ; তাহারা বাটীতেই আছে তাহাও জানি। আপনি অত উতলা হইবেন না। পিতা গুরুজন, তাঁহার নিন্দা করিব না। আমরা তাঁহার অর্থলালসার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি,—আক্ষেপ করিয়াছি। কি করি, পিতা গুরুজন,—তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করা মহাপাপ। যাহাই হউক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইলেই আমরা দুই ভাই বালকদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া মদিনার পথে যাইব। যদি সুবিধা করিতে পারি, ভালই ; না করিতে পারি, আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া মদিনায় তাহাদিগকে রাখিয়া আসিব।”

গৃহিণী সন্তুষ্টচিত্তে অথচ চক্ষুজলে ভাসিতে ভাসিতে দুই পুত্রের দুই হাত দুই করে ধরিয়া আপন মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন, “বাবা ! তোরা আমার

মাথার উপর হাত রাখিয়া বল—'আমরা সাধ্যানুসারে বালকদ্বয়কে রক্ষা করিব'।

পুত্রদ্বয় অকপটচিত্তে অঙ্গীকার করিল, বলিল, "মা! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, বালকদ্বয়ের অনিষ্ট সম্বন্ধে আমাদের পিতার কোন কথা আমরা শুনিব না! বরং তাঁহার বিরোধী হইব। আপনার আদেশ, আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যদি আমাদের প্রাণও যায়, তথাপি আপনার আদেশের অন্যথা করিব না, কি পশ্চাদ্‌পদ হইব না।"

দুই পুত্র আর গৃহিণী এক কক্ষে পরামর্শ করিতেছেন। অন্য কক্ষে অতি নির্জ্জন স্থানে ভ্রাতৃদ্বয় শুইয়া আছেন। ভিন্ন আর এক কক্ষে হারেস শুইয়া আছে। ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই! মোহাম্মদ ও এব্রাহিম নির্জ্জন কক্ষে নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, হঠাৎ মোহাম্মদ জাগিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এব্রাহিমকে জাগাইয়া ব'লিলেন,—"ভাই রে! আর ঘুমাইও না। শুন—স্বপ্ন-বিবরণ শুন। এখনই পিতাকে স্বপ্নে দেখিলাম। শুন, অতি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! স্বপ্নে দেখিয়াছি, আকাশের দ্বার হঠাৎ খুলিয়া গেল। স্বর্গীয় সৌরভে জগৎ আমোদিত ও মোহিত হইল। দেখিলাম, স্বর্গীয় উদ্যানে হজরত মোহাম্মদ রসুল মকবুল (দঃ), হজরত আলী (কঃ), হজরত বিবি ফাতেমা জোহরা এবং হজরত হাসান উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। পিতৃদেব তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছেন। আমরা দুই ভ্রাতা দূরে দাঁড়াইয়া আছি। ইতিমধ্যে হজরত রসুল মকবুল আমাদের পিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মোসলেম! তুমি চলিয়া আসিলে, আর তোমার পুত্র দুইটিকে জালেমের হস্তে রাখিয়া আসিলে?"

পিতৃদেব করজোড়ে নিবেদন করিলেন,—"হজরত! এলাহীর কৃপায় তাহারাও আগামী কল্য ইন্‌শা আল্লাহুর পবিত্র পদ-চুম্বনের জন্য আসিবে।"

এব্রাহিম বলিলেন,—"ভাই, আমিও ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছি। আর চিন্তা কি? রাত্রি প্রভাতেই আমরা পিতৃদেবের নিকটে যাইব। এস ভাই, এইক্ষণে দুই ভাই গলাগলি করিয়া একবার শয়ন করি। জগতে আমাদের আজ নিদ্রার শেষ, নিশারও শেষ। আমাদের পরমায়ুরও শেষ। এস

ভাই, এস! গলাগলি করিয়া একবার শয়ন করি।" দুই ভাই এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেই পাপমতি হারেসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অতি ত্রস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাড়ীতে বালকের ক্রন্দন! কাহার ক্রন্দন? কোথায় তাহারা? কোথা হইতে তাহারা আসিয়াছে? কে তাহাদিগকে তোমার নিকটে আনিয়া দিল? শীঘ্র শীঘ্র প্রদীপ জ্বালিয়া আন; আর যাহারা কাঁদিতেছে, তাহাদিগকেও আমার সম্মুখে শীঘ্র শীঘ্র লইয়া আইস।"

হারেস্-জায়া নীরব! কারণ, দুর্দ্দান্ত স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ—প্রদীপ জ্বালিতে আদেশ, "যাহারা কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস"—এই সকল কথায় সতী-সাধ্বী দয়াবতীর প্রাণপাখী যেন দেহ-পিঞ্জর হইতে 'উড়ু উড়ু' করিতে লাগিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই বোধ নাই—জ্ঞান নাই —তিনি নীরব রহিলেন! হারেস গৃহিণীর এইরূপ ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন, মনে মনে বলিলেনঃ এ কি? হঠাৎ এরূপ হইল কেন? তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এ কি ভাব হইল?" কোন উত্তর নাই! গৃহিণী নির্ব্বাকে, এক ধ্যানে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। হারেস স্ত্রীর এইরূপ অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া নিজেই প্রদীপ জ্বালিয়া যে গৃহ হইতে ক্রন্দন-শব্দ বাহির হইতেছিল, সন্ধান করিয়া প্রদীপহস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, —দুইটি বালক গলাগলি করিয়া শুইয়া কাঁদিতেছে। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এ কাহারা? আমার বাড়ীর নির্জ্জন স্থানে পরম রূপবান্ দুইটি বালক শয়নাবস্থায় কাঁদে কেন?" তখন তিনি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোরা কে? কাঁদিস্ কেন? শীঘ্র বল্, কে তোরা?"

বালকদ্বয় সভয়ে উত্তর করিলেন, "আমরা হজরত মোস্লেমের পুত্র।" হারেস নিকটে যাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, "মোসলেমের পুত্র! তোমরাই মোসলেমের পুত্র! আমি কি আহম্মক—কি পাগল! ঘরে শিকার রাখিয়া জঙ্গলে ঘুরিতেছি! কি পাগলামী! যাক্, যাহা হইবার হইয়াছে! আমার অদৃষ্টজোরেই শিকার ঘরে আসিয়াছে! পাঁচ হাজার মোহর পায়ে হাঁটিয়া আমার নির্জ্জন ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে! এখন কি করি?

রাত্রি প্রভাত হইতে অনেক বিলম্ব। কিন্তু আর যাইবে কোথা ?”—এই বলিয়া দুই ভ্রাতার জোল্‌ফে জোল্‌ফে বন্ধন করিলেন। চুলে টান পড়ায় দুই ভাই কাঁদিয়া উঠিতেই হারেস্—নির্দ্দয় হারেস্ উভয় ভ্রাতার সুললিত কোমল গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন,—“চুপ্! চুপ্! কাঁদ্‌বি ত এখনই মাথা কেটে ফেল্‌বো।”

বলিতে বলিতে দুই ভ্রাতার হস্ত বন্ধন করিয়া, দ্বারে জিঞ্জির লাগাইয়া, দ্বার ঘেঁসিয়া শয্যা পাতিয়া তিনি তরবারি-হস্তে বসিয়া রহিলেন। স্বগত বলিতে লাগিলেন,—“আর ঘুমাইব না। আর কি—হোঃ হোঃ! আর কি!—প্রভাতেই মোহরের তোড়া, মোহরের ঝন্‌ঝনা, এইবার সুখের সীমা কত দূর—দেখিয়া লইব!”

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পা দুইখানি ধরিয়া বলিলেন,—“ছেলে দুইটির প্রতি দয়া কর।”

হারেস বলিলেন,—“দয়া ত করিবই, রাত্রিটা আছে বলিয়া ‘দয়া’ দেখিতে পাইতেছ না, একটু পরেই দয়া-মায়া সকলই দেখিবে।”

“দেখ তুমি আমার স্বামী! তোমার পায়ের উপর এই মাথা রাখিয়া বলিতেছি, ছেলে দুইটির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিও না। এতিমের উপর কোনরূপ কর্কশ ব্যবহার করিতে নাই। ছেলে দুইটির প্রতি দয়া কর। টাকা কয় দিন থাকিবে ?”

হারেস স্ত্রীর মাথায় পদাঘাত করিরা বলিলেন,—“দূর্ হ হতভাগিনী, দূর হ!—আমার সম্মুখ হ’তে দূর হ! তোকে কি বলিব—তুই চ’লে যা! তোর কথা শুনবো কি না! পাঁচ হাজার মোহর লক্ষ্মীর কথায়, বুড়ী রূপসীর মায়া-কান্নায় ছাড়িয়া দিব ? এ ত আমার ঘরে তোলা টাকা। দেখ্!—ফের্ আমার এই বিছানার নিকটে আস্‌বি ত মাথা মাটিতে গড়াইয়া দিব!”

“তোরা সকলে ভেবেছিস কি ? আমার চক্ষেও ঘুম নাই! তোদের চক্ষেও ঘুম নাই! আর তোরা কখনই এ কথা মনে করিস না যে, মোস্‌লেমের দুই পুত্র আমার হাতছাড়া হইবে,—তাহা হইবে না। আর তোরা যা ভাব্‌ছিস তাও হ’বে না। আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, মোসলেমের দুই

পুত্রকে জীবন্তভাবে মহারাজ জেয়াদের দরবারে লইয়া যাইতে আমার মত লোকের সাধ্য নাই। পথে বাহির হইলেই চারিদিকে পুরস্কারলোভী গুণ্ডার দল বালক দুইটিকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। কি অন্যায় কথা! ধরিলাম আমি—পুরস্কার পাইব আমি, তাহা না হইয়া যার বল বেশী, সেই-ই বলপূর্ব্বক লইয়া মহারাজ জেয়াদের দরবারে উপস্থিত করিয়া বিজ্ঞাপিত পুরস্কার লইবে! টাকার লোভ বড় শক্ত লোভ! আমি সে সকল ভবিষ্যৎ আশঙ্কার মধ্যেই যাইব না। রাত্রি প্রভাত হইলেই মোস্‌লেম-পুত্রদ্বয়ের শুধু মস্তক লইয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত হইব। তাহাতেই আশা পূর্ণ, কার্য্যসিদ্ধি! তাহাতেই মহারাজ অধিক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইবেন!"

স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া হারেস বলিলেন,—"তুই স্ত্রীলোক! ওরে তুই কি বুঝ্‌বি? এ সকল উপার্জ্জনের অঙ্গ তুই কি বুঝ্‌বি রে?—ছেলে দুটাও দেখ্‌ছি ওদের পাগলী মায়ের কথায় পাগল হইয়াছে! আমার চক্ষেও ঘুম নাই! তোদের চক্ষেও ঘুম নাই! যা যা, তোরা বিছানায় যা!" এদিকে রাত্রি প্রভাত হইল—কুক্কুটদল সপ্তস্বরে কুফা নগরকে জাগ্রত করিতে লাগিল।

হারেস প্রত্যূষে উঠিয়াই মোসলেমের পুত্রদ্বয়কে বন্ধন করিলেন এবং ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া সু-ধার তরবারি ও ঘোড়ার বাগডোর হস্তে ধরিয়া ফোরাত নদীতীরে যাইতে লাগিলেন। হারেসের দুই পুত্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইল। গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে মাথায় ঘা মারিতে মারিতে অশ্বপশ্চাতে ছুটিলেন। গৃহিণীও দুই পুত্রসহ গোপনে পরামর্শ করিয়াছেন, যে কোন উপায়েই হউক তাঁহারা তিনজনে একত্রে বালক দুইটিকে রক্ষা করিবেন,—উপস্থিত যমের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন! পুত্রদ্বয় মাতার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—'দেহে প্রাণ থাকিতে, আমাদের দুই ভ্রাতার শির স্কন্ধে থাকিতে, মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের শির দেহবিচ্ছিন্ন হইতে দিব না।' দৌড়াইতে দৌড়াইতে সকলেই ফোরাত নদীতীরে উপস্থিত হইলেন।

হারেসের ক্ষণকাল বিলম্ব সহিতেছে না। শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিয়া দুই ভ্রাতার দুইটি মাথা মহারাজ জেয়াদ-দরবারে উপস্থিত করিতে পারিলেই তাঁহার

কার্য্যের প্রথম পালা শেষ হয়। দ্বিতীয় পালা মোহরগুলি গণিতে যা বিলম্ব! যে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বালকদ্বয়ের মাথা চাপাইয়া রাজদরবারে যাইবেন, সেই ঘোড়ার পৃষ্ঠেই মোহরের ছালা তুলিয়া শীঘ্রই বাটীতে আসিতে পারিবেন—এইরূপ কার্য্যপ্রণালী মনে মনে স্থির করিয়া হারেস শীঘ্র শীঘ্র বালকদ্বয়ের মাথা কাটিতে আগ্রহ করিতেছেন। তিনি বালক দুইটিকে অশ্ব হইতে নামাইয়া সম্মুখে স্থাপন করিলেন। বালকদ্বয় স্বপ্নে যদিও পিতা মোসলেমকে দেখিয়া শীঘ্রই পিতার নিকট যাইতে হইবে—ইহা স্বপ্নযোগে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কতক্ষণ? কুহকিনী দুনিয়ার এমনই মায়া যে, তাহাকে ছাড়িবার কথা কর্ণে প্রবেশ করিলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মৃত্যুর কথা মনে পড়িলেই হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রাণের মায়া কাহার না আছে? মোসলেমের পুত্রদ্বয় হারেসের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উলঙ্গ খরধার অসিহস্তে কালান্তকের ন্যায় রক্তজবা সদৃশ আঁখিতে চাহিয়া হারেস বালক দুইটিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

দুই ভাই কাঁদিতে কাঁদিতে হারেসের পদতলে মাথা রাখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দোহাই তোমার! আমাদিগকে প্রাণে মারিও না। তোমার পদতলে মাথা রাখিয়া বলিতেছি, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আমাদের চিরদুঃখিনী মায়ের মুখখানি একবার দেখিতে ছাড়িয়া দাও—মদিনায় যাই। আর কখনও কুফায় আসিব না।"

বালকদ্বয়ের কাতর ক্রন্দনে পাষাণপ্রাণ হারেসের কিছুই হইল না। দুরন্ত নরপিশাচের কর্ণে পিতৃহারা বালকদ্বয়ের করুণ ক্রন্দন প্রবেশই করিল না; একটি বর্ণও না। হারেস বালকদ্বয়ের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করেন, আবার কে যেন বাধা দেয়, থামিয়া যান। আবার ক্ষণকাল পরে মুখ চোখ লাল করিয়া, আঁখিদ্বয়ের তারা বাহির করিয়া, বালকদ্বয়ের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করেন, আবার থামিয়া যান। কি মর্ম্মঘাতী দৃশ্য! হারেসের এই অত্যাচার. অমানুষিক ব্যবহার ও হৃদয়বিদারক ঘটনার সূত্রপাত, মুক্ত আকাশে দিননাথ শতসহস্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া দেখিতেছেন। ফোরাত নদীতীরে এই ঘটনা, ফোরাত-জলও দেখিয়া যাইতেছে, প্রবাহে প্রবাহে হারেসের এই কু-কীর্ত্তি দেখিয়া বহিয়া

চলিয়া যাইতেছে। নদীতীরে পিতৃহারা অনাথ দুইটি বালক, কৃপাণধারী যমদূত-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, "ওগো! আমাদিগকে প্রাণে মারিও না।" তাঁহারা প্রাণের দায়ে হন্তার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "আমরা দুঃখিনীর সন্তান। জনমের মত পিতাকে এই দেশে হারাইয়াছি। মায়ের মুখখানি দেখিব। তোমার নিকটে প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি—আমাদের প্রাণভিক্ষা দাও। আমরা জীবনে আর কুফায় আসিব না।"

বালক দুইটি কতই অনুনয় বিনয় করিলেন—হারেসের মন গলিল না। হারেসের সম্মুখে বধ্যভূমে বালকদ্বয় দণ্ডায়মান। বাম পার্শ্বে হারেসের দুই পুত্র,—বিষণ্নবদনে দণ্ডায়মান। দয়াবতী হারেস-জায়াও পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎ—মোস্‌লেম-পুত্রদ্বয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামী-ভয়ে নীরবে কাঁদিয়া চক্ষুজলে ভাসিতেছেন। হারেস এক একবার তরবারি উত্তোলন করেন, আবার থামিয়া যান। একবার বালকদ্বয়ের মুখের দিকে, তৎপরেই ফোরাতের জলস্রোতের দিকে চাহিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করেন। এইরূপে ক্রমেই বিলম্ব হইতে লাগিল।

হারেস যেন বিরক্ত হইয়া পালিত পুত্রকে বলিলেন,—"পুত্র! ধর ত আমার এই তরবারি। আজ দেখিব তোমার তরবারির হাত। এক আঘাতে দুইটি বালকের মাথা মাটিতে গড়াইয়া দাও দেখি।"

পুত্র উত্তর করিল, "পিতঃ! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি উহা পারিব না। নিষ্পাপ, নিরপরাধ, দোষশূন্য দুইটি পিতৃহীন অনাথ বালককে টাকার লোভে বধ করিতে পারিব না—কখনই পারিব না। বরং ঐ বালকদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা করিতে যাহা আবশ্যক তাহা করিব। আমার প্রাণ দিব, তথাপি ঐ বালকদ্বয়ের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইতে দিব না। আপনার এ অবৈধ আদেশ কখনই প্রতিপালন করিব না। টাকার লোভে মানুষ খুন, এ মানুষের কার্য্য নহে—ডাকাত! ডাকাত!!"

হারেস রোষ-কষায়িত লোচনে রক্ত আঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে লাগিলেন,—"কি রে পামর! আমার কার্য্য তোর চক্ষে হ'ল অবৈধ? তোর এত বিচারে কাজ কি? আর এত লম্বা-চওড়া কথা তুই কার কাছে

শিখেছিস ? তুই আমার হুকুম মান্‌বি কিনা তাহাই বল্ ? তুই বেটা ভারি অবাধ্য !”

“আপনি যাহাই বলুন, আমি মানুষ খুন করিতে পারিব না ! আর এই দুইটি বালককে আমি রক্ষা করিবই। আমি এতক্ষণ কিছুই বলি নাই। দেখি, আপনি পাপের কোন্ সীমায় গিয়া উপস্থিত হন ! জানিবেন—পিতা বলিতে ঘৃণা বোধ হইতেছে—জানিবেন, দস্যু মহাশয় ! জানিবেন, লোভীর লোভ পূর্ণ হয় না। ঈশ্বর তাহার মনের আশা পূর্ণ করেন না। এই দেখুন তাহার দৃষ্টান্ত।”

পরে সে বালকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া বলিল,—“এস ভাই, তোমরা এস ! আমি তোমাদিগকে এখনই মদিনায় লইয়া যাইতেছি।”

বালকদ্বয় মদিনার নাম শুনিয়াই যেন প্রাণের ভয় ভুলিয়া গেলেন। হারেসের পালিত পুত্র হস্ত বাড়াইয়া বালকদ্বয়ের হস্ত ধরিয়া ক্রোড়ের দিকে টানিয়া আনিতেই হারেস ক্রোধে এক প্রকার জ্ঞানহারা হইয়া বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—“ওরে নিমক-হারাম ! আমার হাত থেকে বালকদ্বয়কে তুই কাড়িয়া লইবি ? তোর এত বড় ক্ষমতা ? এত বড় মাথা ? তোকেই আগে শিক্ষা দিই।” পালিত পুত্রের দক্ষিণ হস্ত মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের দিকে প্রসারিত ! বালকদ্বয়েরও ঐ প্রসারিত হস্ত ধরিতে একটু মাথা নোওয়াইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা ! এই সময়ে হারেসের তরবারি পালিত পুত্রের গ্রীবা-লক্ষ্যে উত্তোলিত হইল। চক্ষের পলক পড়িতেও অবসর হইল না। হারেসের আঘাতে পালিত পুত্রের শির ফোরাতকূলে বালুকা-মিশ্রিত ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। হারেসের রক্তরঞ্জিত তরবারি ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। গৃহিণী পালিত পুত্রের অবস্থা দেখিয়া আর ক্রন্দন করিলেন না ; স্ত্রী-স্বভাব বশতঃ অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারও দেখিলেন না। তিনি আপন গর্ভজাত পুত্রের প্রতি আদেশ করিলেন,—“বাছা এই ত সময়, তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ কর। বালক দুইটিকে রক্ষা কর !” মাতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তিনি পিতৃহীন বালকদ্বয়কে রাক্ষস হারেসের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে এক লম্ফে বালকদ্বয়ের নিকটে গিয়া পড়িলেন। হারেস পালিত পুত্রের শির দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া

বালকদ্বয়ের প্রতি অসি উত্তোলন করিতেই দয়াবতী গৃহিণী গর্ভজাত সন্তানের প্রতি সঙ্কেতে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র বীরপুত্র বালকদ্বয়কে বুকের মধ্যে করিয়া আঘাত ব্যর্থ করিলেন। হারেস ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"ওরে! তুইও তোর মায়ের কথায় আমার বিরোধী হ'য়েছিস? আমার কাজে বাধা দিতে পার্‌বি না। মোস্‌লেম—পুত্রদ্বয়কে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বি না—পার্‌বি না। ওরে মূর্খ! তোর জন্যও যমদূত দণ্ডায়মান। ছেড়ে দে ছোঁড়া দু'টোকে!"

পুত্র বলিল—"কখনই ছাড়িব না। নরপিশাচ অর্থলোভীর অর্থলাভ জন্য জীবন্ত জীবকে নরব্যাঘ্রের হস্তে দিব না—দিব না!"

"দিবি না? আচ্ছা যা, তুইও যা,—বিদ্রোহী পুত্রকে চাই না। যা বেটা জাহান্নামে যা!"

তরবারি কম্পিত হইয়া বিজলীবৎ চমকাইল। তরবারি স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের গ্রীবাদেশে বসিয়া আঘাতে তাহার শির ফোরাতকূলে দেহ-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। গৃহিণীর চক্ষের উপর এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিতেছে। পালিত পুত্র, গর্ভজাত পুত্র—দুই পুত্রের খাণ্ডত দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে। দুইটি মস্তক যেন তাঁহারই মুখের দিকে চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া আছে। এখনও চক্ষুর পাতা বন্ধ হয় নাই, চারিটি চক্ষু এক দৃষ্টে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই আছে। এ দৃশ্য দেখিয়া গৃহিণী পুত্রদ্বয়ের কথা মনেই করিলেন না, স্বামীর ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াও ভয় করিলেন না। বালকদ্বয়ের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য—কি উপায়ে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন, এই চিন্তাই তখন প্রবল। হারেস রক্তরঞ্জিত তরবারির দ্বারা বালকদিগের মস্তকে আঘাত করিবেন, এমন সময়ে গৃহিণী, "ও কি কর—ও কি কর" বলিয়া তরবারিসমেত স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী, আমি এত অনুনয়-বিনয় করিতেছি, মোস্‌লেম-পুত্রদ্বয়ের শিরে অস্ত্রাঘাত করিও না। দেখ! একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ! তোমার কর্ম্মফল দেখ! টাকার লোভে পুত্রসম পালিতপুত্রের প্রাণ বিনাশ করিলে! তোমার হৃদয়ের সার, কলেজার অংশ—নয়নের মণি যুবক পুত্রকে টাকার লোভে দুই খণ্ড করিলে! ভালই

করিলে! টাকার লোভে আজ তোমার নিকটে পিতৃস্নেহও পরাস্ত হইল। ভালই করিলে! তোমার এ কীর্ত্তিগান চিরকাল জগতের লোকে গাহিবে। দুঃখ নাই!—তোমার পুত্রের প্রাণ তুমি বিনাশ করিয়াছ, তাহাতে হতভাগিনীর দুঃখ নাই। তবে তোমার ঔরসজাত নয়, আমার গর্ভে জন্মে নাই, কিন্তু আমার বুকের দুধ দিয়া যাহাকে পালিয়া পুষিয়া এত বড় করিয়াছিলাম—সেই পালিত পুত্রের জন্য মনটা একটু দমিয়াছে। তাই বলিয়া তোমাকে কিছু বলিব না। এ কথা তুমি নিশ্চয় জানিও—আমি বাঁচিয়া থাকিতে, আমার প্রাণ দেহে থাকিতে আমার সম্মুখে তোমাকে মোস্‌লেম-পুত্রদ্বয়ের মাথা কাটিতে দিব না, কখনই দিব না। আগে আমাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর, তাহার পর মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের গায়ে হাত দিও—অস্ত্র বসাইও।"

মানুষের কু-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে আর কি রক্ষা আছে? হারেস বলবান্, কৌশলী। তিনি কৌশলে স্ত্রীর হাত ছাড়াইয়া রক্ত—আঁখি ঘুরাইয়া বলিলেন,—"তোকে তোর ছেলের নিকট পাঠাচ্ছি। যা তোর ছেলে কোলে ক'রে শুয়ে থাক্।" তাহার পর বিষম রোষে তিনি স্ত্রীর প্রতি আঘাত করিলেন!—"যা শুইয়া পড়্! শুইয়া শুইয়া তামাসা দেখ্!"

হারেসের স্ত্রী মৃত্তিকায় পড়িতেই হারেস উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"এই মোস্‌লেমের পুত্রদ্বয় যায়! কে রক্ষা কর্‌বি আয়! মোহাম্মদের শিরে তরবারি তুলিতেই এব্রাহিম কাঁদিয়া বলিলেন, "দেখ হারেস! আগে আমার মাথা কাট।" তিনি মাথা নোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি বড় ভাইয়ের মাথা-কাটা এই চক্ষে দেখিতে পারিব না। হারেস! তোমার পায়ে ধরি, আগে আমার মাথা কাট।" হারেস মোহাম্মদকে ছাড়িয়া এব্রাহিমের মাথায় তরবারি তুলিতেই মোহাম্মদ কাঁদিয়া বলিলেন, "হারেস! অমন কার্য্য করিও না—কখনও করিও না। আমার প্রাণতুল্য কনিষ্ঠ ভাই! আমারই মাথা আগে কাট, বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মাথা-কাটা কোন্ প্রাণে দেখিবে? দোহাই তোমার—দোহাই তোমার ধর্ম্মের—আগে আমার মাথা কাট।"

হারেস মোহাম্মদের কথায় থতমত খাইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিয়াই

মহা সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসি ঘুরাইয়া বলিলেন,—"তোদের কাহারও কথা শুনিব না, আর শুনিব না, বিলম্বও করিব না। ভ্রাতৃ-মায়া মিটাইয়া দিতেছি!"—বলিয়াই অগ্রে মোহাম্মদের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। পরে কনিষ্ঠা ভ্রাতা এব্রাহিমের মাথা মাটিতে গড়াইয়া দিলেন। মোস্‌লেম-পুত্রদ্বয়ের মৃতদেহ ফোরাত জলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের মস্তক অতি সাবধানে লইয়া হারেস অশ্বে চাপিলেন। রক্তমাখা তরবারি-হস্তেই একেবারে মহারাজ জেয়াদের দরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন,—

"বাদশাহ্‌-নামদারের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি। তবে আজ্ঞার কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়াছে। আপনি যাহা করিতেন, তাহাই করিয়াছি। জীবন্ত আনিতে পারি নাই, অপরে কাড়িয়া লইবে সন্দেহে জীবনান্ত করিয়া—দুই ভাইয়ের এই 'মাথা'দুটি আনিয়াছি—এই দেখুন! আমার পুরস্কার—আপনার আদিষ্ট পুরস্কার আমাকে দিন, আমি চলিয়া যাই। স্বীকৃত পঞ্চ সহস্র মোহর আনিতে আজ্ঞা করুন। মহারাজ! ছেলে দুইটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে!"

নরপতি আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদ, রাজদরবারের সভাসদ্‌গণ, অমাত্যগণ, দরবারের যাবতীয় লোক হারেসের এই অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। সকলেই মোসলেমের পুত্রদ্বয়ের জন্য অন্তরে বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। কাহারও মুখে কোন কথা সরিল না।

নরপতি আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদ হারেসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন,—"ওহে! সুন্দর বালক দুইটিকে এরূপভাবে শিরশ্ছেদ করিলে কেন? যাও, শীঘ্র দরবারের বাহিরে যাও। উহাদের ধূলি-রক্তজমাটযুক্ত মস্তক ধৌত করিয়া একটি পরিষ্কার পাত্রে করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন কর।"

হারেস তখনই মস্তকদ্বয় ধৌত করিয়া মূল্যবান পাত্রোপরি রাখিয়া নরপতি জেয়াদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

জেয়াদ বলিলেন,—"ওহে যুগল-বালকহন্তা পাষাণপ্রাণ হারেস! তোমার

মন কি উপকরণে গঠিত? বল শুনি। সত্যই কি মানব-রক্তমাংস তোমার দেহে নাই? অন্য কোন প্রকারে জীবনীশক্তি থাকিতে পারে? এই বালক দুইটির মুখের লাবণ্য, চক্ষের ভাব, গণ্ডস্থলের স্বাভাবিক ঈষৎ গোলাপী আভা দেখিয়াও কি তোমার মন কিছুই বলে নাই? হাতের তরবারি কি প্রকারে ঊর্দ্ধে উঠিল? ইহাদের বিষাদমাখা মুখের ভাব দেখিয়াও কি তরবারি নীচে নামিল না? মহারাজ এজিদ-নামদার যদি মোস্লেম-পুত্রদ্বয়কে দামেস্কে পাঠাইতে আদেশ করেন, তখন আমি কি করিব? উপায় কি? অল্পবয়স্ক বালক দুইটিই কি আমার বেশী ভারবোধ হইয়াছিল? তাহাদের জীবিত থাকাই কি আমার বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছিল? ওহে বীর! বালকহন্তা মহাবীর! আমার ঘোষণায় কি বালকদের শিরশ্ছেদ করিয়া মাথা আনিবার কথা ছিল? না ডঙ্কা বাজাইয়া মাথা আনিবার ঘোষণা করা হইয়াছিল?"

হারেস বলিল—"শিরশ্ছেদের কথা ছিল না, ধরিয়া আনিবার আদেশ ছিল। জীবিত অবস্থায় তাহাদিগকে দরবার পর্য্যন্ত আনা দুঃসাধ্য বলিয়াই মাথা দুইটি আনিয়াছি। শত শত জন এই বালকদ্বয়ের সন্ধানে ছিল—আমাকে দরবারে আনিতে দেখিলেই তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ বালকদ্বয়কে কাড়িয়া লইত: মাথা সমেত বালক দুইটিকে আনিয়া স্বচ্ছন্দে পুরস্কার লাভ করিয়া চলিয়া যাইত! পরিশ্রম আমার—লাভ করিত ডাকাতদল!"

"আমি বাদ্শাহ-নামদারের মঙ্গলকামী হিতৈষী। চিরশত্রুর বংশে কাহাকেও রাখিতে নাই। হয় ত সময়ে এই বালকদ্বয় বীরশ্রেষ্ঠ বীর শত্রুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইত। আমি ইহাদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছি, আমাকে স্বীকৃত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করুন। আজ দুই তিন রাত্রি আমার আহার নাই—নিদ্রা নাই—বিশ্রামের সময়, অবসর কিছুই নাই। এই দুইটি বালকের মস্তক গ্রহণ করিতে আমার দুইটি পুত্র এবং স্ত্রীর মাথা কাটিয়াছি।"

দরবারসমেত সকলে মহাদুঃখিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নরপতি জেয়াদ বলিলেন,—"ওহে বীর! সে কি কথা?—"

"কি কথা!—আপনার শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে আমার বংশ নিপাত করিলাম, তথাপি আপনার নিকট যশোলাভ করিতে পারিলাম না। যাহার জন্য এত কাণ্ড, তাহা—অর্থাৎ সে মোহরগুলি পাইব কি না, তাহাতেও এখন সন্দেহ হইতেছে!"

মন্ত্রীদল মধ্য হইতে এক জন বলিলেন,—"আপনার পুরস্কার ধরা আছে, আর তিনটি খুন কোথায় কি প্রকারে করিলেন, বলুন শুনি।"

"তিনটি খুনই বটে! কেন করিলাম, শুনুন। আমার দুই পুত্র, এক স্ত্রী—এই তিনটি। তাহারা কিছুতেই এই শত্রু বালকদের শির কাটিতে দিবে না। বাধা দিতে আরম্ভ করিল! একে একে বাধা দিল। একে একে লাল বসন পরাইয়া ফোরাত নদীর কূলে তাহাদিগকে শয়ন করাইয়া দিলাম। এক স্থানেই সকলের শিরশ্ছেদ—রক্তপাত—নড়াচড়া—পরে সকলের দেহই ফোরাত-জলে ক্ষেপণ—অবগাহন—নিমজ্জন—বিসর্জ্জন!"

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ বলিলেন,—"এ দৃশ্য আমি দেখিতে পারি না! নিরপরাধ বালকদ্বয়ের শির যে আপন হাতে কাটিতে পারে, তাহাকে বাধা দিয়াছিল কাহারা? এই নরপিশাচের সন্তান দুই জন; আর সহধর্ম্মিণী স্বয়ং। তাহাদিগকেও সে বিনাশ করিয়াছে! এমন নর-রাক্ষসের শির কিছুতেই স্বস্থানে থাকিতে পারে না। হায়! হায়!! একই সময়ে পাঁচটি মানবজীবন শেষ করিয়াছে! আমার আদেশ—মোসলেম-পুত্রদ্বয়-হন্তা হারেস্ এই দুই বালকের শির সম্মানের সহিত মাথায় করিয়া ফোরাত-কূলে লইয়া যাইবে। এই দুই বালকের মস্তক সে যে স্থানে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, সেই স্থানে সেই অস্ত্রে সেই মহাপাপীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষণের সুযোগ করিয়া দিও। ফোরাত-জলে নিক্ষেপ করিয়া—জল অপবিত্র করিও না! মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের দেহখণ্ড ফোরাত জলে ভাসাইয়া দিয়াছে, কি করিব কোন উপায় নাই। বিশেষ সন্ধান করিয়া দেখিও। যদি এই যুগলভ্রাতার মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে রীতিমত কাফন দাফন করিয়া, যথোচিতরূপে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি করিয়া আমার আদেশ সম্পূর্ণ করিও এবং কার্য্যশেষে আমাকে সংবাদ জ্ঞাপন করিও।"

ঘাতক, প্রহরী, কার্য্যকারক তখনই রাজাদেশ মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের খণ্ডিত শির মহামূল্য বস্ত্রে আবরিত করিয়া হারেস শিরে চাপাইয়া ফোরাত-কূলে লইয়া চলিল। ফোরাত-কূলে যাইয়া তাহারা দেখিল, রক্তে আর বালিতে জমাট বাঁধিয়া একটি স্থান চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনা তাহারা দেখিল যে, মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের শিরশূন্য যুগল দেহ গলাগলি করিয়া জড়াইয়া জলে ভাসিতেছে। কি আশ্চর্য্য! স্রোতের জলে যে মৃতদেহ ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, স্রোতের বিপরীত দিকে তাহা টানিয়া আনিল কে? এই আশ্চর্য্য সংযোগ করিল কে?

এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের মনেও একটি কথা হঠাৎ উদয় হইল। তিনি পাত্রস্থ দুইটি মস্তক ফোরাত-জলের নিকটে ধরিতেই জড়িত যুগল দেহ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া আপন আপন মস্তকে সংলগ্ন হইল। রাজকর্ম্মচারী মৃতদেহ দুইটি উঠাইয়া পৃথক করিতে বহু চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই পৃথক করিতে পারিলেন না; সে অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ-বন্ধন বহু যত্নেও ভিন্ন করিতে পারিলেন না, শবদেহের সে আশ্চর্য্য ভ্রাতৃমায়া-বন্ধন ছাড়াইয়া পৃথক করিতে সক্ষম হইলেন না। বাধ্য হইয়া তিনি দুই ভ্রাতার দেহ একত্রে স্নান করাইয়া একত্রে কাফন করিয়া একযোগে দাফন করিলেন।

তাহার পর হারেসের প্রতি রাজাজ্ঞা যাহা ছিল, তাহা সম্পাদন করিতে যাইতেই হারেস বলিল, "আমার উচিত শাস্তি হইল। অতিরিক্ত লোভের অতিরিক্ত ফলও ভোগ করিলাম। হা-পুত্র—হা-স্ত্রী—হা-লোভ!"

হারেসের খণ্ডিত দেহ বধ্যভূমিতে পড়িয়া রহিল।

চতুর্বিংশ প্রবাহ

হোসেন সপরিবারে ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া নির্ব্বিঘ্নে কুফায় যাইতেছেন। কিন্তু এত দিন যাইতেছেন, কুফার পথের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছেন না। একদিন হোসেনের অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের খুর মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাইতে লাগিল। কারণ কি? এইরূপ কেন হইল? কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী হোসেনের মনে পড়িল। নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! হোসেন গণনা করিয়া দেখিলেন, আজ মহর্‌রম মাসের ৮ই তারিখ। তাহাতে আরও ভয়ে ভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, এক পার্শ্বে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। চক্ষুনির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে মানব কিম্বা—জীব-জন্তুর নাম মাত্র নাই; আতপ-তাপ নিবারণোপযোগী কোন প্রকার বৃক্ষও নাই, কেবল প্রান্তর—মহাপ্রান্তর। প্রান্তর-সীমা যেন গগনের সহিত সংলগ্ন হইয়া ধূ ধূ করিতেছে! চতুর্দ্দিকে যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বরে আক্ষেপ "হায়! হায়!" শব্দ উত্থিত হইয়া নিদারুণ দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। জনপ্রাণীর নামমাত্র নাই, কে কোথা হইতে করিতেছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বোধ হইল, যেন শূন্যপথে শত সহস্র মুখে "হায়! হায়!" শব্দ চতুর্দ্দিক আকুল করিয়া তুলিয়াছে!

হোসেন সকরুণ স্বরে, ঈশ্বরেকে ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গীগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! হাস্য-পরিহাস দূর কর; সর্ব্বশক্তিমান জগৎ-নিদান করুণাময় ঈশ্বরের নাম মনে কর। আমরা বড় ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানের নাম করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। ভাই রে! মাতামহ বলিয়া গিয়ছেন, যে স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই-ই তোমার জীবন বিনাশের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং তাহারই নাম দাস্ত-কারবালা। মাতামহের

বাক্য অলঙ্ঘনীয়; পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমরা কি কর্ণে কিছু শুনিতেছ?" তখন সকলেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন—চতুর্দ্দিকেই "হায়! হায়!!" রব। ধন্য নূরনবী মোহাম্মদ! হোসেন বলিলেন, "মাতামহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, চতুর্দ্দিক হইতে যে স্থানে "হায়! হায়!!" শব্দ উত্থিত হইবে, নিশ্চয় জানিও সেই-ই কারবালা। ঈশ্বরের লীলা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। কোথায় যাইব? যাইবারই বা সাধ্য কি? কোথায় দামেস্ক, কোথায় মদিনা, কোথায় কুফা, আর কোথায় কারবালা! আমি কারবালায় আসিয়াছি, আর উপায় কি? ভাই সকল! ঈশ্বরের নাম করিয়া ক্ষান্ত দাও।" ক্রমে সঙ্গীরা সকলেই আসিয়া একত্রিত হইল। হোসেনের মুখে কারবালার বৃত্তান্ত এবং চতুর্দ্দিকে "হায়! হায়!" রব স্বকর্ণে শুনিয়া সকলেরই মুখে কালিমা রেখা পড়িয়া গেল। যে যেখান হইতে শুনিল, সে সেইখানেই অমনি নীরবে বসিয়া পড়িল।

হোসেন বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আর চিন্তা কি? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে ভাবনা কি? এই স্থানে শিবির নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই নাম ভরসা করিয়া থাকিব। সম্মুখে প্রান্তর, পার্শ্বে ভয়ানক বিজন বন, কোথায় যাই? অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহাই ঘটিবে, এক্ষণে চিন্তা বিফল। শিবির নির্ম্মাণের আয়োজন কর। আমি জানি, ফোরাত নদী এই স্থানের নিকট প্রবাহিত হইতেছে। কতদূর এবং কোন্ দিকে তাহা নির্ণয় করিয়া কেহ কেহ জল আহরণে প্রবৃত্ত হও! পিপাসায় অনেকেই কাতর হইয়াছে, আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আপাততঃ ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ কর।"

শিবির নির্ম্মাণ করিবার কাষ্ঠস্তম্ভ সংগ্রহ করিতে এবং রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, শোণিতাক্ত কুঠার-হস্তে অত্যন্ত বিষাদিত চিত্তে বাষ্পাকুললোচনে তাহারা হোসেনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "হজরত! এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমরা কোন স্থানে দেখি নাই, কোন দিন কাহারও মুখে শুনিও নাই।

কি আশ্চর্য্য! এমন আশ্চর্য্য ঘটনা জগতে কোন স্থানে ঘটিয়াছে কি না, তাহাও সন্দেহ। আমরা বনে নানা প্রকার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম; যে কোন বৃক্ষের যে কোন স্থানে কুঠারাঘাত করিলাম, সেই বৃক্ষেই অজস্র শোণিত-চিহ্ন দেখিয়া ভয় হইল। ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। এই দেখুন! আমাদের সকলের কুঠারেও সদ্যশোণিত-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে!”

হোসেন কুঠার সংযুক্ত শোণিত দর্শনে বলিতে লাগিলেন, “নিশ্চয় এই-ই কারবালা। তোমরা সকলে এই স্থানে ‘শহীদ’-স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, তাহারই লক্ষণ ঈশ্বর এই শোণিত-চিহ্নে দেখাইতেছেন। উহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, ঐ বন হইতেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আন। দারু-রস শোণিতে পরিণত হইয়াছে, দেখিয়া আর ভীত হইও না।”

এমামের বাক্যে সকলেই আনন্দোৎসাহে শিবির সংস্থাপনে যত্নবান হইলেন। সকলেই আপন আপন স্থানোপযোগী এবং এমামের পরিজনবর্গের অবস্থানের জন্য অতি নির্জ্জন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া সকলেই যথাসম্ভব বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

আরব দেশে দাসের অভাব নাই! যে সকল ক্রীতদাস হোসেনের সঙ্গে ছিল, তাহারা কয়েকজন একত্রিত হইয়া ফোরাতের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল; ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া সকাতরে এমামের নিকট তাহারা বলিতে লাগিল, “বাদশাহ্-নামদার! আমরা ফোরাত নদীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলাম। পূর্ব্ব উত্তর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইলাম যে, ফোরাত নদী কুলুকুলুরবে দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। জলের নির্ম্মলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জলপানেচ্ছা আরও চতুর্গুণ বলবতী হইল, কিন্তু নদীর তীরে অসংখ্য সৈন্য সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি সতর্কতার সহিত নদীর জল রক্ষা করিতেছে। যত দূর দৃষ্টির ক্ষমতা হইল, দেখিলাম—এমন কোন স্থানই নাই যে, নির্ব্বিঘ্নে এক বিন্দু জল লইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করা যায়। আমরা সৈন্যদিগকে কিছু না বলিয়া যেমনই নদীতীরে যাইতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহারা অমনই অতি কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত আমাদিগকে

বিতাড়িত করিয়া দিয়া বলিল, "মহারাজ এজিদের আজ্ঞায় ফোরাত নদীকূল রক্ষিত হইতেছে, এই রক্ষক বীরগণের একটি প্রাণ, বাঁচিয়া থাকিতে এক বিন্দু জল কেহ লইতে পারিবে না। আমাদের মস্তকের শোণিত ভূতলে প্রবাহিত না হইলে ফোরাত প্রবাহে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। জল লইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করা ত অনেক দূরের কথা! এবার ফোরাতকূল চক্ষে দেখিয়াই ইহজীবন সার্থক করিয়া গেলে,—যাও; ভবিষ্যতে এদিকে আসিলে আমাদের দৃষ্টির সীমা পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে। নদীতীরে এক পদও অগ্রসর হইতে দিব না। এবং সুতীক্ষ্ণ শরই তোমাদের পিপাসার শান্তি করিবে। প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া যাও! নিশ্চয় জানিও, ফোরাতের সুস্নিগ্ধ বারি তোমাদের কাহারও ভাগ্যে নাই।"

কথা শুনিয়া হোসেন মহাব্যস্ত হইলেন। খাদ্যাদির অভাব না থাকিলেও জলবিহনে কিরূপে বাঁচিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইল। মদিনার বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে রহিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ যখন পিপাসায় কাতর হইবে, যখন তাহাদের জিহ্বাকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বলিতেও ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কি করিবেন? এই চিন্তায় হোসেন ফোরাত নদীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি উপায়ে জল সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন,—এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, চারি জন সৈনিক পুরুষ তাঁহার শিবির লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ কিছু ত্রস্তে চলিয়া আসিতেছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'মোস্‌লেম আমার কুফা গমনে বিলম্ব দেখিয়া হয়তো সৈনিকগণকে কোন স্থানে রাখিয়া অগ্রে আমার সন্ধান লইতে আসিতেছে!'

আগন্তুক চতুষ্টয় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কল্পনা যে ভ্রমসঙ্কুল তাহা প্রমাণিত হইল। শেষে তিনি দেখিলেন যে, তাহারা অপরিচিত; এমন কি, কোন স্থানে তাহাদিগকে দেখিয়াছেন কি না, তাহাও মনে হইল না। সৈন্যচতুষ্টয় নিকটে আসিয়াই হোসেনের পদচুম্বন করিল। তন্মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত সজ্জিত পুরুষ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া নতশিরে বলিতে লাগিলেন, "হজরত, দুঃখের কথা কি বলিব,

আমরা এজিদের সৈন্য, কিন্তু আপনার মাতামহের উপদিষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত। আমাদের কথায় অবিশ্বাস করিবেন না, শত্রুর বেতনভোগী বলিয়াও শত্রু মনে করিবেন না। আমরা কিছুরই প্রত্যাশী নহি, কেবল আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কয়েকটি কথা মাত্র বলিতে অতি সাবধানে আপনার শিবিরে আসিয়াছি। সময় যখন মন্দ হইয়া উঠে, তখন চতুর্দ্দিক হইতেই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে ; এক্ষণে আপনার চতুর্দ্দিকেই অমঙ্গল দেখিতেছি। মোসলেমের ন্যায় হিতৈষী বন্ধু জগতে আপনার কেহই হইবে না। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ আপনার প্রাণ বিনাশ করিবার আশায় ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ভাগ্যগতিকে মোসলেম কুফায় যাইয়া আবদুল্লাহ জেয়াদের হস্তে বন্দী হইলেন। শেষে তাহারি চক্রান্তে ওত্‌বে অলীদ ও মারওয়ানের সহিত যুদ্ধে মোসলেম বীর-পুরুষের ন্যায় শত্রু বিনাশ করিয়া সেই শত্রুহস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যে সহস্র সৈন্য ছিল, তাহারাও ওত বে অলীদ ও জেয়াদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছে। এক্ষণে সীমার, ওমর প্রভৃতি আপনার প্রাণবধের জন্য নানা প্রকার চেষ্টায় আছে। মারওয়ান, ওতবে অলাদ এ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। এজিদের আজ্ঞাক্রমে আমরাই ফোরাত নদীকূল একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। মনুষ্য দূরে থাকুক, পশু-পক্ষীকেও না ছাড়িয়া দিলে নদীতীরে যাইতে কাহারও সাধ্য নাই। সংক্ষেপে সকলই বলিলাম, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন।"—এই বলিয়াই আগন্তুক চতুষ্টয় হোসেনের পদচুম্বন করিয়া চলিয়া গেল।

মোসলেমের দেহত্যাগের সংবাদে হোসেন মহা শোকাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হা ভ্রাতঃ মোসলেম! যাহা বলিয়া গিয়াছিলে তাহাই ঘটিল!—'হোসেনের প্রাণবিনাশ করিতেই যদি আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কোন ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, তবে সে ষড়যন্ত্রে আমিই পড়িব, হোসেনের প্রাণ ত রক্ষা পাইবে।' ভাই! নিজ প্রাণ দিয়া হোসেনকে জেয়াদের হস্ত হইতে রক্ষা করিলে! তুমি ত মহা অক্ষয় স্বর্গসুখে সুখী হইয়া জগৎ-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলে। আমি দুরন্ত কারবালা প্রান্তরে অসহায় হইয়া বিন্দুমাত্র জলের প্রত্যাশায় বোধ হয় সপরিবারে জীবন হারাইলাম!

রে দুরন্ত পাপিষ্ঠ জেয়াদ! তোর চক্রান্তে মোসলেমকে হারাইলাম। তোর চক্রান্তেই আজ সপরিবারে জল-বিহনে মারা পড়িলাম।" মোসলেমের জন্য হোসেন অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। ওদিকে জলাভাবে তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল।

প্রথমে সকলেই পিপাসাক্রান্ত হইয়া হোসেনের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"জলাভাবে সমস্ত লোক মরে! পিপাসায় সকলেরই শুষ্ককণ্ঠ, এক্ষণে আর কষ্ট সহ্য হয় না!"

সকাতরে হোসেন বলিলেন, "কি করি! বিন্দুমাত্র জলও পাইবার প্রত্যাশা আর নাই। ঈশ্বরের নামামৃতপান ভিন্ন পিপাসা নিবৃত্তির আর এখন উপায় কি আছে? বিনা জলে যদি প্রাণ যায়, সকলেই সেই করুণাময় বিশ্বনাথের নাম করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি কর। সকলেই আপন আপন স্থানে যাইয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ কর।"

অতঃপর সকলেই পরমেশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে নয় তারিখ কাটিয়া গেল। দশম দিবসের প্রাতে হোসেনের শিবিরে মহা-কোলাহল উঠিল! "প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না!" এই প্রকার গগনভেদী শব্দ উঠিতে লাগিল। পরিবারস্থ সকলের আর্ত্তনাদে এবং কাতরস্বরে হোসেন আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। উপাসনায় ক্ষান্ত দিয়া হাসনেবানু ও জয়নাবের বস্ত্রাবাসে যাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পুত্র-কন্যা এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা আসিয়া এক বিন্দু জলের জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

শাহরেবানু দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানটি ক্রোড়ে করিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ সাত দিনের মধ্যে এক বিন্দু জলও স্পর্শ করিলাম না, পিপাসায় আমার জীবন শেষ হউক, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করি না; কিন্তু স্তনের দুগ্ধ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণনাশের উপক্রম হইল। এই সময়ে এক বিন্দু জল যে কোন উপায়ে ইহার কণ্ঠে প্রবেশ করাইতে পারিলেও বোধ হয় এ বাঁচিতে পারিত।"

হোসেন বলিলেন, "জল কোথায় পাইব? এজিদের সৈন্যগণ ফোরাত নদীর কূল আবদ্ধ করিয়াছে, জল আনিতে কাহারও সাধ্য নাই!"

শাহ্‌রেবানু বলিলেন, "এই শিশুসন্তানটির জীবন রক্ষার্থে যদি আপনি নিজে গিয়াও কিঞ্চিৎ জল উহাকে পান করাইতে পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? একটি প্রাণ ত রক্ষা হইবে? আমাদের জন্য আপনাকে যাইতে বলিতেছি না।"

হোসেন বলিলেন, "জীবনে কোনও দিন শত্রুর নিকট, কি বিধর্ম্মীর নিকট কোন বিষয়েই প্রার্থী হই নাই। কাফেরের নিকট কোন কালে কিছু প্রার্থনাও করি নাই। জল চাহিলে কিছুতেই পাইব না। আর আমি এই শিশুর প্রাণ রক্ষার কারণেই যদি তাহাদের নিকট জল ভিক্ষা করি, তবে আমি চাহিলে তাহারা জল দিবে কেন? আমাকে মনোকষ্ট, মনোবেদনা দিতেই ত তাহারা ফোরাতকূল আবদ্ধ করিয়াছে!"

শাহ্‌রেবানু বলিলেন, "তাহা যাহাই বলুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কি বলিয়া এই দুগ্ধপোষ্য সন্তান দুগ্ধ-পিপাসায়,—শেষে জল-পিপাসায় প্রাণ হারাইবে, ইহা কিরূপেই বা স্বচক্ষে দেখিব?"

হোসেন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সত্বর উঠিয়া গিয়া অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিয়া বলিলেন, "দাও, আমার ক্রোড়ে দাও! দেখি, আমার সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া দেখি।"—এই বলিয়া হোসেন অশ্বে উঠিলেন। শাহ্‌রেবানু সন্তানটি হস্তে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে স্বামীর ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন। হোসেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি ফোরাত নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নদীতীরস্থ সৈন্যগণকে বলিলেন, "ভাই সকল, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মুসলমান থাক, তবে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ জলদান কর। পিপাসায় ইহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া একেবারে নীরস কাষ্ঠের ন্যায় হইয়াছে। এ সময় কিঞ্চিৎ জলপান করাইতে পারিলেও বোধ হয় এ বাঁচিতে পারে! তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই, এই শিশু সন্তানটির জীবন রক্ষার্থ ইহার মুখের প্রতি চাহিয়া কিছু জলদান কর। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণরক্ষা করিলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

কেহই উত্তর করিল না। সকলেই একদৃষ্টে হোসেনের দিকে চাহিয়া

রহিল। হোসেন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, এ দিন—চিরদিন তোমাদের সুদিন থাকিবে না; কোন দিন ইহার সন্ধ্যা হইবেই হইবে। ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর; তাঁহাকে একটু ভয় কর। ভ্রাতৃগণ! পিপাসায় জলদান মহাপুণ্য, তাহাতে আবার অল্পবয়স্ক শিশু! ভ্রাতৃগণ! ইহার জীবন তোমাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি সামান্য সৈনিক পুরুষ নহি; আমার পিতা মহামান্য হরজত আলী, মাতামহ নূরনবী হজরত মোহাম্মদ, মাতা ফাতেমা জোহ্‌রা খাতুনে জেন্নাত। এই সকল পুণ্যাত্মাদিগের নাম স্মরণ করিয়াই এই শিশু সন্তানটির প্রতি অনুগ্রহ কর। মনে কর, যদি আমি তোমাদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইয়াও থাকি, কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য বালক ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই, তোমাদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধীও হয় নাই! ইহার প্রতি দয়া করিয়াই তোমরা ইহার জীবন রক্ষা কর!"

সৈন্যগণ মধ্য হইতে একজন বলিল, "তোমার পরিচয় জানিলাম; তুমি হোসেন। তুমি সহস্র অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেও তোমাকে জল দিব না। তোমার পুত্র জল-পিপাসায় জীবন হারাইবে, তাহাতে তোমার দুঃখ কি? তোমার জীবনই ত এখনই যাইবে; সন্তানের দুঃখে না কাঁদিয়া তোমার নিজের প্রাণের জন্য একবার কাঁদ—অসময়ে পিপাসায় কাতর হইয়া কারবালায় প্রাণ হারাইবে, সেই দুঃখে একবার ক্রন্দন কর, শিশু-সন্তানের জন্য আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এখনই তোমার সকল জ্বালা-যন্ত্রণা একেবারে নিবারণ করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি হোসেনের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিল। ক্ষিপ্রহস্তনিক্ষিপ্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণ হোসেনের বক্ষে না লাগিয়া ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। হোসেনের ক্রোড় রক্তে ভাসিতে লাগিল।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাষাণহৃদয়! ওরে শরনিক্ষেপ-কারি! কি করিলি! এই শিশুসন্তান-বধে তোর কি লাভ হইল? হায়

হায়! আমি কোন্ মুখে ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব! শাহ্‌রেবানুর নিকটে গিয়াই বা কি উত্তর দিব!” হোসেন মহাখেদে এই কথা কয়েকটি বলিয়াই সরোষে অশ্বচালনা করিলেন। শিবির সম্মুখে আসিয়া মৃত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া লম্ফ দিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; শাহ্‌রেবানুর নিকটে গিয়া বলিলেন, “ধর, তোমার পুত্র ক্রোড়ে লও! আজ বাছাকে স্বর্গের সুশীতল জল পান করাইয়া আনিলাম!” শাহ্‌রেবানু সন্তানের বুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; বলিলেন, “ওরে! কোন্ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এমন কার্য্য করিলি! কোন্ পাষাণ হৃদয় এমন কোমল শরীরে লৌহশর নিক্ষেপ করিলি! ঈশ্বর! সকলই তোমার খেলা! যে দিন মদিনা পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই দিনই দুঃখের ভার মাথায় ধরিয়াছি। শিবিরস্থ পরিজনেরা সকলেই শাহ্‌রেবানুর শিশুসন্তানের জন্য কাঁদিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হইল না। মদিনাবাসীদিগের মধ্যে আবদুল ওহাব নামক একজন বীরপুরুষ হোসেনের সঙ্গীদল মধ্যে ছিলেন। আবদুল ওহাবের মাতা এবং স্ত্রীও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। হোসেনের এবং তাঁহার পরিজনগণের দুঃখ দেখিয়া আবদুল ওহাবের মাতা সরোষে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, “আবদুল ওহাব! তোমাকে কি জন্য গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম? হোসেনের এই দুঃখ দেখিয়া তুমি এখনও বসিয়া আছ? এখনও তোমাকে অস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিতেছি না? এখনও তুমি অশ্ব সজ্জিত করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইতেছ না? জল বিহনে সকলেই মরিবে, আর কতক্ষণ বাঁচিবে? ধিক্ তোমার জীবনে! কেবল কি পশুবধের জন্যই শরীর পুষিয়াছিলে? এখনও স্থির হইয়া আছ? ধিক্ তোমার জীবনে! ধিক্ তোমার বীরত্বে! হায়! হায়! হোসেনের দুগ্ধপোষ্য সন্তানটির প্রতি যে হাতে তীর মারিয়াছে, আমি কি সেই পাপীর সেই হাতখানা দেখিয়াই পরিতৃপ্ত হইব? তাহা মনে করিও না। তোমার শরসন্ধানে সেই বিধর্ম্মী নারকীর তীরবিদ্ধ মস্তক আজ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। হায়! হায়! এমন কোমল শরীরে যে নরাধম তীর বিদ্ধ করিয়াছে, তাহার শরীরে মানব-রক্ত, মানব-ভাব—

কিছুই নাই! আবদুল ওহাব! তুমি স্বচক্ষে শাহ্‌রেবানুর ক্রোড়স্থ সন্তানের সাংঘাতিক মৃত্যু দেখিয়াও নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছ? শিশুশোকে শুধু নয়নজলই ফেলিতেছ! নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! বিপদে দুঃখে তোমরাই যদি কাঁদিয়া অনর্থ করিলে, তবে আমরা কি করিব? অবলা নিঃসহায়া স্ত্রীজাতির জন্যই বিধাতা কান্নার সৃষ্টি করিয়াছেন, বীরপুরুষের জন্য নহে।"

মাতার উৎসাহসূচক ভর্ৎসনায় আবদুল ওহাব তখনই সজ্জিত হইয়া আসিলেন; মাতার চরণ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আবদুল ওহাব আর কাঁদিবে না! তাহার চক্ষে জল আর দেখিবেন না; ফোরাত নদীর কুল হইতে শত্রুদিগকে তাড়াইয়া সে মোহাম্মদের আত্মীয়-স্বজন পরিবারদিগের জলপিপাসা নিবারণ করাইবে, আর না হয় আজ কারবালাভূমি আবদুল ওহাবের শোণিতে রঞ্জিত হইবে! কিন্তু মা, এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিবার আশায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন সময়ে আমার সহধর্ম্মিণীর মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

মাতা বলিলেন, "ছি! ছি! বড় ঘৃণার কথা। যুদ্ধযাত্রার যোগ্য অঙ্গসজ্জা রমণীর নয়নতৃপ্তির জন্য নহে। বীর বেশ বীরপুরুষেরই চক্ষুরঞ্জন। বিশেষতঃ, এই সময়ে যাহাতে মনে মায়ার উদ্রেক হয়, বাঁচিবার আশা বৃদ্ধি হয়, এমন কোন স্নেহ-পাত্রের মুখ দেখিতেও নাই, দেখাইতেও নাই। ঈশ্বর-প্রসাদে ফোরাতকূল উদ্ধার করিয়া অগ্রে হোসেন-পরিবারের জীবন রক্ষা কর, মদিনাবাসিগণের প্রাণ বাঁচাও, তাহার পর বিশ্রামসময়ে বিশ্রামের উপকরণ যাহা যাহা, তাহা সকলই পাইবে। বীরপুরুষের মায়া-মমতা কি? বীরধর্ম্মে অনুগ্রহ কি? একদিন জন্মিয়াছ, একদিন মরিবে,—শত্রুর সম্মুখীন হইবার অগ্রে স্ত্রী-মুখ দেখিবার অভিলাষ কি জন্য? তুমি যদি মনে মনে স্থির করিয়া থাক যে,—এই শেষ যাত্রা, আর ফিরিব না, জন্মশোধ মুখখানি দেখিয়া যাই, তবে তুমি কাপুরুষ, বীরকুলের কণ্টক, বীরবংশের গ্লানি, বীরকুলের কুলাঙ্গার!

আবদুল ওহাব আর একটি কথাও না বলিয়া জননীর চরণচুম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে

ফোরাতকূলে যাইয়া বিপক্ষগণকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাষাণহৃদয় বিধর্ম্মিগণ! যদি প্রাণের মমতা থাকে, যদি আর কিছু দিন জগতে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র নদীকূল ছাড়িয়া পলায়ন কর্। দেখ্, আবদুল ওহাব নদীকূল উদ্ধার করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুহন্তার মস্তক নিপাত করিবার জন্য আসিয়াছে। তোদের বুদ্ধিজ্ঞান একেবারেই দূর হইয়াছে, তোরা কি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন চিরদিনেরই জন্য মনে করিয়াছিস্? এ জীবনের কি আর অন্ত নাই? ইহার কি শেষ হইবে না? শেষ দিনের কথা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিস্? যে দিন স্বর্গাসনে বিচারপতি স্বয়ং বিচারাসনে বসিয়া জীবমাত্রের পাপপুণ্যের বিচার করিবেন, বল্ ত কাফের, সেদিন আর তোদের কে রক্ষা করিবে? সেই সহস্র সহস্র সূর্য্যকিরণের অগ্নিময় উত্তাপ হইতে কে বাঁচাইবে? সেই বিষম দুর্দ্দিনে অনুগ্রহ-বারি সিঞ্চনে কে আর তোদের পিপাসা নিবারণ করিয়া শান্ত দান করিবে? বল্ ত কাফের! কাহার নাম করিয়া সেই দুঃসহ নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবি? অর্থের দাস হইলে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান থাকে না? যদি যুদ্ধের সাধ থাকে, সে সাধ অবশ্যই মিটাইব। এখনও বলিতেছি, ফোরাতকূল ছাড়িয়া দিয়া সেই বিপদকাণ্ডারী প্রভু হজরত মোহাম্মদের পরিজনগণের প্রাণ রক্ষা কর্। অবলা অসহায়দিগকে শুষ্ককণ্ঠ করিয়া মারিতে পারিলেই কি বীরত্ব প্রকাশ পায়? এই কি বীরধর্ম্মের নীতি? দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে দূর হইতে চোরের ন্যায় বধ করাই কি তোদের বীরত্ব? যদি যথার্থ যুদ্ধের সাধ থাকে, যদি যথার্থই বীরত্ব দেখাইয়া মরিতে ইচ্ছা থাকে, আবদুল ওহাবের সম্মুখে আয়! যদি মরিতে ভয় হয়, তবে ফোরাতকূল ছাড়িয়া পলায়ন কর্। ন্যূনতা স্বীকার কিংবা যাচ্ঞা করিলে আবদুল ওহাব পরম শত্রুকেও তাহার প্রাণ ভিক্ষা দিয়া থাকে। মদিনাবাসীরা তোদের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত নহে—এই অহঙ্কারেই তোরা মাতিয়া আছিস্। কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে তাহারা যথার্থই বীর ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী।

আবদুল ওহাব অশ্বে কশাঘাত করিয়া শত্রুদলের সম্মুখে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিল

না, নদীকূলও ছাড়িয়া দিল না। আবদুল ওহাব পুনরায় সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "যোদ্ধাই হউক, বীরেন্দ্রই হউক, উদ্যোগী পুরুষই হউক,—সেই ধন্য, যে সময়কে অতি মূল্যবান জ্ঞান করে। তোদের সকল বিষয়েই জ্ঞান আছে, দেখিতেছি। যদি সাহস থাকে, যদি আবদুল ওহাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র আয়্। আবদুল ওহাব আজ বিধর্ম্মীর রক্তপাতে ফোরাত-জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দ্বিগুণ রঞ্জনে রঞ্জিত করিবে, এই আশাতেই তোদের সম্মুখে আসিয়াছে। শত্রুসম্মুখীন হইতে তোদের এত বিলম্ব কেন? শত্রু যুদ্ধপ্রার্থী, তোরা বিশ্রামপ্রার্থী! ধিক্ তোদের বীরত্বে! ধিক্ তোদের সাহসে! আজ সাত রাত নয় দিন আবদুল ওহাব জলস্পর্শ করে নাই; ফোরাত নদী তীরে তোরা মহানন্দে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া রহিয়াছিস্। তবু তোদের ইহাতে এত বিলম্ব, এত ভয়! শীঘ্র আয়্। একে একে তোদের সকলকেই নরকে প্রেরণ করিতেছি।"

বিপক্ষদল হইতে এক দীর্ঘকায় বীরপুরুষ বহির্গত হইয়া অতি উচ্চ লোহিতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বিশেষ দক্ষতার সহিত অসি চালনা করিতে করিতে আবদুল ওহাবের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মূর্খেরাই দর্প করে। কাপুরুষেরাই অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া থাকে। শৃগাল! বাক্‌চাতুরি ছাড়িয়া পুনরায় শিবিরে প্রস্থান কর্—তোকে মারিয়া কি হইবে? আবদুল ওহাব, তুই কাহার সন্তান! তোর জননী কাহার কন্যা! সেই সকল পরিচয় লইয়া আসিতেই আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে। তুই কেন এই নব যৌবনে পরের জন্য আপন প্রাণ হারাইবি? তোকে বধ করিলে এজিদের নিকট যশোলাভ হইবে না। তোদের হোসেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে বল্। তুই যদি কিছু দিন সংসারে বাস করিতে বাসনা করিস্, ফিরিয়া যা, তোকে চাহিনা।"

আবদুল ওহাব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "বিধর্ম্মী কাফের! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! অগ্রেই তুই হোসেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিস্? আবদুল ওহাবের পদাঘাতের কি কিছুমাত্র বল নাই? রে ক্ষুদ্র কীট! চিরশরণাগত দাস বাঁচিয়া থাকিতে প্রভুকে আহ্বান কেন? অগ্রে আবদুল

ওহাবের পদাঘাত সহ্য কর্, তাহার পর অন্য কথা।”—সদর্পে এই কথা বলিয়া আবতুল ওহাব অশ্ব ঘুরাইয়া বিধর্ম্মীর নিকট যাইয়া এমনই জোরে তরবারি আঘাত করিলেন যে, এক আঘাতে অশ্বের সহিত আরোহীকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বচক্র দিয়া শত্রুবিনাশী আবতুল ওহাব প্রত্যেক চক্রপরিবর্ত্তনে বিপক্ষগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। একে একে সত্তরজন বিধর্ম্মীকে নরকে প্রেরণ করিয়া পুনরায় পরিক্রমণের জন্য শত্রুগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার সম্মুখে আর অগ্রসর হইল না, দূর্ হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবতুল ওহাব ভীত হইলেন না—তুই হস্তে অসি চালনা করিয়া নিক্ষিপ্ত শরজাল খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শত্রু-নিক্ষিপ্ত শরে আবতুল ওহাবের গাত্র বিদ্ধ হইয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে দিকে আবতুল ওহাবের দৃষ্টি নাই, কেবল শত্রু বিনাশেই তিনি কৃতসঙ্কল্প!

বহু পরিশ্রম করিয়া আবতুল ওহাব পিপাসায় আরও কাতর হইলেন। কি করেন, কোন উপায় না পাইয়া বেগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হোসেনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হজরত! বড় পিপাসা! এই সময় ওহাবকে যদি জল দান করিতে পারেন, তাহা হইলে শত্রুকুল—”

“জল?—জল আমি কোথা পাইব ভাই?” হোসেন অধিকতর কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, “ভাই, সে ক্ষমতাই যদি থাকিত, তবে তোমার আর এমন তুর্দ্দশা হইবে কেন?”

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহা উত্তেজিত কণ্ঠে আবতুল ওহাবের জননী বলিতে লাগিলেন, “আবতুল ওহাব, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কি ফিরিতে আছে? তুমি যদি ইচ্ছা করিয়াও না ফিরিয়া থাক, যদি কাহারও আদেশে ফিরিয়া থাক, তাহা হইলেও কি শত্রু হাসিবে না? কি ঘৃণা! কি লজ্জা! কেন তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? শত্রুকে পিঠ দেখাইয়া সামান্য জল-পিপাসা হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিলে! তোমার ও-কলঙ্কিত মুখ আমি আর দেখিব না। আমি

তোমাকে জীবিত ফিরিয়া আসিবার জন্য যুদ্ধে পাঠাই নাই। হয় ফোরাত-কূল উদ্ধার করিয়া হোসেনের পুত্র-পরিজনকে রক্ষা করিতে দেখিব, না হয় রণক্ষেত্র-প্রত্যাগত তোমার মস্তকশূন্য দেহ দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে জীবন শীতল করিব, এই আমার আশা ছিল। তুমি বীরকুল-কলঙ্ক, আমার আশা ফলবতী হইতে দিলে না।”

সভয়ে কম্পিত হইয়া আবদুল ওহাব কহিলেন, “জননি! আবার আমি যাইতেছি, আর ফিরিব না—হয় নদীকূল উদ্ধার, নয় আবদুল ওহাবের মস্তক দান। কিন্তু জননি! পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত! পিপাসা নিবারণ করিবার আর উপায় নাই! একটিমাত্র নিবেদন, তোমার চরণদর্শনেই পিপাসার শান্তি! আর—একবার আমার স্ত্রীর মুখখানি—”

হাঁ, বুঝিয়াছি। সেই মুখখানি দেখিতে পার, কিন্তু অশ্ব হইতে নামিতে পারিবে না।” মাতার অজ্ঞানুযায়ী সেই অবস্থাতেই আবদুল ওহাব আপন স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিলেন, “জীবিতেশ্বরি! আমি যুদ্ধযাত্রী। যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার কথা মনে পড়িল, পিপাসাতেও প্রাণ আকুল! ভাবিলাম, তোমাকে দেখিলে বোধ হয়,—কিছু শ্রান্তি দূর হইবে, পিপাসাও নিবারণ হইবে। এই মনে করিয়াই আসিয়াছি, কিন্তু অশ্ব হইতে নামিবার আদেশ নাই। মাতার আজ্ঞা, তাই—অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই সাক্ষাৎ করিলাম।”

পতিপরায়ণা পতিব্রতা সতী পতির নিকটে যাইয়া অশ্ববল্গা ধারণপূর্ব্বক মিনতিবচনে কহিতে লাগিলেন, “জীবিতেশ্বর! সমরাঙ্গণে অঙ্গনার কথা মনে করিতে নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তঃপুরের কথা যাহার মনে পড়ে, সে আবার কেমন বীর? শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া যে যোদ্ধা স্ত্রীর মুখ দেখিতে আসে, সেই বা কেমন বীর? প্রাণেশ্বর! আমি নারী, আমি ত ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রভু মোহাম্মদের বংশধরগণের বিপদ-সময়ে সাহায্য করিতে স্ত্রী-পরিবার, সন্তানসন্ততির কথা যে যোদ্ধা মনে করে, তাহাকে আমি বীরপুরুষ বলি না। যদি আপনারা ভয় করেন, তবে আমরাই—এই ক্ষুৎ-পিপাসাপীড়িত স্ত্রীলোকেরাই, এলোচুলে রণরঙ্গিণী হইয়া রণবেশে সমরাঙ্গণে অসিহস্তে নৃত্য করিব; রণরঞ্জিত বস্ত্রে আমরাও রণসাজে সজ্জিত হইতে কুণ্ঠিত হইব না। দেখি,

কোন্ বিপক্ষ যোদ্ধা আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে? দেখার দিন, কথার দিন, বিশ্রামের দিন, ঈশ্বরপ্রসাদে যদি পাই, তবে মনের আনন্দে আপনার সেবা করিব। হোসেনের বিপদ চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু এমন দিন পাইয়া আপনি আর সময় নষ্ট করিবেন না; এমন দিন আপনি আর পাইবেন না। এমন সময় কি বিলম্ব করা উচিত? ছিঃ! ছিঃ! বীরপুরুষ!—তোমাকে ছিঃ! ছিঃ! শত্রু যুদ্ধার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তুমি কিনা কাপুরুষের মত অবরোধপুরে আসিয়া অবরোধ-বাসিনী কুলবালার মুখ দেখিতে অভিলাষী হইয়াছ! ছিঃ তোমাকে!"

অশ্ব হইতেই নতশিরে সাধ্বী সতীর কপোল চুম্বন করিয়া আবদুল ওহাব আর তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। সতীর মিষ্ট ভৎর্সনায় অন্তরে লজ্জিত হইয়া সজোরে অশ্বে কশাঘাত করিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; শত্রুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্ম্মী কাফেরগণ! ভাবিয়াছিলি যে, আবদুল ওহাব পলাইয়াছে? আবদুল ওহাব পলায় নাই। ঈশ্বরের নামে অতি অল্প সময়ের জন্য এই জগৎ দেখিতে আমি তোদের অবসর দিয়াছিলাম। আয় দেখি, কত জনে আবদুল ওহাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবি, আয়?"

আবদুল ওহাবের মাতা পুত্রের অজ্ঞাতে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকট যাইয়া তাহার যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই সেনাপতি ওমর সকলকেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আবদুল ওহাব কোন কারণ বশতঃ ফিরিয়া গিয়াছে, এখনই আবার আসিবে। এবার সকলে একত্র হইয়া আবদুল ওহাবকে আক্রমণ করিতে হইবে। যাহার যে অস্ত্র আয়ত্ত আছে, সে সেই অস্ত্র আবদুল ওহাবের প্রতি নিক্ষেপ করিবে।

রণক্ষেত্রে একবারে একযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া একেশ্বর আবদুল ওহাবের প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। বীরবর আবদুল ওহাব শত্রুবেষ্টিত হইয়া দুই হস্তে অসিচালনা করিতে লাগিলেন। এজিদের সৈন্যের অন্ত নাই; কত মারিবেন! শেষে শত্রুপক্ষের আঘাতে আবদুল ওহাবের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইল।

সেই ছিন্ন মস্তক আবদুল ওহাবের মাতার সম্মুখে গিয়া পড়িল। বীরজননী পুত্রশির ক্রোড়ে লইয়া ত্রস্তে শিবিরে আসিয়া নির্জ্জনকক্ষে হোসেনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এই অবসরে আবদুল ওহাবের শিক্ষিত অশ্ব শিরশূন্য দেহ লইয়া অতি বেগে শিবিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের সম্মুখে শিরশূন্য দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। আবদুল ওহাবের মাতা শোণিতাক্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিলেন এবং আবদুল ওহাবের উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"আবদুল ওহাব! তুমি ঈশ্বরকৃপায় স্বগায় সুখভোগে সুখী হও। হোসেনের বিপদ-সময়ে তুমি প্রাণ দিয়া সাহায্য করিলে, প্রভু মোহাম্মদের বংশধরগণের পিপাসার শান্তিহেতু কাফের-হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলে, তোমায় শত শত আশীর্ব্বাদ! তুমি যে জননীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে, তাঁহারও সার্থক জীবন! তোমার মস্তক দেহ হইতে কে বিচ্ছিন্ন করিল?" আবদুল ওহাবের মাতা পুত্রের ছিন্ন মস্তকটি লইয়া পতিত দেহে সংলগ্ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব! বৎস! প্রাণাধিক! অশ্ব সজ্জিত আছে, তোমার হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়াছে, বিধর্ম্মীর রক্তে অস্ত্র রঞ্জিত করিয়াছ, তবে আর ধূলায় পড়িয়া কেন? বাছা! দুঃখিনীর জীবন-সর্ব্বস্ব! উঠিয়া অশ্বে আরোহণ কর। এইবার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে আর আমি তোমাকে যুদ্ধে পাঠাইব না। ঐ দেখ, তোমার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী বণিতা তোমার যুদ্ধবিজয়-সংবাদ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত কর্ণে সতৃষ্ণনয়নে আক্ষেপ করিতেছে!"

আবদুল ওহাবের বিয়োগে হোসেন কাঁদিলেন। হোসেনের পরিজন-বর্গ ডাক ফুক্‌রাইয়া কাঁদিলেন। আবদুল ওহাবের মাতা অশ্রুনয়নে রোষ-ভরে বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব! এত ডাকিলাম, উঠিলে না; তোমার মায়ের কথা আর শুনিলে না!" শোকাবেগে এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় পুত্রমস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 'বলিলেন, আমার পুত্র-হন্তা কে? আবদুল ওহাব কাহার হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিল? কে আমার আবদুল ওহাবের মস্তক আমার ক্রোড়ে আনিয়া নিক্ষেপ করিল? দেখি, দেখি—দেখিব, দেখিব!" বলিয়া আবদুল ওহাব-জননী তখনি ত্বরিত

পদে আবদুল ওহাবের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হোসেন অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিষেধ করিলেন, তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। পুত্রমস্তক কোলে করিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ কাফের, কোন্ পাপাত্মা, কোন শৃগাল আমার পুত্রের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ? ঈশ্বরের দোহাই, এই যুদ্ধক্ষেত্রে একবার আসিয়া সেই পাপাত্মা, সেই পিশাচ, সেই কাফের আমার সম্মুখে দেখা দিক্।"

'ঈশ্বরের দোহাই' শুনিয়া আবদুল ওহাব-হন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দর্পের সহিত বলিতে লাগিল, "আমারই এই শাণিত অস্ত্রে আবদুল ওহাবের মস্তক সেই পাপদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।" আর কোন কথা হইল না। আবদুল ওহাব-জননী পুত্র-ঘাতককে দেখিয়া সক্রোধে আবদুল ওহাবের মস্তক এমন জোরে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিলেন যে, ঐ আঘাতেই কাফেরের মস্তক ভগ্ন হইয়া মজ্জা নির্গত হইতে লাগিল। তাহার তখনই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি!

এই ঘটনা দেখিয়া ওমর মহারোষে আবদুল ওহাবের জননীর চতুর্দ্দিকে সৈন্য বেষ্টন করিলেন। বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ! তোমাদের মঙ্গল হউক! আমার জীবনে মায়া নাই। পুত্রশোক নিবারণ করিবার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছি। তোমরা আমাকে নিপাত কর। যে পথে আমার আবদুল ওহাব গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাই। কিন্তু আকাশে যদি কেহ বিচারকর্ত্তা থাকেন, তিনি তোমাদের বিচার করিবেন।" অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবদুল ওহাব-জননী শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইলেন।

আবদুল ওহাবের মাতা প্রাণত্যাগ করিলে গাজী রহ্‌মান হোসেনের পদচুম্বন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনিও বহুসংখ্যক বিধর্ম্মীকে জাহান্নামে পাঠাইয়া শত্রুহস্তে শহীদ হইলেন। ক্রমে জাফর প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ হোসেনের সাহায্যের জন্য শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কেহই জয়লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রায় দেড় লক্ষ বিপক্ষসৈন্য বিনাশ করিয়া মদিনার প্রধান প্রধান যোদ্ধা মাত্রেই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পন করিয়া স্বর্গধামে মহাপ্রস্থিত হইলেন।

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

সূর্য্যদেব যতই উর্দ্ধে উঠিতেছেন, তাপাংশ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। হোসেনের পরিজনেরা বিন্দুমাত্র জলের জন্য লালায়িত হইতেছেন; শত বীরপুরুষ শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। ভ্রাতা, পুত্র, স্বামীর শোণিতাক্ত কলেবর দেখিয়া কামিনীরা, সময়ে সময়ে পিপাসায় কাতর হইতেছেন। চক্ষুতে জলের নাম মাত্রও নাই, সে যেন একপ্রকার বিকৃত ভাব, কাঁদিবারও বেশী শক্তি নাই। হোসেন চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন: বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আর কেহই নাই! রণসজ্জিত হইয়া জয়লাভের জন্য শত্রু সম্মুখীন হইতে আদেশের অপেক্ষায় তাঁহার সম্মুখে আজ কেহই আসিতেছে না। হোসেন এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়! এক পাত্র বারি প্রত্যাশায় এত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব হারাইলাম, তথাপি কাহারও পিপাসা নিবারণ করিতে পারিলাম না। কারবালা-ভূমিতে রক্ত-স্রোত বহিতেছে, তথাপি স্রোতঃস্বতী ফোরাতকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আর বাঁচিবার ভরসা নাই, আশাও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই।"

হাসানপুত্র কাসেম পিতৃব্যের এই কথা শুনিয়া সুসজ্জিত বেশে সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "তাতঃ! কাসেম এখনও জীবিত আছে। আপনার আজ্ঞাবহ চিরদাস আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। অনুমতি করুন, শত্রুকুল নির্ম্মূল করি।"

হোসেন বলিলেন, "কাসেম, তুমি পিতৃহীন, তোমার মাতার তুমিই এক-মাত্র সন্তান; তোমাকে এই ভয়ানক শত্রুদলমধ্যে কোন্ প্রাণে পাঠাইব?"

কাসেম বলিলেন, "ভয়ানক!—আপনি কাহাকে ভয়ানক শত্রুজ্ঞান করেন? পথের ক্ষুদ্র মক্ষিকা, পথের ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে আমি যেমন ক্ষুদ্র জ্ঞান করি, আপনার অনুমতি পাইলে এজিদের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সৈন্যাধ্যক্ষগণকেও সেই

রূপ তৃণ জ্ঞান করিতে পারি। কাসেম যদি বিপক্ষ-ভয়ে ভয়ার্ত্ত হয়, হাসানের নাম ডুবিবে, আপনারও নাম ডুবিবে। অনুমতি করুন, একা আমি সশস্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র লক্ষ্য লক্ষ্য রিপুবিনাশে সমর্থ।"

হোসেন বলিলেন, "প্রাণাধিক! আমার বংশে তুমি সকলের প্রধান, তুমি এমাম বংশের বহুমুল্য রত্ন, তুমি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি সৈয়দ বংশের অমূল্য নিধি। তুমি তোমার মাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে এবং সমুদয় পরিজনকে সান্ত্বনা দান কর। আমি নিজেই যুদ্ধ করিয়া ফোরাতকূল উদ্ধার করিতেছি।"

কাসেম বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন, কাসেমের প্রাণ দেহে থাকিতে আপনাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে না। যদি ফোরাতকূল উদ্ধার করিতে না পারি, তবে ফোরাত নদী আজ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া এজিদের সৈন্য-শোণিতে যোগ দিয়া মহাসমুদ্রে প্রবাহিত হইবে।"

হোসেন বলিলেন "বৎস! আমার মুখে এ কথার উত্তর নাই। তোমার মাতার আদেশ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

হাসনেবানুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মহাবীর কাসেম যুদ্ধযাত্রা প্রার্থনা করিলে, হাসনেবানু কাসেমের মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ-পূর্ব্বক বলিলেন, "যাও বাছা, যুদ্ধে যাও। তোমার পিতৃঋণ পরিশোধ কর। পিতৃশত্রু এজিদের সৈন্যগণের মস্তক চূর্ণ কর, যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফোরাতকূল উদ্ধার কর। তোমার আর আর ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তোমারই মুখাপেক্ষা করিয়া রহিল। যাও বাপ! তোমায় আজ ঈশ্বরের পদতলে সমর্পণ করিলাম।"

হাসনেবানুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পিতৃব্যের পদচুম্বনপূর্ব্বক কাসেম অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিবেন, এমন সময় হোসেন বলিলেন, "কাসেম! একটু বিলম্ব কর।" অনুজ্ঞা শ্রবণ মাত্র কাসেম তৎক্ষণাৎ অশ্ববল্গা ছাড়িয়া পিতৃব্য সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

হোসেন বলিতে ডাকিলেন, "কাসেম! তোমার পিতার নিকট আমি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, আমাকে সেই প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ধার

করিয়া যুদ্ধে গমন কর। তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিতে আমার আর কোনও আপত্তি নাই। তোমার পিতা প্রাণবিয়োগের কিছু পূর্ব্বে আমাকে এই কড়ারে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন: আমার কন্যা সখিনার সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি সখিনাকে বিবাহ না করিয়া যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। তোমার পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন, আমাকেও প্রতিজ্ঞা হইতে রক্ষা করা, উভয়ই তোমার সমতুল্য কার্য্য।"

কাসেম মহাবিপদে পড়িলেন। এতাদৃশ মহাবিপদ সময়ে বিবাহ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই তিনি অস্থিরচিত্ত হইলেন। কি করেন, কোন উত্তর না দিয়া তিনি মাতার নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন।

হাসনেবানু বলিলেন, "কাসেম! আমিও জানি, আমার সম্মুখে তোমার পিতা তোমার পিতৃব্যের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে কড়ারে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শোক, তাপ এবং উপস্থিত বিপদে আমি সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছি। ঈশ্বরানুগ্রহে তোমার পিতৃব্যের স্মরণ ছিল বলিয়াই তোমার পিতার উপদেশ প্রতিপালিত হইবে, বোধ হইতেছে। ইহাতে আর কোনও আপত্তি উত্থাপন করিও না। এখনই বিবাহ হউক। প্রাণাধিক! এই বিষাদ-সমুদ্র মধ্যে ক্ষণকালের জন্য একবার আনন্দস্রোত বহিয়া যাউক।"

কাসেম বলিলেন "জননি! পিতা মৃত্যুকালে আমাকে একখানি কবচ দিয়া বলিয়া গিয়াছেন: যে সময় তুমি কোন বিপদে পড়িবে, নিজ বুদ্ধির দ্বারা যখন কোন উপায় স্থির করিতে না পারিবে, সেই সময়েই এই কবচের অপর পৃষ্ঠ দেখিয়া তদুপদেশ মত কার্য্য করিও। আমার দক্ষিণ হস্তে যে কবচ দেখিয়াছেন, ইহাই সেই কবচ। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আজ এই মহাঘোর বিপদ সময়ে কবচের অপর পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখি,—কি লেখা আছে।"

হাসনেবানু বলিলেন, "এখনই দেখ! তোমার আজিকার বিপদের ন্যায় আর কোন বিপদই হইবে না। কবচের অপর পৃষ্ঠা দেখিবার উপযুক্ত সময়ই এই!" এই কথা বলিয়াই হাসনেবানু কাসেমের বাহু

হইতে কবচ খুলিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। কাসেম সম্মানের সহিত কবচ চুম্বন করিয়া অপর পৃষ্ঠ দেখিয়াই বলিলেন, "মা! আমার আর কোন আপত্তি নাই। এই দেখুন, কবচে কি লেখা আছে।" পরিজনেরা সকলেই দেখিলেন, কবচে লেখা আছে,—"এখনই সখিনাকে বিবাহ কর।" কাসেম বলিলেন, "আর আমার কোন আপত্তি নাই, এই বেশেই বিবাহ করিয়া পিতার আজ্ঞা পালন এবং পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

প্রিয় পাঠকগণ! ঈশ্বরানুগ্রহে লেখনীর সাহায্যে আপনাদের সহিত আমি অনেক দূর আসিয়াছি। কোন দিন ভাবি নাই, একটু চিন্তাও করি নাই, লেখনীর অবিশ্রান্ত গতিক্রমেই আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ-সিন্ধুর পঞ্চবিংশ প্রবাহ পর্য্যন্ত আসিয়াছি কিন্তু আজ কাসেমের বিবাহপ্রবাহে মহাবিপদে পড়িলাম! কি লিখি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। হাস্‌নেবানু বলিয়াছেন, "বিষাদ-সমুদ্রে আনন্দস্রোত!" এমন কঠিন বিষয় বর্ণনা করিতে আমার মস্তক ঘুরিতেছে, লেখনী অসাড় হইয়াছে, চিন্তার গতিরোধ হইয়াছে, কল্পনা-শক্তি শিথিল হইয়াছে। যে শিবিরে স্ত্রী-পুরুষেরা, বালক-বালিকারা দিবারাত্র মাথা ফাটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে, পুত্র-মিত্রশোকে জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছে, প্রাণপতির চিরবিরহে সতী নারীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, ভ্রাতার বিয়োগ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রিয় ভ্রাতা বক্ষঃ বিদীর্ণ করিতেছে, শোকে তাপে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে দিবানিশি "হায় হায়" রবে কাঁদিতেছে, জগৎকেও কাঁদাইতেছে; আবার মুহূর্ত্ত পরেই পিপাসা, সেই পিপাসারও শান্তি হইল না;—সেই শিবিরেই আজ বিবাহ! সেই পরিজন মধ্যেই এখন বিবাহ-উৎসব! বিষাদ-সিন্ধুতে হাসিবার কোন কথা নাই, রহস্যের নামমাত্র নাই, আমোদ-আহ্লাদের বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কও নাই—আদ্যান্ত কেবল বিষাদ, ছত্রে ছত্রে কেবল বিষাদ, বিষাদেই আরম্ভ এবং বিষাদেই শেষ। কাসেমের ঘটনা বড় ভয়ানক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাবীর কাসেমের ঘটনা বিষাদ-সিন্ধুর একটি প্রধান তরঙ্গ।

কাহারও মুখে হাসি নাই, কাহারও মুখে সন্তোষের চিহ্ন নাই;

বিবাহ অথচ বিষাদ! পুরবাসিগণ সখিনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। রণবাদ্য তখন সাদীয়ানা বাদ্যের কার্য্য করিতে লাগিল। অঙ্গরাগাদি সুগন্ধি দ্রব্যের কথা কাহারও স্মরণ হইল না;—কেবল কণ্ঠবিনির্গত নেত্রজলেই সখিনার অঙ্গ ধৌত করিয়া পুরবাসিনীরা পরিষ্কৃত বসনে সখিনাকে সজ্জিত করিলেন, তাঁহার কেশগুচ্ছ পরিপাটী করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, সভ্যদেশ-প্রচলিত বিবাহের চিহ্নস্বরূপ দুই একখানি অলঙ্কার সখিনার অঙ্গে ধারণ করাইলেন। সখিনা পূর্ণবয়স্কা, তিনি সকলই বুঝিতেছেন। কাসেম অপরিচিত নহেন। প্রণয়, ভালবাসা, উভয়েরই রহিয়াছে। ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে যেরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র প্রণয় হইয়া থাকে, তাহা কাসেম-সখিনার বাল্যকাল হইতেই রহিয়াছে। কাহারও স্বভাব কাহারও অজানা নাই, বাল্যকাল হইতে এই উপস্থিত যৌবনকাল পর্য্যন্ত একত্র ক্রীড়া, একত্র ভ্রমণ, একত্র বাস নিবন্ধন উভয়েরই মনে সবিশেষ সরল প্রণয় জন্মিয়াছে। উভয়েই এক পরিবার, এক বংশসম্ভূত, উভয়েরই পিতা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা, সুতরাং লজ্জা, মান, অভিমান প্রভৃতি অপর স্বামী-স্ত্রীতে যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহা ইঁহাদের নাই। লগ্ন সুস্থির হইল। ওদিকে এজিদের সৈন্যমধ্যে ঘোর রবে যুদ্ধের বাজনা বাজিতে লাগিল। ফোরাত নদীর কূল উদ্ধার করিতে আর কোন বীরপুরুষই হোসেনের পক্ষ হইতে আসিতেছে না দেখিয়া, আজিকার যুদ্ধে জয় সম্ভব বিবেচনায়, তুমুল শব্দে বাজনা বাজিতে লাগিল। সেই শব্দে ফোরাতকূল হইতে কারবালার অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হোসেনের শিবিরে পতিপুত্র-শোকাতুরা অবলাগণের কাতর নিনাদে সপ্তুতল আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। সেই কাতরধ্বনি ঈশ্বরের সিংহাসন পর্য্যন্ত যাইতে লাগিল! হোসেন বাধ্য হইয়া এই নিদারুণ দুঃখ সময়ে কাসেমের হস্তে প্রাণাধিকা দুহিতা সখিনাকে সমর্পন করিলেন। বিধিমতে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। শুভ কার্য্যের পর আনন্দাশ্রু অনেকের চক্ষে দেখা যায়, কিন্তু হোসেনের শিবিরস্থ পরিজনগণের চক্ষে কোন প্রকার অশ্রুই দেখা যায় নাই। কিন্তু কাসেমের বিবাহ বিষাদ-সিন্ধুর সর্ব্বাপেক্ষা

প্রধান তরঙ্গ। সেই ভীষণ তরঙ্গে সকলেরই অন্তর ভাসিয়া যাইতেছিল। বরকন্যা উভয়েই সমবয়স্ক। স্বামী-স্ত্রীতে দুই দণ্ড নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিতেও আর সময় হইল না। বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই গুরুজন-গণের চরণ বন্দনা করিয়া, মহাবীর কাসেম অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এখন কাসেম শক্রনিপাতে চলিল।"

হাস্‌নেবানু কাসেমের মুখে শত শত চুম্বন দিয়া আর আর সকলের সহিত দুই হস্ত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে করুণাময় জগদীশ্বর! কাসেমকে রক্ষা করিও, আজ কাসেম বিবাহ-সজ্জা,—বাসরসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া চিরশত্রু-সৈন্য সম্মুখে যুদ্ধসজ্জায় চলিল। পরমেশ্বর! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা; তুমিই রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক হইয়া পিতৃহীন কাসেমকে এ বিপদে রক্ষা কর!"

কাসেম যাইতে অগ্রসর হইলেন, হাস্‌নেবানু বলিতে লাগিলেন "কাসেম! একটু অপেক্ষা কর। আমার চির মনঃসাধ আমি পূর্ণ করি। তোমাদের দুই জনকে একত্রে নির্জ্জনে বসাইয়া আমি একটু দেখিয়া লই। উভয়কে একত্রে দেখিতে আমার নিতান্তই সাধ হইয়াছে।" এই বলিয়া সখিনা ও কাসেমকে বস্ত্রাবাস-মধ্যে একত্রে বসাইয়া বলিলেন, "কাসেম! তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লও।" হাস্‌নেবানু শিরে করাঘাত করিতে করিতে তথা হইতে বাহির হইয়া কাসেমের গম্য পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাসেম সখিনার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। কেবল সখিনার মুখপানে চাহিয়া কাসেম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাসেম বলিলেন, "সখিনা! প্রণয়,—পরিচয়ের ভিখারী আমরা নহি; এক্ষণে নূতন সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রণয় নূতন ভাবে আজীবন সমভাবে রক্ষার জন্যই বিধাতা এই নূতন সম্বন্ধ সৃষ্টি করাইলেন। তুমি বীর-কন্যা—বীরজায়া; এ সময় তোমার মৌনী হইয়া থাকা আমার অধিকতর দুঃখের কারণ। পবিত্র প্রণয় ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এক্ষণে তাহার উপর পরিণয়সূচক বন্ধন যুক্ত হইল। আর কি আশা কর? অস্থায়ী জগতে আর কি সুখ আছে বল ত?"

সখিনা বলিলেন, "কাসেম! তুমি আমাকে প্রবোধ দিতে পারিবে না। তবে এইমাত্র বলি, যেখানে শত্রুর নাম নাই, এজিদের ভয় নাই, কারবালা প্রান্তরও নাই, ফোরাত-জলের পিপাসাও যেখানে নাই. সেই স্থানে যেন আমি তোমাকে পাই; এই আমার প্রার্থণা। প্রণয় ছিল, পরিণয় হইল, আর চাই কি?"—কাসেমের হস্ত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখিনা পুনঃ পুনঃ বলিলেন; "কাসেম! প্রণয় ছিল, পরিণয় হইল, আর কি আশা?"

প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অতি স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিয়া মুখের নিকটে মুখ রাখিয়া কাসেম বলিতে লাগিলেন, "আমি যুদ্ধযাত্রী, শত্রু-শোণিত পিপাসু; আজ সপ্ত দিবস এক বিন্দু মাত্র জলও গ্রহণ করি নাই, কিন্তু এখন আমার ক্ষুধা-পিপাসা কিছুই নাই। তবে যে পিপাসায় কাতর হইয়া চলিলাম, বোধ হয় এ জীবনে তাহার তৃপ্তি নাই, হইবেও না। তুমি কাঁদিও না, মনের আনন্দে আমাকে বিদায় দাও। একবার কান পাতিয়া শুন দেখি, শত্রুদলের রণবাদ্য কেমন ঘোর রবে বাদিত হইতেছে! তোমার স্বামী—এই কাসেম কি ঐ বাদ্য শুনিয়া নব-বিবাহিতা স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? সখিনা! আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

সখিনা বলিতে লাগিলেন—"তোমাকে ঈশ্বরের হাতে সঁপিলাম। যাও কাসেম, যুদ্ধে যাও! প্রথম মিলন-রজনীর সমাগম আশায় অস্তমিত সূর্য্যের মলিন ভাব দেখিয়া প্রফুল্ল হওয়া সখিনার ভাগ্যে নাই! যাও কাসেম!—যুদ্ধে যাও!"

কাসেম আর সখিনার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না, স্ত্রীর আয়তলোচনের বিষাদিত ভাব চক্ষে দেখিতে আর তাঁহার ক্ষমতা হইল না; কোমলপ্রাণা সখিনার সুকোমল হস্ত ধরিয়া বারংবার চুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন। সখিনার আশা-ভরসা যে মুহূর্ত্তে অঙ্কুরিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই শুকাইয়া গেল! কাসেম শিবির হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। অশ্ব

বায়ুবেগে দৌড়াইয়া চলিল—সখিনা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয়ে বেদনা লাগিল।

কাসেম সমরক্ষেত্রে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ-সাধ যদি কাহারও থাকে, যৌবনে যদি কাহারও অমূল্য জীবন বিড়ম্বনা জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে কাসেমের সম্মুখে অগ্রসর হও।"

সেনাপতি ওমর পূর্ব্ব হইতেই কাসেমকে বিশেষরূপে জানিতেন। কাসেমের তরবারি-সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এমন বলবান্ বীর তাঁহার সৈন্য মধ্যে এক বর্জ্জক ভিন্ন আর কেহই ছিল না। বর্জ্জককে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই বর্জ্জক! হাসান-পুত্র কাসেমের সহিত যুদ্ধ করিতে আমাদের সৈন্যদল মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। ভাই, কাসেমের বলবীর্য্য, কাসেমের বলবিক্রম, কাসেমের বীরত্ব-প্রতাপ সকলই আমার জানা আছে। তাহার সম্মুখে যাহাকে পাঠাইব, সে আর শিবিরে ফিরিয়া আসিবে না। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, কোন ক্রমেই কাসেমের হস্ত হইতে সে আর রক্ষা পাইবে না। নিরর্থক সৈন্যক্ষয় করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমার বিবেচনায় তুমিই কাসেম অপেক্ষা মহাবীর। তুমিই কাসেমের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া আইস।"

বর্জ্জক বলিলেন, "বড় ঘৃণার কথা! শামদেশে মহা মহা বীরের সম্মুখে আমি দাঁড়াইয়াছি, মিশরে প্রধান প্রধান মহারথীরা বর্জ্জকের বীরত্ব, বীর্য্য অবগত আছে, আজ পর্য্যন্ত কেহই সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই; এখন কি না, এই সামান্য বালকের সহিত ওমর আমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন, বড়ই ঘৃণার কথা! হোসেনের সম্মুখে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে বরং কথঞ্চিৎ শোভা পায়; আর এ কি না কাসেমের সহিত যুদ্ধ! বালকের সহিত সংগ্রাম! কনখও না! কখনও না! কখনও আমি কাসেমের সহিত যুদ্ধ করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিব না!"

ওমর বলিলেন, "তুমি কাসেমকে জান না। তাহাকে অবহেলা করিও না। তাহার তুল্য মহাবীর মদিনায় আর নাই। ভাই বর্জ্জক, তুমি ভিন্ন

কাসেমের অস্ত্রাঘাত সহ্য করে এমন বীর আমাদের দলে আর কে আছে ?”

হাসিতে হাসিতে বর্জ্জক বলিলেন, “কাহাকে তুমি কি কথা বল ? ক্ষুদ্র কীট, ক্ষুদ্র পতঙ্গ কাসেম, তাহার মাথা কাটিয়া আমি কি বিশ্ববিজয়ী বীরহস্ত কলঙ্কিত করিব ? কখনই না—কখনই না ! সিংহের সহিত সিংহের যুদ্ধ হয়, শৃগালের সহিত সিংহ কোন কালে যুদ্ধ করে, ওমর ? সিংহ—শৃগাল ! তুলনা করিলে তাহাও নহে। বর্জ্জক সিংহ, কাসেম একটা পতঙ্গ মাত্র। কি বিবেচনায় ওমর ! কি বিবেচনায় তুমি সেই তুচ্ছ পতঙ্গ কাসেমের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে পাঠাও ? আচ্ছা, তোমার যদি বিশ্বাস হইয়া থাকে—কাসেম মহাবীর, তবে আমি যাইব না, আমার অমিততেজা চারি পুত্র বর্ত্তমান, তাহারা রণক্ষেত্রে গমন করুক—এখনই তাহারা কাসেমের মাথা কাটিয়া আনিবে।”

তাহাই ওমরের তথাস্তু। আদেশমত বর্জ্জকের প্রথম পুত্র যুদ্ধে গমন করিলেন। সে যুদ্ধক্ষেত্রে বর্ষা চালাইতে আরম্ভ করিল। বিপক্ষ পরাস্ত হইল না। অবশেষে অসিযুদ্ধ। সম্মুখে কাসেম ! উভয়ে মুখোমুখী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। বর্জ্জকের পুত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন, কাসেম হাস্য করিতেছেন। বর্জ্জকের পুত্রের তরবারি-সংযুক্ত বহুমূল্য মণিমুক্তা দেখিয়া সহাস্য আস্যে কাসেম কহিলেন, “কি চমৎকার শোভা ! মণিময় অস্ত্র প্রদর্শন করিলেই যদি মহারথী হয়, তবে বল দেখি, মস্তকে মণি শোভিত কালসর্প কেন মহারথী হইবে না ?”

কথা না শুনিয়াই বর্জ্জকের পুত্র কাসেমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।

অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। পুনর্ব্বার আঘাত। কাসেমের বর্ম্ম বিদ্ধ হইয়া বাম হস্ত হইতে শোণিতের ধারা ছুটিল। ত্রস্তহস্তে শিরস্ত্রাণ ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থান বন্ধনপূর্ব্বক ক্ষতযোদ্ধা পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করিলেন। বর্জ্জকের পুত্র বর্শা ধারণ করিয়া বলিলেন, “কাসেম ! তলোয়ার রাখ। তোমার বাম হস্তে আঘাত লাগিয়াছে। বর্ম্মধারণে তুমি অক্ষম। অসিযুদ্ধে তুমি এখন অক্ষম। বর্শা ধারণ কর, বর্শাযুদ্ধই শ্রেয়ঃ।”

বক্তার কথা মুখে থাকিতে থাকিতে, কাসেমের বর্শা প্রতিযোদ্ধার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া পৃষ্ঠ পার হইল। বর্জ্জকের পুত্রের শোণিতাক্ত শরীর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহার কটিবন্ধের মহামূল্য অসি সজোরে আকর্ষণ করিয়া কাসেম বলিলেন, "কাফের! মূল্যবান্ অস্ত্রের ব্যবহার দেখ।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই বর্জ্জক-পুত্রের মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রে ধূলিলুণ্ঠিত হইল। কাসেম বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্ম্মী কাফেরগণ! আর কাহাকে রণক্ষেত্রে কাসেমের সম্মুখে পাঠাইবি, পাঠা?"

পাঠাইবার বেশী বিলম্ব হইল না। দেখিতে দেখিতে মহাবীর কাসেম বর্জ্জকের অপর তিন পুত্রকে শীঘ্র শীঘ্র শমনসদনে পাঠাইলেন। এইবার পুত্রশোকাতুর বর্জ্জক সেনাপতির আদেশের অপেক্ষা না করিয়া ভীম-গর্জ্জনে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিলেন। বীরদর্পে তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাসেম! তুমি ধন্য! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। তুমি আমার চারিটি পুত্র নিধন করিয়াছ, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। কাসেম! তুমি বালক। এত যুদ্ধ করিয়া অবশ্যই ক্লান্ত হইয়াছ। সপ্তাহকাল তোমার উদরে অন্ন নাই, কণ্ঠে জলবিন্দু নাই, এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।"

কাসেম বলিলেন, "বর্জ্জক! সে ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। তুমি পুত্রশোকে যে প্রকার বিহ্বল হইয়াছ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার পক্ষে এ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াই বিড়ম্বনা।"

বর্জ্জক বলিলেন, "কাসেম আমি তোমার কথা স্বীকার করি, পুত্রশোকে অতি কঠিন হৃদয়ও বিহ্বল হয়, কিন্তু পুত্রহন্তার মস্তক লাভের আশা থাকিলে—এখনই পুত্রমস্তকের পরিশোধ হইবে নিশ্চয় জানিতে পারিলে, বীরহৃদয়ের বিহ্বলতাই বা কি? দুঃখই বা কি? কাসেম বল ত, তুমি ঐ তরবারিখানি কোথায় পাইলে? ও তরবারি আমার, আমি বহু যত্নে, বহু ব্যয়ে মণিমুক্তা সংযোগে সুসজ্জিত করিয়াছি।"

কাসেম বলিলেন, "বেশ করিয়াছ।—তাহাতে দুঃখ কি? তোমার মণিমুক্তাসজ্জিত তরবারির দ্বারা তোমারই চারি পুত্র বিনাশ করিয়াছি।

নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিও এই মূল্যবান তরবারির আঘাত হইতে বঞ্চিত হইবে না। নিশ্চয় জানিও, অন্য তরবারিতে, অন্যের হস্তে তোমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে না। আক্ষেপ করিও না, তোমার এই মহামূল্য অসি তোমারই জীবন বিনাশের নির্দ্ধারিত অস্ত্র মনে করিও।"

বর্জ্জক মহাক্রোধে বর্শা ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কাসেম! তোমার বাক্‌চাতুরী এই মুহূর্ত্তেই শেষ করিতেছি। তুমিও নিশ্চয় জানিও, বর্জ্জকের হস্ত হইতে তোমার রক্ষা নাই।" এই বলিয়া বর্জ্জক সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। কাসেম বর্ম্ম দ্বারা বর্শাঘাত ফিরাইয়া বর্জ্জকের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া বর্শা উত্তোলন করিতেই বর্জ্জক লঘুহস্তের প্রভাবে কাসেমকে পুনরায় বর্শাঘাত করিলেন। বীরবর কাসেম বিশেষ চতুরতার সহিত বর্জ্জকের বর্শা ফিরাইয়া আপন বর্শা দ্বারা বর্জ্জককে আঘাত করিলেন। উভয় বীর বহুক্ষণ বর্শাযুদ্ধ করিয়া শেষে উভয়েই তরবারি ধারণ করিলেন। তরবারির ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের বর্ম্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কাসেমকে ধন্যবাদ দিয়া বজ্জর্ক বলিতে লাগিলেন, "কাসেম! আমি রুম, শাম, মিশর, আরব প্রভৃতি বহু দেশে বহু যোদ্ধার তরবারিযুদ্ধ দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় তরবারিধারী বীর কুত্রাপি কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। ধন্য তোমার শিক্ষাকৌশল! যাহা হউক, কাসেম! এই আমার শেষ আঘাত। হয় তোমার জীবন, না হয় আমার জীবন—" এই শেষ কথা বলিয়া বজ্জর্ক কাসেমের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি আঘাত করিলেন। কাসেম সে আঘাত তাচ্ছিল্যভাবে বর্ম্মে উড়াইয়া দিয়া বজ্জর্ক সরিতে না সরিতেই তাঁহার গ্রীবাদেশে অসি প্রয়োগ করিলেন। বীরবর কাসেমের আঘাতে বজ্জর্কের শির রণক্ষেত্রে গড়াইয়া পড়িল। এই ভয়াবহ ঘটনা দৃষ্টে এজিদের সৈন্যমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

বর্জ্জকের নিপাত দর্শনে এজিদের সৈন্যমধ্যে কেহই আর সমরাঙ্গণে আসিতে সাহসী হইল না। কাসেম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিপক্ষদিগকে দেখিতে না পাইয়া একেবারে ফোরাত-তীরে উপস্থিত হইলেন। নদী-রক্ষকেরা কাসেমের অশ্বপদধ্বনি শ্রবণে মহা ব্যতিব্যস্ত

হইয়া মহাশঙ্কিত হইল। কাসেম কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তরবারি, তীর, নেজা, বল্লম,—যাহার দ্বারা যাহাকে মারিতে সুবিধা পাইলেন, তাহারি দ্বারা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফোরাতকূল উদ্ধারের উপক্রম করিলেন। ওমর, সীমার ও আবদুল্লাহ্ প্রভৃতিরা দেখিলেন,—নদীকূল-রক্ষীরা কাসেমের অস্ত্র-সম্মুখে কেহই টিকিতেছে না। ইঁহারা কয়েকজনে একত্র হইয়া সমর-প্রাঙ্গণের সমুদয় সৈন্যসহ কাসেমকে পশ্চাৎদিক হইতে ঘিরিয়া তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনবরত তীর কাসেমের অঙ্গে আসিয়া বিদ্ধ হইতেছে; কাসেমের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই; কেবল ফোরাতকূল উদ্ধার করিবেন—এই আশাতেই সম্মুখস্থ শত্রুগণকে সংহার করিতেছেন। কাসেমের শ্বেতবর্ণ অশ্ব তীরাঘাতে রক্তধারায় লোহিতবর্ণ হইয়াছে। শোণিতধারা অশ্বপদ বহিয়া মৃত্তিকা রঞ্জিত করিতেছে। ক্রমেই কাসেম নিস্তেজ হইতেছেন;—শোণিতপ্রবাহে চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার দেখিতেছেন, শেষে নিরুপায় হইয়া অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিলেন। শিক্ষিত অশ্ব কাসেমের শরীরের অবসন্নতা বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে শিবির-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; হাস্‌নেবানু ও সখিনা শিবিরমধ্য হইতে অশ্বপদধ্বনি শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন: কাসেমের পরিহিত শুভ্রবসন লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, শোণিতধারা অশ্বপদ বহিয়া পড়িতেছে। কাসেম অশ্ব হইতে নামিয়া সখিনাকে বলিলেন, "সখিনা! দেখ, তোমার স্বামীর শাহানা * পোষাক দেখ! আজ বিবাহ-সময়ে উপযুক্ত পরিচ্ছদে তোমাকে বিবাহ করি নাই, কাসেমের দেহবিনির্গত শোণিতধারে শুভ্রবসন লোহিত বর্ণে পরিণত হইয়া বিবাহবেশ সম্পূর্ণ করিয়াছে! এই বেশ তোমাকে দেখাইবার জন্যই বহু কষ্টে শত্রুদল ভেদ করিয়া এখানে আসিয়াছি। আইস, এই বেশে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ শীতল করি। সখিনা! আইস, এই বেশেই আমার মানসের চিরপিপাসা নিবারণ করি।"

কাসেম এই কথা বলিয়াই সখিনাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন; সখিনাও অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন।

* লাল পোষাক

কাসেমের দেহবিনির্গত শোণিত-প্রবাহে সখিনার পরিহিত বস্ত্র রক্তবর্ণ হইল। কাসেম সখিনার গলদেশে বাহু বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন—নিজ বশে আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই, শরাঘাতে সমুদয় অঙ্গ জরজর হইয়া সহস্র পথে শোণিতধারা শরীর বহিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। সজ্জিত মস্তক ক্রমশঃই সখিনার স্কন্ধদেশে নত হইয়া আসিতে লাগিল। সখিনার বিষাদিত বদন নিরীক্ষণ করা কাসেমের অসহ্য হইল বলিয়াই তাঁহার চক্ষু দুইটি নীল বর্ণ ধারণ করিয়া ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে সময়েও কাসেম বলিলেন, "সখিনা! নব অনুরাগে পরিণয়-সূত্রে তোমারি প্রণয়-পুষ্পহার কাসেম আজ গলায় পরিয়াছিল; বিধাতা আজই সে-হার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। জগতে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি; দৈহিক সম্বন্ধ-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল; কিন্তু সখিনা! সে জন্য তুমি ভাবিও না—কেয়ামতে অবশ্যই দেখা হইবে। সখিনা! নিশ্চয় জানিও, ইহা আর কিছুই নহে, কেবল অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। ঐ দেখ, আমার পিতা অমরপুরীর সুবাসিত শীতল জলপূর্ণ মণিময় সোরাহী-হস্তে আমার পিপাসার শান্তির জন্য দাঁড়াইয়া আছেন! আমি চলিলাম।"

কাসেমের চক্ষু একেবারে বন্ধ হইল!—প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর হইতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া হাসানের নিকট চলিয়া গেল। শূন্যদেহ সখিনার দেহযষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। পুরবাসীরা সকলেই কাসেমের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সখিনা স্বামীর মৃতদেহ অঙ্গে ধারণ করিয়া করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাসেম! একবার চাহিয়া দেখ, তোমার সখিনা এখনও সেই বিবাহ-বেশ পরিয়া রহিয়াছে! কেশগুচ্ছ যে ভাবে দেখিয়াছিলে, এখনও সেইভাবে রহিয়াছে। তাহার একগাছিও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। লোহিত বসন পরিধান করিয়া বিবাহ হয় নাই; প্রাণেশ্বর! তাই আপন শরীরের রক্তধারে সেই বসন রঞ্জিত করিয়া দেখাইলে! আমি আর কি করিব? জীবিতেশ! জগতে সখিনা বাঁচিয়া থাকিতে তোমার দেহবিনির্গত শোণিত বিন্দু সে মৃত্তিকাসংলগ্ন হইতে দিবে না!" এই বলিয়া কাসেমের দেহবিনির্গত

শোণিত-বিন্দু সখিনা সমুদয় অঙ্গে মাখিতে লাগিলেন; মাখিতে মাখিতে কহিতে লাগিলেন, "বিবাহ-সময়ে এই হস্তদ্বয় মেহেদী দ্বারা সুরঞ্জিত হয় নাই—একবার চাহিয়া দেখ!—কাসেম! একবার চাহিয়া দেখ! তোমার সখিনার হস্ত তোমারি রক্ত-ধারে কেমন শোভিত হইয়াছে! জীবিতেশ্বর! তোমারি এই পবিত্র রক্ত মাখিয়া সখিনা চিরজীবন এই বেশেই থাকিবে। যুদ্ধজয়ী হইয়া আজ বাসর-শয্যায় শয়ন করিবে বলিয়াছিলে, সে সময় ত প্রায় আগত;—তবে ধূলিশয্যায় শয়ন কেন হৃদয়েশ?—বিধাতা! আজই সংসার-ধর্ম্মের মুখ দেখাইলে, আজই সংসারী করিলে, আবার আজই সমস্ত সুখ মিটাইলে!—দিন এখনও রহিয়াছে; সে দিন অবসান না হইতেই সখিনার এই দশা করিলে! যে সূর্য্য সখিনার বিবাহ দেখিল, সেই সূর্য্যই সখিনার বৈধব্য-দশা দেখিয়া চলিল! সূর্য্যদেব! যাও, সখিনার দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও! সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রতিদিন তুমি কত ঘটনা, কত কার্য্য, কত সুখ, কত দুঃখ দেখিয়াছ, কিন্তু দিবাকর! এমন 'হরিষে বিষাদ' কখনও কি দর্শন করিয়াছ?—সখিনার তুল্য দুঃখিনী কখনও কি তোমার চক্ষে পড়িয়াছে? যাও সূর্য্যদেব! সখিনার সন্তবৈধব্য দেখিয়া যাও!"

সখিনা এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। কাসেমের অবস্থা দর্শনে হোসেন একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিঞ্চিৎ পরে সংজ্ঞা পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কাসেম! তুমি আমার কুল-প্রদীপ, তুমি আমার বংশের উজ্জ্বল মণি, তুমিই আমার মদিনার ভাবী রাজা,—আমার অবর্ত্তমানে তোমার শিরেই রাজমুকুট শোভা পাইত। বৎস! তোমার বীরত্বে—তোমার অস্ত্র-প্রভাবে মদিনাবাসীরা সকলেই বিমুগ্ধ! আরবের মহা মহা যোদ্ধাগণ তোমার নিকট পরাস্ত; তুমি আজ কাহার ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া লোহিত বসনে নিস্পন্দভাবে ধরাশায়ী হইয়া রহিলে? প্রাণাধিক!—বীরেন্দ্র! ঐ শুন, শত্রুদল রণবাদ্য বাজাইতেছে। তুমি সমরাঙ্গণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ বলিয়া তোমাকে তাহারা ধিক্কার দিতেছে। কাসেম! গাত্রোত্থান কর,—তরবারি ধারণ কর! ঐ

দেখ, তোমার প্রিয় অশ্ব ক্ষত-বিক্ষত শরীরে শোণিতাক্ত কলেবরে তোমাকে ধরাশায়ী দেখিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতেছে! শরাঘাতে তাহার শ্বেতকান্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া শোণিতধারায় লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে; তথাপি রণক্ষেত্রে যাইবার জন্য উৎসাহের সহিত তোমারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, সম্মুখস্থ পদ দ্বারা মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। কাসেম! একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, তোমার প্রিয়তম অশ্বের অবস্থা একবার চাহিয়া দেখ! কাসেম! আজ আমি তোমার বিবাহ দিয়াছি। যাহার সঙ্গে কোন দিন কোন সম্বন্ধ ছিল না, পরিচয় ছিল না, প্রণয় ছিল না, এমন কোন কন্যা আনিয়া তোমাকে সমর্পণ করি নাই; আমার হৃদয়ের ধনকেই তোমার হস্তে দিয়াছি। তোমারই পিতৃ-আদেশে সখিনাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।"

হাসানকে উদ্দেশ করিয়া হোসেন অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! জগৎ পরিত্যাগের দিন ভাল উপদেশ দিয়া গিয়াছিলে! যে দিন বিবাহ, সেই দিনই সর্ব্বনাশ! যদি ইহাই জানিয়াছিলে, যদি সখিনার অদৃষ্টলিপির মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলে, তবে কাসেমের সঙ্গে সখিনার বিবাহের উপদেশ কেন দিয়াছিলে, ভাই!—তুমি ত স্বর্গসুখে রহিয়াছ, এ সর্ব্বনাশ একবার চক্ষেও দেখিলে না—এই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই অগ্রে চলিয়া গেলে! ভাই! মৃত্যুসময় তোমার যত্নের রত্ন হৃদয়ের অমূল্য মণি কাসেমকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলে; আমি এমনই হতভাগ্য যে, সেই অমূল্য নিধিটি রক্ষা করিতে পারিলাম না। আর কি বলিব? তোমার প্রাণাধিক পুত্র কাসেম এক বিন্দু জলের প্রত্যাশায় শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল! কাসেম বিন্দুমাত্র জল পাইলে এজিদের সৈন্যের নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিত না; তাহাদের দেহ-সমষ্টি শোণিত প্রবাহের সহিত ফোরাত-প্রবাহে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া যাইত তাহার সন্ধানও রহিত না! আর সহ্য হয় না! সখিনার মুখের দিকে আর চাহিতে পারি না! কৈ আমার অস্ত্র শস্ত্র কোথায়? কাসেমের শোকাগ্নি আজ শত্রুশোণিতে পরিণত হউক! সখিনার বৈধব্যসূচক চিরশুভ্রবসন শত্রুশোণিতে রঞ্জিত করিয়া চিরকাল সধবার চিহ্নে রাখিব; কৈ আমার বর্ম্ম কোথায়? কৈ

আমার শিরস্ত্রাণ কোথায়? (জোরে উঠিয়া) কৈ, আমার অশ্ব কোথায়? এখনই অন্তর-জ্বালা নিবারণ করি!—শত্রু বধ করিয়া কাসেমের শোক ভুলিয়া যাই!" পাগলের মত এই সকল কথা বলিয়া হোসেন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে চলিলেন।

হোসেনের পুত্র আলী আক্‌বর করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! এখনও আমরা চারি ভ্রাতা বর্ত্তমান। যদিও আমরা শিশু, তথাপি মরণে ভয় করি না। আমরা বর্ত্তমান থাকিতে আপনি অস্ত্র ধারণ করিবেন? আমাদের বাঁচিবার আশা ত একরূপ শেষই হইয়াছে। জল-পিপাসায়, আত্মীয়স্বজনের শোকাগ্নি-উত্তাপে জিহ্বা, কণ্ঠ, বক্ষ, উদর সকলই ত শুষ্ক হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় আর কয় দিন বাঁচিব? নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। বীর পুরুষের ন্যায় মরাই শ্রেয়ঃ। স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া মরিব না।" এই কথা বলিয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া আলী আক্‌বর অশ্বে আরোহণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে কাহাকেও আহ্বান না করিয়া তিনি একেবারে ফোরাতকূল-রক্ষকদিগের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রক্ষীরা ফোরাতকূল ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। এজিদের সৈন্যমধ্যে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। আলী আক্‌বর যেমন বলবান্, তেমনই রূপবান্ ছিলেন। আলী আক্‌বরের সুদৃশ্য রূপলাবণ্যের প্রতি যাহার চক্ষু পড়িল, তাহার অস্ত্র আর তাঁহার প্রতি আঘাত করিতে উঠিল না। যে দেখিল, সেই-ই আক্‌বরের রূপে মোহিত হইয়া তৎপ্রতি অস্ত্রচালনায় বিরত হইল। অস্ত্রচালনা দূরে থাকুক,—পিপাসায় আক্রান্ত, শীঘ্রই মৃত্যু হইবে, এই ভাবিয়াই অনেক বিধর্ম্মী দুঃখ করিতে লাগিল। আলী আক্‌বর বীরত্বের সহিত নদীকূলরক্ষীদিগকে তাড়াইয়া অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই ভাবিতেছেন: কি করি! সমুদয় শত্রু শেষ করিতে পারিলাম না! যাহারা পলাইতে অবসর পাইল না তাহারাই সম্মুখে দাঁড়াইল। ঐশ্বরী মায়ায় তাহাদের পরমায়ুও শেষ হইল। কিন্তু অধিকাংশ রক্ষীরাই প্রাণভয়ে নদীকূল ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইল। আমি এখন কি করি!'

ঈশ্বরের মায়া বুঝিতে মানুষের সাধ্যমাত্র নাই। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ

তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া সেই সময়েই ফোরাত-তীরে আসিয়া আলী আকবরকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জেয়াদের সৈন্য আলী আকবরের তরবারির সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধরূপে পড়িয়া যাইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত আলী আক্‌বরের অঙ্গে শত্রুপক্ষেরা কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পারে নাই; কিন্তু আলী তাঁর সাধ্যানুসারে বিধর্ম্মী-মস্তক নিপাত করিয়াও শেষ করিতে পারিলেন না। যাহারা পলাইয়া-ছিল, তাহারাও জেয়াদের সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া আলী আক্‌বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। আক্‌বর সৈন্যচক্র ভেদ করিয়া দ্রুতগতিতে শিবিরে আসিলেন; পিতার সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ফোরাতকূল উদ্ধার হইত; কিন্তু কুফা হইতে আবদুল্লাহ্ জেয়াদ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া এজিদের সৈন্যের সাহায্যার্থে পুনরায় নদীতীর বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে উপায়েই হউক, আমাকে এক পাত্র জল দিন, আমি এখনই জেয়াদকে সৈন্যসহ শমনভবনে প্রেরণ করিয়া আসি। এই দেখুন, আমার তরবারি কাফের-শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃপায় এবং আপনার আশীর্ব্বাদে আমার অঙ্গে কেহ এ পর্য্যন্ত একটিও আঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু পিপাসায় প্রাণ যায়।"

হোসেন বলিলেন, "আক্‌বর, আজ দশ দিন কেবল চক্ষের জল ব্যতীত এক বিন্দু জল চক্ষে দেখি নাই। সেই চক্ষের জলও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। জল কোথায় পাইব বাপ্?"

আলী আক্‌বর বলিলেন, "আমার প্রাণ যায়, আর বাঁচি না!"—এই বলিয়া পিপাসার্ত্ত আলী আক্‌বর ভূমিতলে শয়ন করিলেন। হোসেন বলিতে লাগিলেন, "হে ঈশ্বর! জলে মানব-জীবন রক্ষা হইবে বলিয়া জলের নাম তুমি দিয়াছ 'জীবন'!—জগদীশ্বর! সেই জীবন আজ দুর্ল্লভ! জগৎ-জীবন! সেই জীবনের জন্য মানব-জীবন আজ লালায়িত। কার কাছে জীবন ভিক্ষা করি দয়াময়? আশুতোষ! তোমার জগৎ-জীবন নামের কৃপায় শিশু কেন বঞ্চিত হইবে, জগদীশ?—করুণাময়! তুমি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। ভূগোলে বলে, স্থলভাগের অপেক্ষা জলভাগই অধিক।

আমরা এমনই পাপী যে, জগতের অধিকাংশ পরিমাণ যে জল, যাহা পশু পক্ষীরাও অনায়াসে লাভ করিতেছে, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম! ষষ্টি সহস্র লোকের প্রাণ বোধ হয়, এই জলের জন্যই বিনাশ হইল! দয়াময়! সকলই তোমার মহিমা!"

আলী আক্‌বরের নিকটে যাইয়া হোসেন বলিলেন, "আক্‌বর! তুমি আমার এই জিহ্বা আপন মুখের মধ্যে দিয়া একটু শান্তিলাভ কর। জিহ্বাতে যে রস আছে, উহাতে যদি তোমার পিপাসার কিছু শান্তি হয়, দেখ।—বাপ! অন্য জলের আশা আর করিও না।"

আলী আক্‌বর পিতার জিহ্বা মুখের মধ্যে রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরেই বলিলেন, "প্রাণ শীতল হইল, পিপাসা দূর হইল। ঈশ্বরের নাম করিয়া আবার চলিলাম।"

এই বলিয়া আলী আক্‌বর পুনরায় অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু শত্রু নিপাত করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে জেয়াদ এবং ওমর প্রভৃতি পরামর্শ করিলেন, "আলী আক্‌বর আর ক্ষণকাল এইরূপ যুদ্ধ করিলেই আমাদিগকে এক প্রকার শেষ করিবে। আলী আক্‌বরকে যে কোন উপায়েই হউক, বিনাশ করিতে হইবে। সম্মুখ-যুদ্ধে আক্‌বরের নিকট অগ্রসর হইয়া কেহই জয়লাভ করিতে পারিবে না; এস, দূর হইতে গুপ্তভাবে আমরা কয়েকজন উহাকে লক্ষ্য করিয়া বিষাক্ত শর সন্ধান করি, অবশ্যই কাহারও না কাহারও শর আক্‌বরের বক্ষ ভেদ করিবেই করিবে।" এই বলিয়াই প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষেরা বহুদূর হইতে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন! আলী আক্‌বর কাফেরবধে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া মাতিয়া গিয়াছেন! শরসন্ধানীরা শর নিক্ষেপ করিতেছে। একটি বিষাক্ত শর আলী আক্‌বরকে বক্ষে বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। আলী আক্‌বর সমুদয় জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পিপাসাও অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। জলের জন্য তিনি কাতরস্বরে বারবার পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন। সম্মুখে তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতৃব্য জলপাত্র হস্তে করিয়া

বলিতেছেন, "আক্‌বর! শীঘ্র আইস! আমি তোমার জন্য সুশীতল পবিত্র বারি লইয়া দণ্ডায়মান আছি।" আলী আক্‌বর জলপান করিতে যাইতেছিলেন, পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল; কিন্তু তত দূর পর্য্যন্ত যাইতে হইল না, জল পিপাসার শান্তি করিতেও হইল না, জন্মের মত জীবন-পিপাসা ফুরাইয়া গেল। আলী আক্‌বর অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল—শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব শিবিরাভিমুখে দৌড়িল। অশ্বপৃষ্ঠ শূন্য দেখিয়া আলী আক্‌বরের ভ্রাতৃদ্বয়—আলী আস্‌গর ও আবদুল্লাহ ভ্রাতৃশোকে শোকাকুল হইলেন।—তিলার্দ্ধকালও বিলম্ব না করিয়া, জিজ্ঞাসা কি অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া, তাঁহার দুই ভ্রাতা দুইটি অশ্বারোহণে শত্রু-সম্মুখীন হইলেন। ক্ষণকাল মহাপরাক্রমে বহু শত্রু বিনাশ করিয়া তাঁহারা রণস্থলে বিধর্ম্মীহস্তে শহীদ হইলেন। যুগল অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে শিবিরাভিমুখে ছুটিল। অশ্বপৃষ্ঠে পুত্রদ্বয়কে না দেখিয়া হোসেন আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এখনও কি আমি বসিয়া থাকিব? এ সময়েও কি শত্রুনিপাতে অস্ত্রধারণ করিব না? পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র—সকলেই শেষ হইল, আমি কেবল বসিয়া দেখিতেছি; আমার মত কঠিন প্রাণ জগতে কি আর কাহারও আছে?"

হোসেনের কনিষ্ঠ সন্তান জয়নাল আবেদীন ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবির হইতে দৌড়িয়া বাহির হইলেন। হোসেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন; অনেক প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে শত শত চুম্বন দিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া শাহ্‌রেবানুর নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, "জয়নাল যদি শত্রু-হস্তে প্রাণত্যাগ করে, তবে মাতামহের বংশ জগৎ হইতে একেবারে নির্ম্মূল হইবে, সৈয়দ নাম আর ইহজগতে থাকিবে না। কেয়ামতের দিন পিতা এবং মাতামহের নিকট কি উত্তর করিব? তোমরা জয়নালকে সাবধানে রক্ষা কর; সর্ব্বদাই চক্ষে চক্ষে রাখ। কোনক্রমেই ইহাকে শিবিরের বাহির হইতে দিও না।"

হোসেন কাহারও জন্য আর দুঃখ করিলেন না। ঈশ্বরের উদ্দেশে

আকাশ পানে তাকাইয়া দুই হস্ত তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়! তুমি অগতির গতি, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি বিপদের কাণ্ডারী, তুমি অনুগ্রাহক, তুমিই সর্ব্বরক্ষক। প্রভো! তোমার মহিমায় অনন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে! দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, তৃণ, কীটাণু এবং পরমাণু পর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত চরাচর তোমার গুণগান করিতেছে। তুমি মহান্, তুমি সর্ব্বত্রব্যাপী, তুমিই স্রষ্টা, তুমিই সর্ব্বকর্ত্তা, তুমিই সর্ব্বপালক, তুমিই সর্ব্বসংহারক। দয়াময়! জগতে যে দিকেই নেত্রপাত করি, সেই দিকেই তোমার করুণা এবং দয়ার আদর্শ দেখিতে পাই। কি কারণে—কি অপরাধে আবার এই দুর্দ্দশা হইল বুঝিতে পারি না। বিধর্ম্মী এজিদ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া একেবারে নিঃশেষ করিল, একেবারে বংশ নাশ করিল। দয়াময়! তুমি কি ইহার বিচার করিবে না?"

হোসেন শূন্যপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অমনি চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিলেন—আর কোন কথাই কহিলেন না; ঈশ্বরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত উপাসনা করিলেন। উপাসনা শেষ করিয়া তিনি সমর-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মণিময় হীরক-খচিত স্বর্ণমণ্ডিত বহুমূল্য সুসজ্জায় সে সজ্জা নহে। হোসেন যে সাজ আজ অঙ্গে ধারণ করিলেন, তাহা পবিত্র ও অমূল্য। যাহা ঈশ্বর-প্রসাদাৎ হস্তগত না হইলে জগতের সমুদয় ধন দিয়াও হস্তগত হইবার উপায় নাই, জীবনান্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা বা যত্ন করিলেও যে সকল অমূল্য পবিত্র পরিচ্ছদ-লাভে কাহারও ক্ষমতা নাই, হোসেন আজ সেই বসন-ভূষণ পরিধান করিলেন। প্রভু মোহাম্মদের শিরস্ত্রাণ, হজরত আলীর কবচ, হজরত দাউদ পয়গম্বরের কোমরবন্ধ, মহাত্মা সাহাব পয়গম্বরের মোজা,—এই সকল পবিত্র পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি যুদ্ধের আর আর উপকরণে সজ্জিত হইলেন। রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া এমাম হোসেন শিবিরের বাহিরে দাঁড়াইলে স্ত্রীকন্যা, পরিজন সকলেই নির্ব্বাকে কাঁদিয়া তাঁহার পদলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। উচ্চরবে কাঁদিবার কাহারও শক্তি নাই। কত কাঁদিতেছেন, কত দুঃখ করিতেছেন, এক্ষণে প্রায় সকলেরই কণ্ঠস্বর বন্ধ

হইয়া যাইতেছে। এমাম হোসেন সকলকেই সবিনয় মিষ্টবাক্যে একটু আশ্বস্ত করিয়া এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন, এবং পরিজনেরা এমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন:—"মদিনা পরিত্যাগ করিয়া আমার কুফায় আগমন-সঙ্কল্প তোমাদের অজানা কিছুই নাই। তোমরা আমার শরীরের এক এক অংশ। তোমাদের দুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ এতক্ষণ যে কেন আছে, তাহা আমি জানি না!"

সকলে সেই একই প্রকার অব্যক্ত হুহু স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। এমাম পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বরের কোন আজ্ঞা আমার দ্বারা সাধিত হইবে, মাতামহের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে। আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্য করিতে আমি বাধ্য। সেই কার্য্য সাধনে আমি সন্তোষের সহিত সম্মত আছি। জন্মিলেই মানুষকে মরিতে হইবে, তবে সেই দয়াময় কি অবস্থায় কখন কাহাকে কালের করাল গ্রাসে প্রেরণ করেন, তাহা তিনিই জানেন! ইহাও সত্য যে, এজিদের আদেশ-ক্রমে তাহার সৈন্যগণ আমাদের পিপাসাশান্তির আশাপথ একেবারে বন্ধ করিয়াছে। জল-বিহনে জীবনশক্তি কয়দিন জীবনে থাকে? জলই মানুষের একমাত্র জীবন। এই অবস্থাতে শিবিরে বসিয়া কাঁদিলে আর কি হইবে?—পুত্রগণ, মিত্রগণ এবং অন্যান্য হৃদয়ের বন্ধুগণ যাঁহারা আজ প্রভাত হইতে এই সময়ের মধ্যে বিধর্ম্মীহস্তে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য নীরবে বসিয়া কাঁদিলে আর কি হইবে? আজ না হয় কাল এই পিপাসাতেই সকলকে মরিতে হইবে।"

আবার সকলে নীরবে হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমাম আবার বলিতে লাগিলেন, "যদি নিশ্চয়ই মরিতে হইবে, তবে বীরপুরুষের ন্যায় মরিব। আমি হজরত আলীর পুত্র, মহাবীর হাসানের ভ্রাতা; আমি কি স্ত্রীলোকের সঙ্গী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মরিব? তাহা কখনই হইবে না। পুত্র-মিত্রগণের অকাল মৃত্যুজনিত শোকের যাতনা শত্রুবিনাশে নিবারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আজ কারবালা প্রান্তরে মহানদী,—মহানদী কেন—ঐ শোকে মহাসমুদ্রস্রোত মহারক্তস্রোত বহাইয়া প্রাণত্যাগ

করিব। জগৎ দেখিবে, বৃক্ষপত্র দেখিবে, আকাশ দেখিবে, আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য দেখিবে,—হোসেনের ধৈর্য্য, শান্তি, বীর্য্য ও প্রতাপ কত দূর! —আজ এই সূর্য্যকেই আদি, মধ্য, শেষ,—তাহার পরেও যদি কিছু থাকে, তাহাও দেখাইব। তোমরা আমার অন্য কেহ কাঁদিও না। যদি এই যাত্রাই এ জীবনের শেষ যাত্রা হয়, বার বার বলিতেছি, আর যুদ্ধ করিও না; আর কোন প্রাণীকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইও না; জয়নাবকে মুহূর্ত্তের জন্য হাতছাড়া করিও না। আমি তোমাদিগকে সেই দয়াময় বিপত্তারণ জগৎকারণ জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিলাম,—তিনি সকলকেই রক্ষা করিবেন। আমি প্রার্থনা করিতেছি, তোমরাও কায়মনে সেই জগৎপিতার সমীপে প্রার্থনা কর, শত্রু বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে যেন উদ্ধার করিতে পারি।"

পৌরজনমাত্রেই দুই হাত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন: "হে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর! আমাদিগকে আজ এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার কর! হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! আমাদিগকে দুরন্ত এজিদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা কর।" হোসেন বলিতে লাগিলেন, "যদি তোমাদের সঙ্গে আমার এই দেখাই শেষ দেখা হয়, তবে তোমরা কেহই আমার জন্য দুঃখ করিও না—ঈশ্বরের নিন্দা করিও না। আমার মরণে তোমাদেরই মঙ্গল। আমি মরিলে অবশ্যই তোমরা সুখী হইবে, আমিই তোমাদের কষ্টের এবং দুঃখের কারণ ছিলাম।"

পরিজনকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া জয়নালকে ক্রোড়ে লইয়া হোসেন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন: "আমি বিদায় লইলাম, আমার জন্য কাঁদিও না। কেয়ামতে আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হইবে। তুমি তোমার মায়ের নিকট থাকিও; কখনই শিবিরের বাহির হইও না, এজিদ তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না।"

জয়নালের মুখচুম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে শাহ্‌রেবানুর ক্রোড়ে দিয়া সখিনাকে সম্বোধনপূর্ব্বক হোসেন বলিলেন, "মা, আমি এক্ষণে বিদায় লইলাম। কাসেমের সংবাদ আনিতে যাই। আর দুঃখ করিও না, ঈশ্বর তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। আর একটি বীরপুরুষ হানুফা নগরে এখনও বর্ত্তমান আছেন।

যদি কোন প্রকারে এই লোমহর্ষণ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয়, প্রাণান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তোমাদের এই কষ্টের প্রতিশোধ লইতে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না;—কখনই এজিদকে ছাড়িবেন না;—হয় তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, নয় এজিদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিবেন।"

সখিনাকে এইরূপে প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক অবশেষে শাহ্‌রেবানুর হস্ত ধরিয়া রণবেশী রণযাত্রী পুনরায় বলিলেন, "বোধ হয় আমার সঙ্গে এই তোমার শেষ দেখা। শাহ্‌রেবানু! মায়াময় সংসারের দশাই এইরূপ, তবে অগ্রপশ্চাৎ,—এইমাত্র প্রভেদ;—ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া জয়নালকে সাবধানে রাখিও। আমার আর কোন কথা নাই—চলিলাম।"

শিবিরের বাহিরে আসিয়া এমাম হোসেন অশ্বে আরোহণ করিলেন। ওদিকে শিবিরমধ্যে পরিজনেরা এক প্রকার বিকৃতস্বরে 'হায় হায়' রবে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

ষড়বিংশ প্রবাহ

এমাম হোসেনের অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া এজিদের সৈন্যগণ চমকিত হইল। সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। সকলেই দেখিতে লাগিল, হোসেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষের পলকে মহাবীর হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওরে বিধর্ম্মী পাপাত্মা এজিদ! তুই কোথায়? তুই নিজে দামেস্কে থাকিয়া নিরীহ সৈন্যদিগকে কেন রণস্থলে পাঠাইয়াছিস্? আজ তোকে পাইলে জাতি-বধ-বেদনা, ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেমের বিচ্ছেদ-বেদনা এবং স্বকীয় পুত্রগণের বিয়োগ বেদনা, সমস্তই আজ তোর পাপশোণিতে শীতল করিতাম —তোর প্রতি লোমকূপ হইতে হলাহল বাহির করিয়া লোমে লোমে প্রতিশোধ লইতাম। জানিলাম কাফেরমাত্রেই চতুর। রে নৃশংস! অর্থলোভ দেখাইয়া পরের সন্তানদিগকে অকালে নিধন করিবার নিমিত্ত

পাঠাইয়াছিস্। ওরে অর্থলোভী পিশাচেরা, ধর্ম্মভয় বিসর্জ্জন দিয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিস্; আয় দেখি, কে সাহস করিয়া আমার অস্ত্রের সম্মুখে আসিবি, আয়! আর বিলম্ব কেন? যাহার পক্ষে ইহজগৎ ভার বোধ হইয়াছে যে হতভাগ্য আপন মাতাকে অকালে পুত্রশোকে কাঁদাইতে ইচ্ছা করিয়াছে, যৌবনে কুলস্ত্রীর বৈধব্য কামনা যাহার অন্তরে উদয় হইয়াছে, শীঘ্র আয়! আর আমার বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।"

এজিদ-পক্ষীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আবদুর রহমান; হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাহার চিরসাধ! অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই আবদুর রহমান অসি চালনা করিতে করিতে হোসেনের সম্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিল, "হোসেন! তুমি আজ শোকে তাপে মহাকাতর; বোধ হয়, আজ দশ দিন তোমার পেটে অন্ন নাই, পিপাসায় কণ্ঠতালু বিশুষ্ক; এই কয়েক দিন যে কেন বাঁচিয়া আছ বলিতে পারি না। আর এই কষ্টভোগ করিতে হইবে না, শীঘ্রই তোমার মনের দুঃখ নিবারণ করিতেছি। বড় দর্পে অশ্বচালনা করিয়া বেড়াইতেছ; এই আবদুর রহমান তোমার সম্মুখে দাঁড়াইল! যত বল থাকে, অগ্রে তুমিই আমাকে আঘাত কর। লোকে বলিবে যে, ক্ষুৎ-পিপাসাকুল, শোক-তাপবিদগ্ধ, পরিজন-দুঃখকাতর উৎসাহহীন বীরের সহিত কে না যুদ্ধ করিতে পারে? এ দুর্নাম আমি সহ্য করিব না—তুমিই অগ্রে আঘাত কর। তোমার বল বুঝিয়া দেখি: যদি আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিবার উপযুক্ত হও, আমি প্রতিঘাত করিব; নতুবা ফিরিয়া যাইয়া তোমার ন্যায় হীন, ক্ষীণ, দুর্ব্বল যোদ্ধাকে খুঁজিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিব।"

হোসেন বলিলেন, "এত কথার প্রয়োজন নাই। আমার বংশমধ্যে কিংবা জাতিমধ্যে অগ্রে অস্ত্র নিক্ষেপের রীতি থাকিলে তুমি এত কথা কহিবার সময় পাইতে না। হারামজাদা! বেঈমান্! কাফের! শীঘ্র যে কোন অস্ত্র হয়, আমার প্রতি নিক্ষেপ কর। সমরক্ষেত্রে আসিয়া বাগ্‌বিতণ্ডার দরকার কি? অস্ত্রই বল—পরীক্ষার প্রধান উপকরণ। কেন বিলম্ব করিতেছিস্? যে কোন অস্ত্র হউক, একবার নিক্ষেপ

করিলেই তোর যুদ্ধসাধ মিটাইতেছি। বিলম্ব তোর পক্ষে মঙ্গল বটে, কিন্তু তাহা আমার অসহ্য!

হোসেনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক "তোমার মস্তকের মূল্য লক্ষ টাকা" এই বলিয়াই আবদুর রহ্‌মান ভীমবেগে তরবারি আঘাত করিল। হোসেনের বর্ম্মোপরি আবদুর রহ্‌মানের তরবারি সংলগ্ন হইয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল। রহ্‌মান লজ্জিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিলে হোসেন বলিলেন, "অগ্রে সহ্য কর্‌, শেষে পলায়ন করিস্‌।" এই কথা বলিয়াই এক আঘাতে অশ্ব সহিত রহ্‌মানের দেহ তিনি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া এজিদের সৈন্যগণ মহাভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। কেহই আর হোসেনের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। তাহারা বলিতে লাগিল, "যদি হোসেন আজ এ সময় পিপাসা-নিবারণ করিতে বিন্দুমাত্রও জল পায়, তাহা হইলে আমাদের একটি প্রাণীও ইহার হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না। যতই যুদ্ধ হউক না কেন, বিশেষ সতর্ক হইয়া দ্বিগুণ সৈন্য দ্বারা ফোরাতকূল এখনি ঘিরিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। যে মহাবীর এক আঘাতে মহাবীর আবদুল রহ্‌মানকে নিপাত করিলেন, তাঁহার সম্মুখে কে সাহস করিয়া দাঁড়াইবে? আমরা রহ্‌মানের গৌরবেই চিরকাল গৌরব করিয়া বেড়াই, তাঁহারই যখন এই দশা হইল, তখন আমরা ত হোসেনের অশ্বপদাঘাতেই গলিয়া যাইব।" পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিয়া সকলেই এক মত হইয়া দ্বিগুণ সৈন্য দ্বারা বিশেষ সুদৃঢ়রূপে ফোরাতকূল বন্ধ করিল।

হোসেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সমরপ্রাঙ্গণে কাহাকেও না পাইয়া শত্রু শিবিরাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। তদ্দর্শনে অনেকেরই প্রাণ উড়িয়া গেল। কেহ অশ্ব-পদাঘাতে নরকে গমন করিল, কেহ কেহ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া হোসেনের সম্মুখে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাদের হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল, মস্তকগুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে দূরে বিনিক্ষিপ্ত হইল।

মহাবীর হোসেন বিধর্ম্মীদিগকে যেখানে পাইলেন, যে অস্ত্রে যে সুযোগে

যাহাকে মারিতে পারিলেন, সেই অস্ত্রের দ্বারাই তাহাকে মারিয়া নরক পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। শিবিরস্থ অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে যে দিকে সুবিধা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়াইয়া প্রাণরক্ষা করিল। যাহারা তাঁহার সম্মুখে দৌড়াইয়া আসিল, তাহারা কেহই প্রাণরক্ষা করিতে পারিল না। সকলেই হোসেনের অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পাপময় দেহ পাপরক্তে ভাসাইয়া নরকগামী হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ কারবালা পার্শ্বস্থ বিজন বনমধ্যে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। ওমর, সীমার, আবদুল্লাহ জেয়াদ প্রভৃতি সকলেই হোসেনের ভয়ে বনমধ্যে লুকাইলেন।

শত্রুপক্ষের শিবিরস্থ সৈন্য একেবারে নিঃশেষিত করিয়া হোসেন ফোরাতকূলের দিকে অশ্ব চালাইলেন। ফোরাত-রক্ষীরা হঠাৎ পলাইল না, কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্যও হোসেনের অসির আঘাত সহ্য করিয়া তিষ্ঠিবার আর তাহাদের সাধ্য হইল না। কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কেহ জঙ্গলে লুকাইল, কেহ কেহ অন্যদিকে পলাইল, কিন্তু বহুতর সৈন্যই হোসেনের অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত ফোরাত-স্রোতে ভাসিয়া চলিল। কোন স্থানে শত্রুসৈন্যের নাম মাত্রও নাই, রক্তস্রোত মধ্যে শরীরের কোন কোন ভাগ লক্ষিত হইতেছে মাত্র। যে এজিদের সৈন্য-কোলাহলে প্রচণ্ড কারবালা প্রান্তর, সুপ্রশস্ত ফোরাতকূল ঘন ঘন বিকম্পিত হইত, এক্ষণে হোসেনের অস্ত্রাঘাতে সেই কারবালা একেবারে জনশূন্য নীরব প্রান্তর! হোসেন ব্যতীত প্রাণীশূন্য ফোরাত-তীরে প্রকৃতি দেবীর বক্ষঃক্ষেত্রস্থ স্বাভাবিক শোভা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নিম্নভূমিতে রক্তস্রোত কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। রক্তমাখা খণ্ডিত-দেহ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হোসেন জল-পিপাসায় এমনই কাতর হইয়াছেন যে, তাঁহার আর কথা কহিবার শক্তি নাই। তিনি এতক্ষণ কেবল শত্রু-বিনাশের উৎসাহে উৎসাহিত ছিলেন। বিধর্ম্মীর রক্তস্রোত বহাইয়া তাঁহার পিপাসার অনেক শান্তি হইয়াছিল, এখন শত্রু শেষ হইল, পিপাসাও অসহ্য হইয়া উঠিল। শীঘ্র শীঘ্র ফোরাত-কূলে যাইয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক একেবারে জলে নামিলেন।

জলের পরিষ্কার স্নিগ্ধভাব দেখিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেন যেন, এককালে নদীর সমুদয় জল পান করিয়া ফেলেন। অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলিয়া মুখে দিবেন, এমন সময় তাঁহার সমুদয় কথা মনে পড়িল। আত্মীয়-বন্ধুর কথা মনে পড়িল, কাসেমের কথা মনে পড়িল, আলী আক্‌বর প্রভৃতির কথা মনে পড়িল, পিপাসার্ত্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথাও মনে পড়িল। "এক বিন্দু জলের জন্য ইহারা কত লালায়িত হইয়াছে, কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে, কত কষ্টভোগ করিয়াছে! এই জলের নিমিত্তই আমার পরিজনেরা পুত্রহারা, পতিহারা, ভ্রাতৃহারা হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া মরিতেছে, আমি এখন শত্রুহস্ত হইতে ফোরাতকূল উদ্ধার করিয়া সর্ব্বাগ্রেই নিজে সেই জলপান করিব!—নিজের প্রাণ পরিতৃপ্ত করিব!—আমার প্রাণের মায়াই কি এত অধিক হইল? ধিক্ আমার প্রাণে!—এই জলের জন্য আলী আক্‌বর আমার জিহ্বা পর্য্যন্ত চুষিয়াছে! এক পাত্র জল থাকিলে আমার বংশের উজ্জ্বল মণি, মহাবীর কাসেম আজ শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিত না। এখনও যাহারা জীবিত আছে, তাহারা ত শোকতাপে কাতর হইয়া পিপাসায় মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছে। —এ জল আমি কখনই পান করিব না,—ইহজীবনেও আর পান করিব না।"—এই কথা বলিয়া হস্তস্থিত জল নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়া তিনি তীরে উঠিলেন। কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন! একবার আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র শিরস্ত্রাণ শির হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন; দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই কোমর হইতে কোমরবন্ধ খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন, সেই পবিত্র মোজা আর পায়ে রাখিলেন না। ভ্রাতৃশোক, পুত্রশোক, সকল শোক একত্রে আসিয়া তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। কি মনে হইল, তাহাতেই বোধ হয়, পরিহিত পায়জামামাত্র অঙ্গে রাখিয়া আর আর সমুদয় বসন খুলিয়া ফেলিলেন। অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি ফোরাত স্রোতের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হোসেনের অশ্ব প্রভুর হস্ত, পদ ও মস্তক শূন্য দেখিয়াই যেন মহাকষ্টে দুই চক্ষু হইতে অনবরত বাষ্পজল নির্গত করিতে লাগিল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ, ওমর, সীমার, আর কয়েকজন সৈনিক যাহারা জঙ্গলে লুকাইয়াছিল, তাহারা দূর হইতে দেখিল যে, এমাম্

হোসেন জলে নামিয়া অঞ্জলিপূর্ণ জল তুলিয়া পুনরায় ফেলিয়া দিলেন, পান করিলেন না। তদনন্তর তিনি তীরে উঠিয়া সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র, অঙ্গের বসন পর্য্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যশিরে, শূন্যশরীরে অশ্বের নিকট দণ্ডায়মান আছেন। এতদ্দর্শনে ঐ কয়েকজন একত্রে ধনুর্ব্বাণ হস্তে হোসেনকে ঘিরিয়া ফেলিল। হোসেন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। স্থিরভাবে স্থিরনেত্রে ধনুর্দ্ধারী শত্রুদিগকে দেখিতেছেন, মুখে কোন কথা নাই। এমন নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুহস্তে পতিত হইয়াও মনে কোনপ্রকার শঙ্কাও নাই। অন্যমনস্কে তিনি কি ভাবিতেছেন, তাহা ঈশ্বর জানেন, আর তিনিই জানেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ফোরাত-কূল হইতে অরণ্যাভিমুখে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুগণ চতুষ্পার্শ্বে দূরে দূরে তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে জেয়াদ পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া এক বিষাক্ত লৌহশর নিক্ষেপ করিল। সে ভাবিয়াছিল যে, এক শরে হোসেনের পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিয়া বক্ষঃস্থল ভেদ করিবে, কিন্তু, ঘটনাক্রমে সে শর হোসেনের বামপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, গাত্রে লাগিল না। শব্দ হইল, সে শব্দেও হোসেনের ধ্যানভঙ্গ হইল না। তাহার পর ক্রমাগতই শর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু একটিও এমামের অঙ্গে বিদ্ধ হইল না। সীমার শর-সন্ধানে বিশেষ পারদর্শী ছিল না বলিয়াই খঞ্জর * হস্তে করিয়া যাইতেছে। এত তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছে, একটিও হোসেনের অঙ্গে লাগিতেছে না, কি আশ্চর্য্য! সীমার—এই ভাবিয়া জেয়াদের হস্ত হইতে তীরধনু গ্রহণ পূর্ব্বক হোসেনের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া একটি শর নিক্ষেপ করিল। তীর হোসেনের পৃষ্ঠে লাগিয়া গ্রীবাদেশের এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। সে দিকে হোসেনের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি এমন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন যে, শরীরের বেদনা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। যাইতে যাইতে অন্যমনস্কে তিনি একবার গ্রীবাদেশের বিদ্ধস্থান হস্ত দিয়া ঘর্ষণ করিলেন; জলের ন্যায় কিছু বোধ করিলেন,– করতলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন: জল নহে, গ্রীবা-নিঃসৃত সত্যরক্ত! রক্তদর্শনে হোসেন চমকিয়া উঠিলেন। আজ ভয়শূন্য মনে

* খঞ্জর—এক প্রকার ছোরা যাহার দুই দিকেই ধার

ভয়ের সঞ্চার হইল। সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন ঃ আবদুল্লাহ জেয়াদ, ওমর, সীমার এবং আর কয়েকজন সেনা তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া যাইতেছে। সকলের হস্তেই তীরধনু! ইহা দেখিয়াই তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন!—যে সমুদয় বসনের মাহাত্ম্যে তিনি নির্ভয়হৃদয়ে ছিলেন—তৎসমুদয় এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন ; তরবারি, তীর, নেজা, বল্লাম, বর্ম্ম, খঞ্জর কিছুই তাঁহার সঙ্গে নাই, কেবল দুখানি হাত মাত্র সম্বল। অন্যমনস্কভাবে তিনি দুই এক পদ করিয়া চলিলেন ; শত্রুরাও পূর্ব্ববৎ ঘিরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কিছু দূরে যাইয়া হোসেন আকাশ পানে দুই তিন বার চাহি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। বিষাক্ত তীরবিদ্ধ ক্ষতস্থানের জ্বালা, পিপাসার জ্বালা, শোকতাপ, বিয়োগ-দুঃখ,—নানা প্রকার জ্বালায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। জেয়াদ এবং ওমর প্রভৃতি ভাবিল যে, হোসেনের মৃত্যুই হইয়াছে—কিছুক্ষণ পরে হোসেনের হস্তপদ-সঞ্চালনের ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহার যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে—ইহা আর মনে করিল না; তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে তাহারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল।—হোসেন ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন! সামারের সামান্য শরাঘাতে তাদৃশ মহাবীরের প্রাণ বিয়োগ অসম্ভব ভাবিয়া কেহই হোসেনের নিকট যাইতে সাহসী হইল না। কেহ কেহ অনুমান করিতেছে—নিশ্চিয়ই মৃত্যু! মুখেও বলিতেছে যে, "হোসেন আর নাই! চল, হোসেনের মস্তক কাটিয়া আনি।" কিন্তু দুই এক পদ যাইয়া আর কাহারও অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। হোসেনের মৃত্যু-সংবাদ এজিদের নিকট লইয়া গেলে কোন লাভ নাই। এজিদ সে সংবাদ বিশ্বাস করিয়া কখনই পুরস্কার দান করিবেন না! 'মস্তক চাই!'—ভাবিয়া ভাবিয়া সীমার বলিল, "জেয়াদ! তুমি ত খুব সাহসী; তুমিই মৃত হোসেনের মাথা কাটিয়া আন।"

জেয়াদ বলিলেন, "হোসেনের মাথা কাটিতে আমার হস্ত স্থির থাকিবে না, সাহসও হইবে না। আমি উহা পারিব না। যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ হোসেন ধরাশায়ী হইয়া থাকে, কিংবা অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া মরার ন্যায় মাটিতে পড়িয়া থাকে, আমাকে হাতে পাইলে, বল ত

আমার কি দশা ঘটিবে? যাহার ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছি, ইচ্ছা করিয়া তাহার হাতে পড়িব? আমি ত কখনই যাইব না! মাথা কাটিয়া আনা ত শেষের কথা, নিকটেও যাইতে পারিব না।"

অলীদকে সম্বোধন করিয়া সীমার বলিল, "ভাই অলীদ! তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি হোসেনের মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে কি না?"

অলীদ উত্তর করিলেন, "আমি হোসেনের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। এজিদের বেতনভোগী হইয়া আজ কারবালা প্রান্তরে যাহা আমি করিলাম, জগৎ বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত মানবহৃদয়ে সমভাবে তাহা পাষাণে খোদিত হইয়া থাকার মতই থাকিবে। ইহার পরিণাম ফল কি আছে,—ভবিতব্য কি আছে, তাহা কে জানে ভাই!—ভাই! তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর, আমি পারিব না।—হোসেনের মাথাও আমি কাটিতে চাই না, লক্ষ টাকা পুরস্কারেরও আশা করি না। যাহার হৃদয়ে রক্তমাংসের লেশমাত্রও নাই, লক্ষ টাকার লোভে সে এই নিষ্ঠুর কার্য্য করুক।"

সদর্পে সীমার বলিয়া উঠিল, "দেখিলাম তোমাদের বীরত্ব—দেখিলাম তোমাদের সাহস—বুঝিলাম তোমাদের ক্ষমতা!—এই দেখ, আমি এখনই হোসেনের মাথা কাটিয়া আনি!"—এই কথা বলিয়াই সীমার খঞ্জর-হস্তে এক লম্ফে হোসেনের বক্ষের উপর গিয়া বসিল।

যে সীমারের নামে অঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছিল, যে সীমারের নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, পাঠক! এই সেই সীমার! সু-ধার খঞ্জর-হস্তে সেই সীমার ঐ হোসেনের বক্ষের উপর বসিয়া গলা কাটিতে উদ্যত হইল!!

হোসেন জীবিত আছেন, উঠিবার শক্তি নাই। অন্যমনস্কে কি চিন্তায় অভিভূত ছিলেন, তিনিই জানেন। চক্ষু মেলিয়া বক্ষের উপর খঞ্জর-হস্তে সীমারকে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তুমি ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব—তুমি আমার বক্ষের উপর বসিলে? নূরনবী মোহাম্মদের মতাবলম্বী হইয়া এমাম হোসেনের বক্ষের উপর পা রাখিয়া বসিলে? তোমার

কি পরকাল বলিয়া কিছুই মনে নাই ? এমন গুরুতর পাপের জন্য তুমি কি একটুও ভয় করিতেছ না ?”

সীমার বলিল, “আমি কাহাকেও ভয় করি না!—আমি পরকাল মানি না; নূরনবী মোহাম্মদ কে ? আমি তাহাকে চিনি না। তোমার বুকের উপর বসিয়াছি বলিয়া পাপের ভয় দেখাইতেছ, সে ভয় আমার নাই। কারণ, আমি এখনই খঞ্জরে তোমার মাথা কাটিয়া লইব। যাহার মাথা কাটিয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইব, তাহার বুকের উপর বসিতে আমার পাপ কি ? সীমার পাপের ভয় করে না।”

“সীমার! আমি এখনই মরিব। বিষাক্ত তীরের আঘাতে আমি অস্থির হইয়াছি। বক্ষের উপর হইতে নামিয়া আমায় নিঃশ্বাস ফেলিতে দাও। একটু বিলম্ব কর! একটু বিলম্বের জন্য কেন আমাকে কষ্ট দিবে ? আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেলে মাথা কাটিয়া লইও! আমার দেহ যত খণ্ডে খণ্ডিত করিতে ইচ্ছা হয়, করিও! একবার নিঃশ্বাস ফেলিতে দাও! আজ নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু। এই কারবালা-প্রান্তরে হোসেনের জীবনের শেষ কার্য্য সমাপ্ত! তাহার জীবনের শেষ এই কারবালায়! ভাই সীমার! তুমি নিশ্চয়ই আমার মাথা কাটিয়া লইতে পারিবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এই কার্য্য করিয়া তুমি জগতে বিখ্যাত হইবে। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।”

অতি কর্কশস্বরে সীমার বলিল “আমি তোমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছি, মাথা না কাটিয়া উঠিব না। যদি অন্য কোন কথা থাকে, বল। বুকের উপর হইতে একটুও সরিয়া বসিব না।”—এই বলিয়া সীমার আরও দৃঢ়রূপে চাপিয়া বসিয়া হোসেনের গলায় খঞ্জর চালাইতে লাগিল।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, “সীমার! আমার প্রাণ এখনই বাহির হইবে ; একটু বিলম্ব কর।—এই কষ্টের উপর আর কষ্ট দিয়া আমাকে মারিও না!”

সীমার তীক্ষ্ণধার খঞ্জর হোসেনের গলায় সজোরে চালাইতে লাগিল, কিন্তু চুল পরিমাণ স্থানও কাটিতে পারিল না। সে বার বার খঞ্জরের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, হস্ত দ্বারা বারংবার খঞ্জরের ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। পুনরায় অধিক জোরে সে খঞ্জর চালাইতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না! তিলমাত্র চর্ম্মও কাটিল না! সীমার অপ্রস্তুত হইল! আবার সে খঞ্জরের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল—আবার ভাল করিয়া দেখিয়া খঞ্জরের ধার পরীক্ষা করিল।

হোসেন বলিলেন, "সীমার! কেন বারবার এ সময় আমাকে কষ্ট দিতেছ? শীঘ্রই মাথা কাটিয়া ফেল! আর সহ্য হয় না। অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়া তোমার কি লাভ হইতেছে? বন্ধুর কার্য্য কর।—শীঘ্রই আমার মাথা কাটিয়া ফেল।"

"আমি ত কাটিতে বসিয়াছি, সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করিতেছি। খঞ্জরে না কাটিলে আমি আর কি করিব? এমন সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর তোমার গলায় বসিতেছে না, আমার অপরাধ কি—আমি কি করিব?"

হোসেন বলিলেন, "সীমার! তোমার বক্ষের বসন খোল দেখি?"

"কেন?"

"কারণ আছে। তোমার বক্ষ দেখিলেই জানিতে পারিব যে, তুমি আমার 'কাতেল' (হন্তা) কি না?"

"তাহার অর্থ কি?"

"অর্থ আছে। অর্থ না থাকিলে বৃথা তোমাকে এমন অনুরোধ করিব কি জন্য?—তোমরা সকলেই জান,—অন্ততঃ শুনিয়া থাকিবে, হোসেন কখনও বৃথা বাক্যব্যয় করে না। মাতামহ আমাকে বলিয়া গিয়াছেন: রক্তমাংসে গঠিত হইলেও যে বক্ষ লোমশূন্য, সে বক্ষ পাষাণময়, সেই লোমশূন্য বক্ষই তোমার কাতেল; যাহার বক্ষ লোমশূন্য তাহারই হস্তে তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু! মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। সীমার! তোমার বক্ষের বস্ত্র খুলিয়া ফেল।—আমি দেখি, যদি তাহা না হয়, তবে তুমি বৃথা চেষ্টা করিবে কেন? তোমার জীবনকাল পর্য্যন্ত আমাকে এ প্রকারে যন্ত্রণা দিয়া,—সহস্র চেষ্টা করিলেও আমার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

সীমার গাত্রের বসন উন্মোচন করিয়া হোসেনকে দেখাইল; নিজেও দেখিল। হোসেন সীমারের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিলেন। সীমার সজোরে হোসেনের গলায় খঞ্জর দাবাইয়া ধরিল, কিন্তু এবারেও কাটিল না! বারবার খঞ্জর ঘর্ষণে হোসেন বড়ই কাতর হইলেন। তিনি পুনরায় সীমারকে বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আর একটি কথা আমার মনে হইয়াছে, বুঝি তাহাতেই খঞ্জরের ধার ফিরিয়া গিয়াছে; তোমারও পরিশ্রম বৃথা হইতেছে, আমিও যার-পর-নাই কষ্ট-ভোগ করিতেছি। সীমার! মাতামহ জীবিতাবস্থায় অনেক সময় স্নেহ করিয়া আমারই গলদেশ চুম্বন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র ওষ্ঠের চুম্বন-মাহাত্ম্যেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমার মস্তক কাটিতে আমি তোমাকে বারণ করিতেছি না; আমার এই প্রার্থনা যে, আমার কণ্ঠের পশ্চাদ্‌ভাগে, যেখানে তীরের আঘাতে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সেইখানে খঞ্জর বসাও, অবশ্যই দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে।"

"না, তাহা কখনই হইবে না। আমি অবশ্যই এই প্রকারে তোমার মাথা কাটিব।"

"সীমার! আমাকে এ প্রকার কষ্ট দিয়া তোমার কি লাভ? এরূপে কিছুতেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমার গলার সম্মুখ দিকে আর খঞ্জর চালাইও না। তোমার যত্ন নিষ্ফল হইবে, আমিও কষ্ট পাইব, অথচ তুমি মাথা কাটিতে পারিবে না। দেখ, নিশ্বাস ফেলিতে আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। শীঘ্র শীঘ্র তোমার কার্য্য শেষ করিলে, তোমারও লাভ, আমারও কষ্ট নিবারণ হয়। এ জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। তুমি ঐ তীরবিদ্ধ স্থানে খঞ্জর বসাও, এখনই ফল দেখিতে পাইবে। আমাকে এ প্রকার কষ্ট দিলে এজিদের অঙ্গীকৃত লক্ষ টাকা অপেক্ষা তোমার অধিক আর কি লাভ হইবে?"

"তোমার কথা শুনিলে আমার কি লাভ হইবে?"

"অনেক লাভ হইবে। তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া এই অনুগ্রহ কর যে, আমার গলার এদিকে আর খঞ্জর চালাইও না; তীরবিদ্ধ স্থানে

অস্ত্র বসাইয়া আমার মস্তক কাটিয়া লও।—আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরকালে তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করাইব।—বিনা বিচারে তোমাকে স্বর্গসুখে সুখী করাইব। পুনঃপুনঃ ঈশ্বরের নাম করিয়া আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে না পারিলে আমি কখনই স্বর্গের দ্বারে পদনিক্ষেপ করিব না। ইহা অপেক্ষা তুমি আর কি লাভ চাও, ভাই ?"

হোসেনের বক্ষের পরিবর্ত্তে সীমার এইবার তাঁহার পৃষ্ঠোপরি চাপিয়া বসিল। এমামের দুইখানি হস্ত দুই দিকে পড়িয়া গেল,—তিনি বলিতে লাগিলেন, "জগৎ দেখুক, আমি কি অবস্থায় চলিলাম ! নূরনবী মোহাম্মদের দৌহিত্র,—মদিনার রাজা,—মহাবীর আলীর পুত্র হইয়া শূন্যহস্তে সীমারের অস্ত্রাঘাতে কি ভাবে আমি ইহসংসার হইতে বিদায় হইলাম, জগৎ দেখুক !"

সীমার যেমন তীরবিদ্ধ স্থানে খঞ্জর স্পর্শ করিল অমনি হোসেনের শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, অরণ্য, সাগর, পর্ব্বত, বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে রব উত্থিত হইতে লাগিল, "হায় হোসেন ! হায় হোসেন !! হায় হোসেন !!!"

সীমার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হোসেনের শির লইয়া প্রস্থান করিল। রক্তমাখা খঞ্জর এমামের দেহের নিকট পড়িয়া রহিল।

মহরম পর্ব্ব সমাপ্ত

উদ্ধার পর্ব

প্রথম প্রবাহ

অশ্ব ছুটিল। হোসেনের অশ্ব বিকট চীৎকার করিতে করিতে সীমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ, অলীদ প্রভৃতি অশ্ব লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রান্ত শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ তীর অশ্ব-শরীর ভেদ করিয়া পার হইল না, কিন্তু শোণিতের ধারা ছুটিল। কে বলে পশু-হৃদয়ে বেদনা নাই? কে বলে মানুষের জন্য পশুর প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয় না?—মানুষের ন্যায় পশুর প্রাণ ফাটিয়া যায় না?—বাহির হয় না? অশ্ব ফিরিল। কিছু দূর যাইয়া শরসংযুক্ত শরীরে হোসেনের দুল্‌দুল্ * সীমারের পশ্চাদ্‌গমন হইতে ফিরিল।

তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছে! এখন অশ্বের বক্ষে, গ্রীবাদেশে তীক্ষ্ণতর তীর ক্রমাগত বিঁধিতেছে; কিন্তু অশ্বের গতি মুহূর্ত্তের জন্য থামিতেছে না! দুল্‌দুল্ মহাবেগে প্রভু হোসেনের শিরশূন্য-দেহ সন্নিধানে আসিয়া তাঁহার পদ হইতে স্কন্ধ, স্কন্ধ হইতে পদ পর্য্যন্ত নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া আবার তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিবার উদ্যোগ করিতেই বিপক্ষগণ নানা কৌশলে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অশ্বশ্রেষ্ঠ দুল্‌দুল্ সকলই দেখিতেছে, বোধ হয়, অনেক কিছুই বুঝিতে পারিতেছে; ধরা পড়িলে তাহার পরিণাম-দশা যে কি হইবে, তাহাও বোধ হয় ভাবিতেছে। প্রভু হোসেন যে পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, সেই পৃষ্ঠে প্রভুহন্তা কাফেরগণকে লইয়া আজীবন পাপের

* হোসেনের অশ্বের নাম

বোঝা বহন করিতে হইবে, এ কথা কি সেই প্রভুভক্ত বাক্‌শক্তিহীন পশু-অন্তরে উদয় হইয়াছিল? সীমারের দিকে সে আর ছুটিল না, হোসেনের মৃত শরীরের নিকটেও আর রহিল না। বিপক্ষগণের বাধা, কৌশল অতিক্রম করিয়া মহাবেগে হোসেনের শিবিরাভিমুখে সে দৌড়াইয়া চলিল। সকলেই দেখিল, দুল্‌দুলের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ।

আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদ, মারওয়ান, ওমর এবং আর আর যোদ্ধাগণ দুল্‌দুলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হোসেন-শিবিরাভিমুখে বেগে ছুটিলেন। শিবিরমধ্যে বীর বলিতে আর কেহ নাই, একমাত্র জয়নাল আবেদীন! হোসেনের উপদেশক্রমে পরিজনেরা জয়নালকে বিশেষ সাবধানে গোপনভাবে রাখিয়াছেন। হাস্‌নেবানু কাসেম-দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত হুতাশনে শোণিতের আহুতি দিতেছেন। সখিনা মৃত পতির পদপ্রান্তে ধূলায় লুটাইয়া অচেতনভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। যিনি যেখানে যে ভাবে ছিলেন, তিনি সেইখানেই সেই ভাবেই আছেন। কাহারও মুখে কোন কথাই নাই। নীরব! চতুর্দ্দিক নীরব! কিন্তু আকাশ পাতাল বায়ু ভেদ করিয়া যে একটি রব হইতেছে, বোধ হয়, শোকতাপ-পিপাসায় কাতরপ্রযুক্ত এতক্ষণ কেহই সে রব শুনিতে পান নাই। শাহ্‌রেবানুর মন, চক্ষু, কর্ণ, চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিকে! সে রব তিনি শুনিলেন—তাঁহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আবার তিনি শুনিলেন,—স্পষ্ট শুনিলেন,—বন, উপবন, গগন, বায়ু, পর্ব্বত, প্রান্তর ভেদ করিয়া রব উঠিতেছে, "হায় হোসেন! হায় হোসেন!! হায় হোসেন!!!"

শাহ্‌রেবানুর মোহতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মুখে বলিয়া উঠিলেন, "হায়! কি হইল? কি ঘটিল? কে বলিতেছে? চতুর্দ্দিক হইতে কেন রব হইতেছে? নাম উচ্চারণ কেন 'হায় হায়' করিতেছে? 'হায় হায়'! কি নিদারুণ কথা! হায় রে! আবার সেই রব! আবার সেই অন্তরভেদী 'হায় হায়' রব!!"

"এ কি কথা! যে সকল পবিত্র বসন, পবিত্র অস্ত্র, তিনি পবিত্রভাবে ভক্তিসহকারে অঙ্গে ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ

হইতে পারে? ঐ যে অশ্বপদশব্দ! কে শিবিরাভিমুখে আসিতেছে? কাহার অশ্ব? হায় রে! এ কাহার অশ্ব? শাহ্‌রেবানু শিবিরদ্বারদেশে যাইতেই রক্তমাখা শরীরে হোসেনের অশ্ব শিবিরে প্রবেশ করিল। "ভগ্নি! কপাল পুড়িয়াছে! আমাদের কপাল পুড়িয়াছে! দেখ, অশ্ব দেখ, দুল্‌দুলের তীর-সংযুক্ত শরীর দেখ, রক্তের প্রবাহ দেখ!" বলিতে বলিতে শাহ্‌রেবানু অচেতনভাবে পড়িয়া গেলেন। আর আর পরিজনেরা শূন্যপৃষ্ঠ দুল্‌দুলের সমস্ত শরীর রক্ত-রঞ্জিত, আঘাতে জরজর এবং তাহার দেহ বিনির্গত শোণিতের ধারা দেখিয়া, মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ—কেহ হতচেতন অবস্থায় বিকট চিৎকার করিয়া, অচেতনভাবে ধরাশায়ী হইলেন। দুল্‌দুল্ কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। হোসেনের প্রিয়তম অশ্বের প্রাণ বায়ুর সহিত মিশিয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া গেল।

এদিকে মারওয়ান, ওমর, অলীদ, জেয়াদ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ উগ্রমূর্ত্তিতে বিকট শব্দে "কৈ জয়নাল? কোথায় সখিনা?" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহাদের শরীর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, বীরহৃদয় কম্পিত হইল;—সেই হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল!—কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য!

বীরবর আবদুল ওহাবের খণ্ডিত দেহ, কাসেমের মৃত্যুশয্যা, হোসেনের অশ্ব, পতিপ্রাণা সখিনার পতিভক্তির চিহ্ন দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল! মন্ত্রিপ্রবর মারওয়ান একদৃষ্টে সখিনার প্রতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চাহিয়াও, সখিনা মৃত কি জীবিত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না; কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলঃ সখিনা বিবি স্বামী-পদ দুখানি বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া মনঃপ্রাণ যেন ঈশ্বরে ঢালিয়া দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন! পতি-দেহ-বিনির্গত পবিত্র শোণিতে তাঁহার পবিত্র দেহ রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! মৃতদেহে চন্দন, আতর ও কর্পূর দিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। সখিনা অঙ্গে রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া জীবন্তভাবে যেন দয়াময়ের নিকট স্বামীর মঙ্গল-কামনায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া রহিয়াছেন।

মারওয়ান আরও একটু অগ্রসর হইল। সখিনাকে ধরিয়া তুলিতে

আশা করিয়া সে হস্ত বিস্তার করিতেই যেন সখিনার্ মৃত শরীরে হঠাৎ জীবাত্মার সঞ্চার হইল। যেন স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল মর্ত্তে আসিয়া সখিনাকে কানে কানে বলিয়া গেলেন, "সখিনা! তুমি না সাধ্বী সতী? পরপুরুষ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত, এখনও স্বামী-চিন্তা? এখনও স্বামী-শোক? অবলার অবয়ব পরপুরুষের চক্ষে পড়িলে মহাপাপ! নিজে ইচ্ছা করিয়া তাহা দেখাইলে আরও পাপ! তুমি বীর-দুহিতা বীর-জায়া! ছিঃ, ছিঃ সখিনা! তোমারও এত ভ্রম! ছিঃ ছিঃ! সাবধান হও।"

সখিনা ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন; সম্মুখে চাহিতেই দেখিলেন: অপরিচিত যোদ্ধাসকল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, যে যাহা পাইতেছে, তাহাই লইতেছে। হঠাৎ দুল্‌দুলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। হজরত এমাম হোসেনের প্রিয় অশ্ব দুল্‌দুল্ মৃত্তিকায় শায়িত, তাহার সমুদয় অঙ্গ তীক্ষ্ণতর তীরে বিদ্ধ, তীরসকল অশ্বশরীর বিদ্ধ করিয়া কতক মৃত্তিকাসংলগ্ন, কতক শরীরোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতি শরের মুখ হইতে শোণিতধারা ছুটিয়া,—শ্বেত অশ্ব ঘোর লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। সখিনা একদৃষ্টে অশ্বের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্ব-কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহার চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল, মুখভাব ভিন্নভাব ধারণ করিল। সজোরে কাসেমের কটিদেশ হইতে খঞ্জর লইয়া তিনি মহারোষে বলিতে লাগিলেন,—

"ওরে কাফেরগণ! বুঝিয়াছি, কোন্ সাহসে শিবিরে আসিয়াছিস্? —কোন্ সাহসে অত্যাচার করিতে আসিয়াছিস? ওরে! আমরা অসহায়া হইয়াছি, সেই সাহসে!—ওরে! আমরা নিরাশ্রয়া, সেই সাহসে! ওরে নরাধম! পুরুষ বীর আমাদের আর কেহই নাই, সেই সাহসে! ভুলিলাম! ভুলিলাম! এখন প্রাণসখা কাসেমকে ভুলিলাম! ভুলিলাম কাসেম! তোমায় এখন ভুলিলাম! নারী-জীবনের উদ্দেশ্য দেখাইতে তোমাকে এখন ভুলিলাম কাসেম! ঐ পিতার অশ্ব, তার সমুদয় অঙ্গ তীরবিদ্ধ, রক্তে রঞ্জিত,—সে মৃত্তিকায় শায়িত! আর কথা কি? আর আশা কি? এখন সখিনার আর আশা কি? কাসেম, চাহিয়া দেখ! প্রাণাধিক কাসেম! দেখ চাহিয়া, এই দেখ সখিনার হাতে তোমার খঞ্জর!!"

মারওয়ানকে লক্ষ্য করিয়া সখিনা বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্ম্মী কাফের! তুই এখানে কেন? দূর হ! সখিনার সম্মুখ হইতে দূর হ! তুই কি আশায় এখানে আসিয়াছিস্? দূর হ কাফের, দূর হ! এ পবিত্র শিবির হইতে দূর হ! ঐ দেখ্! যদি চক্ষু থাকে, তবে ঐ দেখ্! শূন্যে চাহিয়া দেখ্?—সাহানা বেশ! সেই নয়নমুগ্ধকারী সাহানা বেশ! লোহিত-রক্ত-রঞ্জিত সেই সাহানা বেশ! সেই সাহানা বেশ! শত্রু-অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সাহানা বেশ! ওরে নরাধম বর্ব্বর! চণ্ডালের অমৃতে আশা? শয়তানের বেহেশ্তে আশা? ঘোর নারকীর জেন্নাতে আশা? মহাপাতকীর হুরে আশা? দেখ্! এই দেখ্ কাসেম যার প্রাণ, সে এখন তাঁরই নিকটে!—যেখানে কাসেম, সেইখানে সখিনা, রক্তমাখা সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর—কাসেমের হস্তের খ—"এই বলিয়া সখিনা হস্তস্থিত খঞ্জর সুকোমল বক্ষে সজোরে বসাইয়া পৃষ্ঠ পার করিয়া দিলেন। হায় রে রুধির-ধারা! খঞ্জরের অগ্রভাগ বহিয়া বহিয়া শোণিতের ধারা ছুটিল। সখিনা কাসেমের মৃতদেহ পার্শ্বে অর্দ্ধ-মুকুলিত ছিন্নলতার ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন।*

মারওয়ান নিস্তব্ধ। অন্য অন্য যোদ্ধাগণ, যাহারা সখিনার—সাধ্বী-সতী সখিনার কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিল, তাহারা সকলেই নিস্তব্ধ এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান! পদপরিমাণ ভূমিও অগ্রসর হইতে আর তাহারা সাহসী হইল না।

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "ভ্রাতাগণ! হোসেন পরিবারের প্রতি কেহ কোন প্রকার অত্যাচার করিও না। সাবধান! তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কোন কথা মুখে আনিও না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বচক্ষেই ত দেখিলে? কি অসীম সাহস! কি অসীম ক্ষমতা! কি আশ্চর্য্য! বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখ, ইহাদের এখনকার ভাবভঙ্গি—মনের ভাবগতিক বড় ভয়ানক! সাবধানে কথাবার্ত্তা কহিবে। দেখ, ভাবটি সহজ ভাব নহে, দেখিলেই বোধ হয়, ইঁহারা সন্তোষসহকারে কোথায় যেন যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন! দুঃখের চিহ্নমাত্র নাই! বিয়োগ, শোক, বেদনা, যন্ত্রণা,

* সতী-সাধ্বী সখিনার আত্মঘাতিনী হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রমতে অনৈক্য আছে।

ইঁহাদের অন্তরের বিন্দুপরিমাণ স্থানও যেন অধিকার করিতে পারে নাই। সকলের হাতেই এক-একখানি শাণিত অস্ত্র। তরবারি, খঞ্জর, কাটারী, ছোরা, যে যাহা পাইয়াছে, তাহাই লইয়াছে। ধন্য রে আরবীয় নারী! তোমরাই ধন্য! পতি-পুত্র-বিয়োগ বেদনা ভুলিয়া তোমরা আজ সমরসাজে শত্রুসম্মুখীন! ধন্য তোমরা! ভ্রাতাগণ! আমাদের বীরত্বে ধিক্! অস্ত্রে ধিক্! নারীহস্তে অস্ত্র দেখিয়া কি আর এ সকল অস্ত্র ধরিতে ইচ্ছা করে? ইঁহারা আমাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করুন বা না করুন, আমরা কিছুই বলিব না। ছিঃ! ছিঃ! অবলা কুলস্ত্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করি নাই। ভ্রাতাগণ! তোমরা আর কোন কথা বলিও না, সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র কোষে আবদ্ধ কর। যাহা বলিবার আমিই বলিতেছি।"

মারওয়ান অবনত মস্তকে বলিতে লাগিল, "সাধ্বী-সতী দেবিগণ! আমরা মহারাজ এজিদের আজ্ঞাবহ এবং চিরানুগত দাস। মহারাজ-আদেশে আমরাই কারবালা-ক্ষেত্রে হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসিয়াছিলাম। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আমরা জয়লাভ করিয়াছি। আমরাই আপনাদের সুখতরী আজ মহারাজ এজিদের আদেশাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিষাদ-সিন্ধুতে ডুবাইয়াছি। আজিকার অস্ত্রের সহিত আপনাদের স্বাধীনতা-সূর্য্য একেবারে চির অস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনারা মহারাজ এজিদসৈন্য-হস্তে চিরবন্দী। বন্দীর প্রতি অত্যাচার অবিচার কাপুরুষের কার্য্য। বরং আপনাদের জীবনরক্ষার প্রতি সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টি থাকিবে। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ হেতু যদি কোন দ্রব্যের অভাব হইয়া থাকে, বলুন, আমি সে অভাব মোচন করিতে প্রস্তুত আছি।"

সকলেই নীরব!—কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নীরব!—স্পন্দনহীন জড়বৎ নীরব! অনিমেষে নীরব! কেবল অল্পবয়স্ক বালিকারা শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "জল! জল! আমরা তোমাদের নিকট জল চাহি; দয়া করিয়া এক পাত্র জল দাও—"

মারওয়ান অতি অল্প সময় মধ্যে ফোরাত-জল দ্বারা অনেকের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে পতি-পুত্র-ভ্রাতা-বিয়োগজনিত শোকাগ্নি

প্রচণ্ডবেগে হু হু করিতেছে—শরীরের প্রতি-লোমকূপ হইতে সেই মহা অগ্নির জ্বলন্ত শিখা মহাতেজে নির্গত হইয়া জীবন্ত জীবন জ্বালাইতেছে, তাঁহাদের নিকট জলের আদর হইল না! ফোরাত-জলে সে জ্বলন্ত আগুন নির্ব্বাপিত হইল না; বরং আরও সহস্রগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

মারওয়ান একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বন্দিগণ! শিবিরস্থ বন্দিগণ! প্রস্তুত হও। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত পক্ষকে রাখিবার বিধি নাই। প্রস্তুত হও—তোমরা মহারাজ এজিদের বন্দী,—মারওয়ানের হস্তে। শীঘ্র প্রস্তুত হও। এখনই দামেস্কে যাইতে হইবে।"

দ্বিতীয় প্রবাহ

রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়াইতেছ? কি আশায় খণ্ডিতা‌শর বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে হায়—! ৎ খণ্ডিতশিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার! এ শিরে তোমার আবশ্যকতা কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? তুমি ত আর জয়নাবের রূ৷প মোহিত হইয়াছিলে না? জয়নাব এমাম হাসানের স্ত্রী। হোসেনের ি৷র তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা শির লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে এত বেগে দৌড়াইতেছ কেন?—যাইতেছই বা কোথা? সীমার! একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? তবুও একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি?—খণ্ডিতশিরে প্রয়োজন কি?—অর্থ? হায় রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রে শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জ্জন, বিনাশ,—এ সকলই তোমার জন্য! সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি!—কি মধুমাখা বিষসংযুক্ত প্রেম! রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তোমার জন্য

ব্যস্ত—মহাব্যস্ত—প্রাণ ওষ্ঠাগত! তোমারই জন্য—কেবলমাত্র তোমারই কারণে—কত জনে তীর, তরবারী, বন্দুক, বর্শা, গোলাগুলী অকাতরে বক্ষঃ পাতিয়া বুকে ধরিতেছে,—তোমারই জন্য অগাধ জলে ডুবিতেছে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে, পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতেছে ; রক্ত, মাংস-পেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর, তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক! কি মায়া!! কি মোহিনী শক্তি!!! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে?—কে না ধোঁকা খাইতেছে?—কে না মরিতেছে? তুমি দূর হও! তুমি দূর হও!—কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও! কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও! তোমার নাম করিয়া কথা কহিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তোমারই জন্য প্রভু হোসেনের শির সীমার-হস্তে খণ্ডিত!—রাক্ষসি! তোমারই জন্য সেই খণ্ডিতশির বর্শাগ্রে বিদ্ধ!

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচলগমনে উদ্যোগী। সীমারের অন্তরে নানা ভাব ; তন্মধ্যে অর্থ চিন্তাই প্রবল ; চির অভাবগুলি আশু মোচন করিতেই সে স্থির-সংকল্প। "একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর ভাবনা কি? লক্ষ টাকার অধিকারী আমিই! চিন্তার কোন কারণ নাই! নিশাও প্রায় সমাগত—যাই কোথা? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশাযাপন করি। এ ত সকলই মহারাজ এজিদ-নামদারের রাজ্যভুক্ত। আমার সৈনিক বেশ, হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্যশির বিদ্ধ, মুখে ভয়ানক রোষের লক্ষণ!—সুতরাং কে কি বলিবে? কার সাধ্য—কে কি করিবে?"—সীমার স্বগত এই কথাগুলি বলিল।

তারপর সীমার এক গৃহীর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া, ঐ স্থানে সে নিশাযাপন করিবে,—এই কথা জানাইল। তাহার স্কন্ধে বর্শা-বিদ্ধ খণ্ডিতশির, তাহার দেহ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। 'বুঝি রাজকর্ম্মচারী হইবে' মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না। সাদরে তিনি সীমারকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণাদি ও আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়া ভক্তিসহকারে অতিথি-সেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি

বিনীতভাবে তিনি বলিলেন, "মহাশয়! যদি অনুমতি করেন, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সীমার বলিল,—"কি কথা—"

"কথা আর কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এই বর্শা-বিদ্ধ শির কোন মহাপুরুষের?"

"ইহার অনেক কথা। তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি: মদিনার রাজা হোসেন, যাঁহার পিতা আলী এবং মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যাঁহার জননী, এ তাঁহারাই শির। কারবালা-প্রান্তরে, মহারাজ এজিদ-প্রেরিত সৈন্যের সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া হোসেনের এই অবস্থা! তাঁহার দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া মহারাজের নিকট লইয়া যাইতেছি। পুরস্কার পাইব! লক্ষ টাকা পুরস্কার! তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে দেখিয়াই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মোহাম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না, তোমার আদর-অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহারও গ্রহণ করিতাম না।"

"হাঁ, এতক্ষণে জানিলাম, আপনি কে? আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানাপ্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শা-বিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি ইহা আজ রাত্রে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ, যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ-সময়ে সে কৌশলে, কি বল-প্রয়োগে এই মহামূল্য শির যদি আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনি ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির,—আপাততঃ যাহার মূল্য লক্ষ টাকা—যদি কেহ লইয়া যায়, তবে তাহা মহাদুঃখের কারণ হইবে। শিরটি আমাকে দিন; আমি সাবধানে রাখিব, আপনি প্রত্যুষে ইহা পুনরায় লইবেন। শিরটি আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন।"

সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি প্রস্তাব শ্রবণমাত্রই সম্মত হইলেন। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত স্বীয় মস্তকে লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়নে বিলম্ব; যেমনই শয়ন, অমনই অচেতন।

গৃহ-স্বামী বাস্তবিক হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার শিষ্য ছিলেন না। নানা প্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্ব্বদা তিনি রত থাকিতেন। তাঁহার উপযুক্ত তিন পুত্র ও এক স্ত্রী বর্ত্তমান। গৃহস্বামীর নাম 'আজর' *।

সীমারের নিদ্রার ভাব দেখিয়া, আজর স্ত্রী-পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যান্ত সমুদয় ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চোখের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহ-বিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউন, ইস্‌লামধর্ম্ম-বিদ্বেষীই হউন, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হন? পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেনের শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মানুষমাত্রেই এক উপকরণে গঠিত এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্টি। জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ—সেও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের লীলা। এর জন্য পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। এমাম হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ্ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয়মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন্ চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হউক, আর না হউক, জাতি ও জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু, পরম ধার্ম্মিক, বিশেষতঃ ঈশ্বরভক্ত, মহাপুরুষ মোহাম্মদের হৃদয়ের অংশ—ইঁহাদের এই দশা! হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলেও কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেয়—বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না? ধর্ম্মের বিভেদ বলিয়া মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনা বোধ করিবে না?—

* হজরত ইব্রাহিম খলিলোল্লার পিতার নামও আজর বোত্‌পরস্ত ছিল। ইনি সে আজর নহেন।

যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? যে ধর্ম্মই কেন হউক না, পবিত্রতা রক্ষা করিতে, তৎকার্য্যে যোগ দিতে কে নিবারণ করিবে? মহাপুরুষ মোহাম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র; সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? হোসেন যুদ্ধে হত হইয়াছেন বলিয়াই কি এত তাচ্ছিল্য? জগৎ কয় দিনের? এজিদ! তুই কি জগতে অমর হইয়াছিস্? জীবনশূন্য দেহের সদ্গতির সংবাদ শুনিয়া কি তোর চিরজ্বলন্ত রোষাগ্নি নির্ব্বাণ হইত না? তোর আকাঙ্ক্ষা কি যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ শুনিয়াও মিটিত না? হোসেন-পরিবারের মহাক্রন্দনের রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া অনন্তধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক বিকাশ করিতেছে, ঈশ্বরের আসন টলিতেছে! —তোর মন কি এতই কঠিন যে, জীবনশূন্য শরীরে শত্রুতা সাধন করিতে ত্রুটি করিতেছিস্ না! তোকে কোন্ ঈশ্বর গড়িয়াছিল জানি না; কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত, তাহাও বলিতে পারি না। তুই সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কি কাণ্ড করিলি! তোর এই অমানুষিক কীর্ত্তিতে জগৎ কাঁদিবে, পাষাণ গলিবে। এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে তাঁহার এই মুখে কত শত প্রকারের ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন—কত কাল ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ হইত, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণহরণ করিয়াছিস্, কিন্তু তোর পিতা এমাম বংশের ভিন্ন নহেন, তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না। তাঁহার ঔরসে জন্মিয়া তোর এ কি ভাব! রক্ত-মাংস-বীর্য্য গুণ আজ তোর নিকট পরাস্ত হইল। মানবশরীরের স্বাভাবিক গুণ আজ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। তাহা যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা—জীবন থাকিতে সে হোসেন-শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না; যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তিসহকারে সে ইহা মহাপ্রান্তর কারবালায় লইয়া যাইয়া হোসেনের শিরশূন্য দেহের সন্ধান করিয়া তাঁহার সদ্গতির উপায় করিবে। প্রাণ থাকিতে এ শির আজর ছাড়িবে না!"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "এই হোসন বিবি ফাতেমার অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্তলী ছিলেন। হায়! হায়! তাঁহার এই দশা! এ জীবন থাক্

যা যাক্, প্রভাতে হইতে না হইতেই আমরা এ পবিত্র মস্তক লইয়া কারবালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যা থাকে হইবে!"

পুত্রেরা বলিল, "আমাদের জীবন পণ, তথাপি কিছুতেই সৈনিকহস্তে এ মস্তক প্রত্যর্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কারবালায় যাইব।"

পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন,—"ধার্ম্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বর-ভক্তের মন এক, আত্মা এক! ধর্ম্ম কি কখনও দুই হইতে পারে? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে—রক্তে রক্তে লেশমাত্র যোগাযোগ নাই, তবে তাঁহার দুঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল কেন? বল দেখি, তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কেন? ধার্ম্মিক-জীবন কাহার না আদরের? ঈশ্বর-প্রেমিক কাহার না যত্নের? তোমাদের কথা শুনিয়া, সাহস দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল; 'পরোপকারব্রতে জীবনপণ' কথাটি শুনিয়াও কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব, কিন্তু শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিব না!"

পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জগৎ দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগৎকে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতে, জগৎ-লোচন রবিদেবকে পূর্ব্ব গগনপ্রান্তে বসাইয়া নিজে অন্তর্দ্ধান হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। জগৎ গতকল্য দেখিয়াছে, আজ আবার দেখুক— নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক—পবিত্র-জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক—সাধু জীবনের ভক্তি দেখুক—ধর্ম্মে দ্বেষ, ধর্ম্মে হিংসা মানুষের শরীরে আছে কিনা তাহার দৃষ্টান্ত দেখুক! ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, জায়া, পরিজন বিয়োগ হইলে লোকে কাঁদিয়া থাকে, জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জীবন থাকিতেই জীবলীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্যও যে কাঁদিতে হয়, প্রাণ দিতে হয় তাহারও জ্বলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা করুক। সহানুভূতি কাহাকে বলে—মানুষের পরিচয় কি—মহাশক্তি-সম্পন্ন হৃদয়ে ক্ষমতা কি—নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কি—আজ ভাল করিয়া শিক্ষা করুক!

জগৎ জাগিল। পূর্ব্ব গগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত হইয়া সে বর্শা হস্তে দণ্ডায়মান রহিল। এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে! আর বিলম্ব করিতে পারিবে না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্রই যাইব।"

আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার নামটি কি, শুনিতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই, রাগ করিও না; ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি-ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃত শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই মৃত শরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ! তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য। এ অবস্থায় এ পশু আচার কেন ভাই?"

"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি; সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে তুমি রক্ষা পাইলে। সাবধান! ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক! ভাই সাহেব! বিড়াল-তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলভী, জগতে অনেক আছে,—অনেক দেখিয়াছি,—আজও দেখিলাম। তোমার ধর্ম্মকাহিনী, তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, কারণ, বিধিব্যবস্থা সমুদয় তুলিয়া রাখ। ধর্ম্মাবতারের ধূর্ত্ততা, চতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকী নাই, ও-কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ সোজা কথাটা কে না বুঝিবে যে, হোসেন-মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে গিয়া মহারাজের নিকটে বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকার পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।"

"ওরে ভাই! আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনই

দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চহৃদয়ে টাকার ঘাত-প্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশঃকীর্ত্তি, পরদুঃখ-কাতরতা—এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই ?"

'ওহে ধার্ম্মিকবর ! আমি ও-সকল কথা অনেক জানি। টাকা যে কি জিনিস, তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই 'টাকা অতি তুচ্ছ,' 'অর্থ অনর্থের মূল' বলিয়া থাকে, কিন্তু জগৎ এমনই ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই—সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই—ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট একটি কথা বলিবার সুযোগও নাই ! স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বল ত জগতে আর কে আছে ? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই ; কাহারও নিকট সম্মান নাই ! টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না ! জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা ! টাকা যে কি পদার্থ, তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, আমিও নেহাৎ মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি ? ওরে পাগল ! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি তাহা জান ?"

"রাজদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই, তোমার সহিত বাদবিসম্বাদ ও কৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা। সাধ্য কি, রাজকর্ম্মচারীর আদেশ অবহেলা করি ? একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত-শির আনিয়া দিতেছি, মস্তক পাইলেই ত ভাই তুমি ক্ষান্ত হও ?"

"হাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না। আর ইহাও বলিতেছি—মহারাজের নিকট তোমার প্রশংসাই করিব। আমাকে আদর-আহ্লাদে স্থান দিয়াছ, অভ্যর্থনা করিয়াছ, এ সকলই বলিব। হয় ত তুমি ঘরে বসিয়া কিছু কিছু পুরস্কারও পাইতে পার ! শীঘ্র শির আনিয়া দাও।"

আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিকপুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না, আমি তোমাদের সাহায্যে সৈনিক পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি। আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে ইহা সমর্পণ করিয়াছে। এ অবস্থায় উহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপ পঙ্কিলে ডুবিতে হয়! রাজ-অনুচর, রাজকর্ম্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে, প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক-হস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় ইহা বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত-শির প্রাপ্ত হইলে তিলার্দ্ধকালও সে এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কারবালায় লইয়া, তাঁহার দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এই আমার শেষ উপদেশ। সাবধান! কেহ ইহার অন্যথা করিও না।

আজরের জ্যেষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিল, "পিতঃ! আমরা ভ্রাতৃত্রয় বর্ত্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে? এ কি কথা? আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় নাই? আমরা কি এমনই নরাকার পশু যে, স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছিন্ন করিব? ধিক্ আমাদের জীবনে! ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে! যে পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি, মানুষের পরিচয়ে মানুষের সহিত মিশিয়াছি, সেই পিতার শির যে কারণে দেহবিচ্ছিন্ন হইবে, সে কারণের উপকরণ কি আমরা হইতে পারিব না? পিতঃ! আর বিলম্ব করিবেন না, খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিকপুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার-ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত! তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন সার্থক! যে উদরে জন্মিয়াছ, সে উদরও সার্থক! প্রাণাধিক! জগতে জন্মিয়া পশুপক্ষীদিগের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে ?" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য—বিশেষতঃ, খণ্ডিত মস্তকের জন্য—আজর হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ জ্যেষ্ঠপুত্রের গ্রীবা লক্ষ্যে খড়গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কবির কল্পনা-আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল, কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

উঃ! কি সাহস! কি সহ্যগুণ! দেখ্‌রে! পাষাণ্ড এজিদ! দেখ্‌! পরোপকারব্রতে পিতার হস্তে সন্তানের বধ দেখ্‌! দেখ্‌রে সীমার! তুইও দেখ্‌! মনুষ্য জীবনের ব্যবহার দেখ্‌! খড়গ কম্পিত হইল, পরোপকার আর মৃত শিরের সৎকারহেতু প্রাণাধিক পুত্রশোণিতে আজ পিতার হস্ত রঞ্জিত হইল, লৌহ-নির্ম্মিত খড়গ কাঁপিয়া স্বাভাবিক ঝন্ ঝন্ রবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু আজরের রক্তমাংসের শরীর হেলিল না, শিহরিল না—মুখমণ্ডল মলিন হইল না। ধন্য রে পরোপকার! ধন্য রে হৃদয়!!

এ দিকে সীমার বর্শাহস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিতশির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহারই মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, অথচ হোসেনের মস্তকও লইয়া যাইব।"

আজর খণ্ডিতশির হস্তে করিয়া সীমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সীমার মহাহর্ষে শিরটি বর্শায় বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল—সদ্যকর্ত্তিত একটি শির, শোণিতে রঞ্জিত, রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,

"এ কি! তুমি উন্মাদ হইয়া এ কি করিলে! এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা-প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক লইয়া গোপন করিয়া কাহাকে তুমি বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী ত আমি কখনও দেখি নাই। আহা! এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ! এই বুঝি তোমার পরোপকারব্রত! আরে নরাধম! এই বুঝি তোর সাধুতা? কি প্রবঞ্চক! কি পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ! আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্?"

"ভ্রাতঃ! আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমি ত বলিয়াছ যে, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে। এখন এ কি কথা?—এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?"

"আমি কি জানিতাম যে, তুমি একজন প্রধান দস্যু! টাকার লোভে তুমি কখন কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে কে জানিত!"

"তুমি কি পুণ্যবলে হোসেনের মস্তক কাটিয়াছিলে ভাই! মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম; এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।"

"কথা কাটাকাটি করিলে চলিবে না! যে মস্তকের জন্য কারবালা-প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিতেছে, যে মস্তকের জন্য মহারাজ এজিদ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তকের জন্য চতুর্দ্দিকে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' রব উঠিতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্ত্তে এ কি?—ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও।"

"ভাই! তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। ইহা ত মানুষের ধর্ম্ম নহে।"

সীমার গোলযোগে পড়িল, একটু চিন্তা করিরা বলিল, "এ শির এইখানে রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এবার হোসেনের শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি।"

আজরের মুখের ভাব দেখিয়া মধ্যম পুত্র বলিল, "পিতঃ, চিন্তা কি? আমরা সকলই শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিকপ্রবর চলিয়া

যাইবে। অধম সন্তান এই দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্ক-রাজ্যের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।"

আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন। যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া তিনি সীমারের নিকটে আসিলেন। সীমার আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, "এ উন্মাদ কি করিতেছ?" প্রকাশ্যে সে বলিল, "ওহে পাগল! তোমার এ পাগলামী কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"এ কি কথা? ভ্রাতঃ! তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই। ধিক্ তোমাকে!"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই, হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এই মস্তকটির পরিবর্ত্তে দুইটি প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে, বল ত ইহারা তোমার কে?"

"এই দুইটি আমার সন্তান!"

"তবে ত তুমি বড় ধূর্ত্ত ডাকাত! টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিয়াছ! ছিঃ! ছিঃ! তোমার ন্যায় অর্থ-পিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দাও, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি, লইয়া যাও।"

"আরে হাঁ হাঁ, সেইটিই ত চাহিতেছি; সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন, তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয়, বুঝিয়া থাকিবেন। এবারে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনই পারিবি না।"

"আমি পুরস্কার চাই না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ] মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই! তবুও তুমি এখান হইতে যাইবে না?"

"ওরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিয়াছিস্? তোর সকলই কপটতা, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।"

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। একটি মস্তকের পরিবর্ত্তে তিনটি দিয়াছি, আর দিব না,—তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অস্থির হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস্ না যে, হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ কর্‌বি, এই যা—একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা!" সীমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল এবং বীরদর্পে আজরের শয়ন-গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল,—সুবর্ণ পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে, আজরের স্ত্রী খড়্গহস্তে তাহা রক্ষা করিতেছেন। সীমার এক লম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ব্ববৎ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না, ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি? যাহা হইবার হইয়া গেল! এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্ব্বহারা হইলাম—আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না—হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ! তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?"

"কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"আমার কি জীবন আছে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ চাহি না।"

"কি! তুই অনুগ্রহ চাহিস্ না? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস্ না? ওরে পাপীয়সি! তুই স্বচক্ষেই ত দেখ্‌লি, তোর স্বামীকে কি

করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। তুই স্ত্রীলোক হইয়া আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না?"

এই বলিয়া সীমার বর্শাহস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইল, আজরের স্ত্রী খড়গহস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস্! ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস্? তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এই খড়গ রঞ্জিত করিয়াছি, পরপর আঘাতে স্পষ্টতঃ তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর! নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিল, "ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব? আমার বাঁচিয়া থাকা আর না থাকা, সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এই খড়েগ তিন পুত্র গিয়াছে, আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবন-সর্ব্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস্!" এই কথা বলিতে বলিতে আজরের স্ত্রী সীমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়গাঘাত করিলেন। খড়গ সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা পাইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিল। বর্শাবিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজরের স্ত্রী মস্তকটি ক্রোড়ে করিয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার বাম হস্তে সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়গ দ্বারা আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন,—সীমারের বর্শাঘাতে তাঁহাকে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন-শির পূর্ব্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

তৃতীয় প্রবাহ

সময়ে সকলই সহ্য হয়। কোন বিষয়ে অনভ্যাস থাকিলে বিপদ-কালে তাহা অভ্যাস হইয়া পড়ে, মহাসুখের শরীরেও মহা কষ্ট সহ্য হইয়া থাকে,—এ কথার মর্ম্ম হঠাৎ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পরাধীন জীবনে সুখের আশা করাই বৃথা। বন্দী অবস্থায় ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ বিবেচনা করাও নিষ্ফল। চতুর্দ্দিকে নিষ্কোষিত অসি, ত্বরিতগতি বিদ্যুতের ন্যায় বর্শাফলক সময় সময় চক্ষে ধাঁধা দিতেছে। বন্দিগণ মলিনমুখ হইয়া দামেস্কে যাইতেছে, কাহার ভাগ্যে কি আছে, কে বলিতে পারে? সকলেরই একমাত্র চিন্তা—জয়নাল আবেদীন। এজিদ সকলের মস্তক লইয়াও যদি জয়নালের প্রতি দয়া করেন, তাহা হইলেও সহস্রগুণে ভাল। দামেস্ক নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে সকলেই এজিদ-ভবনে আনন্দ-বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সীমার হোসেনের শির লইয়া পূর্ব্বেই আসিয়াছে, কাজেই আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে, নগরবাসীরা উৎসবে মাতিয়াছে। মহারাজ এজিদের জয়! দামেস্ক-রাজের জয়-ঘোষণা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘোষিত হইতেছে। নানা বর্ণের রঞ্জিত পতাকারাজি উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উড্ডীয়মান হইয়া মহাসংগ্রামের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। আজ এজিদ আনন্দ-সাগরে সন্তোষ-তরঙ্গে সভাসদ্‌গণের সহিত মনঃপ্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছেন। বন্দিগণ রাজ-প্রাসাদে আনীত হইলে, দ্বিগুণরূপে আনন্দবাদ্য বাজিয়া উঠিল। এজিদ যুদ্ধবিজয়ী সৈন্যদিগকে আশার অতিরিক্ত পুরস্কৃত করিলেন, শেষে মনের উল্লাসে ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। অবারিত দ্বার!—যাহার যত ইচ্ছা তত লইয়া মনের উল্লাসে রাজাদেশে আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল; অনেকেই আমোদে মাতিল।

হাসনেবানু, শাহরেবানু, জয়নাব, বিবি ফাতেমা (হোসেনের অল্পবয়স্কা কন্যা) এবং বিবি ওম্মে সালেমা * প্রভৃতিকে দেখিয়া এজিদ

* ওম্মে সালেমা হজরত মোহাম্মদের ষষ্ঠ স্ত্রী

মহাহর্ষে হাসি-হাসি মুখে বলিতে লাগিলেন, "বিবি জয়নাব! এখন আর কার বল বলুন? বিধবা হইয়াও হোসেনের বলে এজিদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, এখন সে হোসেন কোথায়? আর হাসানই বা কোথায়? আজ পর্য্যন্তও কি আপনার অন্তরের গরিমা—চক্ষের ঘৃণা অপরিসীম ভাবেই রহিয়াছে? আজ কার হাতে পড়িলেন, ভাবিয়াছেন কি? দেখুন দেখি, চেষ্টায় কি না হয়? ধন, রাজ্য, রূপ তুচ্ছ করিয়াছিলেন; একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, রাজ্যে কি না হইল? বিবি জয়নাব! মনে আছে, সেই আপনার গৃহনিকটস্থ রাজপথ? মনে করুন, সেদিন আমি সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় যাইতেছিলাম, আপনি আমাকে দেখিয়াই গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কে না জানিল যে, দামেস্কের রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন! শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে ঔৎসুক্যের সহিত ব্যস্ত হইল, কেবল আপনার দুটি চক্ষু তখনই ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্দ্ধান হইল। সে দিনের আপনার সে অহঙ্কার কই? সে দোলায়মান কর্ণাভরণ কোথায়? আপনার সে কেশ-শোভা, মুক্তার জালি কোথায়? এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিতপ্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ? কি কারণে এজিদ আপনার চক্ষের বিষ? কি কারণে দামেস্কের পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা?"

জয়নাব আর সহ্য করিতে পারিলেন না, আরক্তিম লোচনে বলিতে লাগিলেন, "কাফের! তোর মুখের শাস্তি ঈশ্বর দিবেন। সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমাকে একেবারে নিঃসহায়া, নিরাশ্রয়া করিয়া বন্দীভাবে দামেস্কে আনিয়াছিস্, তাই বলিয়াই কি এত গর্ব্ব? তোর মুখের শাস্তি, তোর চক্ষের বিধান, যিনি করিবার তিনিই করিবেন। তোর হাতে পড়িয়াছি, যাহা ইচ্ছা বলিতে পারিস্। কিন্তু কাফের! ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই আছে। তুই সাবধানে কথা বলিস্; জয়নাব নামেমাত্র জীবিতা,—এই দেখ্, (বস্ত্রমধ্যস্থ খঞ্জর দেখাইয়া) এমন প্রিয়বস্তু সহায় থাকিতে, বল্ ত কাফের, তোকে কিসের ভয়?

এজিদ আর কথা কহিলেন না। জয়নাবের নিকট কত কথা কহিবেন,

ক্রমে মনের কপাট খুলিয়া দেখাইবেন, শেষে সজল নয়নে দুঃখের কান্না কাঁদিবেন!—তাহা আর সাহস হইল না! কৌশলে হোসেন-পরিবারের হস্ত হইতে অস্ত্রাদি অপহরণ করিবার মানসে সে সময়ে তিনি আর বেশী বাক্য-ব্যয় করিলেন না। কেবল জয়নাল আবেদীনকে বলিলেন, "কি সৈয়দজাদা, তুমি কি করিবে?"

জয়নাল আবেদীন সক্রোধে বলিলেন, "তোমার প্রাণবধ করিয়া দামেস্ক-নগরের রাজা হইব।"

এজিদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার আছে কি? তুমি মাত্র একা, অথচ বন্দী, তোমার জীবন আমার হস্তে। মনে করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল-কুক্কুরের উদরে দিতে পারি, এ অবস্থাতেও আমাকে মারিয়া দামেস্কের রাজা হইবার সাধ আছে?"

"আমার মনে যাহা উদয় হইল বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। 'ইহা পার, উহা পার' বলিয়া আমার নিকট গরিমা দেখাইয়া ফল কি?"

"ফল যাহা তাহা ত দেখিয়াই আসিয়াছ! এখানেও কিছু দেখ, একটি ভাল জিনিস তোমাদিগকে দেখাইতেছি, দেখ!"

এজিদ হোসেন-মস্তক পূর্ব্বেই এক সুবর্ণপাত্রে রাখিয়া তদুপরি মূল্যবান বস্ত্রের আবরণ দিয়া রাখিয়াছিলেন। হোসেনের অল্পবয়স্কা কন্যা ফাতেমাকে এজিদ নিকটে বসাইলেন এবং বলিলেন, "বিবি! তোমরা ত খর্জ্জুর-প্রিয়, এইক্ষণে যদি মদিনার খর্জ্জুর পাও, তাহা হইলে কি কর?"

"কোথায় খর্জ্জুর? দিন, আমি খাইব!"

এজিদ বলিলেন, "ঐ পাত্রে খর্জ্জুর রাখিয়াছি, আবরণ উন্মোচন করিলেই দেখিতে পাইবে। খুব ভাল খর্জ্জুর উহাতে আছে। তুমি একা খাইও না, সকলকেই কিছু কিছু দিও।"

ফাতেমা বড় আশা করিয়া খর্জ্জুর-লোভে পাত্রের উপরিস্থিত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বলিলেন, "এ কি? এ যে মানুষের কাটা-মাথা! এ যে আমারই পিতার!"—এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরিজনেরা হোসেনের ছিন্ন

মস্তক দেখিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম, পরে নূরনবী মোহাম্মদের গুণানুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর! তোমার মহিমা অসীম, তুমি সকলই পার। দোহাই ঈশ্বর! বিলম্ব সহে না,—দোহাই ভগবান্! আর সহ্য হয় না, একেবারে সপ্ততল আকাশ ভগ্ন করিয়া আমাদের উপর নিক্ষেপ কর। দয়াময়! আমাদের চক্ষের জ্যোতিঃ হরণ কর, বজ্রাস্ত্র কোন্ সময় ব্যবহার করিবে? দয়াময়! আর সহ্য হয় না; এজিদের দৌরাত্ম্য আর সহিতে পারি না। দয়াময়! সকল অবস্থাতেই তোমাকে ধন্যবাদ দিয়াছি, এখনও দিতেছি। সকল সময়ে তোমার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, এখনও করিতেছি;—কিন্তু দয়াময়! এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। আমাদের চক্ষু অন্ধ হউক, কর্ণ বধির হউক, এজিদের অমানুষিক কথা যেন আর শুনিতে না হয়। দয়াময়! আর কাঁদিব না। তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম।"

কি আশ্চর্য্য! সেই মহাশক্তিসম্পন্ন মহাকৌশলীর লীলা অবক্তব্য। পাত্রস্থ শির ক্রমে শূন্যে উঠিতে লাগিল। এজিদ এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতেছেন, অথচ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। কে যেন তাঁহার বাক্-শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। পরিজনেরা সকলেই দেখিলেন: হোসেনের মস্তক হইতে পবিত্র জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া যেন আকাশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। খণ্ডিতশির জ্যোতিঃর আকর্ষণে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইল।

এজিদ সভয়ে গৃহের ঊর্দ্ধভাগে বারবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; দেখিলেন: কোথাও কিছু নাই। পাত্রের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন: শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে। যে মস্তক লইয়া কত খেলা করিবেন, হোসেন-পরিবারের সম্মুখে কত প্রকার বিদ্রূপ করিয়া হাসি-তামাসা করিবেন, তাহা আর হইল না। হোসেন-মস্তক কে লইল, তাহা কেন ঊর্দ্ধে উঠিয়া একেবারে অন্তর্দ্ধান হইল, এত জ্যোতিঃ, এত তেজ, তেজের এত আকর্ষণ-শক্তি কোথা হইতে আসিল?—এজিদ ভাবিতে ভাবিতে হতবুদ্ধিপ্রায় হইলেন, কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। কেবল একটি অপূর্ব্ব সৌরভ কতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজভবন আমোদিত করিয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারিলেন।

এজিদ মনে মনে যে সকল সঙ্কল্প রচনা করিয়াছিলেন, দুরাশা-সূত্রে আকাশ কুসুমে যে মালা গাঁথিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহার কিছুই থাকিল না। অতি অল্প সময় মধ্যে আশাতে আশা, কুসুমে কুসুম মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গেল। ঐশ্বরিক ঘটনায় ধার্ম্মিকের আনন্দ, চিত্তের বিনোদন,—কিন্তু পাপীর ভয়, তাহার মনের অস্থিরতা! এজিদ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অস্ফুটস্বরে তিনি এইমাত্র বলিলেন: "বন্দিগণকে কারাগারে লইয়া যাও।"

চতুর্থ প্রবাহ

কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবি কল্পনার সীমা পর্য্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পাইলে তাহার মনে ভয়ানক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সমাজের এমনই কঠিন বন্ধন, এমনই দৃঢ় শাসন যে, কল্পনা-কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় দোলাইতে পারিলাম না। শাস্ত্রের খাতিরে নানা দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কার-তিমির সদ্‌জ্ঞান-জ্যোতিঃপ্রভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই, সেই পথেই বাধা। সে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইতে মনের গতিরোধ হয়। তাহাতে জাতীয় কবিগণের বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়; কিন্তু তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের যে কল্পনাশক্তির বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করেন না। এই সামান্য আভাষই যথেষ্ট, আর বেশী দূর যাইব না। বিষাদ-সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয় মূর্খদল হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে, পয়গম্বর এবং এমাম-দিগের নামের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার্য্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে; মহাপাপের কার্য্যই করিয়াছি! আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে, ঈশ্বরই জানেন! কারণ, মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া স্বর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে!

স্বর্গীয় প্রধান দূত জেব্রাইল অতি ব্যস্ততা সহকারে ঘোষণা করিতেছেন,—"দ্বার খুলিয়া দাও। প্রহরিগণ! আজ স্বর্গের দ্বার, সপ্ততল আকাশের দ্বার খুলিয়া দাও। পুণ্যাত্মা তপস্বী, সিদ্ধপুরুষ, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরপ্রণয়ী প্রাণিগণের অমরাত্মার বন্দিগৃহের দ্বার খুলিয়া দাও। স্বর্গীয় দূতগণ! অমর পুরবাসী নরনারিগণ! প্রস্তুত হও। হোসেনের এবং অন্য অন্য মহারথিগণের দৈহিক সৎক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মর্ত্ত্যলোকে যাইবার আদেশ হইয়াছে। দ্বার খুলিয়া দাও, প্রস্তুত হও!"

মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। "অল্পক্ষণের জন্য আবার মর্ত্ত্যলোকে" অমরাত্মাগণ এই বলিয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলেন। এদিকে হজরত জেব্রাইল আপন দলবলসহ সকলের পূর্ব্বেই কারবালা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সকলের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জনমানবশূন্য প্রান্তর, পুণ্যাত্মাদিগের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; বালুকাময় প্রান্তরে সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া বহিয়া স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক মোহিত ও আমোদিত করিয়া তুলিল।

স্বর্গীয় দূতগণ, স্বর্গসংস্রবী দেবগণ, সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত আদম,—যিনি আদি পুরুষ, যাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রধান ফেরেশ্‌তা আজাজীল শয়তানে পরিণত হইয়াছিল, সেই স্বর্গীয় দূতগণ-পূজিত হজরত আদম,—হোসেন-শোকে কাতর! স্নেহপরবশে প্রথমেই তাঁহার সমাগম হইল। পরে মহাপুরুষ মুসা—স্বয়ং ঈশ্বর তুর পর্ব্বতে যাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন; এবং তিনি সেই সচ্চিদানন্দের তেজোময় কান্তি দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলে, সেই কান্তির কিঞ্চিৎ আভামাত্র তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি স্বীয় শিষ্যগণসহ সে তেজ ধারণে অক্ষম হইয়া তখনই অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল,—আবার করুণাময় জগদীশ্বর, তাঁহার প্রর্থনায় ঐ শিষ্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাঁহার অন্তরে অটল ভক্তির নব ভাবের আবির্ভাব করিয়াছিলেন—সেই মহামতি সত্য তার্কিক মুসাও আজ হোসেন-শোকে কাতর,—কারবালায় সমাসীন। প্রভু সোলেমান—যাঁহার হিতোপদেশ আজও পর্য্যন্ত

সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর নিকট সমভাবে আদৃত,—সেই নর-কিন্নর-দানবদল-ভূপতি মহামতিও আজ কারবালা-প্রান্তরে উপস্থিত! যে দায়ূদের গীতে জগৎ মোহিত, পশুপক্ষী উন্নত, স্রোতঃস্বতীর স্রোত স্থিরভাবাপন্ন, সেই দায়ূদও আজ কারবালায়।

ঈশ্বর-প্রণয়ী ইব্রাহিম,—যাঁহাকে ঈশ্বরদ্রোহী রাজা নমরুদ প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সত্য প্রেমিকের প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ফলে যে অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া জগজ্জনের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিল,—দয়াময়ের কৃপায় সেই প্রজ্জ্বলিত গগনস্পর্শী অগ্নি, ইব্রাহিম-চক্ষে বিকশিত কমলদলে সজ্জিত উপবনের ন্যায় দেখাইয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধকর গোলাপমালা বলিয়া বোধ হইয়াছিল,—সেই সত্য বিশ্বাসী মহাঋষিও আজ কারবালা-ক্ষেত্রে সমাগত। ইস্‌মাইল—যিনি নিজ প্রাণ ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া "দোম্বার" পরিবর্ত্তে নিজে বলি হইয়াছিলেন,—সেই ঈশ্বরভক্ত ইস্‌মাইলও আজ কারবালা-প্রান্তরে! ঈশা—যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী, জগদ্বেষী মহাঋষি তাপস, ঈশ্বরের মহিমা দেখাইতে যে মহাত্মা চিরকুমারী মাতৃ-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—তিনিও আজ মর্ত্ত্যধামে কারবালার মহাক্ষেত্রে! ইউনুস্—যিনি মৎস্যগর্ভে থাকিয়া ভগবানের অপরিসীম ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন—তিনিও কারবালায়! মহামতি হজরত ইউসুফ যিনি বৈমাত্র ভ্রাতার চক্রে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ঈশ্বর-কৃপায় জীবিত ছিলেন এবং দাস-পরিচয়ে বিক্রীত হইয়া শেষে মিসর-রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সেই মহাসুশ্রীর অগ্রগণ্য পূর্ণজ্যোতিঃর আকর হজরত ইউসুফও আজ কারবালার মহা-প্রান্তরে! হজরত জাজিস্‌কে বিধর্ম্মিগণ শতবার শত প্রকারে বধ করিয়াছে, কিন্তু তিনিও পুনঃ পুনঃ জীবন প্রাপ্ত হইয়া দয়াময়ের মহিমার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখাইয়াছেন! সেই ভুক্তভোগী হজরত জাজিস্‌ও আজ কারবালা-ক্ষেত্রে। এই প্রকার হজরত ইয়াকুব, আস্‌হাব, ইস্‌হাক, ইদ্রীস, আয়ুব, ইলিয়াস্, হরকেল, শামাউন, লুত, এহিয়া, জেক্‌রিয়া প্রভৃতি মহা মহা মহাত্মাগণের আত্মা অদৃশ্য শরীরে কারবালায় হোসেনের দৈহিক শেষ-ক্রিয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন।

সকলেই যেন কাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে

সকলেই একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে বারবার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আর সকলেই আরব্য ভাষায় "এয়া নবী সালাম আলায়কা, এয়া হবীব সালাম আলায়কা, রসুল সালাম আলায়কা সালওয়াতোল্লাহ্ আলায়কা" সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী মুখে মহাঋষি প্রভু হজরত মোহাম্মদের গুণানুবাদ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মৃদুমন্দভাবে শূন্য হইতে "হায় হোসেন ! হায় হোসেন !!" রব করিতে করিতে হজরত মোহাম্মদ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পবিত্র পদ ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। এত দিন প্রকৃতি শরীরী জীবের মুখে "হায় হোসেন !" রব শুনিয়াছিল ; আজ দেবগণ, স্বর্গের হুর-গেলেমাগণ, মহাঋষি, যোগী, তপস্বী ও অমরাত্মাগণের মুখে শুনিতে লাগিল, "হায় হোসেন ! হায় হোসেন !! হায় হোসেন !!!"

এই গোলযোগ না যাইতে যাইতেই সকলেই যেন মহাদুঃখে নির্ব্বাক-ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। হায় হায় ! পুত্রের কি স্নেহ ! রক্ত, মাংস, ধমনী অস্থি, শরীরবিহীন আত্মাও অপত্য-স্নেহে ফাটিয়া যাইতেছে, যেন মেঘ-গর্জ্জনের সহিত শব্দ হইতেছে—"হোসেন ! হায় হোসেন !!" মোরতজা আলী "শেরে খোদা" (ঈশ্বরের শার্দ্দূল) স্বীয় পত্নী বিবি ফাতেমা সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈহিক জীবের জন্য অমরাত্মাগণের শোক অমূলক, খেদ বৃথা। দৈহিক জীবের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই,—তথাপি পুত্রের এমনই মায়া যে, সকল মূলতত্ত্ব জ্ঞাত থাকিয়াও মহাত্মা আলী মহা খেদ করিতে লাগিলেন। জাগতিক বায়ু প্রকৃত আত্মায় বহমান হইয়া ভ্রমময় মহাশোকের উদ্রেক করিয়া দিল। কুহকিনী দুনিয়ার কুহক-জালের ছায়া দেখিয়া হজরত আলী অনেক ভ্রমাত্মক কথা বলিতে লাগিলেন : "আন অশ্ব, আন তরবারি, এজিদের মস্তক এখনই সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিব।" হায় ! সন্তানের স্নেহের নিকট তত্ত্বজ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান, সকলই পরাস্ত !

সকল আত্মাই হজরত আলীকে প্রবোধ দিলেন। হজরত জেব্রাইল আসিয়া বলিলেন : "ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালিত হউক। শহীদগণের

দৈহিক সৎকারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। অগ্রে শহীদগণের মৃতদেহ অন্বেষণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; বিধর্ম্মী, ধর্ম্মী, স্বর্গীয়, নারকীয়, একত্র মিশ্রিত হইয়া সমরাঙ্গণে অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়া রহিয়াছে, সেইগুলি বাছিয়া লইতে হইবে।" সকলেই শহীদগণের দেহ অন্বেষণে ছুটিলেন।

ঐ যে শিরশূন্য মহারথী-দেহ ধূলায় পড়িয়া আছে, খরতর তীরাঘাতে অঙ্গে সহস্র সহস্র ছিদ্র দৃষ্ট হইতেছে, পৃষ্ঠে একটি মাত্রও আঘাত নাই,—সমুদয় আঘাতই বক্ষ পাতিয়া সহ্য করিয়াছেন, এ কোন্ বীর? কবচ, কটি-বন্ধ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি—বীর-সাজের সমুদয় সাজ-সাজওয়া অঙ্গেই শোভা পাইতেছে—বয়সে কেবল নবীন যুবা! কি চমৎকার গঠন! হায়! হায়!! তুমি কি আবদুল ওহাব? হে বীরবর! তোমার মস্তক কি হইল? তুমি কি সেই আবদুল ওহাব—যিনি চিরপ্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্য্যার মুখখানি একবার দেখিতে বৃদ্ধা মায়ের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই যিনি বীররমণী বীরবালার বঙ্কিম আঁখির ভাব দেখিয়া এবং তাঁহার রণোত্তেজক কথা শুনিয়া অসংখ্য বিধর্ম্মীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন,—তুমি কি সেই আবদুল ওহাব?

বীরবরের পদপ্রান্তে এ আবার কে? এ বিশাল অক্ষি দুইটি ঊর্দ্ধে উঠিয়াও বীরশ্রেষ্ঠ আবদুল ওহাবের সজ্জিত শরীর-শোভা দেখিতেছে! এক বিন্দু জল!—ওহো, এক বিন্দু জলের জন্য আবদুল ওহাব-পত্নী হতপতির পদপ্রান্তে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন!

এ বৃদ্ধা রমণী-হৃদয়ে কে আঘাত করিল? এ কোমল শরীরে, কোন্ পাষাণ-হস্ত অস্ত্রাঘাত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার জীবন-লীলা শেষ করিল? রে কাফেরগণ! হোসেনের সহিত শত্রুতা করিয়া রমণী-বধেও পাপ মনে করিস্ নাই? বীরধর্ম্ম, বীর-নীতি, বীর-শাস্ত্র কি বলে? যে হস্ত রমণী-দেহ আঘাত করিতে উত্তোলিত হয়, সে হস্ত বীর-অঙ্গের শোভনীয় নহে, সে বাহু বীর-বাহু বলিয়া গণনীয় নহে। সে বাহু নরাকার পিশাচের বাহু!

সে বীর-কেশরী, সে বীরকুল-গৌরব, সে মদিনার ভাবী রাজা কোথায়? মহা মহা রথী যাঁহার অশ্ব-চালনায়, তীরের লক্ষ্যে, তরবারির

তেজে, বর্শার ভাঁজে মুগ্ধ,—সে বীরবর কৈ?—সে অমিত-তেজা রণকৌশলী কৈ?—সে নব পরিণয়ের নূতন পাত্র কৈ? এই ত শাহানা বেশ! এই ত বিবাহকালীন জাতিগত পরিচ্ছদ! এই কি সেই—যে সখিনার প্রণয়ানুরাগ নব পুষ্পহার পরিণয়সূত্রে গলায় পরিয়াছিল? এই কি সেই কাসেম? হায়! হায়! রুধিরের কি অন্ত নাই!

সখিনা সমুদয় অঙ্গে, পরিধেয় বসনে রুধির মাখিয়া, বীর-জায়ার পরিচয়—বিবাহের পরিচয় দিয়াছেন; তবু রুধিরের ধারা বহিতেছে, মণিময় বসন-ভূষণ ও তরবারি অঙ্গে শোভা পাইতেছে! তূণীর, তীর বর্শা দেহপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাম পার্শ্বে এ মহাদেবী কে? এ নবকমলদলগঠনা নব যুবতী সতী কে? চক্ষু দুইটি কাসেমের মুখ দেখিতে দেখিতে যেন বন্ধ হইয়াছে, জানিত কি অজানিতভাবে বাম হস্তখানি কাসেমের বক্ষের উপর রহিয়াছে। সতি! তুমি কে? তোমার দক্ষিণ হস্তে এ কি? একি ব্যাপার—কমলকরে লৌহ অস্ত্র! অস্ত্রের অগ্রভাগ কৈ? উহু! কি মর্ম্মাঘাতী দৃশ্য! বদ্ধমুষ্টিতে অস্ত্র ধরিয়া হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করাইয়াছ! তুমি কি সখিনা? তাহা না হইলে এত দুঃখ কার? স্বামীর বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছ? না—না—বীর-জায়া, বীর-দুহিতা কি কখনও স্বামী-বিরহে, কি বিয়োগে আত্মবিসর্জ্জন করে? কি ভ্রম! তাহা হইলে এ বদনে হাসির আভা কেন থাকিবে? জ্যোতির্ম্ময় কমলাননে জ্বলন্ত প্রদীপ-প্রভা কেন রহিবে? বুঝিলাম—বিরহ কি বিয়োগ-দুঃখে এ তীক্ষ্ণ খঞ্জরের হৃদয়-শোণিত, স্বামীদেহ-বিনির্গত শোণিতে মিশ্রিত হয় নাই, স্বামী-বিয়োগে অধীরা হইয়া দুঃখভার হ্রাস করিতে খঞ্জরের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। ধন্য সতী, ধন্য সতী সখিনা! তুমি জগতে ধন্য, তোমার সুকীর্ত্তি জগতে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি! কি মধুময় কথা বলিয়া খঞ্জর হস্তে করিয়াছিলে, জগৎ দেখুক! জগতের নরনারীকুল তোমায় দেখুক! এত প্রণয়, এত ভালবাসা, এত মমতা, এত স্নেহ! এক শোণিতে গঠিত যে কাসেম, সেই-ই আবার নব প্রেমে দীক্ষিত—যে ঘটনায় নিতান্ত অপরিচিত হইলেও মুহূর্ত্তমধ্যে প্রণয়ের, প্রেমের সঞ্চার হয়,—
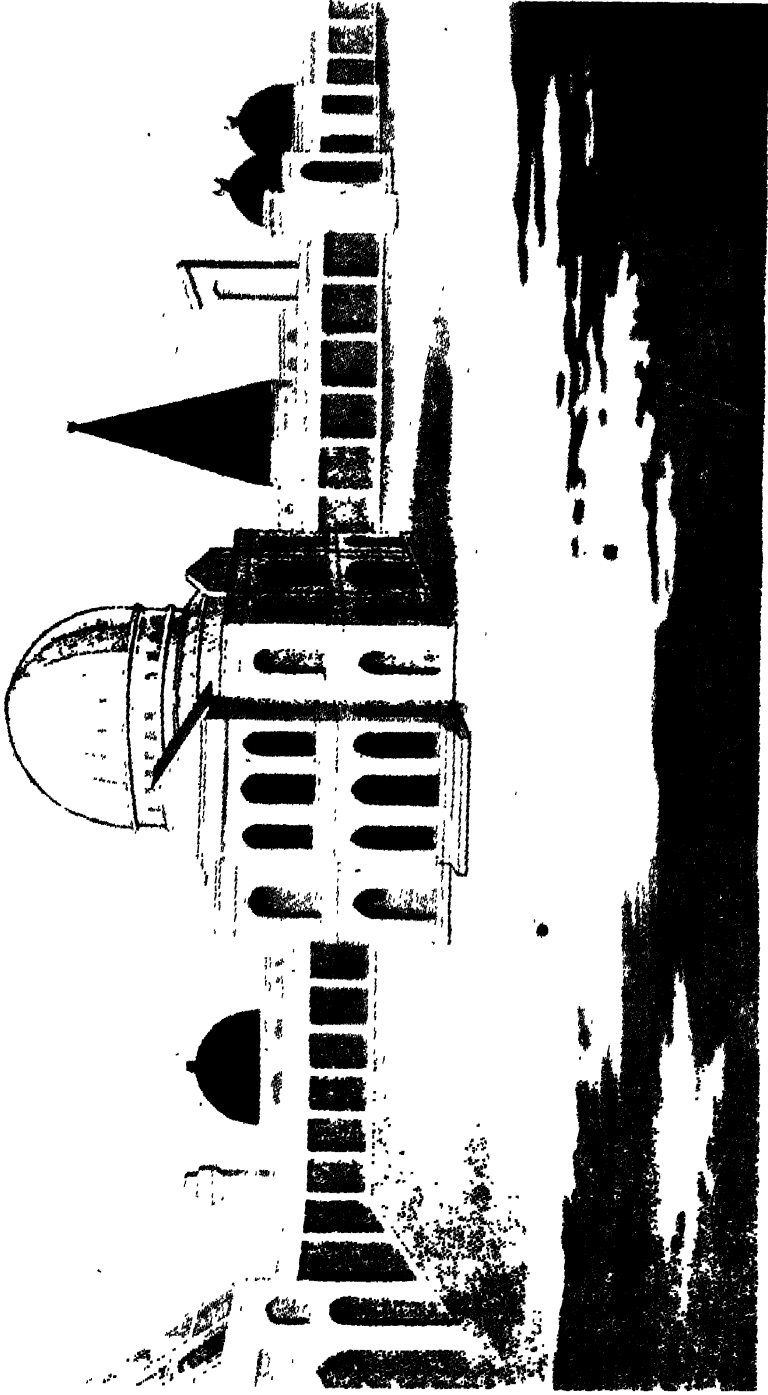
কারবালায় হজরত হোসেনের মাজার শরীফ

সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে সেই কাসেমকেই তুমি মুক্তকণ্ঠে বলিলে, "ভুলিলাম কাসেম! এখন তোমায় ভুলিলাম!" এই চিরস্মরণীয় মহামূল্য কথা বলিয়া যাহা করিলে তাহাতে অপরের কথা দূরে থাকুক,—নির্দ্দয় হৃদয় মারওয়ানের অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। ধন্য ধন্য সখিনা! সহস্র ধন্যবাদ তোমাকে!

এ প্রান্তরে এ রূপরাশি কাহার? এ অমূল্যরত্ন ধরাসনে কেন? ঈশ্বর! তুমি কি না করিতে পার? একাধারে এত রূপ প্রদান করিয়া শেষে কি ভ্রম হইয়াছিল? সেই আজানুলম্বিত বাহু,—সেই বিস্তারিত বক্ষঃ—সেই আকর্ণ বিস্তারিত অক্ষিদ্বয়,—কি চমৎকার ভ্রূযুগল,—ঈষৎ গোঁফের রেখা! হায়! হায় ভগবান! এত রূপবান করিয়া কি শেষে তোমারই ঈর্ষা হইয়াছিল? তাহাতেই কি এই কিশোর বয়সে আলী আক্‌বর আজ চির-ধরাশায়ী?

এ যুগলমূর্ত্তি এ স্থানে পড়িয়া কেন? এ ননীর পুতুল রক্তমাখা অঙ্গে মহাপ্রান্তরে পড়িয়া কেন? বুঝিলাম, ইহাও এজিদের কার্য্য। রে পাষণ্ড পিশাচ! হোসেনের ক্রীড়ার পুত্তলি দুইটিও ভগ্ন করিয়াছিস্? হায়! হায়!! এই ত সেই ফোরাত নদী, ইহার ভয়ানক প্রবাহ মৃত শরীর-সকল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে লোহিত, স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ লোহিত, কোন স্থানে ঘোর পীত, কোন স্থানে নীল-বর্ণের আভা-সংযুক্ত স্রোত বহিয়া নিদারুণ শোক প্রকাশ করিতেছে,—হোসেন-শোকে ফোরাতের প্রতি তরঙ্গ মস্তক নত করিয়া রঞ্জিত জলে মিশিয়া যাইতেছে।

শব্দ হইল, "এ যে আমার কোমরবন্ধ, এ যে আমার শিরস্ত্রাণ, এ যে আমারই তরবারি, এ সকল এখানে পড়িয়া কেন?" আবার শব্দ হইল, "এ সকলই হোসেনের আয়ত্তাধীনে ছিল।"

এই ত সেই মহাপুরুষ—মদিনার রাজা! তিনি এ প্রান্তরে বৃক্ষতলে পড়িয়া কেন? রক্তমাখা খঞ্জর কাহার? এ ত হোসেনর অস্ত্র নহে! অঙ্গের বসন, শিরস্ত্রাণ কবচ স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে,—কারণ কি? এ কি আত্ম-বিকারের চিহ্ন, না ইচ্ছামৃত্যুর লক্ষণ? তাহাতেই কি এই দশা? বাম হস্তের অর্দ্ধ পরিমাণ খণ্ডিত হইয়াও দুই হস্ত দুই দিকে পড়িয়া যে উপদেশ দিতেছে,

তাহার অর্থ কি জগতে কেহ বুঝিয়াছে? বাম হস্তে আবার কে আঘাত করিল? মস্তক খণ্ডিত হইয়াও জন্মভূমি মদিনার দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে! হায় রে জন্মভূমি !!

সীমার মস্তক লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়াছিল, আজর সেই মস্তক এই দেহে সংযুক্ত করিবার আশায় পুত্রগণের মস্তক কাটিয়া দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এজিদ,—কত খেলা খেলিবেন, কত অপমান করিবেন—এই আশা করিয়া মস্তক দামেস্কে লইয়া গিয়াছিলেন। ধন্য রে কারিগিরি! ধন্য রে ক্ষমতা! জগদীশ! তোমার মহিমা অপার। তুমি যাহা সংঘটন করিয়া একত্র করিতে ইচ্ছা কর,—তাহা অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে থাক্, ঘোর অরণ্যে থাক্, অতল জলধিতলে থাক্, অনন্ত আকাশে থাক্, বায়ু-অভ্যন্তরে থাক্—তাহা তুমি সংগ্রহ করিয়া একত্র করিবেই করিবে। এ লীলা বুঝা মানবের সাধ্য নহে, এ কীর্ত্তির কণামাত্র বুঝাও ক্ষুদ্র নরমস্তকের কার্য্য নহে। জগদীশ! প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি, "তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় প্রভু! তোমার মহিমা অপার !!"

স্বর্গীয় দূতগণ, পবিত্র আত্মাগণ শহীদগণের দৈহিক ক্রিয়ায় যোগ দিলেন; স্বর্গীয় সুগন্ধে সমাধিস্থান আমোদিত হইতে লাগিল।

শহীদগণের শেষ-ক্রিয়া "জানাজা" করিতে অন্য অন্য মৃত শরীরের ন্যায় জলে স্নান করাইতে হয় না, অন্য বসন দ্বারা শরীর আবৃত করিতে হয় না,—ঐ রক্তমাখা শরীরে, সজ্জিত বেশে, ঐ বীর-সাজেই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়। ধর্ম্মযুদ্ধের কি অসীম বল, কি অসীম পরিণাম-ফল!

দৈহিক কার্য্য শেষ হইলে শহীদগণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরের আদেশে স্বর্গে নীত হইলেন।

পঞ্চম প্রবাহ

স্বাধীনতা—কি মধুমাখা কথা! স্বাধীন জীবন কি আনন্দময়! স্বাধীন দেশ কি আরামের স্থান! স্বাধীন ভাবের কথাগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের সূক্ষ্ম শিরা পর্য্যন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অন্তরে বিবিধ ভাবের উদয় হয়; মহাহর্ষে মন নাচিতে থাকে, না হয় মহাদুঃখে অন্তর ফাটিয়া যায়। স্বাধীন মন, স্বাধীন জীবন পরাধীনতা স্বীকার করিতে যেরূপ কষ্ট বোধ করে, আবার অন্যকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারিলে ঐ অন্তরেই তেমনি অসীম আনন্দ অনুভূত হয়। এক পক্ষের দুঃখ, অপর পক্ষের সুখ!

এজিদ স্বরাজ্যে স্বাধীন। সকলেই তাঁহার আদেশের অধীন। জয়নালকে তিনি হাসি-রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুই কি করিবি?" জয়নালের মুখে তাহার উত্তরও তিনি শুনিয়াছেন। "ক্রমে বশে আনিয়া, ক্রমে শান্তভাব ধরাইয়া, কার্য্যসিদ্ধির উপায় না করিলে এইক্ষণে কিছুই হইবে না। জয়নালকে প্রাণে মারিয়া, মদিনার সিংহাসনে বসিলে কোন লাভ নাই। জয়নাল নিয়মিতরূপে মদিনার কর দামেস্কে যোগাইলে, দামেস্কসিংহাসনের সহস্র প্রকারে গৌরব! কিন্তু সিংহশাবককে বশে আনা সহজ কথা নহে। কিছু দিন চেষ্টা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রথমেই নিরাশ হইয়া হোসেন-বংশ একেবারে বিনাশ করিলে বাহাদুরী কি?" এই সকল আশার কুহকে পড়িয়া এজিদ বন্দিগণের প্রতি সুব্যবস্থার অনুমতি করিয়াছিলেন।

জয়নাল কিসে বশ্যতা স্বীকার করে, কিসে সে প্রভু বলিয়া মান্য করে, কি উপায় করিলে নির্ব্বিঘ্নে মদিনা-রাজ্য করতলস্থ হয়,—অধীনতা,দাসত্ব-কলঙ্করেখা জয়নালের সুপ্রশস্ত ললাটে অক্ষয়রূপে অঙ্কিত হয়,—এজিদ এই সকল মহাচিন্তার ভার নিজ মস্তকে লইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিনা যুদ্ধে মদিনার সম্রাট হওয়া সহজ কথা নহে! এজিদের মস্তক

কেন—লোকমান, আফ্‌লাতুন প্রভৃতি মহা মহা চিন্তাশীল মহাজনের মস্তিষ্কও চিন্তায় ঘুরিয়া যায়। কিন্তু এজিদের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মারওয়ান চেষ্টা করিলে অবশ্যই ইহার কোন এক প্রকারের সদুপায় বাহির করিতে পারিবে। মনের ব্যগ্রতায় দামেস্কের বহু লোকের প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল, কিন্তু মারওয়ান ভিন্ন ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করার উপযুক্ত পাত্র মানস-চক্ষে কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না।

মারওয়ান উপস্থিত হইলে, এজিদ ঐ সকল গুপ্ত বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে বলিলেন। মারওয়ান একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আগামী জুম্মাবারে (শুক্রবারে) জয়নাল দ্বারা মহারাজের নামে খোৎবা পাঠ করাইব। এক্ষণে সমগ্র প্রদেশে হোসেনের নামে খোৎবা হইতেছে। কারণ, হোসেনের পর এ পর্য্যন্ত মদিনার রাজা কেহ হন নাই। জয়নাল যদি আপন পিতার নাম পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের নামে খোৎবা পাঠ করে, তবেই কার্য্যসিদ্ধি—তবেই দামেস্কের জয়—তবেই বিনা যুদ্ধে মদিনা করতলে। যাঁহার নামে খোৎবা, তিনি মক্কা-মদিনার রাজা! এখনই রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিতেছি যে, আগামী জুম্মাবারে শেষ ইমাম জয়নাল আবেদীন দামেস্ক-সম্রাট—মহারাজাধিরাজ এজিদ নামদারের নামে খোৎবা পাঠ করিবেন। নগরের যাবতীয় ঈশ্বরভক্ত লোককেই উপাসনা-মন্দিরে খোৎবা শুনিতে উপস্থিত হইতে হইবে। যিনি রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরশ্ছেদ করা যাইবে।"

এজিদ মহাতুষ্ট হইয়া মারওয়ানকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে রাজ-ঘোষণা দামেস্ক নগরের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল! ঘোষণার মর্ম্মে অনেকেই সুখী হইল, আবার অনেকে মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। প্রকাশ্যে কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই—পাছে রাজদ্রোহী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণ যায়! গোপনে গোপনে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত দিন পরে নূরনবী মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মে কলঙ্ক-রেখা পতিত হইল! হায় হায়! কি মর্ম্মভেদী ঘোষণা! হায় হায়! ইস্‌লাম ধর্ম্মের এত অবমাননা! কাফেরের নামে খোৎবা! বিধর্ম্মী

নারকী ঈশ্বরদ্রোহীর নামে খোৎবা! হা ইসলাম ধর্ম্ম! দুরন্ত জালেমের হস্তে পড়িয়া তোমার এই দুর্দ্দশা! হায় হায়। পুণ্যভূমি মদিনার সিংহাসন যাঁহার আসন, সেই শেষ ইমাম জয়নাল আবেদীন, কাফেরের নামে খোৎবা পড়িবে? সে খোৎবা শুনিবে কে? আমরা অধীন প্রজা, না যাইয়া নিস্তার নাই! জগদীশ! আমাদের কর্ণ বধির কর, চক্ষুর জ্যোতিঃ হরণ কর, চলৎ শক্তি রহিত কর।"

মোহাম্মদীয়গণ নানাপ্রকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এজিদ-পক্ষীয় বিধর্ম্মীরা দর্প করিয়া বলিতে লাগিল, "মোহাম্মদ-বংশের বংশমর্য্যাদার চিরগৌরব এখন কোথায় রহিল? ধন্য মন্ত্রী মারওয়ান!"

এ সকল সংবাদ বন্দীরা এখনও পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। এজিদ মনে করিয়াছেন: "উহাদের জীবন আমার হস্তে,—মুহূর্ত্তে উহাদের প্রাণ রাখিতে পারি, মুহূর্ত্তে বিনাশও করিতে পারি। জুম্মার দিন জয়নালকে ধরিয়া আনিয়া মস্‌জিদে পাঠাইয়া দিব। যদি সে আমার নামে খোৎবা পড়িতে অস্বীকার করে, রাজাজ্ঞা অমান্য করা অপরাধে তখনই উহার প্রাণবিনাশ করিব।"

জুম্মাবার উপস্থিত। নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই মোহাম্মদীয়গণ প্রাণের ভয়ে উপাসনামন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়নাল আবেদীনের নিকটে যাইয়া মারওয়ান বলিল, "আজ তোমাকে মস্‌জিদে খোৎবা পড়িতে হইবে।"

জয়নাল বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। ইমামদিগের কার্য্যই উপাসনায় অগ্রবর্ত্তী হওয়া, খোৎবা পাঠ, ধর্ম্মের আলোচনা, শিষ্যদিগকে উপদেশ দান;—সুতরাং ঐ সকল আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। তুমি অপেক্ষা কর, আমি আমার মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।"

"তোমার মা'র অনুমতি লইতেই যদি চলিলে, আর একটি কথা শুনিয়া যাও!"

"কি কথা?"

"খোৎবা পড়িতে হইবে বটে, কিন্তু তোমার নামে পড়িতে পারিবে না।"

জয়নাল চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, "কেন পারিব না ?"

"কেন-র কোন উত্তর নাই,—রাজার আজ্ঞা।"

"ধর্ম্মচর্চ্চায় বিধর্ম্মী রাজার আজ্ঞা কি ? আমার ধর্ম্মকর্ম্ম আমি করিব, তাহাতে তোমাদের কথা কি ? আমি যত দিন মদিনার সিংহাসনে না বসিব, তত দিন পিতার নামেই খোৎবা পাঠ করিব; এই ত রাজার আজ্ঞা। তুমি কোন্ রাজার কথা বলিতেছ ?"

"তুমি নিতান্তই অবোধ, কিছুই বুঝিতেছ না। তোমার মা'র নিকট বলিলে, তিনি সকলই বুঝিতে পারিবেন।"

"আমি অবোধ না হইলে তোমাদের বন্দীখানায় কেন আসিব ? আর কি কথা আছে বল। আমি মা'র নিকটে যাইতেছি।"

"যিনি দামেস্কের রাজা, তিনিই এক্ষণে মদিনার রাজা। মক্কা ও মদিনা একই রাজার রাজ্য হইয়াছে। এখন ভাব দেখি : কাহার নামে খোৎবা পাঠ করা কর্ত্তব্য ?"

"আমি ও-প্রকারের কথা বুঝিতে পারি না। যাহা বলিবার হয়, স্পষ্টভাবে বল।"

"তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কেবল থাকিবার মধ্যে আছে রাগ আর নিজের অহঙ্কার। বাদশাহ্-নামদার এজিদের নামে খোৎবা পড়িতে হইবে।"

জয়নাল আবেদীন রোষে ও দুঃখে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের নামে আমি খোৎবা পড়িব ? এজিদ কোন্ দেশের রাজা ? আর সে কোন্ রাজার পুত্র ?"

মারওয়ান অতি ব্যস্তে জয়নাল আবেদীনকে ধরিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিল, "সাবধান ! সাবধান !! ও-কথা মুখে আনিও না। ও-কথা মুখে আনিলে নিশ্চয়ই তোমার মাথা-কাটা যাইবে।"

"আমি মাথা-কাটাতে ভয় করি না। তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও—আমি খোৎবা পড়িতে যাইব না।"

মারওয়ান মনে করিয়াছিল যে, জয়নালকে বলিবামাত্রই তিনি খোৎবা

পড়িতে আসিবেন; কিন্তু জয়নাবের কথা শুনিয়া সে অবাক্ হইল। এদিকেও উপাসনার সময় অতি নিকট। মারওয়ান মনে মনে বলিতে লাগিল: "এ সিংহ-শাবকের নিকট চাতুরী চলিবে না, বলপ্রকাশ করিলেও কার্য্য উদ্ধার হইবে না। সালেমা বিবির নিকটে যাইয়া বলি;—তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, বয়সেও প্রবীণা; অবশ্যই ভালমন্দ বিবেচনা করিয়া জয়নালকে সম্মত করাইয়া দিবেন। সকলেই ত একই বন্দীগৃহে রহিয়াছেন!"

মারওয়ান সালেমা বিবির নিকট যাইয়া বলিল, "আপনাদের কপালের এমনই গুণ যে, ভাল করিতে গেলেও মন্দ হইয়া যায়। আমার ইচ্ছা—যে কোনও প্রকারে যেন এই বিপদ হইতে আপনারা উদ্ধার পান।"

সালেমা বিবি বলিলেন, "কি প্রকারে ভাল করিতে ইচ্ছা কর?"

"মহারাজ এজিদ-নামদার আজ্ঞা করিয়াছেন যে, জয়নাল আবেদীনের দ্বারা আজিকার জুম্মার খোৎবা পড়াইয়া তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দাও।"

"ভাল কথা। জয়নাল কৈ? তাহাকে এ কথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি এবং তাহার উত্তরও শুনিয়াছি।"

"সে কি উত্তর করিল? তার বুদ্ধি আছে কি?"

"বুদ্ধিও খুব আছে, ক্রোধও খুব আছে।"

"ক্রোধের কথা বলিও না। তাহারা ধর্ম্মের দাস, ধর্ম্মই তাহাদের জীবন; বোধ হয়, সে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন কথা বলিয়া থাকিবে। ধর্ম্মবিরোধী কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিলে কখনই সে-শরীরে ক্রোধের সঞ্চার হয় না।"

"মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন: আজ হোসেনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মক্কা ও মদিনা এইক্ষণে যাঁহার করতলে, জয়নাল আবেদীন তাঁহারই নামে খোৎবা পাঠ করুক। আমি আজই তাহাদিগকে বন্দীগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া মদিনায় পাঠাইয়া দিব। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করুক,—কিন্তু তাহাকে দামেস্করাজের অধীনে থাকিতে হইবে।"

"এ কি কথা! বন্দী হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই কি তিনি ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন? আমাদের প্রতি তিনি এত অত্যাচার করিতেছেন,

তাঁহাকে যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিব ? হজরত মোহাম্মদ রসুলোল্লার প্রচারিত ধর্ম্মে যিনি দীক্ষিত নহেন, মদিনার সিংহাসনের যিনি অধীশ্বর নহেন, তাঁহার নামে কি প্রকারে খোৎবা পাঠ হইতে পারে ? তাও আবার পাঠ করিবে—জয়নাল আবেদীন ! এ কি কথা ?"

"আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, একটু শান্ত হউন। বন্দীভাবে থাকিয়া এতদূর বলা নিতান্তই অন্যায়। যাহা হউক, আমি বলি,—যদি খোৎবাটা পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তাহাতে দোষ কি ? জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারিলে কি আর তাহার উপর দামেস্করাজের কোন ক্ষমতা থাকিবে ? তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করিতে পারিবে, ইহাতে আর আপনাদের ক্ষতি কি ?"

"ক্ষতি কিছুই নাই ;—কিন্তু—"

"আর 'কিন্তু' মুখে আনিবেন না, প্রাণ বাঁচাইতে অনেক—"

"জয়নালকে একবার ডাকিতে বল।"

জয়নাল আবেদীন আড়ালে থাকিয়া সকলই শুনিতেছিলেন, সালেমা বিবির কথার অভাবেই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহারোষের চিহ্ন এবং ক্রোধের লক্ষণ দেখিয়া সালেমা বিবি অনুমানেই অনেক বুঝিলেন ; সস্নেহে জয়নালের কপোলদেশ চুম্বন করিয়া অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "এজিদের নামে খোৎবা পড়ায় দোষ কি ? যদি ভগবান কখনও তোমায় সুখ-সূর্য্যের মুখ দেখান, তোমার নামেই লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোক খোৎবা পাঠ করিবে। এখন মারওয়ানের কথা শুনিলে, বোধ হয়, ঈশ্বর ভালই করিবেন।"

জয়নাল বলিলেন, "আপনিও কি এজিদের নামে খোৎবা পড়িতে অনুমতি করেন ?"

"আমি অনুমতি করি না ; তবে ইহা বলিতে পারি যে, তোমার মুক্তির জন্য আমরা সকলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। এক দিন খোৎবা-পড়িলেই যদি তুমি সপরিবারে বন্দাগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, মদিনার সিংহাসনে নির্ব্বিবাদে বসিতে পার, তবে তাহাতে ক্ষতি কি ভাই ? আরও

এক কথা, তুমি ইচ্ছা করিয়া এই কুকার্য্যে রত হইতেছ না। এ পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না।"

"সামান্য কারামুক্তি আর মদিনার রাজ্যলাভের জন্য আমি এজিদের নামে খোৎবা পড়িব? এ বন্দীগৃহ হইতে মুক্তির জন্য ভয় কি? শক্তি থাকিলেই মুক্তি হইবে। যদি কেহ রাজ্য কাড়িয়া লইয়া থাকে, তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া রাজ্যগ্রহণ করা অপেক্ষা অস্ত্রে তাহার মস্তক নিপাত করাই শ্রেয়ঃ—এই আমার কথা।"

সালেমা বিবি জয়নালের মুখে শত শত চুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক। ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন!"

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "আপনারা এরূপ গোলযোগ করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। আর সময় নাই; যদি মদিনা যাইবার ইচ্ছা থাকে, এজিদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা থাকে, জয়নালকে খোৎবা পাঠ করিতে প্রেরণ করুন। ইহাতে সম্মত না হন, আমার অপরাধ নাই, আমি নাচার।"

সালেমা বিবি বলিলেন, "জয়নাল! তুমি ঈশ্বরের নাম করিয়া মস্‌জিদে যাও! তোমার ভাল হইবে।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "আপনি যাইতে আজ্ঞা করিলেন?"

"হাঁ, আমি যাইতে আজ্ঞা করিলাম। তোমার কোনও চিন্তা নাই। আরও একটি কথা বলিতেছি, শুন। শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেই ভাল মন্দ বুঝিতে পারিবে।ঃ একদা তোমার পিতামহ হজরত আলী কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আম্বাজ নামে এক নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি শুনিলেনঃ সে দেশ পুরুষাধিকারে নহে, হানুফা নামে একজন রাজ্ঞীর অধিকারভুক্ত। আরও আশ্চর্য্য কথা এই যে,—রাজ্ঞী সে পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই; তাঁহার পণ এই,—বাহুযুদ্ধে যিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন, তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। আর রাজ্ঞী জয়ী হইলে পারাজিত পক্ষকে আজীবন দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার দাসের মত থাকিতে হইবে। মহাবীর আলী

স্ত্রীলোকের এই পণের কথা শুনিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। হানুফাও কম ছিলেন না। যাবতীয় আরবীয় বীরকে তিনি জানিতেন। তাঁহারও মনে ইচ্ছা ছিল যে, আলীকে পরাস্ত করিয়া তিনি একজন মহাবীর দাস লাভ করিবেন। ঘটনাক্রমে সুযোগ ও সময় উপস্থিত!—দিন নির্ণয় হইল। রূপের গরিমায়—যৌবনের জ্বলন্ত প্রতিভায় বিবি হানুফা আরবের সুবিখ্যাত বীরকেও তুচ্ছজ্ঞানে সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বরের মহিমায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মোহাম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মহাবীর অলীকে স্বামীত্বে বরণ করিলেন। হজরত আলী বিবি ফাতেমার ভয়ে একথা মদিনায় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। সময়ে বিবি হানুফার গর্ভে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। আলী সে সময় মহা চিন্তিত হইলেন,—কি করেন? কথাও গোপন থাকে না! বিবি ফাতেমার ভয়ও কম নহে! পুত্রকে গোপনে আনাইয়া একদা তিনি প্রভু মোহাম্মদের পদপ্রান্তে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রভু মোহাম্মদ পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে চুমা দিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানি। আমি ইহার নাম, ইহার মাতার নামের সহিত এবং আমার নামের সহিত যোগ দিয়া রাখিলাম।" বিবি ফাতেমা দেখিলেন যে, একটি অপরিচিত সন্তানকে প্রভু ক্রোড়ে করিয়া বারবার চুমা দিতেছেন। বিবি ফাতেমা ঐ সন্তানটির কথা জিজ্ঞাসা করায় সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইল। বিবি ফাতেমা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পিতাকে এক প্রকার ভর্ৎসনা করিয়াই কহিলেন, "আমার সপত্নীপুত্রকে আপনি স্নেহ করিয়াছেন! আর কোন্ বিবেচনায় আপনার নামের সহিত যোগ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন?"

প্রভু বলিলেন,—"ফাতেমা, শান্ত হও! এই মোহাম্মদ হানিফা তোমার কি কি উপকার করিবে, শুন। যে সময় প্রিয়পুত্র হোসেন কারবালার মহাপ্রান্তরে এজিদের আজ্ঞায় সীমার-হস্তে শহীদ হইবে, তৎকালে তোমার বংশে এক জয়নাল আবেদীন ভিন্ন পুরুষপক্ষে আর কেহই থাকিবে না; তোমার আত্মীয়স্বজন, ভগিনী, পুত্রবধূরা এজিদের সৈন্যহস্তে কারবালা হইতে দামেস্কে বন্দীভাবে আসিবে, তাহাদের কষ্টের

সীমা থাকিবে না। সেই কঠিন সময়ে এই মোহাম্মদ হানিফা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে, জয়নাল আবেদীনকে মদিনার সিংহাসনে বসাইবে।” বিবি ফাতেমা পিতৃমুখে এই সকল কথা শুনিয়া মোহাম্মদ হানিফাকে আহ্লাদে ক্রোড়ে করিয়া তাহার আপাদমস্তকে চুমা দিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন, “প্রাণাধিক! তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার হৃদয়ের ধন, মস্তকের মণি। তোমার দেহস্থ আমার চুম্বিত স্থানে কোনরূপ অস্ত্র প্রবেশ করিবে না! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বজয়ী হইয়া জগতে মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিবে। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও!” এই পর্য্যন্ত বলিয়া সালেমা বিবি কহিলেন: যে সময় কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের সূচনা হয়, সেই সময় আমি গোপনে একজন কাসেদকে মোহাম্মদ হানিফার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া পাঠাইয়াছি। মোহাম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামেস্কে আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। এই ত শাস্ত্রের কথা, এখন সকলই ঈশ্বরের হাত। আরও একটি কথা,—হোসেন যুদ্ধকালে কি বলিয়া গিয়াছিলেন, মনে হয়? তিনি বলিয়াছিলেন, “তোমরা ভাবিও না, এমন একটি লোক আছে, যদি তাহার কর্ণে এই সকল ঘটনার অণুমাত্রও প্রবেশ করে, তবে ইহার প্রতিশোধ সে অবশ্যই লইবে। সে কে?—সে এই মোহাম্মদ হানিফা।”

জয়নাল আবেদীন এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না। খোৎবা পাঠ করিবেন স্বীকার করিয়া উপাসনার সমুচিত পরিধেয় লইয়া তিনি বহির্গত হইলেন; মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। নগরে হুলুস্থূল পড়িয়াছে!—আজ জয়নাল আবেদীন এজিদের নামে খোৎবা পাঠ করিবেন! মারওয়ানের আনন্দের সীমা নাই। আজ এজিদের আশা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবে। জয়নাল উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনান্তে খোৎবা পাঠ আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদীয়গণের অন্তরে খোৎবার শব্দগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। কোন্ মুখে জয়নাল আবেদীন মদিনার ইমামের নাম অর্থাৎ, হোসেনের নামের স্থানে এজিদের নাম উচ্চারণ করিবেন? হায়! হায়! এ কি হইল? কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে

মদিনার সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী যিনি, তাঁহারই নামে খোৎবা পাঠ হইল। খতিবের * মুখে কেহ এজিদের নাম শুনিল না, পূর্ব্বেও যে নাম, এখনও সেই হোসেনের নাম স্পষ্ট শুনিল।

মোহাম্মদীয়গণ মনের আবেগে আনন্দ-উল্লাসে 'জয় জয়' শব্দ করিয়া উঠিল। এজিদপক্ষীয়গণ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া জয়নাল আবেদীনকে নানা প্রকার কটুবাক্যে ভৎর্সনা করিতে করিতে ভজনালয় হইতে বাহির হইল।

নিষ্কোষিত অসিহস্তে এজিদ ক্রোধে অধীর। কম্পিত-কলেবরে কর্কশ-স্বরে অসির ঝন্‌ঝন্ শব্দের সহিত রসনা সঞ্চালন করিয়া তিনি বলিলেন, "এখনই জয়নালের শিরশ্চেদ করিব। এত চাতুরী আমার সঙ্গে?"

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "বাদশাহ্-নামদার! আশাসিন্ধু এখনও পার হই নাই। বহুদূর আসিয়াছি বলিয়া ভরসা হইয়াছে;—অচিরেই তীরে উঠিব। কিন্তু মহারাজ! আজ যে একটী গোপনীয় কথা শুনিয়াছি, তাহাতে জয়নাল আবেদীনের জীবন শেষ করিলেও এমামবংশ সমূলে বিনাশ হইবে না, বরং সমরানল সতেজে জ্বলিয়া উঠিবে। সে দুর্দ্দান্ত প্রমত্ত বারণকে মারওয়ান যত দিন কৌশলাঙ্কুশে হোসেনের দাদ-উদ্ধার পর্য্যবেক্ষণ হইতে নিবারণ করিতে না পারিবে, ততদিন মারওয়ানের মনে শান্তি নাই, আপনার জীবনে আশা নাই!"

এজিদ মৃত্তিকায় তরবারি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সে কি কথা! হোসেনবংশে এখনও প্রমত্ত কুঞ্জরসম বীরশ্রেষ্ঠ বীর আছে! আমি ত আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই?"

মারওয়ান বলিল, "জয়নালকে নির্দ্দিষ্ট বন্দীগৃহে প্রেরণ করিবার আদেশ হউক। আমি সে গুপ্তকথা—নিগূঢ়-তত্ত্ব এখনই বলিতেছি।"

---

* খতিব—যে খোৎবা পাঠ করে

ষষ্ঠ প্রবাহ

যে নগরের সুখসাগরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলা করিতেছিল, মহানন্দের স্রোত বহিতেছিল, রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, প্রধান প্রধান সৌধ আলোক-মালায় পরিশোভিত হইয়াছিল, ঘরে ঘরে নৃত্য গীত, বাজনার ধূম পড়িয়াছিল, রঞ্জিত পতাকাসকল হেলিয়া দুলিয়া জয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল ;—হঠাৎ তৎসমুদয় বন্ধ হইয়া গেল ! মুহূর্ত্তমধ্যে মহানন্দ-বায়ু থামিয়া বিষাদ-ঝটিকা-বেগ রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল, মাঙ্গলিক পতাকারাজি নতশিরে হেলিতে দুলিতে পড়িয়া গেল। রাজপ্রাসাদের বাদ্যধ্বনি, নূপুরের ঝন্‌ঝন্, সুমধুর কণ্ঠস্বর আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। সুহাস্য আস্যসকল বিষাদ-কালিমা রেখায় মলিন হইয়া গেল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইতেছে না। রাজভবনের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া কত জনে কত কথার আলোচনায় বসিয়া গেল। শেষে সাব্যস্ত হইল, গুরুতর মনঃপীড়ায় হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন, নিশ্চয়ই হঠাৎ কোন দুঃখের সংবাদ শ্রবণ ! তাহা কি ? কারবালার সংবাদ—বিবি সালেমার প্রেরিত কাসেদের আগমন।

এ প্রদেশের নাম আম্বাজ, রাজধানী—হানুফা নগর। এই সমৃদ্ধিশালী মহানগরীর দণ্ডধর—মোহাম্মদ হানিফা। সম্রাট স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদে মাতিয়াছিলেন, শুভ-সময়ে শুভ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন আশা ছিল, এমন সময় কাসেদ আসিয়া হরিষে সম্পূর্ণ বিষাদ ঘটাইয়া মোহাম্মদ হানিফাকে নিতান্তই দুঃখিত করিয়া তুলিল !

হাসানের সাংঘাতিক মৃত্যু, জেয়াদের সখ্যতা, মারওয়ানের আচরণ ; কুফার পথ ভুলিয়া হোসেনের কারবালায় গমন ও ফোরাত নদীর তীর শত্রুপক্ষের দ্বারা বেষ্টন,—এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে, বিষাদে নরপাল মহা অস্থির ! কাসেদ তাঁহার সম্মুখে অবনতশিরে দণ্ডায়মান।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "হায়! জীবিত থাকিতেই ভ্রাতা হাসানের মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে হইল। ভ্রাতা হোসেনও কারবালা-প্রান্তরে সপরিবারে কষ্টে পড়িয়াছেন! হায়! এত দিন না জানি কি ঘটনাই ঘটিয়া থাকিবে! জগদীশ! আমার এই প্রার্থনা, দাসের এই প্রার্থনা,—কারবালা প্রান্তরে যাইয়া যেন ভ্রাতার পবিত্র চরণ দেখিতে পাই, পিতৃহীন কাসেমের মুখখানি যেন দেখিতে পাই। দয়াময়! আমার পরিজনকে রক্ষা করিও, দুরন্ত কারবালা-প্রান্তরে তুমি ভিন্ন তাহাদের সহায় আর কেহ নাই। দয়াময়! দয়াময়!! আমার মনে শান্তি দান কর। আমি স্থির মনে অটলভাবে যেন কারবালায় গমন করিতে পারি—পূজ্যপাদ ভ্রাতার সাহায্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। দয়াময়! আমার শেষ ভিক্ষা এই যে, তোমার এ চিরকিঙ্করের চক্ষু কারবালার প্রান্তসীমা না দেখা পর্য্যন্ত হোসেন-শিবির শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিও।"

এই প্রকারে উপাসনা করিয়া মোহাম্মদ হানিফা তাঁহার সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "আমার সঙ্গে কারবালায় যাইতে হইবে। আমি এ নগরে আর ক্ষণকালের জন্যও থাকিব না। রাজকার্য্য প্রধান মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত থাকিল।"

মোহাম্মদ হানিফা ঈশ্বরের নাম করিয়া বীরসাজে সজ্জিত হইলেন। যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ গাজী রহমান্‌কে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে বরণ করিয়া তিনি কারবালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাসেদ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সপ্তম প্রবাহ

তোমার এ দুর্দ্দশা কেন? কোন্ কুক্রিয়ার ফলে তোমার এ দশা ঘটিয়াছে? যখন পাপ করিয়াছিলে, তখন কি তোমার মনে কোন কথা উদয় হয় নাই? এখন লোকালয়ে মুখ দেখাইতে এত লজ্জা কেন? খোল, খোল, মুখের আবরণ খোল; দেখি,—কি হইয়াছে। চিরপাপী পাপ-পথে দণ্ডায়মান হইলে হিতাহিত জ্ঞান অণুমাত্রও তাহার অন্তরে

উদয় হয় না। যেন তেন প্রকারেণ পাপ-কূলে ডুবিতে পারিলেই সে এক প্রকার রক্ষা পায়,—কিন্তু পরক্ষণে অবশ্যই তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

পাঠক! লেখনীর গতি বড় চমৎকার! ষষ্ঠ প্রবাহে আপনাদিগকে কোথায় লইয়া গিয়াছি, আবার সপ্তম প্রবাহে কোথায় আনিয়াছি! সম্মুখে পবিত্র রওজা—পুণ্যভূমি মদিনার সেই রওজা। পবিত্র রওজার মধ্যে অন্য লোকের গমন নিষেধ, একথা আপনারা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। আর যাহার জন্য উপরে কয়েকটি কথা বলা হইল, সে আগন্তুককে কি করিতে দেখিতেছেন? সে পাপী পাপ-মোচনের জন্য এখন কি কি করিতেছে, —দেখিতেছেন? সে রওজার বহির্ভাগস্থ মৃত্তিকার ধূলি অবনতমুখে মস্তকে মর্দ্দন করিতেছে, আর বলিতেছে, "প্রভু রক্ষা কর। হে হাবিবে খোদা, আমায় রক্ষা কর। হে নূরনবী হজরত মোহাম্মদ! আমায় রক্ষা কর। তুমি ঈশ্বরের প্রিয় বন্ধু। তোমার নামের গুণে নরকাগ্নি নরদেহের নিকটে আসিতে পারে না। তোমার রওজার পবিত্র ধূলিতে শত শত জরাগ্রস্ত, মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নীরোগ হইয়া সুকান্তি লাভ করিতেছে, তাহাদের সাংঘাতিক বিষের বিষাক্ত গুণ হ্রাস পাইতেছে। সেই বিশ্বাসে এই নরাধম পাপী বহু কষ্টে পবিত্র ভূমি মদিনায় আসিয়াছে। যদিও আমি প্রভু হোসেনের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছি,—দয়াময়! হে দয়াময় জগদীশ! তোমার করুণা-বারি পাত্রভেদে নিপতিত হয় না। দয়াময়! তোমার নিকট সকলই সমান। জগদীশ! এই পবিত্র রওজার ধূলির মাহাত্ম্যে তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

ক্রমে এক দুই জন করিয়া জনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগন্তুকের আত্মগ্লানি ও মুক্তি-কামনার প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই সমুৎসুখ হইয়া, —কোথায় নিবাস, কোথা হইতে আগমন,—এই সকল প্রশ্ন তাহাকে করিতে লাগিল। অগন্তুক বলিল, "আমার দুর্দ্দশার কথা বলি। ভাই রে! আমি এমাম হোসেনের দাস। প্রভু যখন সপরিবারে কুফায় গমনের জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করেন, তখন আমিও তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। দৈব-নির্ব্বন্ধে কুফার পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় যাই।"

সকলে মহাব্যস্তে বলিল—"তার পর ? তার পর ??"

"তার পর কারবালায় যাইয়া দেখি যে, এজিদ-সৈন্য পূর্ব্বেই আসিয়া ফোরাত নদীকূল ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এক বিন্দু জল লাভের আর আশা নাই। আমার দেহ মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। সমুদয় বৃত্তান্ত আমি একটু সুস্থ না হইলে বলিতে পারিব না। আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম !"

মদিনাবাসীরা আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর কি হইল, বল ; জল না পাইয়া কি হইল ?"

"আর কি বলিব—রক্তারক্তি, 'মার মার,' 'কাট কাট' আরম্ভ হইল ; প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবলি তরবারি চলিল ; কারবালার মাঠে রক্তের স্রোত বহিতে বাগিল, মদিনার কেহই বাঁচিল না।"

"ইমাম হোসেন, ইমাম হোসেন ?"

"ইমাম হোসেন সীমার হস্তে শহীদ হইলেন।"

সমস্বরে আর্ত্তনাদ ও সজোরে বক্ষে করাঘাত হইতে লাগিল। মুখে "হায় হোসেন ! হায় হোসেন !" শব্দ নির্গত হইল।

কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমরা তখনই হজরতকে বারণ করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম মদিনা পরিত্যাগ করিবেন না। নূরনবী হজরত মোহাম্মদের পবিত্র রওজা পরিত্যাগ করিয়া কোনও স্থানে যাইবেন না।"

কেহ কেহ আর কোন কথা না শুনিয়া ইমাম-শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে পথ বাহিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ ঐ স্থানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর, যুদ্ধ অবসানের পর কি হইল ?"

"যুদ্ধের অবসানের পর কে কোথায় গেল, কে খুঁজিয়া দেখে ?" স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া উটে চড়াইয়া দামেস্কে লইয়া যাওয়া হইল। জয়নাল আবেদীন যুদ্ধে যান নাই, মারাও পড়েন নাই। আমি জঙ্গলে পলাইয়াছিলাম। যুদ্ধ শেষে ইমামের সন্ধান করিতে রণক্ষেত্রে, শেষে ফোরাত নদীর তীরে

গিয়া দেখি যে, এক বৃক্ষ-মূলে হোসেনের দেহ পড়িয়া আছে। কিন্তু মস্তক নাই! রক্তমাখা খঞ্জরখানিও ইমামের দেহের নিকট পড়িয়া আছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে, ইমামের পায়জামার বন্ধ মধ্যে বহুমূল্য একটি মুক্তা থাকিত। সেই মুক্তা-লোভে দেহের নিকট গিয়া যেমন বন্ধ খুলিতেছি অমনি ইমামের বামহস্ত আসিয়া সজোরে আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। আমি মহা ভীত হইলাম, সে হাত কিছুতেই ছাড়িল না। মুক্তা হরণ করা দূরে থাকুক, আমার প্রাণ লইয়াই টানাটানি! সাত পাঁচ ভাবিয়া নিকটস্থ খঞ্জর বাম হস্তে উঠাইয়া সেই পবিত্র হস্তে আঘাত করিতেই হাত ছাড়িয়া গেল। কিন্তু কর্ণে শুনিলাম,—"তুই অনুগত দাস হইয়া আপন প্রভুর সহিত এই ব্যবহার করিলি? সামান্য মুক্তা-লোভে ইমামের হস্তে আঘাত করিলি? তোর শাস্তি—তোর মুখ কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের মুখে পরিণত হউক, জগতেই নরকাগ্নির তাপে তোর অন্তর, মর্ম্ম, দেহ সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকুক।"

"এই আমার দুর্দ্দশা, এই আমার মুখের আকৃতি দেখুন। আমি আর বাঁচিব না, সমুদয় অঙ্গে যেন আগুন জ্বলিতেছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি যে, হজরতের রওজার ধূলি গায়ে মাখিলে মহারোগও আরোগ্য হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা সকলই কমিয়া জল হইয়া যায়। সেই ভরসাতেই মহাকষ্টে কারবালা হইতে এই পবিত্র রওজায় আসিয়াছি।"

মদিনাবাসিগণ এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই আর কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। সকলেই ইমাম-শোকে কাতর হইলেন। নগরের প্রধান প্রধান এবং রাজসিংহাসন সংস্রবী মহোদয়গণ সেই সময়ে নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া, কি কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য রওজার নিকটস্থ উপাসনা-মন্দির সম্মুখে মহাসভা আহ্বান করিয়া একত্রিত হইলেন।

কেহ বলিলেন, "এজিদকে বাঁধিয়া আনি।"

কেহ বলিলেন, "দামেস্ক-নগর ছারখার করিয়া দিই।"

বহু তর্ক-বিতর্কের পর শেষে সুস্থির হইল, "নায়ক-বিহনে সবাই প্রধান; এ অবস্থায় ইহার কোন প্রতিকারই হইবে না। সেই কারণে মদিনার

সিংহাসনে একজন উপযুক্ত লোককে বসাইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রবল তরঙ্গমধ্যে শিক্ষিত কর্ণধার বিহনে যেমন তরী রক্ষা করা কঠিন, রাষ্ট্র-বিপ্লবের মত মহা বিপদে একজন ক্ষমতাশালী অধিনায়ক না হইলে রাজ্য রক্ষা করাও সেইরূপ মহা কঠিন। স্ব স্ব প্রাধান্যে কোন কার্য্যেরই প্রতুল নাই।"

সমাগত দলমধ্যে এক জন বলিয়া উঠিলেন, "কাহার অধীনতা স্বীকার করিব? পথের লোক ধরিয়া কি মদিনার সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন? মদিনাবাসীরা কোন্ অপরিচিত নীচবংশীয় লোকের নিকট নতশিরে দণ্ডায়মান হইবে? প্রভু মোহাম্মদের বংশে ত এমন কেহই নাই যে, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিব।"

প্রথম বক্তা বলিলেনঃ "কোন চিন্তা নাই, মোহাম্মদ হানিফা এখনও বর্ত্তমান আছেন। হোসেনের পর তিনিই আমাদের পূজ্য, তিনিই রাজা! ইহার পর হোসেনের বৈমাত্র ভ্রাতাও অনেক আছেন। কারবালার এই লোমহর্ষণ ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা কি স্ব স্ব সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন? ইহার পর নূরনবী মোহাম্মদের ভক্ত রাজাও অনেক আছেন; এই সকল ঘটনা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারাই কি নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এজিদ ভাবিয়াছে কি? সে মনে করিয়াছে যে, হোসেন-বংশ নির্ব্বংশ করিয়াছে, সুতরাং এখন নিশ্চিন্তে থাকিবে! তাহা কখনই ঘটিবে না, চতুর্দ্দিক হইতে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে। আমরা এখনই উপযুক্ত একজন কাসেদকে হানুফা নগরে প্রেরণ করিব। আপাততঃ মোহাম্মদ হানিফাকে সিংহাসনে বসাইয়া, যদি জয়নাল আবেদীন প্রাণে বাঁচিয়া থাকেন, তবে তাঁহার উদ্ধারের উপায় করিব। সঙ্গে সঙ্গে এজিদের দর্প চূর্ণ করিতেও সকলে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব।"

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখনই হানুফা নগরে কাসেদ প্রেরিত হইল।

প্রথম বক্তা পুনরায় বলিলেন, "মোহাম্মদ হানিফা মদিনায় না আসা পর্য্যন্ত আমরা কিছুই করিব না। শোক-বস্ত্র যাহা এক্ষণে ধারণ করিয়াছি,

তাহাই রহিল। জয়নাল আবেদীনের উদ্ধার এবং এজিদের সমুচিত শাস্তি-বিধান না করিয়া আর এ শোক-সিন্ধুর প্রবল তরঙ্গের প্রতি কখনই দৃষ্টিপাত করিব না। আঘাত লাগুক, প্রতিঘাতে অন্তর ফাটিয়া যাউক, মুখে কিছুই বলিব না। কিন্তু সকলেই ঘরে ঘরে যুদ্ধ-সাজের আয়োজনে প্রবৃত্ত হও।"

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন। হোসেন-শোকে সকলেই অন্তরে কাতর; কিন্তু নিতান্ত উৎসাহে যুদ্ধসজ্জার আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। নগরবাসিগণের অঙ্গে, দ্বিতল—ত্রিতল গৃহদ্বারে এবং গবাক্ষে শোক-চিহ্ন! নগরের প্রান্তসীমায় শোকসূচক ঘোর নীল বর্ণ নিশান উড্ডীয়মান হইয়া জগৎকে কাঁদাইতে লাগিল।

এদিকে দামেস্কনগরে আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। এজিদের লক্ষাধিক সৈন্য সমর-সাজে সজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিল। হানিফার মদিনা-আক্রমণের পূর্ব্বেই সৈন্যগণ মদিনার প্রবেশ-পথে অবস্থিত হইয়া তাঁহার গমনে বাধা দিবে, ইহাই মারওয়ানের মন্ত্রণা। মোহাম্মদ হানিফা প্রথমে কারবালায় গমন করিবেন, তৎপরে মদিনায় না যাইয়া, মদিনাবাসীদের অভিমত না লইয়া, হজরতের রওজা পরিদর্শন না করিয়া কখনই দামেস্ক আক্রমণ করিবেন না—ইহাই মারওয়ানের অনুমান। সুতরাং মদিনার প্রবেশপথে সৈন্য সমবেত করিয়া রাখাই আবশ্যক এবং সে প্রবেশ-পথে হানিফার দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহার জীবন শেষ করাই যুক্তি-যুক্ত,—এই সিদ্ধান্তই নির্ভুল মনে করিয়া এজিদ মারওয়ানের অভিমতে মত দিলেন;—তাই আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল। ওত্‌বে অলীদ দামেস্ক হইতে আবার মদিনাভিমুখে সসৈন্যে চলিল। হানিফার প্রাণ-বিনাশ, কিম্বা তাঁহাকে বন্দী করিয়া দামেস্কে প্রেরণ না করা পর্য্যন্ত সে মদিনা আক্রমণ করিবে না—কারণ, মোহাম্মদ হানিফাকে পরাস্ত না করিয়া, মদিনার সিংহাসন লাভ করিলে, কোন লাভই নাই, বরং নানা বিঘ্ন, নানা আশঙ্কা। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ওত্‌বে অলীদ নির্ব্বিঘ্নে যাইতে থাক্, আমরা একবার হানিফার গম্যপথ দেখিয়া আসি।

অষ্টম প্রবাহ

কি চমৎকার দৃশ্য! মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বল্গা সজোরে টানিয়া অশ্ব-গতি রোধ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রীবা বক্র, দৃষ্টি পশ্চাতে—কারণ, সৈন্যগণ কতদূরে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। অশ্ব সম্মুখস্থ পদদ্বয় কিঞ্চিৎ বক্রভাবে উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান। এক পার্শ্বে মদিনার কাসেদ। হানিফার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ চন্দ্র এবং পূর্ণ তারকাসংযুক্ত নিশান হেলিয়া দুলিয়া ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল। গাজী রহ্‌মান উপস্থিত; তিনি দেখিলেন: প্রভুর চক্ষু সজল, মুখভাব মলিন,—নিকটে অপরিচিত কাসেদ, বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ! নিশ্চয়ই বিপদ! মহাবিপদ! বুঝি হোসেন আর ইহজগতে নাই !!

গাজী রহ্‌মান! আপনার সিদ্ধান্তই নিশ্চিত। মোহাম্মদ হানিফা ভ্রাতৃহারা, জ্ঞাতিহারা হইয়া এক্ষণে জ্ঞানহারা হইবার উপক্রম হইয়াছেন। তাঁহাকে রক্ষার উপায় দেখুন। ভ্রাতৃশোক মহাশোক!

মোহাম্মদ হানিফা গদ গদ স্বরে বলিলেন, "গাজী রহ্‌মান,! আর কারবালায় যাইতে হইল না, বিধির নির্ব্বন্ধে ভ্রাতৃবর হোসেন শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন! ইমাম বংশ সমূলে বিনাশ হইয়াছে। পরিজন মধ্যে যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন তাঁহারাও দামেস্ক নগরে এজিদের কারাগারে বন্দী—এইক্ষণে কি করি? আমার বিবেচনায় অগ্রে মদিনায় যাইয়া প্রভু মোহাম্মদের রওজা পরিদর্শন করি। পরে অন্য বিবেচনা।"

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, "এ অবস্থায় মদিনাবাসীদিগের মত গ্রহণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। রাজা বিহনে সেখানেও নানাপ্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে। ইমাম বংশে কেহই নাই—একথা যথার্থ হইলে পুণ্যভূমি মদিনা যে এতদিন এজিদের পদভরে দলিত হয় নাই—ইহাতেই বা বিশ্বাস কি? তবে অনিশ্চিত হইয়া অন্য চিন্তা নিরর্থক, মদিনাভিমুখে যাওয়াই এখন কর্ত্তব্য।"

পুনরায় মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতের লেখা খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। মদিনাভিমুখে গমনই যখন স্থির হইল, তখন বিশ্রামের কথা যেন কাহারও অন্তরে আর উদয় না হয়। সৈন্যগণসহ আমার পশ্চাদগামী হও।"

দিবারাত্রি গমন। বিশ্রামের কথা কাহারও মুখে নাই। এই প্রকারে কয়েক দিন অবিশ্রান্তভাবে গমন করিলে দ্বিতীয় কাসেদের সহিত মোহাম্মদ হানিফার দেখা হইল। দ্বিতীয় নিশান দেখিয়াই তিনি গমনে ক্ষান্ত দিলেন।

কাসেদ যথাবিধি অভিবাদন করিয়া জোড়করে বলিল,—"বাদশাহ্-নামদার! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা হউক। আমি মদিনার কাসেদ।"

মোহাম্মদ হানিফা বিশেষ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

"পূর্ব্বসংবাদ বাদশাহ্-নামদারের অবিদিত নাই। তৎপরে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আর আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি,—তৎসমুদয়ই বলিতেছি।"

"বাদশাহ্-নামদার! আপনার ভ্রাতৃবংশে পুরুষ-পক্ষে কেবলমাত্র এক জয়নাল আবেদীন জীবিত আছেন। তিনি, তাঁহার মাতা, ভগ্নী পিতৃব্য-পত্নী এখন দামেস্ক নগরে বন্দী। দিনান্তে এক টুকরা শুষ্করুটি, এক পাত্র জল ভিন্ন আর কোন প্রকার খাদ্যের মুখ দেখাও তাঁহাদের ভাগ্যে নাই। এজিদ এক্ষণে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন—সে কেবল আপনার সংবাদে। আপনার প্রাণ বিনাশ করাই এক্ষণে তাঁহার প্রথম কার্য্য। তিনি ওত্বে অলীদকে লক্ষাধিক সৈন্যসহ সাজাইয়া মদিনার সীমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। ওত্বে অলীদ মদিনা আক্রমণ না করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় মদিনার প্রবেশ-পথ রোধ করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত রহিয়াছে। অলীদ আপনার শিরশ্ছেদ করিয়া পরে মদিনার সিংহাসনে এজিদ-পক্ষ হইতে বসিবে,—ইহাই ঘোষণা করিয়াছে। এক্ষণে যাহা ভাল হয় করুন।"

মোহাম্মদ হানিফা এবার এক নূতন চিন্তায় নিপতিত হইলেন। সহজে

মদিনায় যাইবার আর সাধ্য নাই—প্রথমে যুদ্ধ, পরে প্রবেশ, তার পর মদিনাবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ!

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, "তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য। যেখানে বাধা সেই-খানেই সমর, এ ত বিষম ব্যাপার! অলীদ চতুরতা করিয়া এমন কোন স্থানে যদি শিবির নির্ম্মাণ করিয়া থাকে যে, সম্মুখে সুপ্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র নাই, শিবির নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান নাই, জলের সুযোগ নাই, সৈনিক-দিগের দৈনিক ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত প্রাঙ্গন নাই, তবে ত মহাবিপদ! তাই অগ্রেই গুপ্তচর, চিত্রকর এবং কুঠারধারিগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে।"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "আমার মতি স্থির নাই, যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর। তবে এইমাত্র কথা যে, বিপদে, সম্পদে, শোকে, দুঃখে সর্ব্বদা সকল সময়ে যিনি ভগবান—তাঁহারই নাম করিয়া চলিতে থাক। যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে। আর এখান হইতে আমার আর আর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ যাঁহারা যেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে ইমামের অবস্থা, ইমাম পরিবারের অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিয়া কাসেদ পাঠাও। একথাও লিখিয়া দাও যে, পদাতিক; অশ্বারোহী প্রভৃতি যত প্রকার যোদ্ধা যাঁহার অধীনে যত আছে, তাহাদের আহার সংগ্রহ করিয়া মদিনা-প্রান্তরে আসিয়া আমার সঙ্গে তাঁহারা যোগদান করুন। ইরাক নগরে মস্‌হাব-কাক্কা, আঞ্জাম নগরে ইব্রাহিম ওয়াদি, তোগান রাজ্যে আলিওয়দের নিকটে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া কাসেদ প্রেরণ কর। আর আর মুসলমান রাজা যিনি যে প্রদেশে, যে নগরে রাজ্য বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহাদের নিকটেও এই সমাচার লিখিয়া কাসেদ প্রেরণ কর। শেষে এই কয়েকটি কথা লিখিওঃ "ভ্রাতৃগণ! যদি জাতীয় ধর্ম্ম-রক্ষার বাসনা থাকে, জগতে মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের স্থায়িত্ব রাখিতে ইচ্ছা থাকে, কাফেরের রক্তে ইসলাম-অস্ত্র রঞ্জিত করিতে ইচ্ছা থাকে, আর প্রভু মোহাম্মদের প্রতি যদি অটল ভক্তি থাকে, তবে এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র আপন আপন সৈন্যসহ মদিনাপ্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হউন। প্রভু-পরিবারের প্রতি যে দৌরাত্ম্য হইতেছে, সে বিষয় আলোচনা করিয়া

এখন কেহ দুঃখিত হইবেন না। এখন ধর্ম্মরক্ষা, মদিনার সিংহাসন রক্ষা, এজিদের বধ, হোসেন-পরিজনের উদ্ধার,—এই সকল কথাই যেন জপমালার মন্ত্র হয়। এইক্ষণে কেহ চক্ষের জল ফেলিবেন না। কাঁদিবার দিনে সকলে একত্র হইয়া কাঁদিব। শুধু আমরা কয়েকজনেই যে কাঁদিব, তাহা নহে; জগৎ কাঁদিবে। এ জগৎ চিরদিন কাঁদিবে। স্বর্গীয় দূত এস্‌রাফিল জীবের জীবন-লীলা শেষ করিতে যে দিন ঘোর নাদে শিঙ্গা বাজাইয়া জগৎ সংহার করিবেন, সে দিন পর্য্যন্ত জগৎ কাঁদিবে। দুঃখ করিবার দিন ধরা রহিল; এখন অস্ত্র ধরুন, শত্রু বিনাশ করুন—মোহাম্মদীয় দিন, ঐ শিঙ্গাবাদন দিন পর্য্যন্ত অক্ষয়রূপে স্থায়িত্বের উপায় বিধান করুন। আবদুর রহ্‌মান্! এ সকল কথা লিখিতে কখনও ভুলিও না।”

গাজী রহ্‌মান প্রভুর আদেশ মত “শাহীনামা” পত্র, যাহা যাহার নিকট উপযুক্ত, তখনই লিখাইতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিল। মন্ত্রীপ্রবর রাজাদেশে সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান অধ্যক্ষ-গণকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাসেদসকল প্রেরিত হইল। সকলে আবার গমনে অগ্রসর হইলেন। এক দিন প্রেরিত গুপ্তচর ও সন্ধানী লোকদিগের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইয়া পুনরায় তাঁহারা যাইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থান অতি নিকট; উৎসাহে গমনবেগ বৃদ্ধি করা হইল।

নবম প্রবাহ

ওত্‌বে অলীদ সৈন্যগণসহ মদিনা-প্রবেশপথের প্রান্তরে হানিফার অপেক্ষায় রহিয়াছ। একদা সায়াহ্নকালে একজন অনুচরসহ নিকটস্থ শৈলশিখরে বায়ু-সেবন আশায় সজ্জিত বেশে সে বহির্গত হইল। পাঠক! যেখানে মায়মুনার সহিত মারওয়ান নিশীথ সময়ে কথা কহিয়াছিল—এই-ই সেই পর্ব্বত। হোসেনের তরবারির চাক্‌চিক্য দেখিয়া যে পর্ব্বতের

গুহায় অলীদ লুকাইয়াছিল, এ সেই পর্ব্বত। শৈলশিখরে বিহার করিবে, প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিবে,—এই আশাতেই এখানে অলীদের আগমন। আশার অভ্যন্তরে যে, একটু স্বার্থ না আছে, তাহাও নহে। স্বাভাবিক দৃষ্টির বহির্ভূত যদি কোন ঘটনা ঘটিবার লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার জন্য দূরদর্শন যন্ত্রও অলীদ সঙ্গে আনিয়াছে। সমতলক্ষেত্রে অশ্বতরসকল রাখিয়া কয়েকজন অনুচরসহ সে পর্ব্বতে আরোহণ করিল। প্রথমে মদিনা নগরের দিকে যন্ত্রের সাহায্যে নীরিক্ষণ করিয়া দেখিল—নীল পতাকাসকল উচ্চ মঞ্চে উড়িয়া হোসেনের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিতেছে; অন্য দিকে দেখিল,—খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখাসকল বাত্যাঘাতে উন্মত্ত ভাব ধারণ করিয়া হোসেনের শোকে মহাশোক প্রকাশ করিতেছে। তাহার পর সম্মুখ দিকে নীরিক্ষণ করিতেই তাহার হস্ত কাঁপিয়া গেল। সে যন্ত্রটি সুবিধা মত ধরিয়া দেখিল, কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। আবার বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিল, সন্দেহ ঘুচিয়া নিশ্চিন্ত সাব্যস্ত হইল। এখন কথা,—এ কাহার সৈন্য? এমন সুসাজে সুসজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে আসিতেছে,—এ সৈন্যশ্রেণী কাহার? তুরঙ্গগুলি গায়ে গায়ে মিশিয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে; অশ্বারোহীদের অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিবারই কি পরিপক্কতা, অস্ত্র ধরিবারই বা কি পারিপাট্য! বেশভূষা, কান্তি, গঠন অতি চমৎকার, মনোহর এবং নয়ন তৃপ্তিকর! ইহারা কে?—শত্রু না মিত্র? আবার দূর-দর্শন যন্ত্রে চক্ষু দিয়া সঙ্গীগণকে অলীদ বলিল, "তোমরা একজন শীঘ্র শিবিরে যাইয়া শ্রেণী-বিভাগের অধ্যক্ষগণকে সংবাদ দাও যে, অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারকাসংযুক্ত পতকা গগনে দেখা গিয়াছে, প্রস্তুত হও।"

আজ্ঞামাত্র তাহার একজন সহচর দ্রুতগতি তুরঙ্গপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

অলীদ আবার দূর-দর্শন যন্ত্রে মনোনিবেশ করিল। আগন্তুক সৈন্যগণ আর অগ্রগামী হইতেছে না,—শ্রেণীবদ্ধভাবে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। অলীদ আরও দেখিল যে, একজন আরোহী দ্রুতবেগে

চলিয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তূণীর হইতে তীর বাহির করিয়া সে ধনুকে টঙ্কার দিল। অশ্বারোহীর প্রতি লক্ষ্য করিতেই দেখিল, সে জাতীয় চিহ্নযুক্ত শুভ্র নিশান উড়াইয়া সংবাদবাহীর পরিচয় দিতে দিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। অলীদ সামরিক বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া দূতবরের বক্ষ লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিবে, কি উত্তোলিত হস্ত ধনুর্ব্বাণসহ সঙ্কুচিত করিবে, এই চিন্তা করিতে করিতেই দূতবর পর্ব্বত-পার্শ্ব হইতে চক্ষের নিমিষে তাহার শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। অলীদ চক্ষু ফিরাইয়া কেবল ধাবিত অশ্বের পুচ্ছসঞ্চালন আর নিশানের অগ্রভাগ মাত্র দেখিল।

কি করিবে! অলীদ এখনও কিছু সাব্যস্ত করিতে পারে নাই। পরিশেষে তাহার হিংসাপূর্ণ হৃদয় স্থির করিল যে, যে কোন কৌশলেই হউক, মোহাম্মদীয়-গণকে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। নিশ্চয়ই মোহাম্মদ হানিফা মদিনায় আসিতেছেন। হানিফার দূতকে গুপ্তভাবে বধ করিলে কে জানিবে? কে জানিবে যে, এ কার্য্য একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে? যে শুনিবে, সেই-ই বলিবে, কোন দস্যু কর্ত্তৃক এরূপ বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া অলীদ পুনরায় আপন আয়ত্তমত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিল। মনে মনে বলিল, "পুনঃ এই পথে আসিলেই একবার দেখিব!" কিন্তু এই বলিতেই বলিতেই তাহার কর্ণে দ্রুতগতি অশ্ব-পদ-প্রতিশব্দ প্রবেশ করিল। চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল,—সেই নিশান, সেই দূত। দূতবরের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিবে,—অলীদের এই উদ্যোগেই দূতবর তাহার লক্ষ্য ছাড়াইয়া বহুদূর সরিয়া পড়িলেন, অলীদের হাতের তীর হাতেই রহিয়া গেল। সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল—দূতবর আগন্তুক সৈন্যমধ্যে যাইয়া মিশিলেন। ওত্‌বে অলীদ পর্ব্বত-বিহার পরিত্যাগ করিয়া সহচরগণসহ শিবিরে আসিবার জন্য শিখর হইতে অবরোহণ করিল।

মোহাম্মদ হানিফার প্রেরিত দূত অলীদ-শিবিরে অল্প সময় মধ্যে যাহা যাহা জানিয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় মোহাম্মদ হানিফার গোচর করিয়া বলিল, "বিনা যুদ্ধে মদিনায় যাওয়ার সাধ্য নাই। সৈন্যগণ বীরসাজে সজ্জিত—প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ওত্‌বে অলীদ মহোদয় এক্ষণে শিবিরে নাই।"

এই সকল কথা হইতেছে, এমন সময় বিপক্ষ দূত শিবির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। মোহাম্মদ হানিফার আজ্ঞায় বিপক্ষ-দূত সমাদরে আহূত হইয়া শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশেষ সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া দূতবর বলিলেন, "বাদশাহ্-নামদার! মহারাজ এজিদের আজ্ঞা এই যে, সংস্রবশূন্য নগরে প্রবেশ করিতে, বিশেষতঃ সৈন্যসামন্তসহ পর-রাজ্যে আসিতে স্থানীয় রাজার অনুমতি আবশ্যক। আপনি সে অনুমতি গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং আর অগ্রসর হইবেন না। আর একপদ ভূমি অগ্রসর হইলেই রাজপ্রতিনিধি মহাবীর অলীদ আপনার গমনে বাধা দিতে সৈন্যসহ অগ্রসর হইবেন। আর আপনি যদি হোসেন পরিবারের সাহায্যের জন্য আসিয়া থাকেন, তবে নূন্যতা স্বীকার পূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রার্থনা করিলেও যাইতে পারিবেন না, আপনাকে বন্দীভাবে দামেস্কে যাইতে হইবে।"

দূতবর নিজ প্রভুর আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া নতশিরে পুনরায় অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে গাজী রহ্‌মান বলিতে লাগিলেন,—"দূতবর! তোমাদের রাজ-প্রতিনিধি বীরবর অলীদ মহোদয়কে গিয়া বল, নিজের রাজ্যে প্রবেশ করিতে কেহ কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করে না; হোসেনের পরিজনকে কারাগার হইতে উদ্ধার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং হাসান-হোসেনের প্রতি যিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে আমরা কখনই ভুলিব না। পৈতৃক দামেস্ক-রাজ্য, মারিয়ার পুত্র এজিদ যাহা নিজ রাজ্য বলিয়া দামেস্ক-সিংহাসনের অবমাননা করিয়াছে, তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিব। মদিনায় প্রবেশ করিয়া আমাদের গতি ক্ষান্ত হইবে না। অলীদের লক্ষাধিক সৈন্যশোণিতে আমাদের চিরপিপাসু তরবারির শোণিত-পিপাসা মিটিবে না! এজিদের এক একটি সৈন্য-শরীর শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেও আমাদের তরবারির তেজ কমিবে না, ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না। বন্দীভাবে আমাদিগকে দামেস্কে পাঠাইতে হইবে না—এই সজ্জিত বেশে, এই বীরবেশে, বিজয় নিশান উড়াইয়া রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় শত্রুবধ করিতে

করিতে আমরা দামেস্ক-নগরে প্রবেশ করিব। আমাদের বিশ্রাম-বিরাম-ক্লান্তি—কিছুই নাই। এখনই মদিনায় প্রবেশ করিব। তুমি শিবিরে যাইতে না যাইতেই দেখিবে—যুদ্ধনিশান উড়িতেছে, আমরাও শিবিরের নিকটবর্ত্তী।”

দূতবর নতশিরে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার শিবির হইতে বহির্গত হওয়ামাত্রই সুনীল আকাশে মোহাম্মদ হানিফার পক্ষে লোহিত ধ্বজা উড়িতে লাগিল। ঘোররবে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কাড়া-নাকাড়া ও ডঙ্কা-ঝাঁঝরী শারদীয় ঘনঘটাকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিক আলোড়িত করিয়া তুলিল। তুরঙ্গসকল কর্ণ উচ্চ করিয়া পুচ্ছগুচ্ছ স্বাভাবিক ঈষৎ বক্রভঙ্গিতে হ্রেষারবে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। পদাতিক সৈন্যরাও বীরদর্পে পদক্ষেপন করিতে লাগিল। বহু দূর ব্যপিয়া তাহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক, পরিজনের কারারোধ-বেদনা বা জয়নালের উদ্ধার-চিন্তার নাম এখন নাই। এখন একমাত্র চিন্তা—মদিনা-প্রবেশ ও হজরত নূরনবী মোহাম্মদের রওজা “জিয়ারত” (ভক্তি দর্শন)। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয়, তিনি নিশ্চিন্তভাবে সৈন্যশ্রেণীকে উৎসাহের দৃষ্টান্ত, সাহসের আদর্শ, বীরজীবনের উপমা দর্শন করাইয়া মহানন্দে অশ্ব চালাইয়া যাইতেছেন। এজিদপক্ষেও সমর-প্রাঙ্গন সীমায় নির্দ্দিষ্ট লোহিত নিশান নীলাকাশে দেখা দিয়াছে। সৈন্যশ্রেণী সপ্তশ্রেণীতে পঞ্চ প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে।—কোন ব্যূহ চতুষ্কোণে স্থাপিত, কোন ব্যূহ পশুপক্ষীর শরীরের আদর্শে গঠিত। আক্রমণ এবং বাধা উভয়ভাবেই অটল!

গাজী রহমান বলিলেন,—“অলীদ যে প্রকারে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া আক্রমণ ও বাধা দিতে দণ্ডায়মান, এ সময় একটু বিবেচনার আবশ্যক হইতেছে। আমাদের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা বিপক্ষসৈন্য অধিক—তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মুখ-যুদ্ধে আমাদের আম্বাজী সৈন্যগণ সুদক্ষ। এত অধিক বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ব্যূহ ভেদ করিলেও আমাদের বিস্তর সৈন্যক্ষয় হইবে। কিছুক্ষণের জন্য শত্রুদিগকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করাই

যুক্তিসঙ্গত। যদি অলীদের আর সৈন্য না থাকে, তবে অবশ্যই তাহাকে তাহার রচিত ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধার্থে সৈন্য পাঠাইতে হইবে। একজন আম্বাজী সৈন্য যদি দশ জন কাফেরকে নরকে প্রেরণ করিয়া শহীদ হয়, সে-ও সৌভাগ্য !"

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহ্‌মানের বাক্যে অশ্ব-গতি রোধ করিলেন। ক্রমে সৈন্যগণও প্রভুকে গমনে ক্ষান্ত দেখিয়া দণ্ডায়মান রহিল।

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, "কে দ্বৈরথ-যুদ্ধপ্রিয় ? কার অস্ত্র আগে শত্রুর শোণিতপানে সমুৎসুক ?"

অশ্বারোহী সৈন্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি অগ্রে যাইব।" মোহাম্মদ হানিফা সকলকে ধন্যবাদ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন, "প্রথম যুদ্ধ জাফরের !"

জাফর প্রভুর আদেশে নিষ্কোষিত অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আহ্বানের শব্দ অলীদশিবিরে প্রবেশমাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে বায়ুবেগে বিপক্ষদল হইতে একজন সৈন্য আসিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে ! মদিনা-প্রবেশের আশা এই পরিশুষ্ক বালুকারাশিতে বিসর্জ্জন দিয়া পলায়ন কর্। ওরে ! কি সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্ ? হাসান, হোসেন, কাসেম যখন আমাদের হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তোরা কোন্ সাহসে তরবারি ধরিয়াছিস্ ? তোদের সৌভাগ্য-সূর্য্য কারবালার প্রান্তরে লোহিত বসন পরিয়া ইহকালের জন্য একেবারে অস্তমিত হইয়াছে। এখন তোদের অঙ্গে নীল বসনই শোভা পায় ; আর্ত্তনাদ এবং বক্ষে করাঘাত করাই তোদের এখনকার কর্ত্তব্য ; রণভেরী বাজাইয়া আবার কি সাধে তরবারি ধরিয়াছিস্ ? দুঃখসময়ে লোকে যে বুদ্ধিহারা হইয়া আত্মহারা হয় তাহার দৃষ্টান্ত আজ তোরাই দেখাইলি, জগৎ হাসাইলি ! পিপীলিকার পালক যে জন্য উঠিয়া থাকে, তাহাই তোদের ভাগ্যে আছে। আর অধিক কি ?"

আম্বাজী বীর বলিলেন, "কথার উত্তর-প্রত্যুত্তরের সময় আমাদের এখন নাই ; সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যমদূত অস্থির হইতেছেন ; আমার হস্তস্থিত অস্ত্রের প্রতি চাহিয়া আছেন।"

"যমদূত কোথায় রে বর্ব্বর?—দেখ্ যমদূত কে?— এই বলিয়াই অসির আঘাত! আঘাতে আঘাত উড়িয়া গেল। এজিদ-সৈন্য লজ্জায় মহালজ্জিত হইল। অশ্ব ফিরাইয়া পুনরায় আঘাত করিবার ইচ্ছায় যেমনি সে তরবারি উত্তোলন করিয়াছে, অমনি তাহার বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া জাফরের সুতীক্ষ্ণ অসি চঞ্চল চপলা সদৃশ চাকচিক্য দেখাইয়া চলিয়া গেল। অলীদ জাফরের তরবারির হাত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এদিকে দ্বিতীয় যোদ্ধা সমরে আগত। সে আর টিকিল না,—যে তেজে আগত, সেই তেজেই খণ্ডিত। তৃতীয় সৈন্য উপস্থিত—সে আর তরবারি ধরিল না,—বর্শা ঘুরাইয়া জাফরের প্রতি নিক্ষেপ করিল। জাফর সে আঘাত বর্ম্মে উড়াইয়া পদাঘাতে বিপক্ষকে অশ্ব হইতে মৃত্তিকায় ফেলিয়া বর্শার দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। চতুর্থ বীর গদাহস্তে আসিয়া জাফরকে বলিল, "কেবল তরবারি-খেলা আর বর্শা ভাঁজাই শিখিয়াছ, বল ত, ইহাকে কি বলে?" গদা বজ্রবৎ জাফরের মস্তকে পড়িল। জাফর বাম হস্তে বর্ম্ম ধরিয়া গদার আঘাত উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোষে তাঁহার চক্ষু ঘোর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। তিনি মহাক্রোধে তরবারি আঘাত করিয়া বলিলেন, "যা কাফের! তোর গদা লইয়া নরকে যা।" উভয় দলের লোকই দেখিল যে, গদাধারী যোদ্ধার শরীর দ্বিখণ্ডিত হইয়া অশ্বের দুই দিকে পড়িয়া গেল।

ক্রমে দামেস্কের সত্তর জন সেনাকে একা জাফর শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। এখনও ব্যূহ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। কিন্তু আর কেহই দ্বৈরথযুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে না। জাফর চক্রাকারে অশ্ব চলাইতেছেন,—অশ্ব গলদঘর্ম্ম হইয়া ঘন ঘন শ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে।

ওতবে অলীদ মহাক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "একটি লোক সত্তর জনের প্রাণ বিনাশ করিল, আর তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না! দ্বৈরথযুদ্ধ তোমাদের কার্য্য নহে! শত্রুপক্ষের প্রথম ব্যূহের সমুদয় সৈন্যের মস্তক আনয়ন কর।"

আজ্ঞামাত্র জাফরকে সৈন্যদল ঘিরিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ হানিফার আশাও পূর্ণ হইল; গাজী রহমানকে তিনি বলিলেন,—"এই-ই সময়—এই-ই

উপযুক্ত সময় !" সিংহগর্জ্জনে মোহাম্মদ হানিফা আসিয়া জাফরের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, অশ্বের দাপটে দামেস্ক-সৈন্যগণ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

অলীদ দেখিল, মোহাম্মদ হানিফা স্বয়ং জাফরের পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয় ব্যূহ ভগ্ন করিতে আদেশ করিয়া সে বলিল, "উভয়কে ঘিরিয়া কেবল তীর নিক্ষেপ কর। তরবারির আয়ত্তের মধ্যে কেহই যাইও না।"

আজ হানিফার মনের সাধ পূর্ণ হইল। ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত শোক-চিহ্ন তিনি বিপক্ষ শোণিতে শীতল করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়া কি করিবে? তরবারির আঘাতে, দুল্‌দুলের * পদাঘাতে, জাফরের বর্শায় দামেস্ক-সৈন্য তৃণবৎ উড়িয়া যাইতে লাগিল,—মরুভূমিতে রক্তের স্রোত বহিল। জগৎ-লোচন রবি সেই রক্তস্রোতের প্রতিবিম্বে আরক্তিম দেহে পশ্চিম গগনে লুক্কায়িত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা এবং জাফর শত্রু-বিনাশে বিরত হইয়া বেষ্টনকারী সৈন্যের এক পার্শ্ব হইতে কয়েকজনকে লোহিত বসন পরাইয়া সেই পথে নিজেদের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য হানিফার সম্মুখে দাঁড়ায়? কত তীর, কত বর্শা, মোহাম্মদ হানিফার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

ওত্‌বে অলীদ প্রথম যুদ্ধ-বিবরণ, হানিফার বাহুবলের পরিচয়, তাঁহার তরবারি চালনার ক্ষমতা, বিস্তারিতরূপে লিখিয়া দামেস্ক নগরে এজিদের নিকট কাসেদ প্রেরণ করিল।

দশম প্রবাহ

বিশ্রামদায়িনী নিশার দ্বিযাম অতীত! অনেকেই নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। এ সময় কিন্তু আশা, নিরাশা, প্রেম, হিংসা, শোক, বিয়োগ, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, বিকার এবং অভিমানযুক্ত হৃদয়ের বড়ই কঠিন সময়। সে হৃদয়ে শান্তি নাই—সে চক্ষে নিদ্রা নাই। ঐ এজিদের মন্ত্রণাগৃহে দীপ

---

* হানিফার অশ্বের নাম

জ্বলিতেছে, প্রাঙ্গণে, দ্বারে, শাণিত কৃপাণহস্তে প্রহরী দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; গৃহাভ্যন্তরে মন্ত্রদাতা মারওয়ানসহ এজিদ জাগরিত, সন্ধানী গুপ্তচর সম্মুখে উপস্থিত।

মারওয়ান আগন্তুক গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাইতে দেখিলে ? আর সন্ধানেই বা কি জানিতে পারিলে ?"

"আমি বিশেষ সন্ধানে জানিয়াছি, তাহারা হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছে।"

"মোহাম্মদ হানিফা যে মদিনায় গিয়াছে, একথা তোমাকে কে বলিল ?"

"তাঁহাদের মুখেই শুনিলাম। মোহাম্মদ হানিফা প্রথমতঃ কারবালাভিমুখে যাত্রা করেন, পরে কি কারণে কারবালায় না যাইয়া মদিনায় গিয়াছেন,—সে কথা অপ্রকাশ রহিয়াছে।"

"তবে কি যুদ্ধ বাধিয়াছে.?"

"যুদ্ধ না বাধিলে সাহায্য কিসের ?"

"আচ্ছা, কত পরিমাণ সৈন্য ?"

"অনুমানে নিশ্চিত করিতে পারি নাই ; তবে তুরস্ক ও তোগান প্রদেশেরই বিস্তর সৈন্য। এই দুই রাজ্যের ভূপতিদ্বয়ও আছেন।"

এজিদ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ওতবে অলীদ কি করিতেছে ? ভিন্ন দেশ হইতে হানিফার সাহায্যে সৈন্য যাইতেছে, সৈন্য-সামন্তের আহারীয় পর্য্যন্ত যাইতেছে, ইহার কি কোন সংবাদ অলীদ প্রাপ্ত হয় নাই ? মোহাম্মদ হানিফা স্বয়ং মহাবীর, তাহার উপরও এত সাহায্য! শেষ যাহাই হউক, ঐ সকল সৈন্য যাহাতে মদিনায় যাইতে না পারে তাহার উপায় করিতে হইবে। ঐ সকল সৈন্য ও আহারীয় সামগ্রী যদি মদিনায় না যায়, তাহা হইলেও অনেক লাভ। এমন কোন বীরপুরুষই কি দামেস্ক-রাজধানীতে নাই যে, উপযুক্ত সৈন্য লইয়া এই রাত্রেই উহাদিগকে আক্রমণ করে, আর না হয় উহাদের গমনে বাধা দেয় ?"

সীমার করজোড়ে বলিল, "বাদশাহ্-নামদার! চির আজ্ঞাবহ দাস উপস্থিত, কেবল আজ্ঞার অপেক্ষা। যে হস্তে হোসেন-শির কারবালা-প্রান্তর

হইতে দামেস্কে আনিয়াছি, সেই-ই হস্তে তোগানের ভূপতি ও তুরস্কের সম্রাটকে পরাস্ত করা কতক্ষণের কার্য্য ?"

এজিদের চিন্তিত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, মলিন মুখে ঈষৎ হাসির আভা প্রকাশ পাইল। তখনই সৈন্য-শ্রেণীর অধিনায়ককে তিনি সীমারের আজ্ঞাধীন করিয়া দিলেন।

সীমার হানিফার সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সৈন্য লইয়া গুপ্তচরসহ ঐ নিশীথ সময়েই যাত্রা করিল।

এজিদ বলিলেন, "মারওয়ান ! মোহাম্মদ হানিফা একাদিক্রমে শত বর্ষ যুদ্ধ করিলেও আমার সৈন্যবল ক্ষয় করিতে পারিবে না। যে পরিমাণ সৈন্য নগর হইতে বাহির হইবে, তাহার দ্বিগুণ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পূর্ব্বেই আদেশ করিয়াছি। ওদিকে যুদ্ধ হউক, এদিকে আমরা জয়নাল আবেদীনকে শেষ করিয়া ফেলি। জয়নাল আবেদীনের মৃত্যু ঘোষিত হইলে হানিফা কখনই দামেস্কে আসিবে না। কারণ, জয়নাল-উদ্ধারই হানিফার কর্ত্তব্য কার্য্য, সেই জয়নালই যদি জীবিত না থাকিল, তবে হানিফার যুদ্ধ বৃথা। দ্বিতীয় কথা, হানিফার বন্দীদশা অথবা মৃত্যু আমাদের পক্ষে উভয়ই মঙ্গল। কিন্তু যদি জয়নাল জীবিত থাকে, আর হানিফাও জয়লাভ করে, তাহা হইলে মহা সঙ্কট ও বিপদ ! এ অবস্থায় আর জয়নালকে রাখা উচিত নহে। আজ রাত্রেই হউক, কি কাল প্রত্যুষেই হউক, জয়নালের শিরশ্ছেদ করিতেই হইবে।"

—"আমি ইহাতে অসম্মত নহি, কিন্তু ওত্বে অলীদের কোন সংবাদ না পাইয়া জয়নাল-বধে অগ্রসর হওয়া ভাল কি মন্দ তাহা আজ আমি স্থির করিতে পারিলাম না। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়া দামেস্ক-সিংহাসনের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক কিছু কিছু কর যোগাইলে দামেস্ক-রাজ্যের যত গৌরব, হোসেন-বংশ একেবারে শেষ করিয়া একচ্ছত্ররূপে মক্কা মদিনার রাজত্ব করিলেও কখন তত গৌরব হইবে না।"

—"সে কথা যথার্থ, কিন্তু তাহাতে সন্দেহ অনেক। কারণ, জয়নাল প্রাণরক্ষার জন্য আপাততঃ আমার অধীনতা স্বীকার করিলেও করিতে পারে, কিন্তু সে যে বংশের সন্তান, তাহাতে কালে তাহার পিতা, পিতৃব্য এবং

ভ্রাতৃগণের দাদ উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আমার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধঘোষণা করিবে না, ইহা আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।”

—“যাহা হউক, মহারাজ! জয়নাল-বধ বিশেষ বিবেচনা-সাক্ষেপ, আগামী কল্য প্রাতে যাহা হয় করিব।”

একাদশ প্রবাহ

এজিদের গুপ্তচরের অনুসন্ধান যথার্থ। তোগান ও তুরস্কের ভূপতিদ্বয় সসৈন্যে মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনাভিমুখে যাইতেছেন এবং দিনমণি অস্তাচলে গমন করায় তাঁহারা গমনে ক্ষান্ত দিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছেন। প্রহরিগণ ধনুহস্তে শিবির রক্ষার্থে দণ্ডায়মান। শিবিরের চতুর্দ্দিকে আলোক-মালা সজ্জিত। ভূপতিগণ স্ব স্ব নিরূপিত স্থানে অবস্থিত। শিবির-মধ্যে বিশ্রাম, আয়োজন, রন্ধন, কথোপকথন, স্বদেশ-বিদেশের প্রভেদ, জলবায়ুর গুণাগুণ, দ্রব্যাদির মূল্য এবং আচার-ব্যবহারের আলোচনা ইত্যাদি নানা প্রকার কথা ও আলাপের স্রোত চলিতেছে।

ওদিকে সীমার সসৈন্যে মহাবেগে আসিতেছে। সীমারের মনে আশা অনেক। সে হোসেনের মস্তক দামেস্কে আনিয়া পুরস্কার পাইয়াছে, আবার এই বৃহৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বিশের পুরস্কার লাভ করিবে। ক্রমে মানমর্য্যাদা বৃদ্ধির সহিত পদবৃদ্ধির নিতান্তই সম্ভাবনা। যদি বিপক্ষদলের সহিত দেখা হয়, তবে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিবে, কি নিশাচর নরপিশাচের ন্যায় গুপ্তভাবে আক্রমণ করিবে, এ চিন্তাও তাহার অন্তরে উদয় হইতেছে। সীমার কি করিবে? আজ মহারাজ এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচয়ে দণ্ডায়মান হইবে, কি দস্যুনামে জগৎ কাঁপাইবে, এ পর্য্যন্ত তাহা মীমাংসা করিতে পারে নাই। যাইতে যাইতে আগন্তুক রাজগণের শিবির, বর্হিদ্বারস্থ আলোকমালা—সীমার দেখিতে পাইল: স্থায়ী গৃহ নহে, চিরস্থায়ী রাজপুরী নহে,—নিশাপযোগী বস্ত্রাবাস মাত্র। তাহারই সম্মুখস্থ আলোকমালার পারিপাট্য দেখিয়া সীমার আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার নয়নের তৃপ্তি বোধ হইতে

লাগিল। শিবিরের চতুষ্পার্শ্বেই প্রহরী—তাহাদের হস্তে তীরধনু। বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রহরীরা আপন আপন কার্য্য করিতেছে। সাবধানের মার নাই! সীমারের পথপ্রদর্শক গুপ্তচরদিগের হস্তস্থিত দীপশিখা শিবিররক্ষীদের চক্ষে পড়িবামাত্র তাহারা পরস্পর যেন কোন্ এক কথা বলিয়া শরাসনে বাণ যোজনা করিল। সীমারদলের দক্ষিণ ও বাম-পার্শ্ব দিয়া সমযোগে দুইটি শব্দ বজ্রশব্দে চলিয়া গেল। পাষাণ-হৃদয় সীমারের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমেই সুতীক্ষ্ণ বাণ উপর্য্যুপরি সীমার-সৈন্যমধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। শিবির মধ্যে সংবাদ রটিয়া গেল যে, দস্যুদল অগ্নি জ্বালিয়া শিবির লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে,—তাহাদের যে প্রকার গতি দেখা যাইতেছে, তাহারা যেন অল্প সময় মধ্যে শিবির আক্রমণ করিবে! সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা প্রজ্জ্বলিত আলোকাভায় অস্ত্রের চাক-চিক্য, অশ্বের অবয়ব, সৈন্যের সজ্জিত বেশ,—সকলই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তমোময়ী নিশার প্রতিবন্ধকতায় নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিতে পারিলেন না —দস্যু কি রাজসৈন্য। গুপ্তসন্ধানীরাও সন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।—মহা সঙ্কট! সীমারের দুইটি চিন্তার একটি নিষ্ফল হইল। দস্যুভাবে আক্রমণ করিতে আর তাহার সাহস হইল না। প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করিবে স্থির করিয়া সীমার রণবাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল।

আর সন্দেহ কি? একজন আগন্তুক-সৈন্যদলের মধ্যে জনৈক দূত পাঠাইয়া সংবাদ-সংগ্রহের অভিমত প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কাহারও কাহারও অমত হইল। তাঁহারা বলিলেন, "এই দল প্রথমে দস্যুভাবে, শেষে প্রকাশ্যে রণবাদ্য বাজাইয়া আসিয়াছে, ইহাদিগকে বিশ্বাস নাই। সমর-পদ্ধতির চির-প্রচলিত বিধি, এই আগন্তুক শত্রুর নিকট আশা করা যাইতে পারে না। এই দলের অধিনায়ক খ্যাতনামা বীর হইলেও এইক্ষণে তিনি নিতান্ত নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, অতএব কখনই উহার নিকট দূত পাঠান কর্ত্তব্য নহে।"

শিবিরস্থ প্রায় সমস্ত লোকই দেখিলেন যে, আগন্তুকদল ক্রমে তিন দলে বিভক্ত হইয়া, দক্ষিণ ও বামে দুই দল চলিয়া গেল, এক দল স্থিরভাবে

যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। নিশীথ সময়ে যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর! শিবিরস্থ মন্ত্রীদল মন্ত্রণায় বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, এক্ষণে কেবল আত্মরক্ষা, নিশাবসান হইলে চক্ষে দেখিয়া যাহা বিবেচনা হয় যুক্তি করা হইবে। তবে রক্ষীসৈন্য আত্মরক্ষা ও শত্রুগণের আক্রমণে বাধা জন্মাইতে কেবল তীরধনুতে যাহা করিতে পারে, তাহাই করুক; নিশাবসান না হইলে অন্য কোন প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে না। যতক্ষণ প্রভাত-বায়ু বহিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে তীর চলিতে থাকুক। ইহারা কে, কেন আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সন্ধান না লইয়া, শত্রুবল না বুঝিয়া আক্রমণ বৃথা। অনিশ্চিত অপরিচিত আগন্তুক শত্রুর সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর নহে।

সীমার-প্রেরিত সৈন্যদল দুই পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইতে হইতে পুনঃ একত্র মিশিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল। তাহাদের ক্রমেই অগ্রসর, ক্রমেই আক্রমণের উদ্যোগ!

এ যুদ্ধ দেখে কে? এ বীরগণের প্রশংসা করে কে? সীমারের বাহাদুরীর যশোগান মুক্তকণ্ঠে গায় কে? জাগে নক্ষত্র, জাগে নিশা, জাগে উভয় দলের সৈন্যদল। কিন্তু দেখে কে?

সীমার-দল এবং তাহার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি-দল অগ্রসরে ক্ষান্ত হইল; আর পদবিক্ষেপে সাহস করিল না। শিবিরের চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত তীর আসিতে লাগিল। সীমার-পক্ষীয় বিস্তর সৈন্য তীরাঘাতে হত বা আহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। উভয় দলই হস্তে নিশাদেবীকে তাড়াইয়া উষার প্রতীক্ষা করিতেছে। গগনের চিহ্নিত নক্ষত্রের প্রতিও বার বার তাহাদের চক্ষু পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে শুকতারা দেখা দিল, শিবির-রক্ষীদিগের তীরও তূণীরে উঠিল। কারণ, প্রভাতীয় উপাসনার সময় প্রায় সমাগত; এ সময় অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিপক্ষদল তীর নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেও সীমার-সৈন্য এক পদ ভূমিও অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। সকলেই প্রভাতের প্রতীক্ষায় রহিল!

শিবিরস্থ মন্ত্রীদল দেখিতেছেন—শিবিরের চতুর্দ্দিকেই বিপক্ষ সৈন্য, নিজেরা

এক প্রকার বন্দী! এ আগন্তুক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে মদিনা যাওয়া কঠিন। উভয় দলই ঊষা-দেবীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। ক্রমে প্রদীপ্ত দীপ-শিখার তেজ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল—ঘোর অন্ধকারে তরলতা প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাতবায়ুর সহিত ক্ষণস্থায়ী ঊষাদেবী ধবল বসনে ঘোমটা টানিয়া পূর্ব্বদিক হইতে রজনী দেবীকে ক্রমে ক্রমে সরাইয়া সরাইয়া দিনমণির আগমন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন; উভয় দলই পরস্পরের চক্ষে পড়িল।

সীমার-পক্ষ হইতে জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে শিবিরের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা যে উদ্দেশ্যে সেখানে যাইতেছ, ক্ষান্ত হও! যদি প্রাণের আশা থাকে, গমনে ক্ষান্ত হও! আর যাইতে পারিবে না। যদি চক্ষু থাকে, তবে চাহিয়া দেখ, তোমরা মহারাজ এজিদের প্রধান বীর সীমারের কৌশলে এক্ষণে বন্দী। পরের জন্য কেন প্রাণ হারাইবে? তোমাদের সহিত মহারাজ এজিদের কোন প্রকারের বাদ বিসম্বাদ নাই। তোমাদের কোন বিষয়ে অভাব কি অনটন হইয়া থাকে, বল—আমরা পূরণ করিতে বাধ্য আছি। মানে মানে প্রাণ লইয়া স্ব স্ব রাজ্যে গমন কর। মদিনাভিমুখে যাইবার কথা আর মুখে আনিও না। যদি এই সকল কথা অবহেলা করিয়া মদিনাভিমুখে যাইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও, তবে জানিও তোমাদের মরণ অতি নিকটে। এখন তোমাদের ভাল-মন্দের ভার তোমাদের হস্তে।"

শিবিরবাসিদের পক্ষ হইতে কেহ তাহার নিকট আসিল না, কেহ তাহার কথার উত্তর করিল না! কিন্তু তাহার কথা-শেষের সহিত লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে তীরসকল গগন আচ্ছন্ন করিয়া স্বাভাবিক শন্ শন্ শব্দে আসিতে লাগিল। আক্রমণ এবং বাধার আশা অতি অল্প সময় মধ্যেই সীমারের অন্তর হইতে অপসৃত হইয়া গেল। তাহার সৈন্যগণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না। কেহ আঘাত সহ্য করিতেছে, কেহ মরিতেছে, কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে,—রক্ত বমন করিতেছে, কাহারও বক্ষ হইতে রক্তের ধারা ছুটিতেছে,—চক্ষু উল্টাইয়া পড়িতেছে, কেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মহা অস্থির হইয়া

পড়িতেছে, আবার কেহ বা ধরাশায়ী হইয়া নাকে মুখে শোণিত উদ্গারণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে।

সীমারের চাতুরী বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন! সে সন্ধির প্রস্তাবে দূত প্রেরণ করিল। শিবিরস্থ সৈন্যগণের সুতীক্ষ্ণ তীর তূণীরে প্রবেশ করিল, ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিদ রহিল।

সীমার-প্রেরিত দূতবরের প্রার্থনা এই যে, "আমরা বহুদূর হইতে আপনাদের অনুসরণে আসিয়া মহাক্লান্ত হইয়াছি। আজিকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক,—আগামী প্রভাতে আমরা প্রস্তুত হইব। যদি সেরূপ বিবেচনা হয়, তবে বিনা যুদ্ধে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিব। আমরা মহাক্লান্ত।"

শিবিরস্থ মন্ত্রীদল মধ্যে তুর্কীর মন্ত্রী বলিলেন, "আমরা সম্মত হইলাম, ক্লান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করিলে অস্ত্রের অবমাননা করা হয়। আমরা ক্ষান্ত হইলাম। তোমরা পথশ্রান্তি দূর কর।"

সীমার-দূত যথাবিধি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

সীমার চিন্তায় মগ্ন হইল। অনেকক্ষণ পরে সীমারের কথা ফুটিল—প্রকাশ্য যুদ্ধে পারিব না! কখনই পারিব না!! এই মুখে আমরা টিঁকিতে পারিব না!!! কৌশলে না হয় অর্থে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, বাহুবলে আশা বৃথা!!! সীমার উঠিল, পরিচারকগণকে বলিল, "আমার এই সকল সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, বেশভূষা রাখিয়া দাও, যদি কখনও অস্ত্র হস্তে লইবার উপযুক্ত হই তবে লইব—নতুবা, এই রাখিলাম। সীমার আর উহা স্পর্শ করিবে না! যুদ্ধসাজ অস্ত্রশস্ত্র আমাদের উপযুক্ত নহে, তুরস্ক ও তোগানের সৈন্যগণই উহার যথার্থ অধিকারী।"

দ্বাদশ প্রবাহ

তুমি না সেনাপতি! ছিঃ ছিঃ সীমার! তুমি যে এক্ষণে এজিদের সেনাপতি! কি অভিমানে বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছ? উচ্চ পদ লাভ করিয়াও কি তোমার চির নীচ স্বভাব যায় নাই? ছিঃ ছিঃ! সেনাপতির এই কার্য্য? বল ত, আজ কোন্ কুসুম কাননের প্রস্ফুটিত কমল গুচ্ছসকল গোপনে হরণ করিতে ছদ্মবেশী হইলে? কি অভিপ্রায়ে অঙ্গে মলিন বসন,—স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি,—শিরে জীর্ণ আস্তরণ?—এত কপটতা কা'র জন্য? তোমার অন্তরের কপাট তুমিই খুলিয়া দেখ। দেখ ত, বাহ্যিক বেশের সহিত তাহার কোন বর্ণেও সম্মিলন আছে কিনা? মনের কথা বল, খুলিয়া বল ত, তোমার পূর্ব্ব কথার সহিত কোন সমতা আছে কিনা? ও-হাতে আর অস্ত্র ধরিবে না,—ইহাই কি সত্য? সেই অভিমানেই কি এই বেশ? আজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছ বলিয়াই কি সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়াছ? কিন্তু সীমার, একটি কথা! 'সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়া দশ দিনের মধ্যে আর জগতে আসিবেন না,—বহু পরিশ্রমের পর কিছু বিশ্রাম করিবেন। বৎসরকাল আর বিধুর উদয় হইবে না, তাঁহার ক্রোড়স্থ মৃগ-শিশুটি হঠাৎ ক্রোড়স্খলিত হইয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে! সেই দুঃখে তিনি মহাকাতর!' —এ সকল অকথ্য, স্বভাবের বিপরীত কথাও বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু সীমার! তোমার বাহ্যিক বৈরাগ্যভাব দেখিয়া তোমার অন্তরে বিরাগ, সংসারে ঘৃণা, ধর্ম্মে আস্থা জন্মিয়াছে,—ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। সূর্য্যদেব মধ্যগগনে—উত্তাপ প্রখর। তুমি একাকী কোথায় যাইতেছ? ওদিকে তোমার প্রয়োজন কি? ওরা যে তোমার শত্রু, শত্রু-শিবিরের দিকে এ বেশে কেন?

সীমার অতি গম্ভীরভাবে যাইতেছে। শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেই প্রহরিগণ বলিল, "কোন প্রাণীর প্রবেশের অনুমতি নাই—তফাৎ যাও।"

সে দ্বার হইতে বিফলমনোরথ হইয়া সীমার অন্য দ্বারে উপস্থিত। সেখানেও ঐ কথা। তৃতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলে প্রহরিগণ কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত তাহাকে তাড়াইয়া দিল। নিরাশ হইয়া চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত। সে দ্বারের প্রহরিগণ নিজেদের মধ্যে নানা প্রকার কথার তরঙ্গ উঠাইয়া আলাপে মন দিয়াছিল। সীমার ঈশ্বরের নাম করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই প্রহরিগণ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কোন মহামতি অধ্যক্ষ বারণ করিলেন এবং বলিলেন, "ফকির কি চাহে জিজ্ঞাসা কর।"

এ দ্বার তুর্কীদিগের তত্ত্বাবধানে। জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমার ঈশ্বরের নাম করিয়া বলিল, "আমি সংসারত্যাগী ফকির। আমার কোন আশা নাই, কিছুই চাহি না। আপনারা কে—কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন—জানিতে বাসনা, আর অন্য কোনরূপ আশা আমার নাই।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনি মহাধার্ম্মিক। আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া হাসিমুখে যেন স্বদেশে ফিরিয়া যাই,—এই মাত্র বলিলাম। আর কোন কথা বলিব না, তবে আপনি অনুমানে যতদূর বুঝিতে পারেন।"

"আমি অনুমানে কি বুঝিব, আমি ত অন্তর্য্যামী নহি।"

"হজরত! কি করিব। প্রভুর আদেশ অগ্রে প্রতিপাল্য, ইহা আপনি জানেন।"

"তাহা জানি,—কিন্তু যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই নিজ মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কুচিত।"

"আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি আর কিছুই বলিব না,—এ সম্বন্ধে আপনার কথার আর কোন উত্তর করিব না, অন্য আলাপ করুন।"

"অন্য আলাপ কি করিব? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারে না।"

"সে কথা সত্য, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ।"

"আমি কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র; ইচ্ছা হয় বলিবেন, না

হয় বলিবেন না ; আর আমি ইহাও বলি, যদি আমার দ্বারা আপনাদের কোন সাহায্য হয়—আমি প্রস্তুত আছি। পরোপকার করিতে করিতেই জীবন শেষ করিয়াছি। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেরই আমি ভক্ত। তাঁহাদের সামান্য উপকার করিতে পারিলেও কিঞ্চিৎ সুখী হইব। পরোপকার—পরকার্য্য করাই আমার স্বভাব এবং ধর্ম্ম। মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি ? পরোপকারের ন্যায় পুণ্য আর কি আছে ? ভাবিতে পারেন ঃ আমি পথের ভিখারী—এক মুষ্টি অন্নের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। কিন্তু সে ভাব অজ্ঞ লোকের হৃদয়ে উদয় হওয়াই সম্ভব। আপনার ন্যায় মহান্ হৃদয়ে কি সে ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে ?”

—“তবে আপনি কিছু বলিবেন, আমার দ্বারাও কিছু বলাইবেন ?”

—“আপনি কিছু বলুন আর না বলুন, আমি দুই একটি কথা বলিব।”

—“বলুন আপনার কথা।”

—“এখানে বলিব না।”

—“তবে কি গোপনে বলিবেন ?”

—“ইচ্ছা ত তাহাই। আমার মঙ্গলের জন্য আমি ভাবি না, চিন্তাও করি না। পরহিত-সাধনই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য, নিত্য নিয়মিত ব্রত।”

—“আচ্ছা চলুন, আমিই আপনার সঙ্গে যাইতেছি।”

মহামতি সৈন্যাধক্ষ যাইবার সময় সঙ্গীদিগকে সঙ্কেতে বলিয়া গেলেন, “আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। আমরা ঐ বৃক্ষের আড়ালে কথাবার্ত্তা কহিব। তোমরা আমাদের অদৃশ্যভাবে বিশেষ সতর্কে সজ্জিতভাবে দূরে থাকিবে।”

সৈন্যাধ্যক্ষ সীমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বকথিত বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন ; কিন্তু কথাগুলি বড়ই মৃদু মৃদু ভাবে চলিল ; অপরের শুনিবার ক্ষমতা রহিল না। হস্ত-চালনা, মুখ-ভঙ্গী, মস্তক-হেলন, হাঁ—না, মোহাম্মদ হানিফা, এজিদ মহারাজ, অসংখ্য ধন, লাভের জন্য চাকুরী,—আত্মীয় নয়,—ভ্রাতা নয়—লাভ কি—

আপন লাভ—ইত্যাদি অনেক বাদানুবাদের পর সৈন্যাধ্যক্ষ নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "বিশ্বাস কি ?"

সীমার বলিল, "অগ্রে হস্তগত, পরে ধৃত, শেষে শিবির-ত্যাগ,—আবার তাহার পরেই পদলাভ। আপনার কথাও শুনিলাম। আমার চিরব্রত হিত কথাও শুনাইলাম। এখন ভাবিয়া দেখুন, লাভালাভ কি ?"

"তাহা ত বটে, কিন্তু শেষে একূল ওকূল—দু'কূল না যায়।"

"না—না, দুই কূল যাইবার কথা কি ? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। বিশ্বাস না হয়, আমিই অগ্রে বিশ্বাসস্থাপন করি। সন্ধ্যার পর একটু ঘোর ঘোর অন্ধকার হইলে আপনি এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবেন। যে কথা, সেই-ই কাজ। হস্তগত হইলেও কি আপনার মনের সন্দেহ দূর হইবে না ?"

"সে ত বটে, সে কথা ত বটে ; কিন্তু শেষে কি ঘটে বলিতে পারি না।"

"আর কি ঘটিবে ? আপনারাই সব, আপনারাই বাহুবল !"

"তা যাহা হউক, আপনি কৌশল করিয়া ত আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন না ?"

"যদি তাহাই বিবেচনা করেন, তবে আপনিই ঠকিলেন। আমি এখন আর কিছুই বলিব না। কেবলমাত্র এই বলিব যে, সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা টানিয়া জগৎ অন্ধকার করিলেই আপনাকে যেন এখানেই পাই। আমি বিদায় লইলাম।—নমস্কার।"

"আপনি বিদায় লইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে অশান্তির বীজ রোপণ করিয়া গেলেন।"

সীমার ত্রস্তপদে আর এক পথে স্বসৈন্যমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। সেনাপতি মহোদয়ও অতি মৃদু মৃদু ভাবে পদ বিক্ষেপ করিতে করিতে শিবিরে আসিলেন ; প্রহরীদ্বয়ও পরে শিবিরে আসিল। ধিক্ রে তুর্কী সেনাপতি ! ধিক্ রে অর্থ !!

ত্রয়োদশ প্রবাহ

কে জানে, কাহার মনে কি আছে? এই অস্থি, চর্ম্ম, মাংসপেশী-জড়িত দেহের অন্তরস্থ হৃদয়খণ্ডে কি আছে—তা কে জানে? ভূপালদ্বয় শিবিরমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন—রজনী ঘোর অন্ধকার, শিবিরস্থ প্রহরিগণ জাগরিত,—হঠাৎ চতুর্থ দ্বারে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ঘোর আর্ত্তনাদ, 'মার' 'ধর' 'কাট' 'জ্বালাও' ইত্যাদি রব উঠিল। যাহারা জাগিয়াছিল; যাহারা ঐ সকল শব্দ ও গোলযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, তাহারা ঘোর নিদ্রার ভাণেই পড়িয়া রহিল। যাহারা যথার্থ নিদ্রায় অচেতন ছিল, তাহারা ব্যস্তসমস্তে জাগিয়া উঠিল, তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল;—কোথায় অস্ত্র, কোথায় অশ্ব, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য অগ্নিশিখা সহস্র প্রকারে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। মহাবিপদ! কার কথা কে শুনে, কেই বা ভূপতির অন্বেষণ করে!

ভূপতিদ্বয়ের মধ্যে যিনি সৈন্যগণের কোলাহলে, অগ্নির দাহিকা-শক্তির আরবে জাগরিত হইয়াছিলেন, তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিশ্চয়ই মরণ জানিয়া মনে মনে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই—কঠিনভাবে বস্ত্রে মুখ বন্ধ; শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি নাই—হস্ত-পদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যাহারা বাঁধিল, তাহারা সকলেই পরিচিত, কেবল দুই একটি মাত্র অপরিচিত। তাঁহারা কি করিবেন? কোন উপায় নাই। মহা মহা বীর হইয়াও হস্তপদ বন্ধন অবস্থায় তাঁহাদের কোনই ক্ষমতা নাই। দেখিতে দেখিতে তাহারা ভূপালদ্বয়ের চক্ষুদ্বয়ও বস্ত্রে আবৃত করিয়া ফেলিল, ক্রমে তাঁহাদিগকে শয্যা হইতে শূন্যে তুলিয়া কোথায় লইয়া চলিল।

শিবির মধ্যে যাহারা যথার্থ নিদ্রিত ছিল, তাহারা অনেকেই জ্বলিয়া

ভস্মসাৎ হইয়া গেল। যাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা কেহই মরিল না, শিবিরেও থাকিল না, সীমার-দলে মিশিয়া গেল। অবশিষ্টের মধ্যে যাহারা রহিল তাহারা প্রাণ লইয়া পলাইল। কে জ্বলন্ত হুতাশন নিবারণ করে? কে প্রভুর অন্বেষণ করে? কে মন্ত্রীদের সন্ধান লয়? আপন আপন প্রাণ লইয়া সকলেই মহা ব্যস্ত!

ভূপতিদ্বয়কে বন্ধন-দশাতেই শিবিরে লইয়া সীমার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিল। বন্দীদ্বয়ের বন্ধন, চক্ষের আবরণ মোচন করিয়া সে নিজের সম্মুখে তাঁহাদিগকে দণ্ডায়মান করাইল। চারি পার্শ্বে প্রহরী, পদমাত্র হেলিবার সাধ্য নাই। বন্দীদ্বয় চক্ষে দেখিলেন: তাঁহাদের কতক সৈন্য ঐ দলে দণ্ডায়মান,—মহাহর্ষে বক্ষ বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান!—কিন্তু সীমারের আজ্ঞাবহ!!

সীমার বলিল, "আপনারা মহারাজ এজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হানিফার সাহায্যে মদিনা যাইতেছেন, সেই অপরাধে আপনারা অপরাধী এবং আমার হস্তে বন্দী। মহারাজ এজিদ স্বয়ং আপনাদের বিচার করিবেন, ফলাফল তাঁহার হস্তে। আমি আপনাদিগকে এখনই দামেস্কে লইয়া যাইব। আপনারা বন্দী।" এই বলিয়া সে ভূপতিদ্বয়কে পুনর্ব্বার বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া দরবার ভঙ্গ করিল।

সীমার-শিবিরে আনন্দের লহরী ছুটিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের প্রতীক্ষা।—গত রজনীতে সীমার প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল, এখনও প্রভাতের প্রতীক্ষা। শিবিরস্থ সৈন্য, যাহারা পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহাদেরও প্রভাতের প্রতীক্ষা! এ প্রভাত কাহার পক্ষে সুপ্রভাত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? দগ্ধীভূত শিবিরের অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। কত সৈন্য নিদ্রার কোলে অচেতন অবস্থায় পুড়িয়া মরিয়াছে, কত লোক অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! ভূপতিদ্বয়ের অবস্থা কি হইল—তাঁহারা পুড়িয়া খাক্ হইয়াছেন, কি পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন—পলায়িত সৈন্যগণ তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। যাহাদের সম্মুখে ভূপতিদ্বয়কে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারা কে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনও জানা যায় নাই।

আজ সীমারের অন্তরে নানা চিন্তা। এ চিন্তার ভাব ভিন্ন, আকার ভিন্ন, প্রকার ভিন্ন। কারণ,—সুখের চিন্তার ইয়ত্তা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই। যে কার্য্যভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া দামেস্ক হইতে সীমার যাত্রা করিয়াছিল, সে সর্ব্বতোভাবেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তাহার মনে আনন্দের তুফান উঠিয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া মহা গোলযোগ করিতেছে। ধনলাভ, মর্য্যাদাবৃদ্ধি, কি পদবৃদ্ধি—কি হইবে, কি চাহিবেন, কি গ্রহণ করিবেন, সীমার তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। রাত্রি প্রভাত হইল। জগৎ জাগিল। প্রথমে পাখীকুল, শেষে মানবগণ বিশ্বরঞ্জন বিশ্বপতির নাম মুখে করিয়া জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্বগগনে রবিদেব আরক্তিম লোচনে দেখা দিলেন। গত দিবাবসানে যে কারণে তিনি মলিনমুখ হইয়া অস্তাচলে মুখ ঢাকিয়াছিলেন, আজ যেন সে ভাব নাই। আজ তিনি ঘোর লোহিতবর্ণ, অসীম তাঁহার তেজ।—দেখিতে দেখিতে তিনি প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সীমার দামেস্ক-যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত,—সৈন্যগণ সাজিতেছে, অশ্ব-সকল সজ্জিত হইয়া আরোহীর অপেক্ষায় রহিয়াছে; বাজনার রোল ক্রমেই বাড়িতেছে, বিজয় নিশান উচ্চ শ্রেণীতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময়ে যেন রবিদেবের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমূর্ত্তির সহিত পূর্ব্ব দিকে প্রায় লক্ষাধিক সশস্ত্র দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব! কি দৃশ্য! কি চমৎকার বেশ! স্বর্ণ-রজত নির্ম্মিত দণ্ডে কারুকার্য্য খচিত পতাকা! অশ্বপদ-বিক্ষেপের শ্রীই বা কি মনোহর! অস্ত্রের চাক্‌চিক্য আরও মনোহর, সূর্য্যতেজে অতি চমৎকার দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। সীমার আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পতাকার চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তাহার বদনে বিষাদ-কালিমা রেখার মত শত শত চিহ্ন বসিয়া গেল; তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; চঞ্চল অক্ষি স্থির হইল। মুখে সীমার বলিল, "এ কাহার সৈন্য? এ যে নূতন বেশ, নূতন আকৃতি, নূতন সাজ! উষ্ট্রোপরি ডঙ্কা, নাকাড়া। নিশান-দণ্ড উষ্ট্রপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান, আকার প্রকারে বীরভাবের পরিচয় দিতেছে! বংশীরবে উষ্ট্রসকল মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। ইহারা কাহারা? ইহারা কাহার সৈন্য?"

উষ্ট্রপৃষ্ঠে নকিব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া যাইতেছে, "ইরাকের অধিপতি মস্‌হাব কাক্কা, হজরত মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছেন। যদি গমনে বাধা দিতে কাহারও ইচ্ছা থাকে, সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হও। না হয়, পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পথ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষা কর।"

এই সকল কথা সীমারের কর্ণে বিষসংযুক্ত তীরের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল; তোগানের সৈন্যমধ্যে যাহারা নিশীথ সময়ে জ্বলন্ত অনল হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া সীমারের ভয়ে জঙ্গলে লুকাইয়াছিল, তাহারা ঐ মধুমাখা রব শুনিয়া মহোল্লাসে মস্‌হাব কাক্কার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, "বাদশাহ্-নামদার! আমাদের দুর্দ্দশার কথা শুনুন,—আমাদের দুর্দ্দশার কথা শুনুন!!"

সৈন্যগণ গমনে ক্ষান্ত দিয়া দণ্ডায়মান রহিল। ইরাক-অধিপতি সৈন্যগণের সম্মুখে শ্রেণীভেদ করিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভুক্তভোগী সৈন্যগণ তাঁহার সম্মুখে রাত্রির সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিল। তাহারা আরও বলিল, "বাদশাহ্-নামদার! ঐ যে জ্বলন্ত হুতাশন দেখিতেছেন—উহাই শিবিরের ভগ্নাবশেষ; এখনও পর্য্যন্ত খাকে পরিণত হয় নাই! কত সৈন্য, কত আহারীয় দ্রব্য, কত অর্থ, কত বীর যে, ঐ মহা-অগ্নির উদরস্থ হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। তোগান ও তুরস্কের ভূপতিদ্বয় মোহাম্মদ হানিফার সাহায্যের জন্য মদিনায় যাইতেছেন; এজিদ-সেনাপতি সীমার রাত্রে দস্যুতা করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া, ভূপতিদ্বয়কে বন্দী করিয়া ঐ শিবিরে লইয়া গিয়াছে, এখনই দামেস্কে লইয়া যাইবে। গতকল্য প্রাতঃকাল হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমরা কেবল তীর-ধনুর লড়াই করিয়াছিলাম। বিপক্ষদিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিই নাই। শেষে তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ঐ দিনের যুদ্ধ বন্ধ রাখিল। তাহার পর রাত্রে এই ঘটনা। সীমার ভয়ানক চতুর। বাদশাহ্-নামদার! মিথ্যা সন্ধির ভাণ করিয়া শেষে সে এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

মস্‌হাব বলিলেন, "তোমরা বলিতে পার, এ কোন্ সীমার?"

"বাদশাহ্‌-নামদার! গতকল্য ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই সীমারই স্বহস্তে ইমাম হোসেনের শির খঞ্জর দ্বারা খণ্ডিত করিয়াছিল। এই সীমারই ইমাম হোসেনের বুকের উপর বসিয়া দুই হাতে খঞ্জর চালাইয়া 'মহাবীর' নামে খ্যাত হইয়াছে, লক্ষ টাকা পুরস্কারও পাইয়াছে। সে পাষাণ-প্রাণ না হইলে এত লোককে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে পারিত কি?"

ইরাক-ভূপতি চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—"উহু! তুমি সেই সীমার! হায়! তুমি সেই!!" এই কথা বলিয়া তিনি অশ্ব ফিরাইলেন। সৈন্যগণও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব ছুটাইল। অশ্ব-পদনিক্ষিপ্ত ধূলারাশিতে চতুষ্পার্শ্ব অন্ধকার হইয়া গেল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় মস্‌হাব কাক্কা সীমার-শিবির আক্রমণ করিলেন। অশ্বের দাপট, অস্ত্রের চাকচিক্য দেখিয়া সীমার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আজ নিস্তার নাই। কাক্কা স্বয়ং অসি ধরিয়াছেন, রক্ষা নাই!

মস্‌হাব বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতেই চিনি, তুমিও আমাকে সেই সময় হইতেই বিশেষরূপে জান। আর বিলম্ব কেন? আইস, দেখি তোমার দক্ষিণ হস্তে কত বল? (ক্রোধে অধীর হইয়া) আয় পামর! দেখি তোর খঞ্জরের কত তেজ।"

সীমার মস্‌হাব কাক্কার বলবিক্রম পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিল। তাঁহার সহিত সম্মুখ সমরাশা দূরে থাকুক, ভয়ে সে কাঁপিতে লাগিল—কি বলিবে, কাহাকে কি আজ্ঞা করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

মস্‌হাব কাক্কা সৈন্যগণকে বলিলেন, "সেই সীমার! এ সেই সীমার! ইহার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন করিতে আমার জীবন-পণ! এ সেই পাপিষ্ঠ, এ সেই নরাধম সীমার! আইস, আমার সঙ্গে আইস, বিষম বিক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে পামরের শিবির আক্রমণ করি। কাক্কা অশ্বে কশাঘাত করিতেই অশ্বারোহী সৈন্যগণ ঘোর নিনাদে সিংহবিক্রমে সীমার শিবিরোপরি যাইয়া পড়িল। আজ সীমারের মহাসঙ্কট উপস্থিত! আত্মরক্ষার অনেক উপায় সে উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, কিছুই কার্য্যে আসিল না। সে পরাভব স্বীকারের চিহ্ন দেখাইল, কোন ফলই হইল না;

কাক্কা সে দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না; কেবল মুখে বলিলেন, "সীমার! তোর সঙ্গে যুদ্ধের রীতি কি? তোর সঙ্গে কথা কি? তুই কোথায়? শীঘ্র আসিয়া আমার তরবারির নীচে স্কন্ধ পাতিয়া দে! তোকে পাইলেই আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হই, তোর সৈন্যগণের প্রাণবধ করিতে বিরত হই। তুই কেন গোপনভাবে আছিস্? তুই নিশ্চয়ই জানিস্, আজ তোর নিস্তার নাই। এই অশ্বচক্রমধ্যে তোর প্রাণ, তোর সৈন্যসামন্ত—সকলেরই প্রাণ বাঁধা রহিয়াছে। একটি প্রাণীও এ চক্র ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিস্, তোদের সকলের জীবন আমাদের তরবারির তেজের উপর নির্ভর করিতেছে। তুই সেই সীমার! আবার আজকাল 'মহাবীর সীমার' নামে পরিচিত! শুনিলাম, তুই নাকি এজিদের সেনাপতি? তোর আত্ম-গোপন কি শোভা পায়? ছিঃ ছিঃ, সেনাপতির নাম ডুবাইলি। 'মহাবীর' নামে কলঙ্ক রটাইলি! তোর অধীনস্থ সৈন্যগণের নিকট অপদস্থ হইলি! ভীরু ও কাপুরুষের পরিচয় প্রদান করিলি! নিজেও মজিলি, অপরকেও মজাইলি! তোর শুভ্র নিশানে ভুলিব না; তুই গত কল্য যাহা করিয়াছিস্, তাহাতে সন্ধির প্রস্তাব আর কর্ণে শুনিব না। তোর কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিব না। তুই যে খেলা খেলিয়াছিস্, যে আগুন জ্বালাইয়াছিস্, তাহার ফল চক্ষের উপর রহিয়াছে,—এখনও জ্বলিতেছে, এখনও পুড়িতেছে। তুই অনেক প্রকারের খেলা খেলিয়াছিস্! কি ধূর্ত্ত! পরকালের পথও একেবারে নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছিস্! তোর চিন্তা কি? তোর মরণে ভয় কি? তোগান ও তুর্কী ভূপতিদ্বয়ের যে দশা ঘটিয়াছে, ইহা তাঁহাদের ভ্রম নহে। বিশ্বাসী না হইলে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সাধ্য কাহার? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ না করিলে আমার অন্তরের জ্বালা নিবারণ হইবে না।"

কাক্কা কথা কহিতেছেন, এদিকে সীমারের সৈন্যদল বাত্যাহত কদলীর ন্যায় কাক্কার সৈন্যহস্তে পতিত হইতেছে,—কথাটি বলিবার অবসর পাইতেছে না, নিঃশব্দে রক্তমাখা হইয়া ভূতলে পড়িতেছে। সীমার কোনও চাতুরী করিয়া আর উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে পারিল না। বহু চিন্তার পর সে

মনে মনে স্থির করিল ঃ ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলেই বোধ হয়, মস্‌হাব কাক্কা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। বাঁচিলে ত পদোন্নতি ? আজ এই কালান্তক কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে ত অন্য আশা ? অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, ঘটনা-স্রোত যে দিকে যায়, সেই দিকেই অঙ্গ ভাসাইব ; এক্ষণে ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।”

সীমার ভূপতিদ্বয়কে নিস্কৃতি দিল। তোগান ও তুরস্কের ভূপতিদ্বয়কে দেখিয়া মস্‌হাব কাক্কা সাদরে ও মিষ্ট সম্ভাষণে বলিলেন, “ঈশ্বর আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আর চিন্তা নাই। সৈন্যসামন্ত, আহারীয় দ্রব্য, অর্থ ইত্যাদি যাহা ভস্মীভূত হইয়াছে, সে জন্য দুঃখ নাই। বিপদ্‌গ্রস্ত না হইলে নিরাপদে সুখ কখনই ভোগ করা যায় না ; দুঃখভোগ না করিলে সুখের স্বাদ পাওয়া যায় না। ভ্রাতাগণ ! কথা কহিবার অনেক সময় পাইব, কিন্তু সীমার হাতছাড়া হইলে আর তাহাকে পাইব না। আপনারা আমার সাহায্যে অস্ত্র-ধারণ করুন। ঐ অশ্বসকল সজ্জিত আছে,—অস্ত্রের অভাব নাই ! যে অস্ত্র লইতে ইচ্ছা করেন, রক্ষীকে আদেশ করিলেই সে তাহা যোগাইবে ; বিলম্বের সময় নহে, শীঘ্র সজ্জিত হইয়া আমায় সাহায্য করুন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন। দেখি, সীমার যায় কোথা ?”

সীমারের সেনাগণ সেনাপতির কাপুরুষতা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “ছিঃ ! ছিঃ ! আমরা কাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছি ? এমন ভীরুস্বভাব নীচমনার আজ্ঞাবহ হইয়া সমরসাজে আসিয়াছি। ছিঃ ! ছিঃ ! এমন সেনাপতি ত কখনও দেখি নাই ;—বিনাযুদ্ধে সৈন্যক্ষয় করিতেছে ! কি কাপুরুষ ! যুদ্ধ করিবার আজ্ঞাও মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে না। ছিঃ ! ছিঃ ! এমন যোদ্ধা ত জগতে দেখি নাই ! ধিক্ আমাদিগকে ! এমন ভীরু-স্বভাব সেনাপতির অধীনে আর থাকিব না। চল ভ্রাতাগণ ! চল, ঐ বীর-কেশরীর আজ্ঞাবহ হইয়া প্রাণরক্ষা করি ; যদি বল, আমাদিগকে তাহারা বিশ্বাস করিবে না ; বিশ্বাস না করুক, আগে পাছে উহাদের হাতেই মরণ—নিশ্চয় মরণ ! চল, ঐ মহাবীর মস্‌হাব কাক্কার পদানত হই, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।”

সীমার-সৈন্যগণ “জয় মোহাম্মদ হানিফা ! জয় মোহাম্মদ হানিফা !!”

মুখে উচ্চারণ করিয়া বিপক্ষদল-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং তরবারি প্রভৃতি সমুদয় অস্ত্র তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া আত্মসর্পণ করিল। মহাবীর মস্‌হাব তাহাদিগকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে অস্ত্র লইতে দিলেন না।

সীমার অর্থ-লোভ দেখাইয়া, পদোন্নতির আশা দিয়া, অর্থে বশীভূত করিয়া যে সকল সৈন্য ও সৈনাধ্যক্ষকে নিজ শিবিরে আনাইয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা যে ব্যবহার করিয়াছি, সীমারের কুহকে পড়িয়া যে কুকাণ্ড করিয়াছি, ইহার প্রতিফল অবশ্যই আমাদিগকে পাইতে হইবে। কি ভ্রমে পড়িয়া এই কুকার্য্যে যোগ দিয়াছিলাম! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া যায় না,—হওয়াই উচিত। কিন্তু এখন কথা এই যে, সেনাপতি মহাশয় নিজ সৈন্য-দিগকে স্ববশে রাখিতে যখন অক্ষম, তখন আমাদের দশা কি হইবে? অতি অল্প সময় মধ্যেই আমরা কাক্কার হস্তে ধরা পড়িব। কোনও দিক হইতেই আর জীবনের আশা নাই। এ অবস্থায় আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কোনও দিক হইতেই আমাদের জীবনের আশা নাই! আর বিলম্ব করিব না। ভাই-সকল! যত সত্বর হয়, এস সকলে মহাবীর মস্‌হাব কাক্কার হস্তে আত্মসর্পণ করি। কিন্তু সেনাপতি মহাশয়কে রাখিয়া যাইব না। শেষে ভবিতব্যে যাহা থাকে হইবে। আমরা বিখ্যাত যোদ্ধা, আমাদের এ কলঙ্ক-কালিমা-রেখা, জগতে চিরকাল সমভাবে আঁকা থাকিবে। মনে হইলেই লোকে বলিবে: তুর্কী সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ভাইসকল! তাহাতেই বলি, কথার শেষে আর একটি কথা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াই যাই;—সীমার! সীমার!! সীমার!!!"

সীমার-শিবির মধ্য হইতে ঘোররবে—"জয় ইরাক অধিপতি! জয় মোহাম্মদ হানিফা" রব উত্থিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা সীমারকে হস্তপদে বন্ধন করিয়া রণপ্রাঙ্গণে মস্‌হাব কাক্কার সম্মুখে রাখিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল, "আমরা অপরাধী, দণ্ডবিধান করুন! বাদশাহ্‌-নামদার! সেনাপতি মহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।"

মস্‌হাব কাক্কা প্রথমে ইহা সীমারের চাতুরী মনে করিয়া দ্রুত অসিচালনে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; পরে আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ ! তোমরাই বাহাদুর ! তোমরাই সীমারের রক্ষক, তোমরাই সীমারকে বন্দীভাবে লইয়া আমার সহিত মদিনায় চল। মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখে তোমাদের এবং সীমারের বিচার হইবে।"

এদিকে কাক্কা সৈন্যগণকে গোপনে আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্রোহী সৈন্য ও সীমারকে কৌশলে মদিনায় লইয়া যাইতে হইবে। সাবধান ! উহাদের একটি প্রাণীও যেন হাতছাড়া না হয়। বিশেষতঃ, সীমার বড় ধূর্ত্ত।" এই আদেশ করিয়া মস্‌হাব কাক্কা মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জগদীশ ! তোমার মহিমার অন্ত নাই। কাল কি করিলে ?—আবার রাত্রে কি ঘটাইলে !—প্রভাতেই বা কি দেখাইলে !—আবার এখনই বা কি কৌশল খাটাইয়া কি খেলা খেলাইলে ! ধন্য তোমার মহিমা ! ধন্য তোমার কারিগিরি ! যে ফণীর দ্বারা দংশন করাইলে, সেই বিষধর ফণীর বিষেই ঔষধ তৈরী করিয়া নির্ব্বিষ করিয়া দিলে ! ধন্য তোমার মহিমা ! ধন্য তোমার লীলা !

যাও সীমার, মদিনায় যাও। তোমার বাক্য আজ সফল হইল। আর ও-হাতে লৌহ-অস্ত্র ধরিতে হইবে না। যাও, মদিনায় যাও। মদিনায় গিয়া তোমার কৃতকার্য্যের ফলভোগ কর। সেখানে অনেক দেখিবে।—সে প্রান্তরে অনেক দেখিতে পাইবে। তোমার প্রাণপ্রতিম প্রিয়সখা ওত্‌বে অলীদকে দেখিতে পাইবে। অশ্ব, শিবির, অস্ত্র, যুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরাঙ্গণ—সকলই দেখিতে পাইবে ; কিন্তু তুমি পরহস্তে থাকিবে। সীমার ! একবার মনে করিও সীমার !! ফোরাতকূলের ঘটনা একবার মনে করিও। আজরের কথা মনে করিও। তুমি জগৎ কাঁদাইয়াছ,—বন, উপবন, পর্ব্বত, গিরিগুহা, গগন, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে যে হৃদয়-বিদারক শব্দ উত্তোলন করাইয়াছ, সে কথাটাও একবার মনে করিও। এই ত সে দিনের কথা। হাতে হাতেই এই ফল !—ইহাতে আর আশা কি ? এই নশ্বর জীবনে, এই অস্থায়ী জগতে আর আশা কি, সীমার ? প্রাতে তোমার মনে যে ভাবনা ছিল, এইক্ষণে তাহার কি কিছু আছে ? বল মানুষের সাধ্য

কি? বাহুবল, অর্থবল লইয়া মূর্খেরাই দর্প করে। তুমি না দামেস্কের অভিমুখে মহা হর্ষে যাত্রা করিয়াছিলে?—সুসময়ে সুযাত্রার চিহ্নস্বরূপ কত পতাকাই না উড়াইয়াছিলে?—কত বাজনাই না বাজাইয়াছিলে? দেখ দেখি, মুহূর্ত্ত মধ্যে কি ঘটিয়া গেল! ভবিষ্যৎ-গর্ভে যে কি নিহিত আছে, তাহা জানিবার কাহারও সাধ্য নাই। যাও সীমার, মদিনায় যাও, তোমার কৃতকার্য্যের ফল ভোগ কর।

চতুর্দ্দশ প্রবাহ

হায়! হায়!! এ আবার কি! এ দৃশ্য কেন চক্ষে পড়িল! উহু! কি ভয়ানক ব্যাপার! উহু! কি নিদারুণ কথা! এ প্রবাহ না লিখিলে কি "উদ্ধার পর্ব্ব" অসম্পূর্ণ থাকিত, না বিষাদ-সিন্ধুর কোন তরঙ্গের হীনতা জন্মিত? বুদ্ধি নাই, তাই সীমারের বন্ধনে মনে মনে একটু সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন যে প্রাণ যায়! এ বিষাদ-প্রবাহে এখন যে প্রাণ যায়! হায়! হায়!! হায়!!! এ সিন্ধুমধ্যে কি মহা-শোকের কল্লোলধ্বনি ভিন্ন আনন্দ-হিল্লোলের সামান্য ভাবও থাকিবে না! হায় রে কৃপাণ! আবরণবিহীন কৃপাণ!! এজিদের হস্তের কৃপাণ!!! সম্মুখে মদিনার ভাবী রাজা ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। তিন পার্শ্বে সজ্জিত প্রহরী—এক পার্শ্বে প্রহরী নাই। হাসনেবানু, শাহ্রেবানু, জয়নাব প্রভৃতির দৃষ্টির বাধা না জন্মে—জয়নালের শিরশ্ছেদন স্বচ্ছন্দে যাহাতে তাঁহাদের চক্ষে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই বন্দীগৃহের সম্মুখে বধ্যভূমি, এবং সেই দিক প্রহরীশূন্য! সন্তানের মস্তক কি প্রকারে ধরায় লুণ্ঠিত হয়, তাহাই মাতাকে দেখাইবার জন্য সে দিক প্রহরীশূন্য! এজিদ অসিহস্তে জয়নালের সম্মুখে দণ্ডায়মান। মারওয়ান নীরব, পুরবাসিগণ নীরব, দর্শকগণ ম্লানমুখে নীরব! এ ঘটনা কেহ ইচ্ছা করিয়া দেখিতে আসে নাই। প্রহরিগণ বলপূর্ব্বক নগরবাসিগণকে ধরিয়া আনিয়াছে।

এজিদের আজ্ঞায় যে সময় জয়নাল আবেদীনকে বন্দীগৃহ হইতে বলপূর্ব্বক আনা হইয়াছে, সেই সময় হাসনেবানু অচৈতন্য হইয়াছেন, তাঁহার চক্ষু আর

উন্মীলিত হয় নাই। শাহ্‌রেবানু, জয়নাব, বিবি সালেমা জয়নালের হাসি-হাসি মুখখানির প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছেন। নিমেষশূন্য চক্ষে জলের ধারা বহিতেছে—অন্তরে, হৃদয়ে, শ্বাসে, প্রশ্বাসে সেই বিপদতারণ ভগবানের নাম, সহস্র বর্ণে, সহস্র প্রকারে, নিঃশব্দে বর্ণিত হইতেছে—জাগিতেছে!

এজিদ বলিলেন, "জয়নাল! তোমার জীবনের এই শেষ সময়। কোন কথা বলিবার থাকে ত বল। তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে। ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলে আর কি হইবে? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে, আমার নামে খোৎবা পড়িবে, আমাকে রাজা বলিয়া মান্য করিবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব! ঘটনাক্রমে তাহা ঘটিল না। কাজেই শত্রুর শেষ রাখিতে নাই—শত্রুকে হাতে পাইয়া ছাড়িতে নাই। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে না; এ অবস্থায় তোমাকে আর জীবিত রাখিতে পারি না। জীবিত রাখিয়া সর্ব্বদা সন্দিহান থাকা আমার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না। জয়নাল! ঊর্দ্ধে কি আছে? অনন্ত আকাশে সূর্য্য ভিন্ন আর কি আছে? তুমি আকাশে কি দেখ? আমায় দেখ! আমার হস্তস্থিত শাণিত কৃপাণের প্রতি চাহিয়া দেখ। তোমার মরণ অতি নিকট; যদি কোন কথা থাকে ত বল। আমি মনোযোগের সহিত শুনিব।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "তোমার সহিত আমার কোন কথা নাই। আমার জীবনে মরণে তোমার সমান ফল। আমি বাঁচিয়া থাকিলেও তোমার নিস্তার নাই, মরিলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই, বন্দীখানায় থাকিলেও তোমার উদ্ধার নাই।"

এজিদ সরোষে বলিলেন, "এখনও স্পর্দ্ধা! এখনও অহঙ্কার! এখনও ঘৃণা! এখনও এজিদকে ঘৃণা! এ সময়েও কথার বাঁধুনি! দেখ্‌, এজিদের নিষ্কৃতি আছে কি না? দেখ্‌, এজিদের উদ্ধার আছে কি না? জীবনে মরণে সমান ফল?—দেখ জীবনে মরণে সমান ফল! এই দেখ্‌, জীবনে মরণে সমান—"

এজিদ তরবারি উত্তোলন করিতেই মারওয়ান বলিল, "বাদশাহ্‌-

নামদার! একটু অপেক্ষা করুন, ঐ দেখুন ওত্‌বে অলীদের সেই নির্দ্দিষ্ট বিশ্বাসী কাসেদ অশ্বারোহণে মহাবেগে আসিতেছে; ঐ দেখুন আসিয়া উপস্থিত হইল—একটু অপেক্ষা করুন। যদি হানিফার জীবন শেষ হইয়া থাকে, তবে সে সংবাদ জয়নালকে শুনাইয়া কার্য্য শেষ করুন। শত্রুর শেষ, কার্য্যের শেষ—সকল শেষ একেবারে হইয়া যাউক। বাদশাহ্‌-নামদার! একটু অপেক্ষা করুন।"

এজিদের হস্ত নীচে নামিল। কাসেদ কি সংবাদ লইয়া আসিল শুনিতে তিনি এখন মহাব্যগ্র, তাই অতি অল্প সময়ের জন্য জয়নাল-বধে ক্ষান্ত দিলেন—কাসেদের প্রতি এখন তাঁহার লক্ষ্য।

কাসেদ অভিবাদন করিয়া ওত্‌বে অলীদের লিখিত পত্র মারওয়ানের হস্তে দিয়া মলিন মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। মারওয়ান উচ্চৈঃস্বরে পত্র পাঠ করিতে লাগিল ঃ—

"মহারাজাধিরাজ এজিদ বাদশাহ্‌-নামদারের সর্ব্বপ্রকারে জয় ও মঙ্গল। আজ্ঞাবহ কিঙ্করের নিবেদন এই যে, মোহাম্মদ হানিফা চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যসহ মদিনার নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তিনি নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। প্রথম দিনের যুদ্ধে আমার সহস্রাধিক সেনা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। আগামী কল্য যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? যত শীঘ্র হয়, মারওয়ানকে অধিক পরিমাণে সৈন্যসহ আমার সাহায্যে প্রেরণ করুন। হানিফাকে বন্দী করা দূরে থাকুক, মারওয়ান না আসিলে চিরদাস অলীদ বোধ হয় আর দামেস্কের মুখ দেখিতে পাইবে না।"

এজিদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ! এ আপদ কোথায় ছিল? এক দিনের যুদ্ধে হাজার সৈন্যের অধিক মারা পড়িয়াছে, এ কি কথা!"

মারওয়ান বলিল, "বাদশাহ্‌-নামদার! এ সময়ে একটু বিবেচনার আবশ্যক। বন্দীর প্রাণ বিনাশ করিতে কতক্ষণ?"

"না—না, ও-সকল কথা কথাই নহে। জয়নালকে আর মরজগতে

রাখা যাইতে পারে না। আমি তোমার এ ভ্রমপূর্ণ উপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

. পুনরায় তরবারি উত্তোলন করিতেই দর্শকগণ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ পিছু হটিল, কেহ পড়িয়া গেল, কেহ উভয় পার্শ্বে ধাক্কা খাইয়া একপার্শ্বে সরিল। জনতা ভেদ করিয়া দ্বিতীয় সংবাদবাহী এজিদ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লান মুখে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন! জয়নাল-বধে ক্ষান্ত হউন! বড়ই অমঙ্গল সংবাদ আনিয়াছি। সাধারণের সমক্ষে বলিতে সাহস হয় না।"

এজিদ মহারোষে বলিলেন, "এখানে মোহাম্মদ হানিফা নাই,—বল।"

সংবাদবাহী বলিল, "আমরা যাইয়া দেখি,—সেনাপতি সীমার বাহাদুর নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিপক্ষগণের শিবির বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। প্রভাত বায়ুর সহিত বিপক্ষদল হইতে অসংখ্য তীরবর্ষণ হইতে লাগিল, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে তীর ছুটিল। আমাদের সেনাপতি এক পদ ভূমিও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ক্রমে সৈন্যগণ শরাঘাতে জর জর হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। সেনাপতি সীমার কি মনে করিয়া সন্ধিসূচক শুভ্রপতাকা উড়াইয়া দিলেন! কিছুই বুঝিলাম না; যুদ্ধ বন্ধ হইল। কোন পক্ষ হইতেই আর যুদ্ধের আয়োজন দেখিলাম না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নিশার গভীরতার সহিত বিপক্ষ শিবিরে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহার পর দেখিলাম যে, বিপক্ষ শিবিরে আগুন লাগিয়াছে—দেখিতে দেখিতে কত অশ্ব, কত সৈন্য পুড়িয়া মরিল! তাহার পর দেখিলাম, শিবিরস্থ ভূপতিদ্বয়কে বন্দীভাবে সেনাপতি মহাশয় শিবিরে লইয়া আসিলেন। আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সূর্য্য উদয় হইলেই শিবির ভগ্ন করিয়া সেনাপতি মহাশয় দামেস্ক-নগরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বদিক হইতে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বিশেষ সজ্জিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপক্ষদলের সৈন্যগণমধ্যে যাহারা পলাইয়া গত রাত্রের জ্বলন্ত হুতাশন হইতে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, দূর হইতে তাহাদের জাতীয় চিহ্নসংযুক্ত পতাকা দেখিয়া তাহারা ঐ আগন্তুক

দলে ক্রমে ক্রমে মিশিতে লাগিল। দলের অধিনায়ক যেমনি রূপবান্, তেমনি বলবান্। পলায়িত সৈন্যগণের মুখে কি কথা শুনিয়া, তিনি চক্ষের পলকে সৈন্যগণসহ আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা ঘিরিয়া, শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় একে একে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহাশয়ের সৈন্যগণ যেন মহামন্ত্রে মোহিত—যেন মায়াপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত! শত্রুর তরবারি-তেজে তাহাদের প্রাণ যাইতেছে; দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহারা ভূতলে পড়িতেছে—এমন আশ্চর্য্য মোহ, কাহারও মুখে কথাটি নাই! কার যুদ্ধ কে করে? পলাইয়া যে, প্রাণরক্ষা করিবে, সে ক্ষমতা কাহারও দেখিলাম না। মহারাজ! দেখিবার মধ্যে দেখিলাম—দামেস্ক-সৈন্যমধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, হানিফার নাম করিয়া তাহারা ঐ মহাবীরের সম্মুখে সমুদয় অস্ত্র রাখিয়া নত শিরে দণ্ডায়মান! সেই দৃশ্য চক্ষু হইতে সরিতে না সরিতে আবার নূতন দৃশ্য!—কয়েকজন ভিন্ন দেশীয় সৈন্য আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে বন্দী অবস্থায় সেই বীরকেশরীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল; এবং তিনি সেনাপতি বাহাদুরকে ঐ বন্ধনদশায় মদিনাভিমুখে লইয়া গেলেন।”

এজিদ হাতের অস্ত্র ফেলিয়া বলিলেন, “সীমার বন্দী!”

মারওয়ান ক্ষণকাল আধোবদনে থাকিয়া বলিল, “মহারাজ! আমি বারবার বলিতেছি, সময় অতি সঙ্কটপূর্ণ! চারিদিকে বিপদ! যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ইহা নির্ব্বাপিত করিয়া রক্ষা পাওয়া সহজ নহে।”

এজিদ বলিলেন, “জয়নাল! যাও, কয়েক দিনের জন্য জগতের মুখ দেখ! মারওয়ানের কথায় আরও কয়েক দিন বন্দীগৃহে বাস কর।”

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, “ঈশ্বর রক্ষা না করিলে তোমার কি সাধ্য? মারওয়ানেরই বা কি ক্ষমতা? আমি বলি—তুমি যাও। আজ হইতে তুমিও তোমার প্রাণের চিন্তা করিতে ভুলিও না! তোমার সময় অতি নিকট। আমি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিব, কি তুমি কিছু দিন দেখিবে—ইহাতে নিশ্চয়তা কি?”

এজিদ মহারোষে জয়নাল আবেদীনকে লক্ষ্য করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বন্দীগৃহে বন্দী আনীত হইলেন।

জয়নাল আবেদীনের চির-বিরহে আর আমাদিগকে কাঁদিতে হইল না! ঈশ্বরের কি মহিমা!

পঞ্চদশ প্রবাহ

এই ত সেই মদিনার নিকটবর্ত্তী প্রান্তর। উভয় শিবিরের উচ্চ মঞ্চে রঞ্জিত মহানিশান উড়িতেছে, সমরাঙ্গণে সামরিক নিশান গগন ভেদ করিয়া বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে—অস্ত্র অবিশ্রান্তে চলিতেছে, 'মার্ মার্' শব্দ হইতেছে। আজ ব্যূহ নাই, সৈন্যশ্রেণীর শ্রেণীভেদ নাই, অস্ত্র-চালনার পারিপাট্য নাই, আত্মপর ভাবিয়া আঘাত নাই,—মরিতেছে, মারিতেছে, আহত হইয়া ভূতলে পড়িতেছে, হুহুঙ্কার বজ্রনাদে সমরাঙ্গণ কাঁপাইতেছে! আজ উভয় দলের সৈন্য-শোণিতে রণভূমি রঞ্জিত হইতেছে। জয়-পরাজয় কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছে না; কিন্তু অলীদ-সৈন্য অধিক পরিমাণে মারা পড়িতেছে। আজ মহাসংগ্রাম। উভয় দলে আজ বিষম সমর, দুর্দ্ধর্ষ রণ। সৈন্যগণের চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, মুখাকৃতি অতি কদর্য্য বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে—তাহারা রোষে, ক্রোধে যেন উন্মত্ত হইয়াছে;—তাহাদের মুখব্যাদনে জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ, কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইবে না—মনের তৃপ্তি জন্মিবে না বলিয়াই যেন নখাঘাত ও দন্তাঘাতের জন্য তাহারা ব্যাকুল রহিয়াছে! প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় যুদ্ধ। হানিফা আজ স্বয়ং সৈন্যগণের পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক, গাজী রহ্‌মান পরিচালক! মহাবীর অলীদও আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছে। এক প্রভাত হইতে অন্য প্রভাত গত হইয়াছে, এখন সূর্য্যদেব মধ্য গগনে,—কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিতেছে না—যুদ্ধও ইতি হইতেছে না। অলীদের প্রতিজ্ঞা,—আজ হানিফার শিরশ্ছেদ করিয়া জগতে মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিবে। হানিফারও চেষ্টা যে, আজ মদিনার পথ পরিস্কার না করিয়া ছাড়িবেন না—হয় অলীদ-হস্তে জীবন বিসর্জ্জন, না হয় সসৈন্যে মদিনায় প্রবেশ।

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, "সৈন্যগণ মহাক্লান্ত হইয়াছে। কি করিবে? এত মারিয়াও যখন শেষ করিতে পারিতেছে না, তখন আর উপায় কি?"

মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বল্গা ফিরাইয়া বলিলেন, "আজ উভয় দলেরই সৈন্য যে প্রকারে ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে মহাবিপদের আশঙ্কা দেখিতেছি। এখন না নিবারণের উপায় আছে, না উপদেশের সময় আছে, না কথা বলিবার সময় আছে। অলীদের সমস্ত সৈন্য শেষ হইলেও অলীদ কখনই পরাভব স্বীকার করিবে না, আমরাও তাহাকে পরাস্ত না করিয়া ছাড়িব না।"

এই প্রকার কথা হইতেছে, এমন সময় অলীদ-দলে আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ওত্‌বে অলীদ তাহার নূতন সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য যে সাজ প্রস্তুত করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ সাজে সজ্জিত সেনাগণ মস্‌হাব কাক্কার সঙ্গে আসিতেছিল। দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া আপন সেনা মনে করিয়া অলীদ মনের আনন্দে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিয়াছিল; গাজী রহ্‌মানের কর্ণে হঠাৎ ঐ বাজনার রোল মহা বিপদজনক ও বিষম বোধ হইতে লাগিল। কারণ, উভয় দলই প্রমত্ত, কেহই পরাজয় স্বীকার করে নাই; এ সময়ে সন্তোষের বাজনা কেন? গাজী রহ্‌মানের বিশাল চক্ষু মদিনা-প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল, চিন্তাস্রোত খরতর বেগে বহিতে লাগিল,—পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি পড়িতেই শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যুদ্ধ-জয়ের আশা, মদিনা-প্রবেশের আশা, তাঁহার অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া গেল।

গাজী রহ্‌মান মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "বাদশাহ্‌-নামদার! ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটাইতে মানুষের ক্ষমতা নাই। সৈন্যশ্রেণী যে প্রকারে চালনা করিয়াছিলাম, সৈন্যগণও যে বীর-বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল, অতি অল্প সময় মধ্যে অলীদ বাধ্য হইয়া পরাভব স্বীকারে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিত; আর সে যদি পথ না ছাড়িত, গাজী রহ্‌মানের হস্তে নিশ্চয়ই আজ বন্দী হইত। কিন্তু কি করি? ঐ দেখুন, উহারা যখন আমাদের পশ্চাদ্দিক হইতে আসিতেছে, তখন আর রক্ষার উপায় নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে —উভয় দিকেই শত্রু-সেনা, আর নিষ্কৃতি কোথা? নিশ্চয় আমরা বন্দী! আজ সৈন্যসহ আমরা নিশ্চয়ই বন্দী!!"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "বহু অশ্বারোহী সৈন্য বটে, পদাতিক সৈন্যও আছে। উহারা যেরূপ বীরদর্পে আসিতেছে, শত্রু-সেনা হইলে মহা বিপদ,—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ অনেক!—বাজনাই কি নিশ্চয়তার একমাত্র প্রমাণ? অথবা ওত্‌বে অলীদ কি এমনই অবোধ যে, না জানিয়া,—আপন-পর না ভাবিয়া আনন্দ-বাজনা বাজাইতেছে?—ইহারা কি নিশ্চয় দামেস্কের সৈন্য?"

আগন্তুক সৈন্যদল ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অলীদের মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, দামেস্ক হইতে মারওয়ান তাহার সাহায্যে আসিতেছে।

অলীদ সদর্পে বলিতে লাগিল, "বন্দী! বন্দী!! মোহাম্মদ হানিফা আজ সৈন্যসহ নিশ্চয়ই বন্দী!!! আর কি সন্দেহ আছে? আমারই নির্ব্বাচিত চিহ্ন-সংযুক্ত নূতন সাজ! উহারা দামেস্কের সৈন্য না হইয়া যায় না। বাজাও ডঙ্কা! বাজাও ভেরী! কিসের ভয়? সহস্র হানিফা আসিলেও আজ তাহাদের অলীদ-হস্তে নিশ্চিত পরাজয়—সম্মুখে অস্ত্র, পশ্চাতে অস্ত্র, ইহাতে কি আর রক্ষা আছে? কার সাধ্য? জগতে এমন কোন বীর নাই যে, সম্মুখ পশ্চাৎ উভয় দিক রক্ষা করিয়া সমানভাবে শত্রু সম্মুখীন হইতে পারে।"

মনের উল্লাসে অলীদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"মোহাম্মদ হানিফা, তুমি কোথায়? তোমার চক্ষু কোন্ দিকে? তুমি কায়মনে যে ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছ, সেই ঈশ্বরের দোহাই,—একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখ। এখনও অলীদের সম্মুখে অস্ত্র রাখিলে না—এখনও যুদ্ধে বিরত হইলে না? একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, তোমার জীবন-প্রদীপ এখনই নির্ব্বাপিত হইবে। তোমার বুদ্ধিমান মন্ত্রী গাজী রহ্‌মানের জীবন এখনই শেষ হইবে। সম্মুখে অলীদ, পশ্চাতে মারওয়ান, এখনও যুদ্ধ? রাখ তরবারী—কর পরজয় স্বীকার—মঙ্গল হইবে!—ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও; আত্মসমর্পণের এই-ই উপযুক্ত সময়! বীরের মান বীরই রক্ষা করিয়া থাকে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমাদের সকলের পরমায়ু শেষ হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই! আবার বলি, পশ্চাতে চাহিয়া দেখ,—মহারাজ এজিদের কারুকার্য্যখচিত উড্ডীয়মান নিশানের প্রতি চাহিয়া দেখ।"

গাজী রহ্‌মান এ পর্য্যন্ত নিশানের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। অলীদের কথায় নিশানের প্রতি চাহিয়াই ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। এদিকে অলীদও ভয়ে বিহ্বলপ্রায় হইয়া অশ্ব ছুটাইয়া শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল।

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহ্‌মানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি? নিশান দেখিয়া অলীদের মুখ ভারী হইল কেন? ওরূপ দ্রুতবেগে সে হঠাৎ শিবিরেই বা চলিয়া গেল কেন?"

"বাদশাহ্-নামদার! অলীদের বাজনার ধূমে আমি আমার চিন্তাকে ভ্রমপূর্ণ বিপথে চালনা করিয়াছিলাম। অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, অনুমান প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া যে কার্য্য করে, তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব? আরও অধিক আশ্চর্য্য যে, একজন সেনাপতি এইরূপ করিয়াছেন! অলীদ যে কি প্রকৃতির সেনাপতি, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না। কি গুণে এত অধিক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া সে প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অলীদের প্রতি আমার কিছুই ভক্তি নাই। আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, ইহারা কি প্রকারে মহাবীর হাসান-হোসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে! একটু অপেক্ষা করুন, সকলি দেখিতে পাইবেন।"

"আমারও সন্দেহ হইতেছে। ঐ সকল চিহ্নিত পাতাকা কখনই এজিদের নহে।"

"বাদশাহ্-নামদার! অলীদ আমাকে ভ্রম-কূপে ডুবাইয়াছে, এখন আর কিছুই বলিব না—সকলই ঈশ্বরের মহিমা।"

এদিকে রণপ্রাঙ্গণে অলীদ-পক্ষীয় সৈন্য তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিসাৎ হইতেছে। পূর্ব্বে একদল হত হইলেই যে অন্য দল আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছিল, এখন তাহা আর হইতেছে না। যাহারা সমরে লিপ্ত ছিল, তাহারা ক্রমেই ক্ষয় পাইতে লাগিল।

সন্দেহ দূর হইল। মোহাম্মদ হানিফার সৈন্যগণ জাতীয় পতাকা স্পষ্টভাবে দেখিয়া সজোরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রান্তরের সহিত রণস্থলও কাঁপাইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে মস্‌হাব কাক্কা সৈন্যসহ আসিয়া হানিফার

সহিত যোগ দিলেন। মস্‌হাব কাক্কা হানিফার পদচুম্বন করিয়া বলিলেন—“বিলম্বের কারণ পরে বলিব, এখন কি আজ্ঞা ?”

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, “ভাই! পরে শুনিব,—কথা পরে শুনিব, এখন ধর তরবারি—মার কাফের, তাড়াও অলীদ। মনের কথা কহিতে, দুঃখের কান্না কাঁদিতে, অনেক সময় পাইবে। সে সকল কথা মনেই গাঁথা আছে। এখন প্রথম কার্য্য,—মদিনায় প্রবেশ। তোমার তরবারি এদিকে চলিতে থাকুক, আমি অন্য দিকে চলিলাম।”

হানিফা অসি উঠাইলেন। মস্‌হাব কাক্কাও ঈশ্বরের নাম করিয়া শত্রু-নিপাতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। উভয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব নব ভাবের আবির্ভাব হইল। উভয় দলের বাজনা একত্রে বাজিতে লাগিল, উভয় দলের সৈন্য মিলিয়া এক হইয়া চলিল,—অলীদের মনেও নানারূপ চিন্তার লহরী খেলিতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফার বিরুদ্ধেই জয়ের আশা ছিল না, তাহার পর তত্তুল্য আর একটি বীর হঠাৎ উপস্থিত হইল—অস্ত্রও ধারণ করিল—আর রক্ষা নাই! কিছুতেই আর রক্ষা নাই!!

অলীদ মহা সঙ্কটে পড়িল, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর সে মনে মনে সাব্যস্ত করিল : ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে, সহসা মস্‌হাব কাক্কার সম্মুখে যুদ্ধে যাইব না। দেখি, মস্‌হাব কাক্কা কি করে।

অলীদ গুপ্তস্থানে বসিয়া দেখিতে লাগিল যে, হানিফা দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া মদিনার গমন-পথ পরিষ্কার করিতেছেন ; মস্‌হাব কাক্কা বাম পার্শ্বে (তাহারই দিকে) অস্ত্রচালনা করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, আর বারবার ‘অলীদ’ নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন এবং বলিতেছেন, “অলীদ! শীঘ্র বাহির হও,—শিবির হইতে শীঘ্র বাহির হও! তোমার বীরত্ব দেখিতেই আজ ক্লান্ত, পথশ্রান্ত শরীরেই অস্ত্র ধরিয়াছি—আইস, আর বিলম্ব কি অলীদ? অলীদ! আইস, আজ তোমাকে দেখিব। ঈশ্বরের দোহাই, তোমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিব। তোমার বল, বিক্রম, সাহস সবই দেখিব। যদি সময় পাই, তবে তোমার তরবারির তেজ, বর্শার

ধার, তীরের লক্ষ্য, খঞ্জরের হাত, গদার আঘাত,—সকলই দেখিব। ভয় কি? শত্রু যুদ্ধপ্রার্থী,—তুমি শিবিরে? ছিঃ ছিঃ! বড় ঘৃণার কথা। ছিঃ ছিঃ! অলীদ! তুমি না সেনাপতি?—এজিদের বিশ্বাসী সেনাপতি?"

মস্‌হাব কাক্কা অলীদকে ধিক্কার দিয়া, তাহার উপর ঘৃণা জন্মাইয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন; কিন্তু অলীদ গুপ্তভাবে থাকিয়া কি দেখিতেছে, কি চিন্তা করিতেছে, তাহা সেই-ই জানে। তাহার সৈন্যগণের হাবভাবে তাহাকে আরও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল; চতুর্দ্দিকে ভীষণ বিভীষিকাময় মুর্ত্তি সে দেখিতে লাগিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবে, মদিনার পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে, এখনই ছাড়িয়া দিতে হইবে,—না হয় বন্দীভাবে হানিফার পদানত হইতে হইবে, ইহাতে দুঃখ নাই,—অপমানের কথা নাই। কিন্তু আপন সৈন্য দ্বারা অপমানিত হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা এবং লজ্জার কারণ মনে করিয়া, অলীদ বাধ্য হইয়া সশস্ত্রে মস্‌হাব কাক্কার সম্মুখীন হইল।

মসহাব কাক্কা বলিলেন, "অলীদ! শত্রুসম্মুখে আসিতে, যুদ্ধার্থে রণক্ষেত্রে পদবিক্ষেপ করিতে, তোমার আমার কি এত বিলম্ব শোভা পায়? যাহা হউক, আইস, অগ্রে তোমার বাহুবল পরীক্ষা করি। আমি তোমাকে অস্ত্রাঘাতে মারিব না—নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার প্রতি মস্‌হাব কাক্কা কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না।"

অলীদ চক্ষু দুইটি পাকাইয়া বলিল, "মহাবীরের দর্প দেখ, অস্ত্রাঘাতে মারিবেন না, কথার আঘাতে মারিবেন!"

"আরে পামর! কথা রাখ্, অস্ত্র ধর্!"

"মস্‌হাব? তুমি এইমাত্র আসিয়াছ—এখনই যুদ্ধ? কে না বলিবে—যে দেখিবে সেই-ই বলিবে, যে শুনিবে সেই-ই বলিবে যে, মস্‌হাব দুর্গম পথশ্রান্তিতে কাতর ছিল, ক্ষণকালও বিশ্রাম করে নাই, যেমনই দেখা অমনই যুদ্ধ—কাজেই পরাস্ত! তাই আমার বিলম্বের কারণ। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিলে না—তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি এতক্ষণ আসি নাই।"

মস্‌হাব কাক্কা রোষে অধীর হইয়া সিংহনাদে অলীদের দুই হস্ত নিজের দুই হস্তে ধরিয়া সজোরে তাহার অশ্বকে পদাঘাত করিলেন, অশ্ব বহু দূরে ছিট্‌কাইয়া

পড়িল। অলীদ কাক্কার হস্তে রহিয়া গেল। মস্‌হাব অলীদকে লইয়া এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান হইলেন। বীরবর অলীদ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কাক্কার হস্ত হইতে হস্ত ছাড়াইতে পারিল না।

মস্‌হাব বলিলেন, "এই ত প্রথম পরীক্ষা; দ্বিতীয় পরীক্ষাও দেখ্।"

এই কথা বলিয়াই অলীদকে শূন্যে উঠাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ কাফের দেখ্, কাহার কথা সত্য,—আমি কথার আঘাতে পারি, কি আছাড় মারিয়া মারিতে পারি?" চতুর্দ্দিক হইতে তখন মহাগোলযোগ হইয়া উঠিল। সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ যায়, দামেস্করাজ এজিদের সেনাপতি শূন্যে চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রাণ হারায়—বড়ই লজ্জার কথা! অলীদ-সৈন্য মস্‌হাবের দিকে 'মার্ মার্' শব্দে মহারোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে মোহাম্মদ হানিফা ঐ গোলযোগের কারণ জানিতে আসিয়া দেখিলেন: অলীদ কাক্কার হস্তে উত্তোলিত হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছে, তাহার আর রক্ষা নাই!

মোহাম্মদ হানিফা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই মস্‌হাব, আমার কথা রাখ! ভাই. আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, কথা রাখ। ভাই, ক্ষান্ত হও, অলীদকে প্রাণে মারিও না! মারিও না!! আমি বারণ করিতেছি, উহাকে প্রাণে মারিও না।"

মস্‌হাব বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য; কিন্তু আমি ইহাকে একটি আছাড় না মারিয়া ছাড়িব না,—তাহাতেই যদি উহার প্রাণ দেহপিঞ্জরে আর না থাকে, কি করিব? উহার প্রতি আমি অস্ত্রের আঘাত করিব না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এজিদের সেনাপতির বীরত্ব দেখুন, বাহুবল দেখুন!"

এই কথা বলিয়াই মস্‌হাব কাক্কা অলীদকে সজোরে বহুদূর শূন্য হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। অলীদ চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে দেখিতে বিংশতি হস্ত ব্যবধানে ছুটিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সে ক্ষণকাল অচেতন হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিল। একটু চমক ভাঙ্গিলেই দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে চাহিয়াই উঠিতে উঠিতে পড়িতে পড়িতে রণ-প্রাঙ্গণ হইতে সভয়ে ফিরিয়া

চাহিতে চাহিতে অলীদ শিবিরাভিমুখে মহাবেগে প্রস্থান করিল। সে এখন কাক্কার হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। আর কি করিবে? শেষ পন্থা—পলায়ন।

মস্‌হাব কাক্কা বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, "আয় রে কাফেরগণ! আয়, মদিনার পথে বাধা দিতে আয়। এই মস্‌হাব চলিল।"

মস্‌হাব সমুদয় সৈন্য লইয়া অলীদ-শিবির পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। কার সাধ্য মস্‌হাবকে বাধা দেয়? কে সেই বীরকেশরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়?

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, "আজ মদিনায় প্রবেশ করিব না, এই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তঃসীমাতেই থাকিব। সৈন্যগণ মহাক্লান্ত হইয়াছে। আরও কথা আছে, মদিনা প্রবেশের পূর্ব্বে আমাদের কতক সৈন্য নগরের বহির্ভাগে, নগর-প্রবেশ-দ্বারে সর্ব্বদা সজ্জিভাবে অবস্থিতি করিবে। দামেস্কের মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষ, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। ছল, চাতুরি, অধর্ম্ম, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা তাহাদের আয়ত্তাধীন—জাতিগত স্বভাব।"

মস্‌হাব কাক্কা সম্মত হইলেন, মোহাম্মদ হানিফাও গাজি রহ্‌মানের কথা গ্রাহ্য করিলেন। সৈন্যগণ অলীদের শিবির লুটপাট করিয়া, খাদ্যসামগ্রী অস্ত্র-শস্ত্র যাহা পাইল লইয়া, 'জয় জয়' রবে প্রান্তর কাঁপাইয়া বীরনাদে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল।

মস্‌হাব কাক্কা মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "হজরত! আর একটি কথা। তুরস্ক ও তোগান রাজ্যের ভূপতিদ্বয় আমার সঙ্গে আছেন, তাঁহারা পথে সীমার-হস্তে যেরূপ বিধ্বস্ত, বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বলিব। এক্ষণে একটি শুভ-সংবাদ অগ্রে না দিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। সেই পাপাত্মা সীমারকে আমি বন্দী করিয়া আনিয়াছি।"

হানিফার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—নির্ব্বাপিত আগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল—কারবালার কথা মনে পড়িল। হুহু শব্দে তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন, মস্‌হাব অপ্রতিভ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে হানিফা মস্‌হাবের হস্ত ধরিয়া

বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার মাথার মণি, হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের ভাই। আইস! তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি। তুমি সীমারকে বন্দী করিয়াছ—তোমার এ গৌরব-কীর্ত্তি অক্ষয়রূপে জগতে চিরকাল সমভাবে থাকিবে—তুমি বিনামূল্যে আজ হানিফাকে ক্রয় করিলে। ভ্রাতঃ! আর আমার গমনে সাধ্য নাই। সীমারের নাম শুনিয়া আমি অধীর হইয়াছি। আরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভ্রাতৃবরের শিরশ্ছেদ-বিবরণ শ্রবণ অবধি, সীমারকে একবার দেখিব বলিয়া মনে করিয়াছি। দেখিব তাহার দক্ষিণ হস্তে কত বল, সে খঞ্জর ধরিতে কেমন পটু! তাহাকে কয়েকটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিব। ইহা ছাড়া সীমারে আর আমার কোন সাধ নাই। সীমার সম্বন্ধে তুমি যাহা করিবে আমি তাহার সঙ্গী আছি। আর বেশী দূর যাইব না, আজ এইখানেই বিশ্রাম।"

ষোড়শ প্রবাহ

পরিণাম কাহার না আছে? নিশার অবসান, দিনের শেষ, সন্ধ্যার শেষ, পরমায়ুর শেষ, গর্ভের প্রসব, উপন্যাসের মিলন, নাটকের যবনিকা-পতন অবশ্যই আছে। পুণ্যের ফল, পাপের শাস্তি—ইহাও নিশ্চিত।

সীমার আজ বন্দী! যে সীমারের নামে হৃদয় কাঁপিয়াছে, যে সীমার জগৎ কাঁদাইয়াছে, সেই সীমার আজ বন্দী! সেই সীমারের আজ পরিণাম-ফল—শেষ দশা! মোহাম্মদ হানিফা, মস্‌হাব কাক্কা, গাজী রহ্‌মান এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের মত হইল যে, সীমারকে কিছুতেই ইহজগতে রাখা বিধেয় নহে। এমন নিষ্ঠুর, অর্থ-পিশাচ পাপাত্মার মুখ আর চক্ষে দেখা উচিত নহে। তবে কি কর্ত্তব্য?—যমালয়ে প্রেরণ। কি প্রকারে?—এখনও তাহা সাব্যস্ত হয় নাই।

অলীদকে ধৃত করিয়া মোহাম্মদ হানিফা কেন ছাড়িয়া দিলেন?—তিনিই জানেন! মোহাম্মদ হানিফা মদিনার প্রবেশ-পথে নির্ব্বিঘ্নে

রহিয়াছেন, সীমারের শাস্তিবিধান করিয়া অগুই মদিনায় যাইবেন—এই কথাই প্রকাশ পাইয়াছে।

অলীদের যুদ্ধের আর সাধ নাই—হানিফার মদিনা-গমনে বাধা দিবার আর শক্তিও নাই, মোহাম্মদ হানিফা যখন তাহাকে ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন এক প্রকার প্রাণের ভয়ও নাই,—কিন্তু আশঙ্কা আছে। মস্‌হাব কাক্কার কথা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরে জাগিতেছে। কি লজ্জা! অধীনস্থ যে সৈন্যগণ জীবিত আছে, তাহারাই বা মনে মনে কি বলিতেছে? আর এক কথা—সে কথা সে কাহাকেও বলে নাই—মনে মনেই চিন্তা করিতেছে, মনে মনেই দুঃখভোগ করিতেছে ঃ দামেস্কের বহুতর সৈন্য মস্‌হাব কাক্কার সঙ্গী হইয়াছে, ইহার কারণ কি? কেন তাহারা কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিল—ইহার কি কোন কারণ আছে? এই সকল ভাবিয়া অলীদ দামেস্কে না যাইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভগ্ন-শিবিরে হানিফার মদিনা-প্রবেশকাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকাই স্থির করিয়াছে।

অসময়ে হানিফার শিবিরে আনন্দের বাজনা। আজ আবার বাজনা কেন? অলীদ ভাবিল ঃ আবার কি যুদ্ধ? আবার কি মস্‌হাব কাক্কা রণক্ষেত্রে? মনোযোগের সহিত সে দেখিতে লাগিল, আবার সেই দূরদর্শন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিল, দেখিল—যুদ্ধসাজ নহে। মস্‌হাব কাক্কা, মোহাম্মদ হানিফা প্রভৃতি বীরগণ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে শিবিরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে বহির্গত হইলেন এবং হস্তপদ বন্ধন অবস্থায় একজন বন্দীকে কয়েকজন সৈন্য ধরাধরি করিয়া আনিল। পরে উভয় শিবিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক লৌহদণ্ডের সহিত তাহার বক্ষঃ বাঁধিয়া দুই দিকে অপর দুই দণ্ডের সহিত তাহাকে কঠিনরূপে বাঁধিয়া তাহার পদদ্বয় ঐ হস্তাবদ্ধ দণ্ডের নিম্নভাগে আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল।

অলীদ মনে মনে ভাবিতেছে, এ আবার কি কাণ্ড উপস্থিত? এমন নিষ্ঠুরভাবে ইহাকে বাঁধিয়া তীরধনু-হস্তে সকলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি-ভাবে কেন ঘিরিয়া দাঁড়াইল? এ লোকটি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে? ইহার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে কেন? একটু অগ্রসর হইয়া দেখি—কার এই দুর্দ্দশা?—কোন্ হতভাগার পাপের ফল?

মসহাব কাক্কা ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আজ তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার নাম কর, তোমার কৃত সকল পাপ-কথা মনে কর। দেখিলে—জগৎ কেমন ভয়ানক স্থান? দেখিলে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে কর্ম্মফল কিঞ্চিৎ পরিমাণে এখানেই পাওয়া যায়। লোক অজ্ঞতা-তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া ভবিষ্যতের জ্ঞান হারাইয়া অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু শেষে রক্ষা পায় কোথায়? কে রক্ষা করে? মাতা, পিতা, স্ত্রী-পরিবার, পরিজন কেহ কাহারও নহে!—আজ কে তোমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল?—কে তোমার পক্ষ লইয়া দুইটা কথা বলিল? মোহ-তিমিরে কেমন আচ্ছন্ন হইয়াছিলে? —তোমার হৃদয় আকাশ কেমন ঘটনার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলে? তুমি একবার ভাব দেখি, নূরনবী মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেনের মস্তক সামান্য অর্থলোভে স্বহস্তে ছেদন করিয়া তোমার কি লাভ হইল? আরও অনেকে তোমার সঙ্গে ছিল, তাহারাও যুদ্ধ জয় করিয়াছিল; কিন্তু ইমাম-শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কৈ কেহই ত অগ্রসর হয় নাই? ধিক্ তোমাকে! সীমার, শত ধিক্ তোমাকে!—তুমি জগৎ কাঁদাইয়াছ,—পশুপক্ষীর চক্ষের জল ঝরাইয়াছ,—মানবহৃদয়ে বিষময় বিশাল শেলের আঘাত করিয়াছ। আকাশ-পাতাল, বন-উপবন, পর্ব্বত, বায়ু তোমার কুকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে—সে রবে প্রকৃতি-বক্ষঃ পর্য্যন্ত ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু তোমার পরিণাম-দশা—তুমি কিছুই ভাব নাই। দেখ দেখি! আজ তোমার কোন্ দিন উপস্থিত? সীমার! তুমি কি ভাবিয়াছিলে যে, সে দিন—চিরদিনই, তোমার সুখসেব্য সুদিনই যাইবে? এক দিনও কি সে দিনের সন্ধ্যা হইবে না। দেখ দেখি, এখন কেমন কঠিন সময় উপস্থিত! সে পবিত্র মস্তক পবিত্র দেহ হইতে ছিন্ন করিতে খঞ্জর দ্বারা কত কষ্ট দিয়াছ। সে যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভু কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—মনে হয়? ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম! ইমামের মুমূর্ষু অবস্থার কথা মনে হয়? তোমাকে নারকী বলিতে পারি না! পরকালের জন্য যে, তোমার চিন্তা নাই, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া

জানি। তোমার পাপভার—সে পাপভার, হায়! হায়!! তুমি যাঁহার বুকের উপর উঠিয়া খঞ্জর দ্বারা গলা কাটিয়াছিলে, তিনিই লইয়াছেন। কিন্তু সীমার! জগতে দৈহিক যাতনার দায় হইতে উদ্ধার করিতে তোমার মুখপানে চায় এমন লোক কৈ? ঈশ্বরের লীলা দেখ, তোমারই অনুগত সৈন্য তোমারই হস্তপদ বন্ধন করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া দিল। ইহাতেও কি তুমি সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি ভক্তি সহকারে বিশ্বাস করিবে না? এখনও কি তোমার পূর্ব্বভাব অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই? এই আসন্নকালে একবার ঈশ্বরের নাম কর। সীমার! আমরা তোমার সমুচিত শাস্তিবিধান করিব বলিয়া আজ তীরহস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তোমায় তরবারি আঘাত করিলাম না,—বর্শা দ্বারা ভেদ করিলাম না; এই বিষাক্ত তীরে তোমার শরীর জর্জ্জরিত করিয়া তোমাকে ইহজগৎ হইতে দূর করিব। ঐ দেখ, তোমার প্রিয়বন্ধু ওত্‌বে অলীদ ছল-ছল নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছে মাত্র। কে আজ তোমার সাহায্য করিতে আসিল? তোমার নীরব রোদন কে কর্ণপাত করিল? তুমি যাহার নিতান্ত অনুগত, তোমার আজিকার দশা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে, আজিকার এ অভিনয়ের অভাবনীয় দৃশ্য রাজার গোচর করিতে —অনেক চক্ষু তোমার দিকে রহিয়াছে, দেখিতেছি। কিন্তু কেহই তোমার কিছু করিল না। কি আশ্চর্য্য, তাহাদের অস্ত্রের অভাব নাই, সাহসের অভাব ঘটিয়াছে কিনা জানি না;—কৈ, তাহারা কি করিল? জগতে কেহ কাহারও নহে! সকলেই স্বার্থের দাস, লোভের কিঙ্কর। তোমার সঞ্চিত অর্থ আজ কোথায় রহিল? সেই পুরস্কারের লক্ষ টাকায় কি উপকার হইল? ঈশ্বর-কৃপায় তুমি আজ আমাদের ক্রীড়ার সামগ্রী। ধনুর্ব্বাণ সহ তোমাকে লইয়া আজ ক্রীড়া করিব। সীমার! তোমার কৃতকার্য্যের ফল সামান্যরূপে আজ আমাদের হস্তে ভোগ কর। এই আমার কথার শেষ—প্রথম বাণ-নিক্ষেপ! দেখ বাণের আঘাত কত মিষ্ট বোধ হয়!—কেমন সুখসেব্য নিদ্রা আইসে!"

ধনুর টঙ্কার সীমারের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

প্রাণের মায়া কাহার না আছে ? আজ সীমারের চক্ষে জল পড়িল, আজ পাষাণ গলিল। পূর্ব্বকৃত প্রতি মুহূর্ত্তের পাপকার্য্যের ভীষণ ছবি তাহার মনে উদিত হইল। পাপময় জীবনের নিদারুণ ভীষণ পাপছায়া তখন সীমারের চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল, জলবিন্দুর সহিত শরীরের রক্তবিন্দু ঝরিতে লাগিল। সীমার ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া হোসেনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া জীবন-শেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শরীরের মাংসসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে দেহস্খলিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে—তথায় সীমারের প্রাণ দেহ পিঞ্জরে ঘুরিতেছে। মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি দ্বিগুণ জোরে শর-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সীমারের শরীরের গ্রন্থিসকল ছিন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তবু প্রাণ বাহির হয় না। কি কঠিন প্রাণ! তখন সীমার ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "হে ঈশ্বর! আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমার শরীরের মাংসখণ্ড প্রায় স্খলিত হইয়া পড়িল, অস্থিসকল জরজর হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল, তবু প্রাণ বাহির হইল না। হে দয়াময়! আমিও তোমার সৃষ্ট জীব, আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর, আমার প্রাণবায়ু শীঘ্রই হোসেনের পদপ্রান্তে নীত কর।"

মোহাম্মদ হানিফা এবং মস্‌হাব কাক্কা এই কাতরপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া শরাসনে জ্যা শিথিল করিলেন, আর তূণীরে হস্ত নিক্ষেপ করিলেন না। সকলেই দয়াময়ের নাম করিয়া শত সহস্র প্রকারে তাঁহার গুণানুবাদ করিলেন। ক্রমে সীমারের প্রাণবায়ু ইহজগৎ হইতে অনন্ত আকাশে মিশিয়া হোসেনের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বীরকেশরিগণ আর সীমারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; শিবিরে আসিয়া মদিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ওত্‌বে অলীদ বিষণ্ণ বদনে দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিল। যে আশা তাহার অন্তরে জাগিতেছিল, সে আশা আশা-মরীচিকাবৎ ঐ প্রান্তরের বালুকা-কণা মধ্যে মিশিয়া গেল। মনে মনেই সে বুঝিল, সীমারের সৈন্যগণ মস্‌হাব কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। আর আশা কি? এ প্রান্তরে আর আশা কি?

সপ্তদশ প্রবাহ

মন্ত্রণাগৃহে এজিদ একা! দেখিয়াই বোধ হয়, কোন বৃহৎ চিন্তায় এখন তাঁহার মস্তিষ্ক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। দুঃখের সহিত চিন্তা,—এ চিন্তার কারণ কি? কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৃহের চতুষ্পার্শে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন;—দেখিলেন: কেহই নাই। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে মারওয়ান মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত থাকিবে; সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, অথচ, মন্ত্রিবর আসিতেছে না! এজিদের চিন্তাকুল অন্তর ক্রমেই অস্থির হইতেছে। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদু মৃদু স্বরে তিনি বলিলেন,—"সীমার বন্দী! এত দিন পরে সীমার শত্রু-হস্তে বন্দী! অলীদেরও প্রাণের আশঙ্কা! আমারই সৈন্য—আমারই চির অনুগত সৈন্য যখন বিপক্ষদলে মিশিয়াছে, তখন আর কল্যাণ নাই। হায়! কি কুক্ষণেই জয়নাব-রূপ নয়নে পড়িয়াছিল। সে বিশালাক্ষির দোলায়মান কর্ণাভরণের দোলায় কি মহা অনর্থই ঘটিল! অকালে কত প্রাণীর প্রাণপাখী দেহ-জগৎ হইতে একেবারে উড়িয়া চলিয়া গেল। শত শত নারী পতিহারা হইয়া মনের দুঃখে আত্মবিসর্জ্জন করিল। কত মাতা সন্তান-বিয়োগে অধীরা হইয়া অস্ত্রের সহায়তায় দৈহিক মায়া হইতে—শোক-তাপের যন্ত্রণা হইতে—আত্মাকে রক্ষা করিল! কত শিশু-সন্তান এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতার ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল! ছিঃ! ছিঃ!! সামান্য প্রেমের দায়ে, দুরাশার কুহকে মহাপাপী হইতে হইল! হায়! হায়!! রূপজমোহে মোহিত হইয়া, আত্মহারা, বন্ধুহারা, শেষে সর্ব্বস্বহারা হইতে হইল! বিনা দোষে, বিনা কারণে কত পুণ্যাত্মার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল! এত হইল, এত ঘটিল, তবুও আগুন নিভিল না,—সে জ্বলন্ত হুতাশনের তেজ কমিল না,—সে প্রেমের জ্বলন্ত শিখা আর নীচে নামিল না—সে রত্ন হস্তগত হইয়াও আশা পূর্ণ হইল না,—স্ববশে আসিল না!—হোসেনকে বধ করিয়াও সে চিন্তার ইতি হইল না!

ক্রমেই আগুন দ্বিগুণ ত্রিগুণরূপে জ্বলিয়া উঠিল। সৈন্যহারা, মিত্রহারা রাজ্যহারা, ক্রমে সর্ব্বস্বহারা হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল! ধিক্ রমণীর রূপে! শত ধিক্ কু-প্রেমাভিলাষী পুরুষে! সহস্র ধিক্ পরস্ত্রী-অপহারক রাজায়!"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই মারওয়ান উপস্থিত হইয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিল। এজিদ অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সীমারের কি হইল?"

"মহারাজ! সীমার যখন বিপক্ষদলের হস্তগত হইলেন, তখন তাঁহার আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন ওতবে অলীদের রক্ষা, রাজ্যরক্ষা, প্রাণরক্ষা,—এই সকল রক্ষার উপায় চিন্তা করাই অগ্রে কর্ত্তব্য। সীমার উদ্ধারের, সীমারের আশা আর করিবেন না। কারণ, সীমার মোহাম্মদ হানিফার হস্তগত হইলে তাহার রক্ষা কিছুতেই নাই।"

"তবে কি সীমার নাই?"

"সীমার নাই—একথা বলিতে পারি না। তবে অনুমানে বোধ হয় যে, সীমার মোহাম্মদ হানিফার হস্তে পড়িয়াছে। সুতরাং সীমার-উদ্ধারের চিন্তা না করিয়া অলীদ-উদ্ধারের চিন্তাই এক্ষণে আবশ্যক হইয়াছে। তাহার পর এ কয়েক দিনে যদি অলীদ বন্দী হইয়া থাকে, কি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, তবে প্রথম চিন্তা দামেস্ক-রাজ্য রক্ষা—আপনার প্রাণরক্ষা। আপন সৈন্য যখন বিপক্ষদলে মিশিয়াছে, তখন দুঃসময়ের পূর্ব্ব-চিহ্ন, দুরাবস্থার পূর্ব্বলক্ষণ সম্পূর্ণ বিপদের সূচনা দেখাইয়া অমঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে। আমাদের সৌভাগ্য-শশী চিররাহুগ্রস্ত হইবে বলিয়াই জগতের অন্ধকার ছায়ার দিকে ক্রমশঃই সরিতেছে।"

এজিদের কর্ণে কথা কয়টি বিষসংযুক্ত সূচিকার ন্যায় বিদ্ধ হইল। তাঁহার মনের পূর্ব্বভাব কে যেন হরণ করিয়া অন্তরময় মহাবিষ ঢালিয়া দিল। সিংহ-গর্জ্জনে তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কি, আমি বাঁচিয়া থাকিতে দামেস্কের সৌভাগ্য-শশী চিররাহুগ্রস্ত হইবে? একথা তুমি আজ কোথায় পাইলে? কে তোমার কর্ণে এ মূলমন্ত্র দিয়াছে? মারওয়ান! বুঝিলাম, হানিফার তরবারির তেজের কথা শুনিয়া তোমারও হৃৎপিণ্ডের শোণিতধার

শুকাইয়া গিয়াছে। তুমিও নিশ্চয় জানিও, এজিদ বর্ত্তমান থাকিতে এ রাজ্যের সৌভাগ্যশশীর অল্প পরিমাণ অংশও রাহুর গ্রাসে পতিত হইবে না। আমি তোমাকে এইক্ষণে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহারই উত্তর দাও। জয়নাল আবেদীন, হাসান-পরিবার ইহারা কি এখনও জীবিত থাকিবে? মোহাম্মদ হানিফা যদি সীমারের প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি জয়নালের শিরশ্ছেদ স্বহস্তে করিব।"

"মহারাজ! এ সময়ে জয়নাল আবেদীনের প্রাণ বিনাশ করিলে আর নিস্তার নাই। এ জ্বলন্ত অগ্নি এখনও নির্ব্বাণের উপায় আছে—এখনও রক্ষার উপায় আছে—এখনও সন্ধির আশা আছে। কিন্তু জয়নালের কোন অনিষ্ট ঘটাইলে ধন, জন, রাজ্য, প্রাণ সমূলে বিনাশের সুপ্রশস্ত পথ পরিস্কার করিয়া দেওয়া হইবে। দামেস্ক-রাজ্যের আশা, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া জয়নাল আবেদীনকে যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পারেন। এখনও পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক জয়নালকে ছাড়িয়া দিলে দামেস্ক-নগর রক্ষার আশা করিলেও করা যাইতে পারে। দেখুন, হাসানের বধ-সাধন হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী হামান প্রকাশ্য সভায় যখন সারগর্ভ রাজনৈতিক উপদেশচ্ছলে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময় আমি তাঁহার মতের পোষকতা করি নাই। যদি জানিতাম যে, হোসেন ব্যতীত মোহাম্মদ হানিফা নামে প্রবল পরাক্রান্ত আরও এক বীর আছে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সচিবের কথা কখনও অবহেলা করিতাম না। আপনার মত প্রবল করিয়া কোনকালেই অগ্রসর হইতাম না; যদি হইতাম, তবে অগ্রে হানিফার বধ-সাধন না করিয়া হোসেনের বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিতাম না। ভ্রম লোকের সর্ব্বনাশের মূল। ভ্রমই মনুষ্যের অমঙ্গলের কারণ!"

"মারওয়ান! তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি আজ কেন হইল? আমি পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি করিব? প্রাণের ভয়ে হানিফার সহিত সন্ধি করিব? জয়নালকে, হাসান-পরিজনকে ছাড়িয়া দিব? জয়নাবকে ছাড়িয়া দিব? ধিক্ তোমার কথায়! আর শত ধিক্ এজিদের প্রাণে! মারওয়ান! বল ত, এ মহাসংগ্রামের কারণ কি? এ ঘটনার মূল কি? তুমি কি

সকলি বিস্মৃত হইয়াছ ? মনে হয়, তুমিই না বলিয়াছিলে, স্ত্রীজাতি বাহ্যিক সুখপ্রিয় ? কৈ এত দিনেও ত তোমার কথার সত্যতা-প্রমাণ বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাইলাম না। জগতে সুখী হইতে কে না ইচ্ছা করে ? —এও তোমারই কথা। কৈ, জয়নাব বন্দীগৃহে মহাক্লেশে থাকিয়াও ত সুখী হইতে ইচ্ছা করে না, পাটরাণী হইতেও চাহে না ? মারওয়ান ! তোমাদের পদে পদে ভ্রম ! আমি ত উন্মাদ। গত বিষয়ের আলোচনা বৃথা। আমার আজ্ঞা এই যে, তোমাকে এখনই অলীদের সাহায্যে এবং সীমারের উদ্ধারে যাইতে হইবে।"

"আমি যাইতে প্রস্তুত। অলীদের সাহায্য ব্যতীত এ সময়ে হানিফাকে আক্রমণ করিতে আমি পারিব না।"

"সুযোগ পাইলে আক্রমণ করিবে না ?"

"সুযোগ পাইলে মারওয়ান ছাড়িয়া দিবে, তাহা মনে করিবেন না। তবে বলিতেছি যে, অগ্রে অলীদকে রক্ষা করাই আমার প্রধান কার্য্য। সীমারের দেখা পাইলে, কিম্বা সে জীবিত থাকিলে অবশ্যই তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

"চেষ্টা করিবে,—এ কি কথা ? উদ্ধার করিতেই হইবে।"

"মহারাজ ! যে কঠিন সময় উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চিতরূপে আর কিছুই বলিতে পারি না। সময় মন্দ হইলে চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ চাপিয়া পড়ে। এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য না করিলে পরিণাম রক্ষা করা যাইবে না। একা মোহাম্মদ হানিফা আপনার শত্রু নহে! নানা দেশের, নানা রাজ্যের ভূপতি ও বীরপুরুষগণ আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে ; বলিতে গেলে, মোহাম্মদভক্ত মাত্রেই আপনার প্রাণ লইতে দুই হস্ত বিস্তার করিয়াছে।"

"আমি কি এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছি যে, তোমার বর্ণিত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইব ?"

"মহারাজ ! জয়-পরাজয় ভবিষ্যতের গর্ভে।"

"তবে কি হানিফার খণ্ডিত মস্তক আমি দেখিব না ?"

"অবশ্যই দেখিতে পারেন—বিলম্বে।"

"কথা অনেক শুনিলাম, তুমি অদ্যই পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অলীদের সাহায্যের এবং সীমারের উদ্ধারের জন্য গমন কর,—এই আমার আজ্ঞা।"

এই আজ্ঞা করিয়া এজিদ রোষভরে মন্ত্রণাগৃহ হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মারওয়ান বলিতে লাগিল, "দুর্ম্মতির লক্ষণ এই, যেখানে উচিত কথা সেইখানেই রোষ। যাহা হউক, আমি এখনই যাত্রা করিব, সীমারের উদ্ধার যাহা হইবার, বোধ হয় এতদিনে হইয়া গিয়াছে, অলীদের উদ্ধার হয় কিনা তাহাই সন্দেহ!"

অষ্টাদশ প্রবাহ

কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! কি হৃদয়-বিদারক বিষাদ ভাব! কাহারও মুখে কথা নাই, হর্ষের চিহ্ন নাই, যুদ্ধ-জয়ের নাম নাই, সীমার-বধের প্রসঙ্গ নাই, অলীদ-পরাজয়ের আলোচনা নাই।—রাজার রাজবেশ-শূন্য, শির শিরস্ত্রাণশূন্য, পদ পাদুকাশূন্য,—পরিধেয় নীলবাস, বিষাদ-চিহ্ন নীলবাস! সৈন্যদলে বাজনা বাজিতেছে না, তুরীডঙ্কার আর শব্দ হইতেছে না, 'নকীব' উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিয়া ভেরীরবে ভূপতিগণের শুভাগমন-বার্ত্তা আর ঘোষণা করিতেছে না। সকলেই পদব্রজে, সকলেরই ম্লানমুখ, সকলেই নীরব। তীর তূণীরে, তরবারি কোষে, খঞ্জর পিধানে, সকলের চক্ষুই জলে পরিপূর্ণ। কারুকার্য্যখচিত সুন্দর নিশান-স্থানে আজ নীল নিশান। হানিফা সসৈন্যে রাজপথে—পুণ্যভূমি মদিনা নগরের রাজপথে। নগরের উচ্চ উচ্চ প্রাসাদে, অত্যুচ্চ মঞ্চে, সিংহদ্বারে, নানা স্থানে অনন্ত শোক-প্রকাশক নীল পতাকাসকল বায়ু তাড়িত হইয়া অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া হোসেনজনিত অনন্ত শোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রকাশ করিতেছে। যে দিকে দৃক্‌পাত কর, সেই দিকেই শোকের চিহ্ন,—বিষাদের রেখা। হোসেন-শোকে মদিনার এই দশা। এ দশা কে করিল? এ অন্তর্ভেদী দুর্দ্দশা কে ঘটাইল? মর্ত্ত্যে, শূন্যে, আকাশে,

নীলিমা-রেখা কে অঙ্কিত করিল? হায়! হায়!! হোসেন-শোকের অন্ত নাই! এ বিষাদ-সিন্ধুর শেষ নাই। বিমানে সূর্য্যদেবের অধিকার, রজনী দেবীর তারকামালার অধিকার থাকা পর্য্যন্ত মোহাম্মদীয়গণের অন্তরাকাশ হইতে এ মহাবিষাদ-নীলিমা-রেখা কখনই সরিবে না!

মোহাম্মদ হানিফা নিদারুণ শোকে, মর্ম্মভেদী বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসিগণ হোসেনের নাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মোহাম্মদ হানিফার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হায়! পুণ্যভূমি মদিনায় আজ অন্ধকার! মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে শোক-সিন্ধুর তরঙ্গ উঠিয়াছে—প্রবাহ ছুটিয়াছে। নূরনবী হজরত মোহাম্মদের রওজার চতুষ্পার্শ্বে যাইয়া সকলে একত্রে হাসান, কাসেম প্রভৃতির শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমেই ক্রন্দনের আবেগ বৃদ্ধি, আরও বৃদ্ধি! কিন্তু বৃদ্ধি হইতে হইতেই হ্রাস, ক্রমেই মন্দীভূত, ক্রমেই নীরব, ক্রমেই হা-হুতাশ, ক্রমেই দুই একটি কথা শুনা যাইতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফা সকলের কথাই শুনিতে লাগিলেন, অনেককে আশ্বস্ত করিলেন, অনেককে সাহস দিলেন, কাহাকেও বা সস্নেহ মিষ্ট সম্ভাষণে আদর করিলেন। ক্রমে নাগরিকদলকে বিদায় দিয়া সঙ্গীয় রাজগণ, সৈন্যগণ, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ—কে কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া আহার বিহার বিশ্রামের শৃঙ্খলায় মনোনিবেশ করিলেন।

মদিনার প্রধান প্রধান ও মাননীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা যায়?"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "মদিনার সিংহাসনে জয়নাল আবেদীনকে না বসাইতে পারিলে আমার মনে শান্তি হইবে না। দুঃখ করিবার সময় অনেক রহিয়াছে। মদিনার যেরূপ বিশ্রী অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া মহা-কষ্টভোগ করিতেছে। জয়নাল আবেদীন নিশ্চয়ই জীবিত আছে। জয়নাল মদিনা ও দামেস্ক উভয় রাজ্যই করতলস্থ করিয়া একচ্ছত্ররূপে রাজত্ব করিবে—ইহা নিশ্চিত, অব্যর্থ। যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এতদূর সফল হইল, তাঁহার বাক্যের শেষ

অংশ কি আর সফল হইবে না? আপনারা সকলে অনুমতি করিলেই আমি দামেস্ক-আক্রমণের জন্য যাত্রা করিতে পারি।"

নাগরিক দলমধ্য হইতে একজন বলিলেন, "জয়নাল আবেদীন ঈশ্বরানুগ্রহে অবশ্যই মক্কা, মদিনা ও দামেস্কের সিংহাসন অধিকার করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অটল আশা আছে; তবে কয়েকদিন বিলম্ব মাত্র। আপনি পথশ্রমে শ্রান্ত, সৈন্যগণও অলাদের সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়াছে; এ অবস্থায় কয়েকদিন এই পবিত্রধামে বিশ্রাম করিয়া দামেস্কে যাত্রা করুন,—এই আমাদের প্রার্থনা। জয়নাল উদ্ধারে মদিনার আবালবৃদ্ধবণিতা আপনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে, কেহই ঘরে বসিয়া থাকিবে না। এত দিন আমরা নায়কবিহীন হইয়া পথে পথে ঘুরিয়াছি; যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়াছি; কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। হজরতের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইব বলিয়াই আমরা কাসেদ পাঠাইয়াছিলাম। আপনি এত অল্প সৈন্য লইয়া কখনই দামেস্কে যাইবেন না। এজিদের চক্র, মারওয়ানের মন্ত্রণা ভেদ করা বড়ই কঠিন,—আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব। এখনও মদিনা বীরশূন্য হয় নাই—এখনও মদিনা পরাধীন বা পরপদভরে দলিত হয় নাই।—এখনও মদিনার স্বাধীনতা-সূর্য্য নিঃসহায়, কি কোন বিষয়ে নিরাশ হয় নাই। এজিদের অত্যাচার—নূরনবী মোহাম্মদের বংশধরগণের প্রতি অত্যাচারের কথা মদিনা ভুলে নাই। যাঁহার জন্য এই সিংহাসন শূন্য আছে, তাঁহার কথা সকলের অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে,—তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা দিবানিশি অন্তরে জাগিতেছে। আপনি যে-দিন মদিনা হইতে যাত্রা করিবেন, সেই দিন মদিনার লোকের প্রভুভক্তি, রাজভক্তি, একতার আদর্শ, হোসেনের বিয়োগজনিত দুঃখের চিহ্ন—সকলই দেখিতে পাইবেন। আমি আর অধিক বলিতে পারি না; এইমাত্র নিবেদন যে, সপ্তাহকাল এই নগরে বিশ্রাম করুন, সপ্তাহকাল পরে আমরা সকলে আপনার সঙ্গী হইব।"

মোহাম্মদ হানিফা নগরবাসীদিগের অনুরোধে সপ্তাহকাল সসৈন্যে মদিনায় থাকিতে সম্মত হইলেন।

ওদিকে মারওয়ানের মদিনাভিমুখে আগমন এবং অলীদের দামেস্কে গমন, পথিমধ্যে উভয় সেনাপতির সাক্ষাৎ—উভয় দলের মিলন! অলীদের সঙ্গে অল্প মাত্র সৈন্য; তাহার অধিকাংশ আহত, কতক জরাগ্রস্ত, বা অর্দ্ধমৃত, কতক অসুস্থ। তাহাদের মুখ মলিন, বসন মলিন। তাহাদের পৃষ্ঠদেশে তূণীর ঝুলিতেছে, তীর নাই—কোষ রহিয়াছে, তরবারি নাই! বর্শার ফলক কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, কেবল দণ্ড বর্ত্তমান! পতাকাচ্ছিন্ন, দণ্ড ভগ্ন—সাহস উৎসাহের নাম মাত্র যেন নাই! তাহারা তাড়িত,—ভয়ে চকিত, তাহাদের সর্ব্বদাই পশ্চাদ্দৃষ্টি। মনঃসংযোগে অশ্ব-পদ-শব্দ শুনিতে তাহাদের কর্ণ স্থির! সৈন্যগণের অবস্থা দেখিলেই অনুমান হয় যে, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেই ইহাদের সর্ব্বস্ব উড়িয়া গিয়াছে। আহারাভাবে তাহারা মহা-ক্লান্ত।

মন্ত্রীপ্রবর মারওয়ান অলীদের অবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না, ঐ সংযোগস্থলেই উভয় দল একত্রিত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হইল। পরস্পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে মারওয়ান বলিল, "এইক্ষণে মদিনা আক্রমণ, কি হানিফার সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে; আমাদের বলবিক্রমের সহিত তুলনা করিলে হানিফার সৈন্যদল সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ; এ অবস্থায় আত্মরক্ষাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।"

অলীদ বলিল, "আত্মরক্ষা ভিন্ন আর উপায় কি? সীমারের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে।"

"সীমারের দুর্দ্দশা কি?"

অলীদ সীমারের শাস্তির বৃত্তান্ত আদি-অন্ত বিবৃত করিল।

মারওয়ান বলিল, "সীমারের যে, দুর্দ্দশা ঘটিবে—তাহা আমি অগ্রেই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম।"

অলীদ বলিল, "ভ্রাতঃ! হানিফার বল বিক্রম দেখিয়া স্বদেশের আশা, জীবনের আশা, ধন-জন-পরিজন-আশা হইতে একেবারে নিরাশ হই নাই বটে, কিন্তু সন্দেহ অনেক ঘটিয়াছে।"

"ওরে ভাই! আমি ত সীমার-উদ্ধার ও তোমার সাহায্য,—এই দুই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। সীমারের উদ্ধার ত এ জীবনে

এক প্রকার শেষ হইল। এখন তোমার সাহায্যেরই বাকী। যাহা হউক, এই সকল অবস্থা লিখিয়া মহারাজ-সমীপে কাসেদ প্রেরণ করি। উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিব। এই স্থানটি অতি মনোহর ও মনোরম।”

ঊনবিংশ প্রবাহ

রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিয়া দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গেল। মদিনাবাসীরা মোহাম্মদ হানিফাকে সসৈন্যে আর এক সপ্তাহ মদিনায় থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। হানিফা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 'হাঁ—না' কিছুই কহিলেন না।

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, “আপনাদের অনুরোধ অবশ্যই প্রতিপাল্য কিন্তু জয়নাল-উদ্ধারে যতই বিলম্ব, ততই আশঙ্কা—ততই বিপদ মনে করিতে হইবে। এ সময় বিশ্রামের সময় নহে, এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষতঃ, মারওয়ানের মন্ত্রণার অন্ত নাই—কোন্ সময় এজিদকে সে কোন্ পথে চালাইয়া কি অনর্থ ঘটাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? হয় ত, সে সময় এজিদের প্রাণান্ত করিয়া দামেস্ক-নগর সমভূমি করিলেও সেই দুঃখের উপশম হইবে না,—সে অনন্ত দুঃখের ইতি হইবে না। আপনারা প্রবীণ এবং প্রাচীন, যাহা ভাল হয় করুন।”

নাগরিকদলের একজন বলিলেন, “মন্ত্রিবর! আপনার সারগর্ভ বচন অবশ্যই আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে কারণে প্রভুকে আর এক সপ্তাহকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছি, সে কথা এখন বলিব না, তবে সময়ে তাহা অপ্রকাশ থাকিবে না। জয়নাল আবেদীন পাপাত্মা এজিদের বন্দীগৃহে বন্দী; প্রভু হাসান-হোসেনের স্ত্রী,

পরিবার, নূরনবী মোহাম্মদের সহর্ম্মিণী বিবি সালেমা*—ইঁহারাও বন্দী; দিবারাত্রি, প্রহরে দণ্ডে, পলে অনুপলে আমাদের অন্তরে এ সকল কথা জাগিতেছে,—প্রাণ কাঁদিতেছে, তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! মনে হইতেছে যদি পাখা থাকিত, যদি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাইবার কোন উপায় থাকিত, তবে এখনই যাইয়া দামেস্ক-নগর আক্রমণ এবং নরাধম এজিদের প্রাণবধ করিয়া জয়নাল-উদ্ধারের উপায় করিতাম। আমরা ভুক্তভোগী, আমাদের পদে পদে আশঙ্কা, পদে পদে নৈরাশ্য। অধিক আর কি বলিব, এজিদের আজ্ঞায়, মারওয়ানের মন্ত্রণায়, অলীদের চক্রে, জাএদার সাহায্যে, মায়মুনার কৌশলে আমরা মহর্ষি হাসানকে হারাইয়াছি। জেয়াদের ছলনায়, সেই মহাপাপী চির-নারকী জেয়াদের প্রবঞ্চনায় প্রভু হোসেন, মহাবীর কাসেম এবং আলী আক্‌বর প্রভৃতিকে মদিনা হইতে চিরবিদায় দিয়াছি! মন্ত্রিবর! কি বলিব? মদিনার শত শত সমুজ্জ্বল রত্ন কারবালা-প্রান্তরে রক্তস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—সে সকল কথা কি আমরা ভুলিয়াছি? তবে যে কেন বিলম্ব করিতেছি, বলিব। যদি ঈশ্বর সে সময়ে মুখ দেখান, তবেই বলিব। আমাদের শত অনুরোধ, মদিনাবাসী আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই অনুরোধ, আর এক সপ্তাহ আপনারা সসৈন্যে মদিনায় অবস্থান করুন। সময় হইলেই আমরা কখনই দামেস্ক-গমনে আপনাদিগকে বাধা দিব না, বরং মনের আনন্দে 'জয় জয়' রবে জয়নাল-উদ্ধারে আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাত্রা করিব।"

মদিনাবাসীদের মত না হইলে দামেস্ক-আক্রমণ করা হইবে না, ইহা পূর্ব্ব হইতেই সুস্থির আছে। সুতরাং গাজী রহ্‌মান আর দ্বিরুক্তি করিলেন

* হজরত মোহাম্মদের সহধর্ম্মিণীদিগের নাম :— ১। হজরত বিবি খোদেজা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রথমা স্ত্রী, ২। সওদা, ৩। আয়েসা, ৪। হাফেজা, ৫। জিনাত, ৬। ওম্মে সালেমা, ৭। জয়নাব, ৮। ওম্মে হাবিবা, ৯। জোবুরিয়া, ১০। সুফিয়া, ১১। মায়মুনা। माननीয়া বিবি খোদেজার গর্ভপ্রসূতা কনিষ্ঠা মহামাননীয়া বিবি ফাতেমা—হজরত আলীর প্রাণপ্রতিম সহধর্ম্মিণী, হাসান-হোসেনের জননী।

না; অন্য অন্য আলাপে নগরবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। সে দিন কাটিয়া গেল। নিশাগমনে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে নিদ্রাদেবীর নিয়মিত অর্চ্চনায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা শয়ন করিয়া আছেন, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত! স্বপ্ন দেখিতেছেন—যেন হজরত নূরনবী মোহাম্মদ তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "মোহাম্মদ হানিফা! জাগ্রত হইয়া আলস্য পরিহার কর, এ সময় তোমার বিশ্রামের সময় নহে। তোমার পরিজন দামেস্কে বন্দী, তুমি মদিনায় বিশ্রামসুখে বিহ্বল! দামেস্কে ঈশ্বরের নাম করিয়া এখনই যাত্রা কর, জয়নাল-উদ্ধার হইবেই,—কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর তোমার সহায়।" মোহাম্মদ হানিফা যেন স্বপ্নযোগে প্রভুর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! ভয়ে ভীত হইয়া তিনি গাজী রহ্‌মানকে ডাকিয়া, মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী এবং আর আর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণকে জাগাইয়া স্বপ্ন-বিবরণ বলিলেন।

গাজী রহ্‌মানকে তিনি বলিলেন, "প্রভুর আদেশ হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই, এখনই যাত্রা,—এই-ই শুভ সময়। হাঁ, এখন বুঝিলাম—'সেই সময়ের' অর্থ এখন বুঝিলাম। আমরা কেবল রাজনীতি, সমরনীতি, বিধিব্যবস্থা, যুক্তি ও কারণের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্য করি। ভ্রম হইলে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া রক্ষা পাই। কিন্তু মদিনাবাসীরা আমাদের অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। আমি 'সেই সময়ের' অর্থ বুঝিতে পারি নাই। ধন্য মদিনা! ধন্য তোমার পবিত্রতা! ধন্য তোমার একাগ্রতা!"

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "গাজী রহ্‌মান! আমরা বাহ্যিক ব্যবহার, বাহ্যিক কারণ দেখিয়াই কার্য্যানুষ্ঠান করি; কিন্তু মদিনাবাসীদিগের প্রতি কার্য্য ঈশ্বরে নির্ভর করে এবং নূরনবী মোহাম্মদের প্রতি তাঁহাদের অটল ভক্তি; তাহার প্রমাণ প্রাচীন কাহিনী। প্রভুর জন্মস্থান মক্কা নগরের অধিবাসীরা প্রভুর কথায় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহার জীবনের বৈরী হইয়াছিল। এই মদিনাবাসীরাই তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন এবং ঈশ্বরের সত্যধর্ম্ম এই

মদিনাবাসীরাই প্রকাশ্যভাবে অকপটে গ্রহণ করেন। আর অধিক কি বলিব, মদিনাবাসীর অন্তর সরল ও প্রেমপূর্ণ। আমি এখনই যাত্রা করিব, প্রভাতের প্রতীক্ষায় আর থাকিব না।"

আজ্ঞামাত্র ঘোররবে ভেরী বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ নিদ্রাসুখ পরিহার করিয়া আতঙ্কে জাগিয়া উঠিল। 'সাজ সাজ' রবে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সজ্জিত হইবার সময় প্রভাতকালীন উপাসনার জন্য আহ্বান-স্বর সকলের কর্ণকে আনন্দিত করিল। মদীনাবাসীরা প্রথমে ভেরীর শব্দে এবং পরে উপাসনার সুমধুর আহ্বান-স্বরে জাগরিত হইয়া নিয়মিতভাবে উপাসনায় যোগ দিলেন। মোহাম্মদ হানিফা, গাজী রহমান প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ এবং সৈন্যগণ সজ্জিতবেশে উপাসনায় দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা সমাধান করিয়া জয়নাল-উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

নগরবাসীরা মহা ব্যস্ত হইয়া হানিফার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া জোড়করে বলিতে লাগিলেন, "হজরত! গত কল্য আমরা, যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় গ্রাহ্য হইল না ?"

মোহাম্মদ হানিফা বিনয় বচনে বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! বিগত নিশায় স্বপ্নযোগে প্রভু মোহাম্মদ আমাকে দামেস্ক-গমনে আদেশ করিয়াছেন। আর আমার সাধ্য নাই যে, এখানে ক্ষণকালও বিলম্ব করি।"

"হজরত! আমরা অজ্ঞ, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ঐ আদেশের জন্যই সপ্তাহকাল মদিনায় আপনার অবস্থিতির নিমিত্ত পূর্ব্বেও প্রার্থনা করিয়াছিলাম, গত কল্যের প্রার্থনাও ঐ কারণে। আমরা চির আজ্ঞাবহ দাস, মার্জ্জনা করুন। এখন আমাদের আর কোনও কথা নাই,—আপনিও প্রস্তুত হইয়াছেন, আমরাও প্রস্তুত আছি। আপনি অশ্বে কশাঘাত করিলেই দেখিবেন, কত লোক জয়নাল-উদ্ধারে আপনার অনুগামী হয়।"

মোহাম্মদ হানিফা, মস্‌হাব কাক্কা, গাজী রহমান ও হানিফার আর আর আত্মীয়স্বজন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজগণ বীরদর্পে অশ্বপৃষ্ঠে ঈশ্বরের নাম করিয়া চাপিয়া বসিলেন। রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ

হইয়া হানিফার বিজয়-ঘোষণা করিতে করিতে যাত্রা করিল। ধানুকী, পদাতিক ও পতাকাধারিগণ আনন্দরবে অগ্রে অগ্রে চলিল।

সাতবার হজরতের পবিত্র রওজা ঘুরিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া সকলে জয়নাল-উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। মদিনাবাসীরাও অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহানন্দে হানিফার জয়ঘোষণা করিতে করিতে সৈন্যদলে মিশিলেন। মারণ ভিন্ন মরণ-কথা কাহারও মনে নাই। সিংহদ্বার পার হইয়া তাঁহারা একস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্ত বার উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পথ প্রদর্শক উষ্ট্রারোহী মধুরস্বরে বংশীবাদন করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল।

দিবাভাগে গমন—রাত্রে বিশ্রাম। এই ভাবে কয়েক দিন যাইতে যাইতে একদিন পথ-প্রদর্শকদল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ভেরী বাজাইতে লাগিল। সকলেই সমুৎসুক হইয়া সম্মুখে স্থিরনেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিলেন যে, বহু দূরে শিবিরের উচ্চ চূড়ায় লোহিত নিশান উড়িতেছে। গাজী রহ্‌মান সাঙ্কেতিক নিশান উড়াইয়া সকলকে গমনে ক্ষান্ত করিলেন। সকলেই মহাব্যস্ত! তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহারা জানিলেন যে, সম্মুখে সমর-নিশান উড়িতেছে, সবিশেষ না জানিয়া আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

মারওয়ান-শিবিরেও মারওয়ান ভেরীবাদনধ্বনি শুনিল। শিবিরের বাহিরে আসিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখে অন্য কোন কথা সরিল না। অস্থির ও আতঙ্কিতভাবে সে অলীদকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভ্রাতঃ! আবার যে পূর্ব্বগগনে কি দেখা যায়? ঐ কি আগমন?"

"কার আগমন?"

"আর কার? যার ভয়ে অলীদ কম্পমান—মারওয়ান অস্থির!"

অলীদ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিল, "আর সন্দেহ নাই—এক্ষণে কি করা যায়?"

"আর কি করা যায়? কিছু দিন বিশ্রাম করিব আশা ছিল—ঘটিল না। আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিলেই তোমার আমার দশা মিলিয়া মিশিয়া, বোধ হয়, একই হইবে। হয়ত কিছু বেশীও হইতে পারে। পূর্ব্বসঙ্কল্প ঠিক রাখিয়া, যত শীঘ্র হইতে পারে যাইয়া নগর রক্ষার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি

নিতান্তপক্ষে উহারা আসিয়া পড়ে, তখন দামেস্ক-নগর নিকটস্থ প্রান্তরে আবার ডঙ্কা বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইব। এক্ষণে আর কিছুই নহে; প্রস্থান—ত্রস্তে প্রস্থান।"

"উহারা যে বিক্রমে আসিতেছে, আমরা যে উহাদের অগ্রে দামেস্কে যাইতে পারিব, তাহাতেও অনেক সন্দেহ! আপন রাজ্যে দ্বিগুণ বল, যেখানেই 'ধর ধর,' সেইখানেই 'মার মার'। ঐ দেখ, উহারাও গমনে ক্ষান্ত হইয়াছে। না জানিয়া বিশেষ তত্ত্ব না লইয়া, কেন অগ্রসর হইবে? আমাদের সন্ধান না লইতে লইতেই আমরা এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। আর কথা নাই ভাই! প্রস্থান—শীঘ্র প্রস্থান।"

তখনই শিবির-ভঙ্গের আদেশ হইল, লোহিত পাতাকা নীচে নামিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শিবির ভঙ্গ করিয়া মারওয়ান ও অলীদ সৈন্যগণসহ দামেস্কাভিমুখে বেগে ধাবিত হইল।

ওদিকে গাজী রহ্‌মান মহাচিন্তায় পড়িয়াছেন। ওই লোহিত নিশান উড়িতে উড়িতে কোথায় উড়িয়া গেল? দেখিতে দেখিতে উহাদের শিবিরও ভগ্ন হইল!—লোকজনও সরিতে লাগিল! ক্রমে উহারা ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, ক্রমেই দৃষ্টির অগোচর হইল!

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহ্‌মানকে বলিলেন, "আর চিন্তা কেন, পৃষ্ঠ দেখাইয়া যখন পলাইয়া গেল, তখন আর সন্দেহ কি? পলায়িত ব্যক্তির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, আজ এই স্থানেই বিশ্রাম।"

"তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু বিশেষ সতর্কভাবে থাকিতে হইবে। তাহারা পলাইল বলিয়া নিশ্চিন্তে থাকিতে পারি না। গুপ্তচরদিগকে কয়েক জন চতুর সৈন্যসহ সন্ধানে পাঠাইতেছি। সন্ধান করিয়া জানিয়া আসুক,—উহারা কে? কেন শিবির স্থাপন করিয়াছিল? কেনই বা চলিয়া গেল?"

"ও ত ওতবে অলীদের শিবির নহে?"

"না না; অলীদের শিবিরের অত জাঁকজমক কোথায়?"

"তবে কে?"

"সেই ত সন্দেহ, এখনই জানিতে পারিবে।"

বিংশ প্রবাহ

"সীমার নাই? আমার চির-হিতৈষী সীমার নাই? মহাবীর সীমার ইহজগতে নাই? হায়! যে বীরের পদভরে কারবালা-প্রান্তর কাঁপিয়াছে, যাহার অস্ত্রের তেজে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, হোসেন-শির দামেস্কে আসিয়াছে,—সেই বীর নাই? কে তাহার প্রাণহরণ করিল? হায়! নিমক-হারাম সৈন্যগণ ষড়যন্ত্র করিয়া সীমারকে বাঁধিয়া দিল, তাহাতেই এই ঘটিল; কাসেদ! বল, কে সীমারকে বধ করিল?"

কাসেদ জোড়করে বলিতে লাগিল, "বাদশাহ্-নামদার! মহাবীর সীমারকে এক জনে মারে নাই। পঞ্চদশ রথী মিলিয়া বাণাঘাতে সীমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

"সীমারের হস্তে অস্ত্র ছিল না?"

"তাঁহার হস্তপদ লৌহদণ্ডে বাঁধা ছিল। ঐ বন্ধন-দশায় তীরের আঘাতে তাঁহার শরীরের মাংস, শেষে অস্থি পর্য্যন্তও জর্জ্জরিত হইয়া খসিতে লাগিল, তবুও মহাবীরের প্রাণ বাহির হয় নাই। শেষে ঈশ্বরের নাম করিয়া মৃত্যু প্রার্থনা করায় সীমারের আত্মা ইহজগৎ হইতে অনন্তধামে চলিয়া গেল।"

এজিদ মহারোষে বলিলেন, "সেখানে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ কেহই ছিল না?"

"বাদশাহ্-নামদার! সৈন্য বলিতে আর কেইই নাই! তবে পতাকাধারী, ভারবাহী প্রহরী, আর জনকয়েক মাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।"

"আর আর সৈন্য?"

"আর আর সৈন্য হানিফার অস্ত্রে মারা গিয়াছে। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে কে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার সন্ধান নাই!"

"অলীদ?"

"সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি জীবিত আছেন,—কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"বাদশাহ্-নামদার! সকলি পত্রে লেখা আছে।"

(মহাক্রোধে) "পত্র শেষে পড়িব। ওত্‌বে অলীদ উপস্থিত থাকিতে সীমার-উদ্ধার হইল না? সে কি কথা?"

"তিনি উপস্থিত ছিলেন, এখনও জীবিতই আছেন, কিন্তু মরিয়া বাঁচিয়া আছেন।"

"হানিফা মদিনা যাইতে সাহসী হইয়াছে?"

"বাদশাহ্-নামদার! সে সকল কথা মুখে বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। পত্রেই বিশেষ লেখা আছে।"

"না—আমি পত্র খুলিব না। তোমার মুখে সকল কথা শুনিব, বল।"

"বাদশাহ্-নামদার! অলীদ পরাস্ত হইয়াছেন।"

"কে পরাস্ত করিল?"

"মোহাম্মদ হানিফা।"

"কি প্রকারে?"

"অলীদ মদিনা-প্রবেশ-পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে হানিফার সহিত যুদ্ধ হয়, ক্রমে কয়েক দিন যুদ্ধ—দিবারাত্র যুদ্ধ! শেষ দিন মস্‌হাব কাক্কা বিস্তর অশ্বারোহী সৈন্যসহ উপস্থিত হইলে, দামেস্ক-সৈন্য আর টিঁকিতে পারিল না—রক্তমাখা দেহ লইয়া দলে দলে ভূতলে গড়াইতে লাগিল; অশ্বদাপটেই কত শত জনের প্রাণবিয়োগ হইল! বাদশাহ্-নামদার! এমন যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন বীরও কখনও দেখি নাই। অস্ত্রের আঘাত, অশ্বের পদাঘাত সমানেই চলিল। দেখিতে দেখিতে দামেস্ক-সৈন্য তৃণবৎ উড়িয়া গিয়া কোথায় পলাইল, তাহার অন্ত রহিল না। বিপক্ষেরা সেনাপতি মহাশয়ের শিবির লুটপাট করিয়া মদিনাভিমুখে 'জয় জয়' রব করিতে করিতে চলিয়া গেল।"

"অলীদ কিছুই করিল না?"

"তিনি আর কি করিবেন? মস্‌হাব কাক্কা তাঁহার অশ্বকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহাকে শূন্যে উঠাইয়া এক আছাড়েই তাঁহার প্রাণ বাহির করিবে—মস্‌হাব কাক্কার এইরূপ কথা; কেবল হানিফার অনুরোধে অলীদের

প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু মস্‌হাব কাক্কা ছাড়িবার পাত্র নহেন, এমন সজোরে তিনি অলীদ মহামতিকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া শেষে তিনি উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।"

"মস্‌হাব কাক্কা কে?"

"তিনিই ত মহারথী সীমারকে ধরিয়া লইয়া—"

"তাহা ত শুনিয়াছি, অলীদ বাঁচিয়া গিয়াও কিছু করিল না?"

"মহারাজ! তিনি পলায়িত, পরাজিত, আতঙ্কিত, নিদ্রাবশে কাক্কারূপে চকিত—চমকিত। তিনি কি আর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন?"

"মারওয়ান বোধ হয় অলীদের সাহায্য করিতে পারে নাই?"

"তিনি আর কি সাহায্য করিবেন? বাদশাহ্-নামদার! মোহাম্মদ হানিফা আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মদিনায় প্রবেশ করিলেন। এদিকে মহামতি অলীদ দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন—ওদিকে মন্ত্রী মহোদয়ও দামেস্ক হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উঁহাদের দেখা হইল। এইক্ষণে তাঁহারা সেই সংযোগ-স্থানে শিবির নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমি সেই সংযোগ-স্থান হইতে মন্ত্রীপ্রবরের পত্র লইয়া আসিয়াছি। তাঁহারা গোপন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে, মোহাম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামেস্ক-নগর আক্রমণ করিবেন।"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন, 'তাহারা শুনিতে পারে, তাহারা হারিতে পারে, তাহারা হানিফার নামে কাঁপিতে পারে, তাহারা বিশ্রামও করিতে পারে। কিন্তু দামেস্ক নগরে মানুষের আক্রমণ করিবার কি সাধ্য আছে? এই নগরে শত্রু প্রবেশের কি ক্ষমতা আছে? এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর, পঞ্চবিংশতি লৌহদ্বার, ষষ্টি সেতু, অশীতি পরিখা, পঞ্চ সহস্র গুপ্ত কূপ, এজিদ জীবিত,—ইহাতে হানিফা দূরের কথা; হানিফার পিতা আলী গোর হইতে উঠিয়া আসিলেও এ নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। যাও কাসেদ; এখনই যাও—মারওয়ানকে গিয়া বল যে; আমি স্বয়ং যুদ্ধে আসিতেছি। দেখি মদিনা আক্রমণ করিতে পারি কি না? দেখি মদিনার সিংহাসনে

বসিতে পারি কি না? দেখি আমার হস্তে হানিফা বন্দী হয় কি না? দেখি এই তরবারিতেও মসহাব কাক্কার শির ধরায় গড়াগড়ি যায় কি না? যাও; তোমার পত্র তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও,—যাহা বলিবার বলিলাম—মুখে বলিও।”

এজিদ ক্রোধে অধীর হইয়া মারওয়ানের পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কাসেদ পত্র লইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

এজিদ বিশ্রাম-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আদেশ করিলেন, “যত সৈন্য এক্ষণে নগরে উপস্থিত আছে, সমুদয় প্রস্তুত হও—সামান্য প্রহরীমাত্র রাজপুরী রক্ষা করিবে, সৈন্য নামে নগরমধ্যে কেহই থাকিতে পারিবে না, সকলকে আমার সঙ্গে মদিনা আক্রমণে যাইতে হইবে;—হানিফার বধসাধনে যাইতে হইবে, মসহাব কাক্কার মস্তক চূর্ণ করিতে যাইতে হইবে—সীমারের দাদ উদ্ধার করিতে যাইতে হইবে। বাজাও ডঙ্কা, বাজাও ভেরী, আন অশ্ব, আন উষ্ট্র, এখনই যাত্রা করিব।”

অমাত্যগণ যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধে বিরত থাকিতে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু কাহারও কথাই এজিদের নিকট স্থান পাইল না,—তাঁহার কর্ণে ভাল লাগিল না। পরিশেষে বৃদ্ধ হামান বলিতে লাগিলেন,—এত দিন পরে বৃদ্ধ সচিব নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন:

“মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, বয়স-দোষে আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মিয়াছে, বিবেচনার দোষ ঘটিয়াছে,—ভবিষ্যৎ ফলাফলের চিন্তাতেও অপারগ হইয়াছি—ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু মহারাজ! এই বৃদ্ধ আপনার পিতার চিরহিতৈষী, আপনার হিতৈষী, দামেস্ক-রাজ্যের হিতৈষী। এই দামেস্ক-রাজ্য পূর্ব্বে যাহার করতলগত ছিল, ন্যায়ের অনুরোধে উচিত কথা বলিতে এই বৃদ্ধ কখনই তাঁহার নিকট সঙ্কুচিত হয় নাই। তাহার পর আপনার পিতার রাজত্বকালেও এই বৃদ্ধ সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর আসন প্রাপ্ত হইয়াও ন্যায্য কথা বলিতে কখনই ত্রুটি করে নাই,—ভীত হয় নাই; মহারাজের রাজত্বসময়েও কর্ত্তব্যকার্য্যে পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু মহারাজ! সে কাল আর এ কাল

অনেক ভিন্ন। পূর্ব্বে মন্ত্রণায় বিচার হইত,—তর্কে মীমাংসা হইত।—ভ্রম কাহার না আছে? ভূপতির ভ্রম হইলে তিনি ভ্রম স্বীকার করিতেন। অমাত্যগণের ভ্রম হইলে তাঁহারাও ভ্রম স্বীকার করিতেন। এখন সে কাল নাই, সে মন্ত্রণাও নাই, সে মীমাংসাও নাই,—ন্যায্য হউক, অন্যায্য হউক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, স্ব স্ব মত প্রবল করিতে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চেষ্টিত। বিশেষতঃ অপরিপক্ক মস্তিষ্কের নিকট আমরা এক প্রকার বাতুল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছি। মহারাজ! মনে হয়, হাসানের বিষপানের পর এই নির্ব্বোধ বৃদ্ধ কি বলিয়াছিল? সেই প্রকাশ্য দরবারে কে কি বলিয়াছিল? নবীন বয়সে নূতন সিংহাসনে বসিয়া কৃষ্ণকেশ বিকৃত অপরিপক্ক মস্তিষ্কের মন্ত্রণাতেই আপনি মত দিলেন। সেই অদূরদর্শী, ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য মারওয়ানই বেশী আদর পাইল। মনের বিরাগে সারগর্ভ উপদেশ বিবেচনা না করিয়া সেই সম্পূর্ণ ভ্রমময় অসার বাক্যেরই আপনি পোষকতা করিলেন। এ পাগল তুচ্ছ হইল। বালকেই বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করে, যুবাই যুবার নিকট আদর পায়। আমি বয়সে মহাপ্রাচীন হইলেও আপনি রাজা,—মাথার মণি। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে সেই একদিন আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, আর আজ রাজ্যের দুরবস্থা—ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি। মহারাজ! বৃদ্ধ মন্ত্রীর অপরাধ মার্জ্জনা হউক। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে কারণে যুদ্ধ, যে কারণে দামেস্ক-রাজ্যের এই শোচনীয় দশা, সে কারণের পরীক্ষা ত অগ্রেই হইয়াছিল! যে আমার নয়, আমি তাহার কেন হইব—একথা সকলের বুঝা উচিত। এক জিনিষের দুই গ্রাহক হইলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুভাব, হিংসাভাব স্বভাবতঃই যে উপস্থিত হয়, ইহা আমি অস্বীকার করি না। তবে যাহার হৃদয় আছে, মনুষ্যত্ব আছে, সে সে-দিকে ভ্রমেও লক্ষ্য করে না, তাহাও জানি। যাহার অসহ্য হয়, সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসে—করিতেও পারে! কারণ, যৌবনকাল বড়ই ভীষণ কাল। সে কালের অনেক দোষ মার্জ্জনীয়। তবে যে হৃদয়ে শক্তি আছে, যে মনে বল আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। শত্রুপরিবারের সহিত শত্রুতা কি? তাহার সন্তান-সন্ততি পরিজনের সহিত হিংসা কি? মহারাজ! হোসেনের শির

দামেস্কে আসিল কেন ? হোসেন-পরিবার দামেস্ক কারাগারে বন্দী কেন ? ইহার কি কোন উত্তর আছে ? বিধির ঘটনা, অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মহারাজ ! এখনও উপায় আছে—রক্ষার পন্থা আছে। আপনি ক্ষান্ত হউন। রাজ্যবিস্তারে আমার অমত নাই, কিন্তু তাহার জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করুন। এখন চতুর্দ্দিকে যে আগুন জ্বলিয়াছে, আপনি তাহা সহজে নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন না। প্রকৃতি ন্যায়ের সহায়, অন্যায়ের বৈরী। মন্ত্রীবর মারওয়ান এখন নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া দামেস্ক-রাজ্য রক্ষাহেতু জয়নাল আবেদীনকে কারামুক্ত করিতে মন্ত্রণা দিতেছে। সে সম্বন্ধে মহারাজ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার সদুত্তর দিব। তবে সামান্য একটু বলিয়া রাখি যে, হানিফার সে জ্বলন্ত রোষাগ্নি সহজে নির্ব্বাণ হইবার নহে। আপনি যে আজ স্বয়ং অগ্রসর হইতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা আছে।—প্রথম, আপনি কোথায় যুদ্ধে যাইতেছেন ? যদি বলেন, মদিনা—আমি বলিতেছি, মদিনায় যাইবার আর আপনার ক্ষমতা নাই। সীমার হত, অলীদ পরাস্ত, মারওয়ান ভয়ে সন্ত্রস্ত ; এ অবস্থায় মদিনা আক্রমণ করা দূরে থাকুক—মদিনার প্রান্তঃসীমাতেও প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ধন-বল আর বাহু-বলই রাজার বল, ক্রমাগত যুদ্ধে ধন-ভাণ্ডার প্রায় শূন্য হইল, আর বাহু-বল এখন নাই বলিলেই হয়। সীমারের সহিত সীমারের সৈন্যও গিয়াছে—ওত্বে অলীদ সৈন্যসামন্ত হারাইয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছেন মাত্র। এখন একমাত্র সম্পূর্ণরূপে জীবিত মারওয়ান। রাজ্যরক্ষার জন্যও সৈন্যের প্রয়োজন। আজ যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যরক্ষার আর কোন উপায় দেখিতেছি না ;—কারণ, শত্রুর নানা পথ—শত্রুর সন্ধান অব্যর্থ। মহারাজ এদিকে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অন্য পথে শত্রু আসিয়া যদি নগর আক্রমণ করে, তখন কে রক্ষা করিবে ? সে অস্ত্রসম্মুখে বক্ষঃ পাতিয়া কে দণ্ডায়মান হইবে ? আমি মহারাজের গমনে বাধা দিতেছি না। আপনারই রাজ্য, আপনারই সিংহাসন,—আপনিই রক্ষা করিবেন। আমার যাহা বলিবার, বলিলাম—গ্রাহ্য করা না করা মহারাজের ইচ্ছা।"

এজিদ মন্ত্রীবর হামানের কথা মনঃসংযোগে শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার

চির-হিংসাপূর্ণ হৃদয়কে স্ববশে আনিতে পারিলেন না। দুর্নিবার ক্রোধ দ্বাদশ প্রকার হিংসার জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। লোহিত লোচনে ক্রোধযুক্ত স্বরে তিনি বলিলেন, "তুমি মাবিয়ার মন্ত্রী—আমার সহিত তোমার কোন মতেরই ঐক্য নাই—হইবেও না—হইতে পারেও না। তুমি অনেক সময় আমাকে মনোকষ্ট দিয়াছ! আমি তোমার মুখ দেখিতেও ইচ্ছা করি না। তুমি দূর হও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও! কে আছ, এই বৃদ্ধ পাগলকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া কারাগারে আবদ্ধ কর। যাহার কোন জ্ঞান নাই, তাহার উপযুক্ত স্থান মশান বা শ্মশান। যাও বুদ্ধিমান, যাও—তোমার পরিপক্ব মস্তক লইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ কারাগারে বাস কর। রাজপ্রাসাদে তোমার আর স্থান নাই।"

আজ্ঞামাত্র প্রহরিগণ বৃদ্ধ সচিবকে লইয়া চলিল। মন্ত্রিবর যাইবার সময়ও বলিলেন, "মহারাজ! রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি এখনও বলিতেছি: আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না, মারওয়ানের সংবাদ না লইয়া কখনও নগর পরিত্যাগ করিবেন না।"

এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, "আমি এখনই যুদ্ধে যাইব। কোথায় —ওমর কোথায়?—হাসেম কোথায়?"

শশব্যস্তে সৈন্যাধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইলেন। পুনরায় এজিদ বলিলেন, "মদিনা-আক্রমণে, হানিফার বধ-সাধনে, আমার সহিত এখনই সসৈন্যে যাত্রা করিতে হইবে। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে আজ ওমর বরিত হইল, যাও—প্রস্তুত হও, যত সৈন্য নগরে আছে, তাহাদিগকে লইয়া প্রস্তুত হও।"

একবিংশ প্রবাহ

হুতাশনের দাহন-আশা, ধরণীর জলশোষণ-আশা, ভিখারীর অর্থলোভ-আশা, চক্ষুর দর্শন-আশা, গাভীর তৃণভক্ষণ-আশা, ধনীর ধনবৃদ্ধির আশা, প্রেমিকের প্রেমের আশা, সম্রাটের রাজ্য-বিস্তারের আশার যেমন নিবৃত্তি নাই, হিংসাপূর্ণ পাপ-হৃদয়ে দুরাশারও তেমনি নিবৃত্তি নাই—ইতি নাই। যতই কার্য্যসিদ্ধি, ততই দুরাশার শ্রীবৃদ্ধি। জয়নাবের রূপমাধুরী হঠাৎ এজিদ-চক্ষে পড়িল, এজিদের অন্তরে দুরাশার সঞ্চার হইল। স্বামী জীবিত,—জয়নাবের স্বামী আবদুল জব্বার জীবিত; অত্যাচারে, বলপ্রকাশে মাবিয়ার নিতান্ত অমত, অথচ এজিদের জয়নাব-রত্ন লাভের আশা! কি দুরাশা!—সে কার্য্যও সিদ্ধ হইল, কিন্তু আশার ইতি হইল না। সে রত্নখচিত সজীব পুষ্পহার বিধিনির্ব্বন্ধে যে কণ্ঠ শোভা করিল—যাঁহার হৃদয় শীতল করিল—সেই-ই কণ্টক! এজিদ-চক্ষে হাসান বিষম কণ্টক; তাঁহার জীবন অন্ত করিতে পারিলেই আশা পূর্ণ হয়! তাহাও ঘটিল; কিন্তু আশার ইতি হইল না। জয়নাব যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ না করিলে কখনই এজিদের মনের আশা পূর্ণ হইবে না! ঘটনাক্রমে কারবালা-প্রান্তরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রক্তের স্রোত বহিয়া তাহাও ঘটিয়া গেল। সৈন্যসামন্ত ও প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সে মহামূল্য জয়নাব-রত্ন দামেস্ক নগরে আসিল, কিন্তু আশার ইতি হইল না।

বৃদ্ধ মন্ত্রী হামান কথার ছলে বলিয়াছিলেন, "যে আমার নয়, আমি তাহার কেন হইব?" এ নিদারুণ বচন কি আহত হৃদয় মাত্রেরই মহৌষধ? না—রূপজ মোহ যে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সে হৃদয় যথার্থ মানব-হৃদয় হইলেও সময়ে সময়ে পশুভাবে পরিণত হয়। প্রথম কথাতেই জয়নাবের মনের ভাব এজিদ অনেক জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হস্তে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাও দেখিয়াছেন। সে অস্ত্র এজিদের বক্ষে বসিবে না, যাঁহার অস্ত্র, তাঁহারই বক্ষ, তাঁহারই শোণিত!—কিন্তু বিনা আঘাতে, বিনা রক্তপাতে, নিজ

হৃদয়ের রক্ত আজীবন শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে যে অদৃশ্যভাবে ঝরিতে থাকিবে, তাহাও এজিদ বুঝিয়াছিলেন। তবে?—আশা আছে। দুরাশা কুহকিনী এজিদের কানে কয়েকটি কথার আভাস দিয়াছে,—তাহাতেই এজিদের অন্তরে এই কথা। এই কথা কি?—কমলে গঠিত কোমলাঙ্গীর হৃদয় কি পাষাণ? কোমল হস্তে লৌহ অস্ত্র? কোমল অক্ষিতে বজ্রদৃষ্টি? কোমল বদনে কর্কশ ভাষা? কোমল প্রাণে কঠিন ভাব?—অসম্ভব! অসম্ভব!! সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং বিপরীত!!! অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। জয়নাল, হানিফা প্রভৃতি জীবিত।—সেই কি মূল কারণ? তাহারা ভব-ধাম হইতে চিরকালের জন্য সরিলে নিশ্চয়ই ও বিপরীত ভাব কখনই থাকিবে না! নিশ্চয়!! নিশ্চয়!!! চিরকালের জন্য সে সময় জয়নাবের সে পদ্মচক্ষুতে এজিদের ছায়া ভিন্ন আর কোন ছায়াই দেখা যাইবে না। সে হৃদয়ে সর্ব্বদা এজিদ-রূপ ব্যতীত আর কোন রূপ জাগিবে না। নিশ্চয়ই কমলে কমল মিশিয়া কোমল ভাব ধারণ করিবে। আপাদমস্তকে, অন্তরে, হৃদয়ে, প্রাণে, শরীরে উত্তাপবিহীন সুকোমল বিজলী-ছটা সবেগে খেলিতে থাকিবে!

দুরাশা! দুরাশা!!

কুহকিনী আশার এই ছলনায় এজিদ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, দুন্দুভি বাজাইয়া লোহিত নিশান উড়াইয়া যাত্রা করিলেন। ওমর, হাসেম, আবদুল্লাহ্, জেয়াদ প্রভৃতি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য মহারাজের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। গুপ্তচর সন্ধানীরা কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে, কেহ ছদ্মবেশে, সকলের অগ্রে নানা সন্ধানে নানা পথে ছুটিল। তাহারা যেখানে যাহা শুনিতেছে, দেখিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসিয়া এজিদকে জানাইয়া যাইতেছে।

একজন আসিয়া বলিল, "বাদশাহ্-নামদারের জয় হউক। কতকগুলি সৈন্য নগরাভিমুখে আসিতেছে।" এজিদের মুখভাব কিঞ্চিৎ মলিন হইল।

কিছুক্ষণ পরে আবার একজন আসিয়া বলিল, "আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, যাহারা আসিতেছে তাহারা দামেস্কের সৈন্য।"

এজিদ মহাসন্তুষ্ট হইয়া সংবাদ-বাহককে কিছু পুরস্কৃত করিতে আদেশ দিয়া বিজয়-বাজনা বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল, "বাদশাহ্-নামদার! প্রধান মন্ত্রী মারওয়ান এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ অলীদ মহামতি আসিতেছেন।

এজিদ মহাহর্ষে বলিতে লাগিলেন, "ওমর! জেয়াদ! শীঘ্র আইস, বিজয়ী বীরদ্বয়কে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করি। কি সুযাত্রায় আজ অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলাম। যে হানিফার নামে জগৎ কম্পিত সেই হানিফা বন্দীভাবে, কিম্বা জীবনশূন্য দেহে, কিম্বা খণ্ডিতশিরে দামেস্কে আনীত হইতেছে। ধন্য বীর মারওয়ান! কিছু না করিয়া সে আর দামেস্কে ফিরিয়া আসিতেছে না! ধন্য মারওয়ান! খণ্ডিত হউক আর অখণ্ডিত হউক, হানিফার মস্তক, বন্দীগৃহের সম্মুখে লটকাইয়া দিব! জয়নাল-শিরও আগামী কল্য ঐ স্থানে বর্শার অগ্রে স্থাপন করিব। দেখিবে আকাশ, দেখিবে সূর্য্য, দেখিবে জগৎ, দেখিবে দামেস্কের নরনারী, দেখিবে জয়নাল—এজিদের ক্ষমতা!"

এজিদ যতই অগ্রসর হইতেছেন, ততই আশার ছলনায় মোহিত হইয়া ভাবিতেছেন: এখন মদিনার রাজা কে? মারওয়ানকে উভয় রাজ্যের মন্ত্রীত্ব-পদে অভিষিক্ত করিব, আর আজ আমার নিকট যে যাহা চাহিবে তাহাই দান করিব। বিজয়ী সেনাগণকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিব। এ সকল সৈন্যগণকেও পুরস্কৃত করিব। কাহাকেও বঞ্চিত করিব না।

এজিদ আশার প্রপঞ্চে পড়িয়া যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহাতে হাসিবার কথা নাই। আশা আর ভ্রম, এই দু'য়েই মানুষের পরিচয়। আমরা ভবিষ্যৎ বিষয়ে অন্ধ না হইলে কখনই ভ্রমকূপে ডুবিতাম না, আশার কুহকে ভুলিতাম না এবং সুখ-দুঃখের বিভিন্নতাও বুঝিতাম না। তাহা হইলে যে কি ঘটিত, কি হইত ঈশ্বরই জানেন!

মারওয়ান ওত্‌বে অলীদসহ দামেস্কাভিমুখে আসিতেছেন, এজিদও মহাহর্ষে সৈন্যগণসহ বিজয়ী বীরদ্বয়ের অভ্যর্থনা হেতু অগ্রসর হইতেছেন। মারওয়ান কখনই পরাস্ত হইবে না, মারওয়ান পৃষ্ঠ দেখাইয়া কখনই পলাইবে না, কার্য্য উদ্ধার না করিয়া দামেস্কে আসিবে না—এজিদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।

এই দৃঢ় বিশ্বাসেই—এজিদের এত আশা। অল্প সময় মধ্যেই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইল। এজিদ বিজয়-বাজনা বাজাইয়া বিজয়নিশান উড়াইয়া উপস্থিত হইলেন। মারওয়ানের অন্তরে আঘাত লাগিতে লাগিল, তাহার ম্লান মুখ আরও মলিন হইল।

এজিদ অনুমানেই বুঝিলেন—অমঙ্গলের লক্ষণ! কি বলিয়া কি জিজ্ঞাসা করিবেন? কু-কথা কু-সংবাদ যতক্ষণ চাপা থাকে, ততক্ষণই মঙ্গল। মন্ত্রী-বরের গলায় রত্নহার পরাইবার কথা বিপরীত চিন্তায় চাপা পড়িয়া গেল। বিজয়-বাজনা স্বভাবতঃই বন্ধ হইল। মারওয়ানের মুখে কি কথা অগ্রে বাহির হইবে শুনিতে এজিদের মহা আগ্রহ জন্মিল।

মারওয়ান নতশিরে অভিবাদন করিয়া বিনম্রভাবে বলিল, "মহারাজ! আর অগ্রসর হইবেন না! শত্রুদল আগত।"

"তোমাদের আকারে-প্রকারেই অনেক বুঝিয়াছি। কিন্তু বারবার পশ্চাদ্দিকে সভয়ে কি দেখিতেছ? পশ্চাতে কি আছে?"

মারওয়ান মনে মনে বলিল, "যাহা আপনার দেখিবার বাকী আছে।" প্রকাশ্যে বলিল "মহারাজ, আর কিছুই নহে—সেই চাঁদ-তারা সংযুক্ত নিশানের অগ্রভাগ দেখিতেছি। বেশী বিলম্ব নাই। তাহারা যেভাবে আসিতেছে, তাহাতে কোনরূপ সাজসজ্জা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোন নূতন উপায়, কি নগর-রক্ষার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত করিবার আর সময় নাই। যাহা সংগ্রহ আছে তাহাই সম্বল—তাহার প্রতিই নির্ভর।"

"হানিফা কি এতই নিকটবর্ত্তী?"

"সে কথা মুখে আর কি বলিব? কান পাতিয়া শুনুন, কিসের শব্দ শুনা যায়।"

"হাঁ, কিছু কিছু শুনিতেছি। কোন কোন সময়ে আকাশে যে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, সেই ঘনঘটা বিজলীর সহিত বহু দূরে খেলা করিতেছে।"

"মহারাজ, ও ঘনঘটার শব্দ নহে, বিদ্যুতের আভাও নহে,—ও দামামা-নাকাড়ার গুড়গুড়ি, ডঙ্কার কর্ণভেদী ধ্বনি আর অস্ত্রের চাকচিক্য।"

এজিদ আরও মনোনিবেশ করিলেন, স্থিরভাবে অশ্ব-বল্‌গা ধরিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন,—স্পষ্টতঃ ভেরীর ভীষণ নাদ, নাকাড়ার খরতর আওয়াজ, শিঙ্গার ঘোর রোল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল। বাজনা শুনিতে শুনিতে তিনি দেখিতে পাইলেন—মোহাম্মদী নিশান-দণ্ডের অগ্রভাগ সজ্জিত, পতাকায় জাতীয় চিহ্ন, আরোহী এবং পদাতিক সৈন্যগণের হস্তস্থিত বর্শা-ফলকের চাকচিক্য, স্ফুর্ত্তিবিশিষ্ট তেজীয়ান্ অশ্বের পদচালনা।

এজিদ সদর্পে বলিলেন, "যাহার জন্য আমাকে বহু দূর যাইতে হইত, ঘটনাক্রমে তাহাকে নিকটেই পাইলাম। চিন্তা কি ? মারওয়ান, এত আশঙ্কা কি ? চালাও অশ্ব—এখনই আক্রমণ করিব।"

"মহারাজ ! আমরা সর্ব্ববলে বলীয়ান্ না হইয়া এ সময়ে আর আক্রমণ করিব না। আমাদের বহু সৈন্য মোহাম্মদ হানিফার হস্তে মারা গিয়াছে। সৈন্যবল বৃদ্ধি না করিয়া আর আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না। আত্মরক্ষা, নগর-রক্ষা—এই দুইটির প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে; বশেষতঃ, ইহাতে আমার আর একটি উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

"কি উদ্দেশ্য সফল হইবে ?"

"মহারাজ ! কারবালা-প্রান্তরে হোসেন যেমন জলাবিহনে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সারা হইয়াছিল, সেইরূপ দামেস্ক-নগরে হানিফা অন্নবিহনে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। এ রাজ্যে কে তাহাদের আহার যোগাইবে ? কে তাহাদের সাহায্য করিবে ? আমরা আক্রমণের নামও করিব না, উহারাই আক্রমণ করুক—আক্রমণের ইচ্ছা না হয়, শিবির নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া থাকুক; অগ্রে আমরা কিছুই বলিব না। উহারা যতদিন বসিয়া থাকিবে, ততদিনই আমাদের মঙ্গল। উহাদের অন্নের অনটন পড়ুক, ক্রমে স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হউক ! সময় পাইলে আমরা মনোমত প্রস্তুত হইতে পারিব। সে সময় আমরা বিষম বিক্রমে আক্রমণ করিব।"

এজিদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন, আক্রমণ করিবার জন্য আর অগ্রসর হইলেন না, অন্য চিন্তায় মন দিলেন।

ওদিকে গাজী রহ্‌মান আপন সুবিধামত স্থানে শিবির নির্ম্মাণের আদেশ দিয়া গমনে ক্ষান্ত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি গাজী

রহ্‌মানের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি মনোনীত করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদি ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিল। বাসোপযোগী বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল। গাজী রহ্‌মানের আদেশে দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া তখনই সামরিক নিশান উড়িতে লাগিল। মারওয়ানের চিন্তা বিফল হইল। সমর-ক্ষেত্র—উভয় দলের সম্মুখস্থ ক্ষেত্র। এজিদ পক্ষেও যুদ্ধ-নিশান উড়িল, শিবির-নির্ম্মাণেও ত্রুটি হইল না—প্রভাতেই যুদ্ধ!

দ্বাবিংশ প্রবাহ

নিশার অবসান না হইতেই উভয় দলের রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। এক পক্ষে হানিফার প্রাণবিনাশ, অপর পক্ষে এজিদের পরমায়ুর শেষ,—দুই দলের এই দুই প্রকার আশা। দামেস্ক নগরবাসীরা কোন্ পক্ষের হিতৈষী, তাহা সহজে বুঝিবার সাধ্য নাই। কারণ, মোহাম্মদ হানিফার পক্ষে কেহ কোন কথা বলিলে, জয়নাল আবেদীনের জন্য কেহ দুঃখ করিলে, সে রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য হয়, কোতোয়ালের হস্তে তাহার প্রাণ যায়—তাই এ অবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট, সকলেই আনন্দিত! কেহ দূরে, কেহ অদূরে কেহ নগর-প্রাচীরে, কেহ কেহ উচ্চ বৃক্ষোপরি থাকিয়া উভয় দলের যুদ্ধ দেখিবার প্রয়াসী হইল। মোহাম্মদ হানিফার পক্ষ হইতে জনৈক আম্বাজী সৈন্য যুদ্ধার্থে রণ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী না পাঠাইয়া উপায় নাই। মারওয়ান বাধ্য হইয়া বল্লকীয়া নামে জনৈক বীরকে আম্বাজীর মস্তক শিবিরে আনিতে আদেশ করিল। যেই আজ্ঞা—অমনি গমন। সকলেই দেখিল, উভয় বীর অস্ত্রচালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষণে সময়ে সময়ে চঞ্চলা চপলাবৎ অগ্নিরেখা দেখা দিতেছে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আম্বাজী বল্লকীয়া-হস্তে পরাস্ত হইলেন। বিপক্ষ পরাভব স্বীকার করিলেও বল্লকীয়া অস্ত্র নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইল না।—সকলেই

দেখিল, ইসলাম-শোণিতে দামেস্কের প্রান্তর প্রথমে রঞ্জিত হইল—এজিদের মন মহাহর্ষে নাচিয়া উঠিল।

বল্লকীয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আয়, কে যুদ্ধ করিবি, আয়! শুনিয়াছি, আম্বাজীরা বিখ্যাত বীর, আয় দেখি! বীরের তরবারির নিকটে কোন্ মহাবীর আসিবি আয়!"

আহ্বানের পূর্ব্বেই দ্বিতীয় আম্বাজী বল্লকীয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইল না। উষ্ণীষের সহিত দ্বিতীয় আম্বাজী-শির ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সপ্তজন আম্বাজী বল্লকীয়া-হস্তে শহীদ হইলেন।

এজিদ হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিতে লাগিলেন, "মারওয়ান! আজ কি দেখিতেছ? এই সকল সৈন্যই ত তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে, শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় তাড়াইয়া আনিয়াছে! তাহারাই ত ইহারা?"

"মহারাজ! ইহার কারণ কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের একটি সৈন্যহস্তে মোহাম্মদীয় সাত জন সৈন্য কোনও যুদ্ধক্ষেত্রেই যমপুরী দর্শন করে নাই। সকলই মহারাজের অনুগ্রহে আর দামেস্ক-প্রান্তরের পবিত্রতার গুণে সম্ভব হইল!"

এজিদ-পক্ষে উৎসাহসূচক বাজনার দ্বিগুণ রোল উঠিয়াছে। বল্লকীয়ার সম্মুখে কেহই টিঁকিতেছে না! হানিফার সৈন্যশোণিতেই রণপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইতেছে! এজিদ মহা সুখী!

গাজী রহ্‌মান মোহাম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "বাদশাহ্-নামদার! এ প্রকারে যোদ্ধাগণকে শত্রু সম্মুখে পাঠান আর উচিত হইতেছে না। বুঝিলাম, দামেস্ক-রাজ্যের সৈন্যবল একেবারে সামান্য নহে।"

মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী প্রভৃতি বল্লকীয়ার যুদ্ধ বিশেষ মনোযোগে দেখিতেছিলেন। একা বল্লকীয়া এতগুলি সৈন্য বিনাশ করিল দেখিয়া তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আর সহ্য হইতেছে না, সমুদয়, শরীরে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। আর শিবিরে থাকিতে পারিলাম

না। তোমরা আমার পশ্চাৎ রক্ষা করিবে। গাজী রহমান শিবিরের তত্ত্বাবধানে থাকিবে, সৈন্যদিগের শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে—আমি চলিলাম। আজ হানিফার অস্ত্র, আর এজিদের সৈন্য, এই দুইয়ে একত্র করিয়া দেখিব—বেশী বল কাহার।"

হানিফা ঐ কথা বলিয়াই অশ্বারোহণ করিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া বলিলেন, "বীরবর! তোমার বীরত্বে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তোমার জীবনের সকল সাধ মিটিল—ইহাই আক্ষেপ!"

বল্লকীয়া বলিল, "মহাশয়! আর একটি সাধের কথা বাকী রাখিলেন কেন?"

"আর কি সাধ?"

"হানিফার মস্তকচ্ছেদন। দোহাই আপনার, আপনি ফিরিয়া যাউন। কেন আপনি আপনার সঙ্গী ভ্রাতৃগণের মত অসময়ে জগৎ ছাড়িবেন? আপনি ফিরিয়া যাউন। বল্লকীয়ার হস্তে রক্ষা নাই। আমি হানিফার শোণিতপিপাসু! আপনি ফিরিয়া যাউন!"

"তোমার সাধ মিটিবে। আমারই নাম মোহাম্মদ হানিফা।"

"সে কি কথা? এত সৈন্য থাকিতে মোহাম্মদ হানিফা সমরক্ষেত্রে? ইহা বিশ্বাস্য নহে। আচ্ছা, যদি তাহাই হয় তবে এই লও আঘাত।"

সে আঘাত কে দেখিল? পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এজিদের প্রাণে আঘাত লাগিল। বল্লকীয়ার শরীরের দক্ষিণভাগ দক্ষিণ হস্তসহ এক দিকে পড়িল—বাম উরু, বাম হস্ত, বাম চক্ষু, বাম কর্ণ লইয়া অপরার্দ্ধ ভাগ অন্য দিকে পড়িল।

এজিদ অলীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে! বলিতে পার এ সৈন্যটির নাম কি?"

অলীদ মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিল, "মহারাজ! ইনিই মোহাম্মদ হানিফা।"

এজিদ চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সৈন্যগণ! অসি নিষ্কোষিত কর, বর্শা উত্তোলন কর, যদি দামেস্কের

স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাও, মহাবেগে হানিফাকে আক্রমণ কর। এমন সুযোগ আর হইবে না। তোমাদের বল-বিক্রমের ভালরূপ পরিচয় পাইলে হানিফা যুদ্ধক্ষেত্রে আর আসিবে না; নিশ্চয়ই পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে। যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র হানিফার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আন। তোমরাই আমার দক্ষিণ বাহু, তোমরাই আমার বল-বিক্রম, তোমরাই আমার সাহস, তোমরাই আমার প্রাণ। ঘোর বিক্রমে হানিফাকে আক্রমণ কর। হয় বন্ধন—নয় শিরশ্ছেদ,—এই দুইটি কার্য্যের একটি কার্য্য করিতে আজ জীবন-পণ কর। বীরগণ! বীর-দর্পে চলিয়া যাও। তোমাদের পারিতোষিক আমার প্রাণ—মন—দেহ!—মণি, মুক্তা, হীরক ইত্যাদি ত তুচ্ছ কথা!"

সৈন্যগণ অসিহস্তে 'মার্ মার্' শব্দে সমরাঙ্গণে যাইয়া হানিফাকে আক্রমণ করিল। এজিদের চক্ষু হানিফার দিকে। এজিদের তরবারি ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় চাকচিক্য দেখাইয়া উর্দ্ধে, নিম্নে, বামে, দক্ষিণে ঘুরিল এবং লোহিত রেখায় তাহার পূর্ব্ব চাকচিক্য কিঞ্চিৎ মলিন ভাব ধারণ করিল। সম্মুখে একটি প্রাণীও নাই। চক্ষুর পলকে সৈন্যেরা যেন স্থির বায়ুর সহিত মিশিয়া অশ্বের সহিত অন্তর্হিত হইল।

মারওয়ান বলিল,—"বাদশাহ্-নামদার! দেখিলেন, অলীদ সহজে মদিনার পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। এই যে হানিফার অস্ত্র চলিল, আমরা পরাজয় স্বীকার না করিলে এ অস্ত্র আর থামিবে না,—দিবা-রাত্রি সমানভাবে চলিবে,—হানিফার মন কিছুতেই টলিবে না—রক্তের স্রোত বহিয়া দামেস্ক-প্রান্তর ডুবিয়া গেলেও সে বিশাল হস্তের বল কমিবে না,—হস্ত অবশ হইবে না,—তাহার তরবারির তেজ কমিবে না, ক্লান্ত হইয়া সে শিবিরেও ফিরিয়া যাইবে না।"

এজিদ রোষে জ্বলিতেছেন। পুনরায় তিনি পূর্ব্বপ্রেরিত সৈন্যের দ্বিগুণ সৈন্য হানিফা-বধে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ মহাবীরের সম্মুখে যাইয়া একত্র একযোগে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যে যেরূপ অস্ত্রই নিক্ষেপ করিল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হানিফা তাহাকে সেই অস্ত্রেই যমপুরী পাঠাইয়া দিলেন। এজিদের ক্রোধের সীমা রহিল না। পুনরায় তিনি চতুর্গুণ

সেনা পাঠাইলেন। এইবার এজিদ হানিফাকে তরবারিহস্তে তাঁহার সৈন্যগণের নিকট যাইতে দেখিলেন মাত্র। পরক্ষণে দেখিলেন যে, প্রেরিত সৈন্যগণের অশ্বসকল দিগ্বিদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে, একটি অশ্বপৃষ্ঠেও আরোহী নাই!

এজিদ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মারওয়ান করজোড়ে বলিলেন,—"মহারাজ! এমন কার্য্য করিবেন না, আজ মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখে কখনই যাইবেন না। এখনও দামেস্কের অসংখ্য সৈন্য রহিয়াছে, আমরা জীবিত থাকিতে মহারাজকে হানিফার সম্মুখীন হইতে দিব না।"

এজিদ মারওয়ানের কথায় ক্ষান্ত হইলেন; সেদিন আর যুদ্ধ করিলেন না। সে দিনের মত শেষ বাজনা বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া মারওয়ানসহ তিনি শিবিরে ফিরিলেন। মোহাম্মদ হানিফাও তরবারি কোষে আবদ্ধ করিয়া অশ্ববল্গা ফিরাইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ

প্রভাত হইল। পাখীরা ঈশ-গান গাহিতে গাহিতে জগৎ জাগাইয়া তুলিল। অরুণোদয়ের সহিত যুদ্ধ-নিশান দামেস্ক-প্রান্তরে উড়িতে লাগিল। যে মস্তক জয়নাবের কর্ণাভরণের দোলায় দুলিয়াছিল, ঘুরিয়াছিল (এখনও দুলিতেছে, ঘুরিতেছে), আজ সেই মস্তক হানিফার অস্ত্রচালনার কথা মনে করিয়া মহাবিপাকে বিষম পাকে ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ান, অলীদ, জেয়াদ ও ওমরের মস্তক পরিশুষ্ক—সৈন্যগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার—না জানি আবার কি ঘটে!

উভয় পক্ষই প্রস্তুত। হানিফার বৈমাত্রেয় এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমর আলী করজোড়ে হানিফার নিকট বলিলেন,—"আর্য্য! আজিকার যুদ্ধভার দাসের প্রতি অর্পিত হউক।"

হানিফা সস্নেহে বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! গতকল্য যে উদ্দেশ্যে তরবারি

ধরিয়াছিলাম, যে আশায় তুল্‌দুল্‌কে কশাঘাত করিয়াছিলাম, তাহা আমার সফল হয় নাই। বিপক্ষদল আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত করিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম,: যুদ্ধ শেষ না করিয়া আর তরবারি কোষে আবদ্ধ করিব না,—শিবির হইতে যে বাহির হইয়াছি, আর শিবিরে যাইব না, আজ প্রথম—আজই শেষ। শুনিয়াছি, বিশেষ সন্ধানেও জানিয়াছি—এজিদ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছে। যুদ্ধ-সময়েই হউক, কি যুদ্ধ-শেষেই হউক, অবশ্যই এজিদকে হাতে পাইতাম। আমার চক্ষে পড়িলে তাহার জীবন কালই শেষ হইত। এজিদ হোসেনের মস্তক কারবালা হইতে দামেস্কে আনাইয়াছিল। আমি তাহার মস্তক হস্তে করিয়া দামেস্কবাসীদিগকে দেখাইতে দেখাইতে বন্দীগৃহে যাইয়া জয়নালের সম্মুখে ধরিতাম, কিন্তু আমার মনের আশা মনেই রহিল। কি করি, বাধ্য হইয়া গত কল্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছি। আজ তুমি যাইবে,—যাও ভাই! তোমাকে ঈশ্বরে সঁপিলাম। দয়াময়ের নাম করিয়া, নূরনবী মোহাম্মদের নাম করিয়া, ভক্তিভাবে পিতার চরণোদ্দেশে নমস্কার করিয়া তরবারি হস্তে কর। শত সহস্র বিধর্ম্মী বধ করিয়া জয়নাল-উদ্ধারের উপায় কর। তোমার তরবারির তীক্ষ্ণধার আজ শত্রু-শোণিতে রঞ্জিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু ভাই, এজিদের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিও না। ক্রোধ বশতঃ ভ্রাতৃ-আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মহাপাপ-কূপে ডুবিও না; সাবধান, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না।"

ওমর আলী ভ্রাতৃ-উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তিভাবে ভ্রাতৃপদ চুম্বন করিয়া হানিফার উপদেশ মত তরবারি হস্তে করিলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করিয়া ওমর আলীর জয় ঘোষণা করিল।

মহাবীর ওমর আলী পুনরায় ঈশ্বরের নাম করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। বিদ্যুৎবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই এজিদ পক্ষীয় বীর সোহ্‌রাব-জঙ্গ অশ্ব-দাপটের সহিত অসিচালনা করিতে করিতে উপস্থিত হইল। স্থিরভাবে ক্ষণকাল ওমর আলীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া সে বলিল,—"তোমার নাম কি মোহাম্মদ হানিফা?"

ওমর আলী বলিলেন,—"সে কথায় তোমার কাজ কি? তোমার কাজ তুমি কর।"

"কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? সিংহ কি কখনও শৃগালের সহিত যুঝিয়া থাকে? শুনিয়াছি মোহাম্মদ হানিফা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। তুমি কি সেই হানিফা?"

"আমার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে, ফিরিয়া যাও।"

সোহ্‌রাব হাসিয়া বলিল,—"এত দিন পরে আজ নূতন কথা শুনিলাম। সোহ্‌রাব-জঙ্গের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার! তুমি যদি মোহাম্মদ হানিফা হও, বীরত্বের সহিত পরিচয় দাও। পরিচয় দিতে ভয় হয়, তুমিই ফিরিয়া যাও।"

"আমি ফিরিয়া যাইব?"

"তবে কি তুমি যথার্থই মোহাম্মদ হানিফা?"

"এত পরিচয়ের আবশ্যক কি? তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি: তুমি কি পাপাত্মা এজিদ?"

"সাবধান! দামেস্ক-অধিপতির অবমাননা করিও না।"

"আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করি না, তোমার তরবারির ক্ষমতা দেখিতে চাহি।"

"জানিলাম, তুমিই মোহাম্মদ হানিফা।"

"শোন্ কাফের! শোন্ নারকী! তুই তোর অস্ত্রের আঘাত ভিন্ন যদি পুনরায় কথা বলিস্, তবে তুই যে পাথর পুজিয়া থাকিস্, সেই পাথরের শপথ!"

"আমি পাথর পূজা করি, তুই ত তাহাও করিস্ না? নিশ্চিন্তভাবে নিরাকারের উপাসনায় কি মনের তৃপ্তি হয়'রে বর্ব্বর?"

"জাহান্নামী কাফের! আবার বাক্‌চাতুরী? তুই আমাদের জাতীয় নীতির বহির্ভূত বলিয়া কথা কহিতে সময় পাইতেছিস্!"

"আমি তোমার পরিচয় না পাইলে কখনও অপাত্রে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব না। ভাল কথাই বলিতেছি,—তুমি যদি মোহাম্মদ হানিফা না হও তবে তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নাই—যুদ্ধ নাই। তুমি আমার পরম বন্ধু, প্রিয় সুহৃদ।"

"বিধর্ম্মীদিগের বাক্‌চাতুরীই এই প্রকার—প্রস্তর পূজকদিগের স্বভাবই এই।"

"ওরে বর্ব্বর! প্রস্তরে কি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য নাই? দেখ্—দেখ্—লৌহতে কি আছে।" এই বলিয়া আঘাত—অমনি প্রতি-আঘাত!

সোহ্‌রাব বলিল,—"রে আম্বাজী! তুই-ই মোহাম্মদ হানিফা; কেন আমাকে বঞ্চনা করিতেছিস্? আমার আঘাত সহ্য করিবার লোক জগতে নাই। সোহ্‌রাবের অস্ত্র এক অঙ্গ দুইবার স্পর্শ করে না।"

এই কথাটা কেবল ওমর আলী শুনিলেন মাত্র। তারপর যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তবে তিনিই দেখিয়াছেন: সোহ্‌রাবের দেহ অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। কাহার আঘাত? আর কাহার,—ওমর আলীর!

সোহ্‌রাব-নিধন এজিদের সহ্য হইল না। মহাক্রোধে নিষ্কোষিত অসি-হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে আসিয়া তিনি বলিলেন,—"তুই কে? আমার প্রাণের বন্ধু সোহ্‌রাবকে বিনাশ করিলি? বল্‌ত আম্বাজী, তুই কে?"

"আবার পবিচয়? বল্‌ত কাফের তুই কে?"

"আমি দামেস্কের অধিপতি। আরও বলিব? আমার নাম এজিদ।"

ওমর আলীর হৃদয় কাঁপিয়া গেল, ভয়শূন্য হৃদয়ে মহাভয়ের সঞ্চার হইল। ভ্রাতৃ-আজ্ঞা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন:

"তুই কি যথার্থ ই এজিদ?"

"কেন, এজিদ নামে এত ভয় কেন?"

"সহস্র এজিদে আমার ভয় নাই, কিন্তু—"

"ও সকল 'কিন্তু' কিছুই নহে! ধর্ এজিদের আঘাত!"

"আমি প্রস্তুত আছি।"

এজিদ মহাক্রোধে তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন। ওমর আলী তাহা বর্ম্মে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"তুই যদি যথার্থই এজিদ, তবে তোর আজ পরম সৌভাগ্য।"

"আমার সৌভাগ্য চিরকাল।"

"তা বটে—কি বলিব, ভ্রাতৃ-আজ্ঞা!"

এজিদ পুনরায় আঘাত করিলেন। ওমর আলী সে আঘাত উড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"আর কেন ? তোমার বাহুবল, অস্ত্রবল সকলই দেখিলাম।"

এজিদ মহাক্রোধে পুনরায় আঘাত করিলেন। ওমর আলী সে আঘাতও অসিতে উড়াইলেন। ক্রমাগত এজিদের আঘাত ও ওমর আলীর আত্মরক্ষা!

এজিদ বলিলেন,—"ওহে তুমি যদি মোহাম্মদ হানিফা না হও, তবে যথার্থ বল তুমি কে ?"

"এখন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তোমার আর কি ক্ষমতা আছে দেখাও।"

"ক্ষমতা ত দেখাইব; কিন্তু দেখিবে কে ? আমার একটু সন্দেহ হইতেছে, তাহাতেই বিলম্ব।" .

"রণক্ষেত্রে সন্দেহ কি ? হাতে অস্ত্র থাকিতে মুখে কথা কেন ?"

"তোমার অস্ত্রে ধার আছে কিনা, দেখিলাম না। কিন্তু কথার ধারে গায়ে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছ।"

"বাক্‌চাতুরী ছাড়, এখন আঘাত কর!"

এজিদ ক্রমে তরবারি, তীর, বর্শা, যাহা কিছু তাঁহার আয়ত্তে ছিল তাহার দ্বারা আঘাত করিলেন। কিন্তু ওমর আলী অচল পাষাণ প্রতিমাবৎ দণ্ডায়মান—এজিদ মহা লজ্জিত!

এজিদ বলিলেন,—"আমার সন্দেহ ঘুচিল, তুমিই মোহাম্মদ হানিফা! হানিফা!! গতকল্য তোমার যুদ্ধ দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম! ধন্য তোমার বাহুবল! এত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম, কিছুই করিতে পারিলাম না! তোমার সহ্যগুণ—"

ওমর আলী হাসিয়া বলিলেন,—"এজিদ! তোমার আর কি ক্ষমতা আছে, দেখাও। অস্ত্র থাকিতে আজ আমি নিরস্ত্র, বল থাকিতে দুর্ব্বল। কি পরিতাপ! আমার হাতে পড়িয়াও আজ তুমি বাঁচিয়া গেলে।"

"ওরে পাষণ্ড! সাধ্য থাকিতে অসাধ্য কি ? ভেকে কি কখনও অহি-মস্তকে আঘাত করে ? শৃগালের কি ক্ষমতা যে, শার্দ্দূলের গায়ে

অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে পারে? তুই যাহাই মনে করে থাকিস্, নিশ্চয় জানিস্,—আজ তোর জীবনের শেষ।"

"কথাটা মিথ্যা বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, হয় অস্ত্রত্যাগ কর, না হয় পলাও।"

"আমি পলাইব? তোর জীবনের শেষ না করিয়া পলাইব?"

এজিদ পুনরায় তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন,—বৃথা হইল। পরিশেষে ফাঁস-হস্তে তিন চারিবার ওমর আলীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ওমর আলীর গলায় ফাঁস নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফাঁসেতে আটকায় কৈ? ওমর আলী ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আজ তিনি এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না। এজিদ এখন অস্ত্র ছাড়িয়া, মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিলেই ওমর আলীর মনের সাধ পূর্ণ হয়। তিনি সেই চিন্তায় আছেন, সময় খুঁজিতেছেন—কার্য্যেও তাহাই ঘটিল।

মোহাম্মদ হানিফা শিবিরে বসিয়া যুদ্ধের সংবাদ লইতেছেন মাত্রঃ এ পর্য্যন্ত কেহই পরাস্ত হয় নাই। এজিদ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছেন, আর হানিফা-বোধে ওমর আলীকে যথাসাধ্য আক্রমণ করিয়াছেন,—এ কথার তত্ত্ব কেহই সন্ধান করেন নাই, হানিফাও শুনিতে পান নাই। এজিদ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবেন, ইহা কেহ মনেই করে নাই।

এজিদ নিশ্চয় জানিয়াছেন যে, ইনিই মোহাম্মদ হানিফা। উভয় ভ্রাতার আকৃতি প্রায় এক; তবে সামান্য একটু যে প্রভেদ, তাহা জগৎকর্ত্তার সৃষ্টির মহিমা ও কৌশল। এজিদ একদিন মাত্র দেখিয়া সে প্রভেদ বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার উপর এ পর্য্যন্ত সে অস্ত্র নিক্ষেপ করিল না দেখিয়া এজিদ বিস্মিত হইলেন। 'মল্লযুদ্ধ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিব—মল্লযুদ্ধে নিশ্চয়ই ধরিব—ইহাই এখন এজিদের মনের ভাব।

উভয়ের মনের আশাই উভয়ে সফল করিবেন। প্রকৃতি কাহার অনুকূল, তাহা কে বলিতে পারে? উভয় বীরই অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন,—মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীর-পদ-দলনে পদতলস্থ মৃত্তিকা স্বাভাবিক ছিদ্রে অঙ্গ মিশাইয়া ক্রমে সরিতে লাগিল।

মারওয়ান, আবদুল্লাহ্ জেয়াদ প্রভৃতি এই অলৌকিক যুদ্ধে এজিদকে লিপ্ত দেখিয়া মহাবেগে অশ্ব চালাইল। হানিফা-পক্ষীয় কয়েকজন যোদ্ধা ওমর আলীকে হঠাৎ মল্লযুদ্ধে রত দেখিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। এজিদ কতবার ওমর আলীকে ধরিতেছেন, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না! ওমর আলীও এজিদকে ধরিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে স্ববশে আনিতে পারিতেছেন না!

মোহাম্মদ হানিফাপক্ষীয় বীরগণ এজিদকে চিনিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং ওমর আলীর মল্লযুদ্ধের কারণ বুঝিলেন। এজিদের প্রতি কাহারও অস্ত্রনিক্ষেপ করিবার অনুমতি নাই! কাজেই ওমর আলীরও নিস্তার নাই। হায়! হায়!! একি কি হইল—মনে মনে এই আন্দোলন করিয়া মোহাম্মদ হানিফার নিকট এই কথা বলিতে কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া সকলেই শিবিরাভিমুখে ছুটিলেন।

এদিকে এজিদ মল্লযুদ্ধের প্যাঁচে ওমর আলীর গ্রীবা এবং উরু সাপ্‌টিয়া ধরিয়াছেন। ওমর আলী সে বন্ধন কাটাইয়া এজিদকে ধরিলেন। সেই সময় মারওয়ান, জেয়াদ প্রভৃতি সকলেই ত্রস্তে অশ্ব হইতে নামিয়া মহাবীর ওমর আলীকে ধরিলেন এবং ফাঁসের দ্বারা তাঁহার হস্ত, পদ, গ্রীবা বাঁধিয়া 'জয় জয়' রব করিতে করিতে আপন শিবিরাভিমুখে আসিতে লাগিল।

মোহাম্মদ হানিফা এজিদের সংবাদ পাইয়া সজ্জিত বেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন: সমরাঙ্গণে জনপ্রাণী মাত্র নাই। এজিদের শিবিরের নিকট মহা কোলাহল—জয় জয় রব—তুমুল বাজনা! আর বৃথা সাজ—বৃথা গমন! ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে গিয়া আজ ওমর আলী বন্দী!

মোহাম্মদ হানিফা কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি মহা চিন্তায় পড়িলেন।

বিপক্ষদলে বাদ্যের তুফান উঠিল, দামেস্ক-প্রান্তর হর্ষে এবং বিষাদে কাঁপিয়া উঠিল। এজিদ-দলের প্রথম কথা—মোহাম্মদ হানিফা বন্দী; অবশেষে সাব্যস্ত হইল, মোহাম্মদ হানিফা নহে, এ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা—

নাম ওমর আলী। যাহা হউক, হানিফার দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, সিংহের এক অঙ্গ হীন—এজিদেরই জয়!

এজিদ আজ্ঞা করিলেন,—"আগামী কল্য যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে; কারণ,—ওমর আলীর প্রাণবধ। শত্রুকে যখন হাতে পাইয়াছি, তখন ছাড়িব না; নিশ্চয়ই তাহার প্রাণদণ্ড দিব। কিসে প্রাণদণ্ড? তরবারিতে নহে, অন্য কোন প্রকারে নহে—শূলে প্রাণদণ্ড। হানিফা দেখিবে, তাহার সৈন্য সামন্তও দেখিবে। প্রকাশ্য স্থানে শূলে ওমর আলীর প্রাণবিনাশ করিতে হইবে। এখনই ঘোষণা করিয়া দাও যে—হানিফার ভ্রাতা মহারাজ এজিদের হস্তে বন্দী, আগামী কল্য তাহার প্রাণবধ।"

মারওয়ান তখনই রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত হইল। মুহূর্তমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ও নগরে ঘোষণা হইল: মোহাম্মদ হানিফার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওমর আলী এজিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল, রাজ-কৌশলে সে পাপী আজ বন্দী!—আগামী কল্য দামেস্ক-নগরের পূর্ব্বপ্রান্তরে সমরক্ষেত্রের নিকট শূলেতে চড়াইয়া তাহার প্রাণবধ হইবে।"

মোহাম্মদ হানিফার কর্ণেও এ নিদারুণ ঘোষণা প্রবেশ করিল। শিবিরস্থ সকলেই এই মর্ম্মভেদী ঘোষণায় মহা আকুল হইলেন। গাজী রহমানের বিশাল মস্তক ঘুরিয়া গেল, মস্তিষ্কের মজ্জা আলোড়িত হইয়া তড়িৎবেগে চালিত হইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ প্রবাহ

আজ ওমর আলীর প্রাণবধ—এ সংবাদে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী। নগরবাসীরা কেহ ম্লানমুখে বধ্য ভূমিতে যাইতেছে—কেহ বা মনের আনন্দে হাসি-রহস্যের নানা কথার প্রসঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইতেছে। শূলদণ্ড দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্বপক্ষ, বিপক্ষ সৈন্যদল যাহাতে ওমর আলীর বধক্রিয়া স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে, মন্ত্রী মারওয়ান সে উপায় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছে। দিনমণির উদয় হইতে না হইতেই নাগরিকদল দলে দলে দামেস্ক-প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। প্রায় সকল লোকের মুখেই একই কথা—"আজ শূলদণ্ডের অগ্রভাগ রক্তমাখা হইয়া ওমর আলীর মজ্জা ভেদ করিবে। কাল মস্‌হাব কাক্কার খণ্ডিতশির ধরায় লুণ্ঠিত হইবে; তাহার পর হানিফার দশা যাহা ঘটিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়!"

কথা গোপন থাকিবার নহে; বিশেষতঃ, মন্দ কথা বায়ুর অগ্রে অগ্রে অতি গুপ্তস্থানেও প্রবেশ করে। বন্দীগৃহেও ঐ কথা! ওমর আলীর প্রাণবধের কথা শুনিয়া শাহ্‌রেবানুর ও হাস্‌নেবানুর মুখের কথা বন্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে। ক্রন্দন ভিন্ন তাঁহাদের আর উপায় কি? হোসেন-পরিজনের দুঃখের অন্ত নাই। তাঁহাদের রক্ত, মাংস, অস্থি চর্ম্মযুক্ত শরীর বলিয়াই এত সহ্য হইতেছে,—পাষাণে গঠিত হইলে এত দিন সে শরীর বিদীর্ণ হইত,—লৌহনির্ম্মিত হইলে কোন্ দিন গলিয়া যাইত।

শাহ্‌রেবানু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, —"হায় সর্ব্বস্ব গেল, প্রাণ গেল, রাজ্য গেল, স্বাধীনতা গেল। আশা ছিল,—জয়নাল আবেদীন বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যিনি জয়নালের উদ্ধার হেতু কত কষ্ট, কত বিপদ, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দামেস্কের প্রান্তর পর্য্যন্ত আসিলেন—তিনি আসিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না! আর ভরসা

কি ? আজ ওমর আলী—কাল শুনিব যে, মোহাম্মদ হানিফার জীবন-শেষ ! আর আশা কি ? জগদীশ, তোমার মনে ইহাই ছিল !—তোমার মনে ইহাই ছিল !!"

সালেমা বিবি বলিলেন, "শাহ্‌রেবানু, এ কি কথা ? ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। সেই নির্ব্বিকার নিরাকার দয়াময়কে কোন প্রকারে দোষী করিও না,—মহাপাপ ! মহাপাপ !! তিনি জীবের ভালর জন্যই আছেন, অজ্ঞ লোকের শিক্ষার জন্য অনেক সময় অনেক লীলা দেখাইয়া থাকেন। সেই করুণাময় ভগবান কৌশলে দেখাইয়া দেন যে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব ক্ষমতাশালী হইলেও তাঁহার ক্ষমতার নিকট সে অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। আমাদের স্বভাবই এই যে, কোন মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেই আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই ! কিন্তু সেই মহাশক্তি প্রভাবে, মানবের অন্তরের মূঢ়তা ও মূর্খতা দূর করিতে সেই অলৌকিক ক্ষমতাশালী মানব প্রতি এমন কোন বিপদ্‌জালের বিস্তার হয় যে, তাহার সে অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তি যে, কোথায়—কোন্ পথে—কিসে মিশিয়া যায়, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভুর ক্ষমতা অসীম। তিনিই সর্ব্বমূল, তিনিই বিপদের কাণ্ডারী,—বিপদ্-সাগর হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র তরী। মানুষের ক্ষমতা কি ? ওমর আলীর সাধ্য কি ? হানিফার শক্তি কি ? সেই বিপদতারণ ভগবানের কৃপা না হইলে, দয়াময়ের দয়া না হইলে, কোন প্রাণী কাহাকেও বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারে ? তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই সর্ব্ববিজয়, সর্ব্বরক্ষক বিধাতা ! শাহ্‌রেবানু স্থির হও—হৃদয়ে বল সঞ্চয় কর। সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি একমনে নির্ভর কর। দুঃখে পড়িয়া সামান্য লোকের ন্যায় বিহ্বল হইও না। বলহীন হৃদয়ের ন্যায় ব্যাকুল হইও না। তাঁহার নামে কলঙ্ক রটাইও না। তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবের মন্দ-চিন্তা কখনই করেন না। সাবধান !—শাহ্‌রেবানু, সাবধান !! মনের মলিনতা দূর কর ! তিনি অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় অদ্বিতীয় ঈশ্বর।"

"এত বিপদ মানুষের অদৃষ্টে ঘটে ! সকলই ত ঈশ্বরের কার্য্য।

আমরা কি অপরাধে অপরাধী? কি পাপ করিয়াছি যে, তাহার জন্য এই প্রতিফল?"

"ও কথা মুখে আনিও না,—বিপদ, ব্যাধি, জরা জগতে নূতন নহে। নূরনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পরিজন হইলেই যে, ইহজগতে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এ কথা কখনই অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর মহান্, তাঁহার শক্তি মহান্। কত নবী, কত অলী, কত দরবেশ, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন! কত শত সহস্র মহাপুরুষ, যোগী, ঋষি এই ভবে জন্মিয়া গিয়াছেন! কত ভক্তের মন পরীক্ষার জন্য তিনি কত কি করিয়াছেন! তুমি জানিয়া শুনিয়া আজ সেই সকল ভুলিয়া যাইতেছ? ছিঃ! ছিঃ! ঈশ্বরে নির্ভর কর! তুমি কি সকলই ভুলিয়া গিয়াছ? হজরত আদমকেও বেহেশ্‌তের চির-সুখশান্তি পরিত্যাগ করিয়া চির-সন্তাপহারিণী নয়নের মণি, পরম প্রিয়তমা, প্রাণের প্রাণ, অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী বিবি হাওয়ার সহিত বিচ্ছেদে এক নয়, দুই নয়, ৪০ বৎসরকাল সজল নয়নে দেশদেশান্তরে, পর্ব্বতে, বিজনে, প্রান্তরে মহাকষ্টে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। হজরত ইব্রাহিমকেও গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত নূহ্ পয়গম্বরকেও জলে ভাসিতে হইয়াছিল। হজরত আইউবকেও মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হজরত ইউসুফকেও অন্ধকূপে ডুবিতে হইয়াছিল। হজরত ইউনুস্‌কেও মৎস্যের উদরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত জাক্‌রিয়াকেও করাতে দ্বিখণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। হজরত মুসাকেও প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। ঈসাইদিগের মতে হজরত ঈসাকেও শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। আমাদের হজরত মোহাম্মদ কি কম বিপদে পড়িয়াছিলেন? প্রাণভয়ে তাঁহাকে জন্মভূমি মক্কা নগর পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে মদিনা যাইতে হইয়াছিল। ইঁহারা কি বিপদকালে ঈশ্বরের নাম ভুলিয়াছিলেন? নূরনবী মোহাম্মদের কথা একবার মনে কর! ঈশ্বরের আদেশে তিনি কি না করিয়াছেন? রাজাধিরাজ সাদ্দাদ, নমরূদ, ফেরাউন, কারুণ—ইঁহাদের অবস্থাও একবার ভাবিয়া দেখ। ধন-বল, রাজ্য-বল, বাহু-বল প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কত বিপদ্‌গ্রস্ত

হইয়াছিলেন! সেই সকল প্রাচীন কাহিনী, প্রচীন কথা, কেবল সেই অদ্বিতীয় ভগবানের মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে। তিনি কি না করিতে পারেন? আজ ওমর আলীর প্রাণবধ হইবে, কাল এজিদের প্রাণ যাইতে পারে! ঈশ্বর যাহা ঘটাইবেন, তাহা নিবারণের কাহারও ক্ষমতা নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকারে দয়াময়—সকল অবস্থাতেই করুণাময়! ভাবিলে কি হইবে?—আর কাঁদিলেই বা কি হইবে?"

"আপনার হিতোপদেশে আমার মন অনেক সুস্থ হইল। কিন্তু একটি কথা এই যে, প্রধান বীর ওমর আলী এজিদহস্তে মারা পড়িল, ইহাতে হানিফার সাহস, বল, উৎসাহ অনেক লাঘব হইল!"

"সে কি কথা? সেই অদ্বিতীয় ভগবান হানিফাকেও এজিদহস্তে বিনাশ করাইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন! তাঁহার নিকটে এ কার্য্য আশ্চর্য্য নহে। তিনি কি না করিতে পারেন? পর্ব্বতকে সমুদ্রে পরিণত করিতে, মহানগরকে বনে পরিণত করিতে, মহাসমুদ্রে মহানগর বসাইতে তাঁহার কতক্ষণের কাজ? তাঁহার ক্ষমতার—দয়ার অন্ত নাই। তবে জগৎ-চক্ষে সাধারণ বিবেচনায় দেখিতে হইবে যে, এ সকল ঘটনার মূল কি? আমার মনের কথা আমি বলিতেছি—ইহা আর কিছুই নহে:—ঈশ্বরের লীলা-প্রকাশ—ক্ষমতা-বিকাশ! কিন্তু সেই ঈশ্বরই সেই ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৃষ্ট জীবকে উপদেশ দিতেছেন,—"জীব! সাবধান! এই কার্য্যে এই ফল, এই পথে চলিলে এই দুর্গতি, আমার নির্দ্ধারিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে—এই শাস্তি। তিনি সকলকেই সমান ক্ষমতা দিয়াছেন, কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে নিবারণ করেন না। আপন ভালমন্দ আপনিই বুঝিয়া লইতে হইবে। সংসার বড় ভয়ানক কঠিন স্থান! আজ আমরা দামেস্কে বন্দীখানায় বন্দীভাবে বসিয়া এত কথা বলিতেছি।—ভাব দেখি, ইহার মূল কি?"

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে জয়নাব আসিয়া বলিলেন,—"আমি গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম: নগরের বহুসংখ্যক লোক দামেস্ক-প্রান্তরে যাইতেছে। সকলের মুখে একই কথা—'আজ ওমর

প্রাণবধ দেখিব, কাল মোহাম্মদ হানিফার খণ্ডিতশির দামেস্ক-প্রান্তরে লুটাইতে দেখিব।' জয়নাল আবেদীন কারাগার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; প্রহরিগণ কে কোথায় আছে, দেখিতে পাইলাম না। জয়নাল ঐ জনতার মধ্যে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল। আমি সঙ্কেতে অনেক নিষেধ করিলাম—শুনিল না। একবার ফিরিয়া তাকাইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে বেগে চলিয়া গেল। কেবলমাত্র একটি কথা শুনিলাম—'হায় রে অদৃষ্ট! কারবালার ঘটনা এখানেও ঘটিতে আরম্ভ হইল! এক একটি করিয়া এজিদ হস্তে,—'এই কথা শুনিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না, দেখিতে দেখিতে সে চক্ষুর অন্তরাল হইয়া পড়িল! —এ আবার কি ঘটনা ঘটিল?"

শাহ্‌রেবানু জয়নাবের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলেন, তাঁহার মুখের ভাব সে সময় যে প্রকার হইয়াছিল, তাহা কবির কল্পনার অতীত, —চিন্তার বহির্ভূত। জয়নাল আবেদীনই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা! শাহ্‌রেবানুর প্রাণপাখী সে সময় দেহপিঞ্জরে ছিল কি-না, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার চক্ষু স্থির!—কণ্ঠরোধ! সেই এক প্রকার ভাব—স্পন্দন-হীন!

সালেমা বিবি বুদ্ধিমতী, তাঁহার সহ্যগুণ অধিক। কিন্তু শাহ্‌রেবানুর অবস্থা দেখিয়া তিনিও বিহ্বল হইলেন। শাহ্‌রেবানুর নাম ধরিয়া তিনি অনেকবার ডাকিলেন। কিন্তু শাহ্‌রেবানুর চৈতন্য নাই! তিনি শাহ্‌রেবানুর বুকে মুখে হাত দিয়া সান্ত্বনা দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইল না, তিনি মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শাহ্‌রেবানু বলিলেন,—"জয়নাল, বাবা জয়নাল! নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর সন্তান! কোথায় গেলি বাপ্? তোর পায় পায় শত্রু, পায় পায় বিপদ! আমরা চিরবন্দী। দুঃখের ভার বহন করিতেই জগতে আমাদের সৃষ্টি হইয়াছিল! তুই দুঃখিনীর সন্তান, কি কথা মনে করিয়া কোথায় গেলি? তুই কি তোর পিতৃব্য ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিতে গিয়াছিস্? তুই সেই বধ্যভূমিতে গিয়া কি করিবি? তোকে যে চিনিবে, সেই-ই এজিদের নিকট লইয়া গিয়া তোকেও ওমর আলীর সঙ্গী করিবে।

এজিদ এখন হানিফার প্রাণ লইতে অগ্রসর হইয়াছে। সে তোকে কয়েকবার মারিতে গিয়াও নিরস্ত হইয়াছে; আজ তোকে দেখিলে তা'র ক্রোধের কী সীমা থাকিবে? বন্দী পলাইলে কা'র না রোষের ভাগ দ্বিগুণ হয়? জয়নাল, তোর এ বুদ্ধি কেন হইল?"

শাহ্‌রেবানু এইরূপে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সালেমা বিবিও তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। শেষে সালেমা বিবি বলিলেন,—"শাহ্‌রেবানু, স্থির হও। জয়নাল অবোধ নহে। তাহার পিতার সমস্ত গুণই তাহাতে রহিয়াছে। ঈশ্বর তাহাকে বীরপুরুষ করিয়াছেন। এজিদের অত্যাচার তাহার হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। সে একা কিছুই করিতে পারিবে না। আবার আমাদিগকে বন্দীখানায় রাখিয়া এমন কোনও কার্য্যে হঠাৎ হস্তক্ষেপ করিবে না যাহাতে সে মারা পড়ে বা ধরা পড়ে। তাহার আশা অনেক! ঈশ্বরে নির্ভর কর, এ সকল তাঁহারই লীলা। তুমি স্থির হও, ঈশ্বরের নাম করিয়া জয়নালকে আশীর্ব্বাদ কর,—তাহার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, এজিদহস্তে তাহার মৃত্যু নাই। সেই-ই মদিনার রাজা, সেই-ই দামেস্কের রাজা। আমি মাননীয় নূরনবীর মুখে শুনিয়াছি, জয়নাল আবেদীন দ্বারা মদিনার সিংহাসন রক্ষা হইবে, ইমাম বংশ জীবিত থাকিবে, রোজকেয়ামত পর্য্যন্ত জয়নাল আবেদীনের বংশধরগণ জগতে সকলের নিকট পূজনীয় হইয়া থাকিবে। নূরনবীর বাণী কি কখনও মিথ্যা হয়? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর: জয়নালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।"

পঞ্চবিংশ প্রবাহ

মানবের ভাগ্যবিমানে দুঃখময়-কালমেঘ দেখা দিলে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না, ভ্রমেও কেহ ফিরিয়া দেখে না। ভাল মুখে দু'টি ভাল কথা বলিয়া তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করা দূরে থাকুক, মুখ ফুটিয়া কথা বলিতেও আমাদের ঘৃণা জন্মে, সে দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও অপমান জ্ঞান হয়। সে উপযাচক হইয়া মিশিতে আসিলেও নানা কৌশলে তাহাকে তাড়াইতে ইচ্ছা করে। আত্মীয়-স্বজন-পরিজন-জ্ঞাতি-কুটুম্বের চক্ষেও দুর্ভাগার আকৃতি চক্ষুঃশূল-বোধ হয়। এক প্রাণ, এক আত্মা, হৃদয়ের বন্ধুও সে সময় সহস্র দোষ দেখাইয়া ক্রমে সরিতে থাকেন। দুঃখের সময় জীবন কাহার না ভারবোধ হয়? শনিগ্রস্ত জীবের কোথায় না অনাদর! রাহুগ্রস্ত বিধুর কতই না অপবাদ! ভবের ভাব বড়ই চমৎকার! কালে আবার সেই আকাশে,—সেই মানবের ভাগ্যাকাশে, মৃদু মৃদু ভাবে সুবাতাস বহিয়া, কাল-মেঘগুলি ক্রমে সরাইয়া, সৌভাগ্য-শশীর পুনরুদয় দেখাইয়া দিলে আর কথাটি নাই! তখন কত হৃদয় হইতে প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, আদর, স্নেহ, যত্ন এবং মায়ার স্রোত, প্রবাহ-ধারা,—যাহা বল, ছুটিতে থাকে—বহিতে থাকে! —কত মনে দয়ার সঞ্চার, মিলনের বাসনা এবং ভক্তির উদয় হইতে থাকে! —কত চক্ষু্স্থানের বঙ্কিমে দেখিতে ইচ্ছা করে!—শতমুখে সুযশ, সুখ্যাতি গাহিতে ইচ্ছা করে, শতমুখে সুকীর্ত্তির গুণ বর্ণনা হইতে থাকে! তখন আর যাচিয়া প্রেম বাড়াইতে হয় না, ডাকিয়াও কাছে কাহাকেও বসাইতে হয় না! পরিচয় না থাকিলেও পরিচয়ের পরিচয় দিয়া লোকে দাবিয়া, চাপিয়া বসিয়া থাকে। আজ এজিদের ভাগ্য-বিমান হইতে কালমেঘ সরিয়া সৌভাগ্যশশীর উদয় হইয়াছে—ওমর আলী বন্দী! শত শত ঘোষণা করিয়া দ্বিগুণ বেতনের আশা দেখাইয়াও এজিদ আশার অনুরূপ সৈন্যসংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। আজ অমর আলী বন্দী; তাঁহার শূলদণ্ডে প্রাণবধ—এই ঘোষণা শুনিয়া লোকে দলে দলে সৈন্যদলে নাম লিখাইতেছে, স্বার্থের আশায়,

অর্থের লালসায় কত লোক বিনা বেতনে এজিদ পক্ষে মিশিতেছে। অপরিচিত বিদেশী বোধে যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মারওয়ানের অমত হইতেছে, তাহাদের কেহ কেহ স্ব স্ব গুণ দেখাইয়া, কেহ বা বাহুবলের পরিচয় দিয়া সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছে। কেহ বা কোন সৈন্যাধ্যক্ষকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহার উপরোধে প্রবেশপথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। সকলেই যে সমরক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইবে, তাহা নহে। জয়ের ভাগ, যশের অংশ গ্রহণ করাই অনেকের অন্তরের নিগূঢ় আশা। আজ ওমর আলীর জীবন-শেষ, কাল হানিফার পরমায়ু-শেষ, যুদ্ধের শেষ—এই বিশেষ তত্ত্বেই স্বদেশী বিদেশী বহু লোকের সৈন্যদলে প্রবেশ! আবার ইহাও অনেকের মনে,—যদি বিপদের সূচনা হয়, পরাজয়ের লক্ষণ দেখা যায়, তবে ভবের ভাব, প্রকৃতির স্বভাব, সময়ের তাৎপর্য্য দেখাইয়া তাহার ক্রমে সরিতে থাকিবে। কিন্তু জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। ওমর আলীর প্রাণবধ ও হানিফার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন,—একই কথা। একা হানিফার এক হস্ত কি করিবে? তাই জয়ের আশাই অধিক। এজিদের ভাগ্যবিমানে সুবায়ু-প্রতিঘাতে কালমেঘের অন্তর্দ্ধান অতি নিকট। এজিদ-শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে বিষম জনতা—সকলের দৃষ্টিই শূলদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে।

ওদিকে মোহাম্মদ হানিফার প্রাণ ওষ্ঠাগত, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কণ্ঠ শুষ্ক, সৈনিক-দলে মহা আন্দোলন:—"হায়! হায়!! এমন বীর বিপাকে মারা পড়িল!—ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অকালে কালের হস্তে নিপতিত হইল! কি সর্ব্বনাশ! 'এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না,'—এই কথাতেই ওমর আলী কিশোর বয়সে শত্রুহস্তে শূলে বিদ্ধ হইতে চলিলেন। ধন্য রে ভ্রাতৃভক্তি! ধন্য রে স্থির প্রতিজ্ঞা! ধন্য আজ্ঞা-পালন! ধন্য ওমর আলী!"

সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা বড় বিষম ব্যাপার। বিপদকালেই দূরদর্শিতার পরিচয়, ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচয়ের পরীক্ষা হয়। সুখের সময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যৎ ভাবনা প্রায় কোন মস্তকই বহন করিতে ইচ্ছা করে না।

মোহাম্মদ হানিফা শুধু আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। গাজী রহ্‌মানও কেবল বিলাপ-বাক্য শুনিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহাদের মস্তিষ্ক-সিন্ধু আজ বিশেষরূপে আলোড়িত হইয়াছে,—সহসা এজিদ-শিবির আক্রমণ করিবেন না, অথচ ওমর আলীকে উদ্ধার করিবার আশা তাঁহাদের অন্তরের এক কোণে বিশেষ গোপনভাবে রহিয়াছে। বিনা বেতনের চাকরে গৃহকার্য্যের সুবিধা নাই, তাহাতে আবার যুদ্ধকাণ্ডে! অবৈতনিক সৈন্য—কি ভয়ানক কথা! কি সাংঘাতিক ভ্রম! এ ভ্রম কাহার?—

এজিদ বস্ত্রমণ্ডপে দরবার আহ্বান করিয়া স্বর্ণময় আসনে মহাগর্ব্বিতভাবে বসিয়া আছেন। রাজমুকুট শিরে শোভা পাইতেছে। মন্ত্রীপ্রবর মারওয়ান দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সৈন্যশ্রেণী দরবার-সীমা ঘিরিয়া গায় গায় মিশিয়া, অসিহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পঞ্চবিংশতি রথী নিষ্কোষিত কৃপাণহস্তে ঘিরিয়া বন্ধনদশায় ওমর আলীকে দরবারে উপস্থিত করিল।

মারওয়ান ওমর আলীকে বলিল, "ওমর আলী! তুমি যে বন্দী, এ জ্ঞান তোমার আছে?"

ওমর আলী বলিলেন, "এক্ষণে তোমাদের হস্তে বন্দী—সে জ্ঞান আমার বেশ আছে।"

"বন্দীর এত অহঙ্কার কেন? নতশিরে করজোড়ে রাজ-সমীপে দণ্ডায়মান হওয়া কি তোমার এ সময়ে উচিত নহে?—রাজাকে অভিবাদন করা কি এ অবস্থায় কর্ত্তব্য নহে? মুহূর্ত্ত পরে তোমার কি দশা ঘটিবে, তাহা কি তুমি মনে করিতেছ না?"

"আমি সকলই মনে করিতেছি। তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর, অনর্থক বাগবিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আমি এমন কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না যে, নতশিরে ন্যূনতা স্বীকারে দণ্ডায়মান হইব।"

"সাবধান! সতর্ক হইয়া জিহ্বা চালনা করিও। নম্রভাবে কথা কহা কি তোমাদের কাহারও অভ্যাস নাই? এ রাজ-দরবার, সমরপ্রাঙ্গণ নহে।"

"আমি প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছি, বাগবিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই।

আমাকে জ্বালাতন করিও না। আমি তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি না।"

এজিদ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমার সহিত কথা বল।"

ওমর আলী বলিলেন, "তুমি এমন পবিত্র শরীর ভবধামে অধিষ্ঠান করিয়াছ যে, নিজের গৌরব নিজেই প্রকাশ করিতেছ, তোমার সহিত কথা বলিলে কি আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে?"

"গৌরব বৃদ্ধি হউক, বা না হউক, অতি অল্প সময়ও যদি জগতের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর, আমাকে প্রভু বলিয়া মান্য কর, আমি তোমাকে প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত করিতেছি।"

"কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এজিদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা! এজিদের আশ্রয়-গ্রহণ! মাবিয়ার পুত্রের নিকট বশ্যতা স্বীকার! ছিঃ! ছিঃ! তুমি আমার প্রভু হইতে ইচ্ছা কর? তোমার বংশাবলীর কথা, তোমার পিতার কথা, একবার মনে কর। ছিঃ! ছিঃ! বড় ঘৃণার কথা! এজিদ, এত আশা তোমার—তুমি আবার মহারাজ!"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন,—"জানো, আমি তোমার গর্দ্দান লইতে পারি, তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল-কুক্কুরের উদরস্থও করিতে পারি। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা জানাও: "মহারাজ! মহাকষ্টে যেন আমাকে বধ না করা হয়।"

ওমর আলী ক্রোধে বলিলেন, "ধিক্ তোমার কথায়! আর শত ধিক্ আমার জীবনে! সহজে প্রাণবধ করা যেন না হয়—ইহাই আমার প্রার্থনা। তোমার যাহা করিবার ক্ষমতা থাকে, কর; আমি প্রস্তুত আছি।"

"মরণের পূর্ব্বে যে, লোকে বিকারগ্রস্ত হয়, এ কথা সত্য! তোমার কপাল নিতান্ত মন্দ, আমি কি করিব?"

"তুমি আর কি করিবে? যাহা করিবে, তাহার দ্বিগুণ ফলভোগ করিবে।"

এজিদ সক্রোধে বলিলেন, "মারওয়ান! ইহার কথা আমার সহ্য হয়

না। প্রকাশ্য স্থানে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পারে এবং বিপক্ষগণও দেখিতে পারে, এমন স্থানে শূলে চড়াইয়া এখনই ইহার প্রাণবধ কর। কার্য্যশেষে আমায় সংবাদ দিও।"

ওমর আলী বলিলেন, "কার্য্য শেষ হইলে তোমাকে আর সংবাদ শুনিতে হইবে না! তোমারই সংবাদ অনেকে শুনিবে।"

মহাক্রোধে এজিদ বলিলেন, "আর সহ্য হয় না! মারওয়ান! শীঘ্র ইহাকে শূলে চড়াও।" মারওয়ান নতশিরে সম্ভাষণ করিয়া বন্দীসহ দরবার-গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

শিবিরের বাহিরে লোকে লোকারণ্য। নির্দ্দিষ্ট বধ্যভূমিতে বন্দীসহ গমন করা বড়ই কঠিন। মারওয়ান শিবির-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল: দর্শকগণের মনে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এদিকে রাজাজ্ঞাও যেন প্রতিপালিত হয়। আবার ওদিকে শত্রুপক্ষ অতি নিকট। তাহারাই বা কখন কি কাণ্ড করিয়া বসে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? প্রকাশ্য স্থানে শূলে চড়াইয়া প্রাণবধ করিতে হইবে,—এ কথাও তাহারা শুনিয়াছে। শূলদণ্ড যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাও তাহারা স্পষ্টভাবেই দেখিতেছে। ইহাতে যে তাহারা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিবে, নিঃশব্দে দণ্ডায়মান হইয়া ওমর আলীর বধ-ক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিবে,—ইহা ত কখনই বিশ্বাস হয় না। হয় ত কোন নূতন কাণ্ড করিয়া বসিবে!

মারওয়ান বিশেষ চিন্তা করিয়া আদেশ করিল, "বধ্যভূমি পর্য্যন্ত যাইবার সুপ্রশস্ত পথের উভয় পার্শ্বে সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান থাকিবে। প্রহরী ও প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত সাধারণ সৈন্য, কি কোন প্রাণী, আমার বিনানুমতিতে এ পথে বধ্যভূমিতে যাইতে পারিবে না।"

আদেশমাত্র নিষ্কোষিত অসিহস্তে সৈন্যগণ গায় গায় মিশিয়া বধ্যভূমি পর্য্যন্ত গমনোপযোগী প্রশস্ত স্থান রাখিয়া দুই শ্রেণীতে পরস্পর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন শিবির-দ্বার হইতে শূলদণ্ডের সমগ্রভাগ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। মারওয়ান পুনরায় আজ্ঞা করিল, "শূলদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে কতক স্থান রাখিয়া শূলদণ্ডসহ ঐ চক্রাকার স্থান

সজ্জিত সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। এক শ্রেণীতে চক্রাকারে ঐ স্থান বেষ্টন করিলে শঙ্কা দূর হইবে না। সপ্তচক্র সৈন্য দ্বারা ঐ স্থান বেষ্টন করিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে। বিপক্ষদল হইতে সামান্য একটি প্রাণীও আমাদের নির্দ্দিষ্ট সীমা যেন অতিক্রম করিয়া না আসিতে পারে – সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার এদিকেও শিবির-দ্বার চতুষ্টয়ে এবং সীমান্ত স্থানে রক্ষীদিগের উপরও সজ্জিত সৈন্য দ্বারা বিশেষ সতর্কে শিবির রক্ষা করিতে হইবে।”

মারওয়ান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আহ্বান করিয়া আরও আজ্ঞা করিল, “যে সকল সৈন্য বিশেষ শিক্ষিত ও পুরাতন, তাহাদের দ্বারা শিবির এবং শিবির দ্বার চতুষ্টয় রক্ষা করিতে হইবে। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমার প্রত্যেক সীমায় সহস্র সহস্র সৈন্য তীর, বর্শা ও তরবারিহস্তে রক্ষীরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে। শিবিরের মধ্যে যেখানে যেখানে প্রহরী নিযুক্ত আছে, সেই সেই স্থানে দ্বিগুণ প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইবে ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আপন সৈন্যদলের প্রতি সম্ভবমত বিশেষ সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিবেন।

ওমর আলীর বধসাধন হইতে কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত সাধ্য মত সতর্কতার সহিত থাকিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ অশ্বারোহী হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিবিরের চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিবেন। ওমর আলীর বধসাধনে হর্ষ, বিপদ, বিষাদ সকলই রহিয়াছে ; সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাবধান ! আমার এই আজ্ঞার অণুমাত্রও যেন অন্যথা না হয়। যে সকল নূতন সৈন্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে কখনই শিবির-রক্ষার কার্য্যে, কি সীমা-রক্ষার কার্য্যে, কি প্রহরীর কার্য্যে—কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে না। এমন কি, আমার দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে এ সকল কথা না বলিয়া বাহিরের অন্য কোন কার্য্যে,—কি শূলদণ্ড যে প্রণালীতে রক্ষা করার আদেশ হইয়াছে, তাহাতেই নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু সে সপ্তচক্রের সীমাচক্রে, কি ষষ্ঠ বা পঞ্চম চক্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে না। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রেই তাহাদের স্থান,—শূলদণ্ডের নিকট হইতে

উপরোক্ত চক্রত্রয় ভিন্ন অন্য কোন চক্রে তাহারা যেন না যাইতে পারে—সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।"

মারওয়ান এই সকল আদেশ করিয়া বন্দীসহ বধ্যভূমিতে যাইতে উদ্যত হইল। বন্দী ওমর আলী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বধ্যভূমিতে যাইতে অসম্মত হইলেন।

মারওয়ান বলিল, "ওমর আলী! তুমি জানিয়া শুনিয়া বিহ্বল হইতেছ? বন্দী-দশায়ও রাজ-আজ্ঞা অবহেলা? তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বধ্য-ভূমিতে না গেলে, আমি কি তোমাকে শূলে চড়াইয়া মারিতে পারিব না? তুমি এখনও যদি মহারাজ এজিদের বশ্যতা স্বীকার কর, প্রভু বলিয়া তাঁহাকে মান্য কর,—তোমার অপরাধ মার্জ্জনাহেতু জোড়করে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, তবে এখনও তোমার প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আমি মহারাজের রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিব। বধ্যভূমিতে যাইবে না,—এ কি কথা? সাধ্য কি যে, তুমি না যাইয়া পার? তোমাকে নিশ্চয়ই ঐ শূলদণ্ডের নিকটে যাইতে হইবে,—নিশ্চয়ই ঐ শূলে আরোহণ করিতে হইবে,—বিদ্ধ হইতে হইবে,—মরিতে হইবে। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।"

ওমর আলী বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও,—শূলে দাও। কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক শূলদণ্ডের নিকট যাইব না,—শূলে আরোহণ করা ত দূরের কথা। আমার প্রাণবধ করাই ত তোমাদের ইচ্ছা; তরবারি আছে, আঘাত কর—তীর আছে, বক্ষোপরি লক্ষ্য কর—বর্শা আছে, বিদ্ধ কর—গদা আছে, মস্তক চূর্ণ কর—ফাঁস আছে, গলায় দিয়া শ্বাস বন্ধ কর—যে প্রকারে ইচ্ছা হয়, প্রাণ বাহির কর। আমি শূলে চড়িব না।"

"আমি তোমাকে শূলেই চড়াইব; মহারাজ এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। তুমি তোমার প্রাণ বাহির করিবার দশটি উপায় বাহির করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ঐ একমাত্র শূলদণ্ডেই তোমার জীবন শেষ—কেন আমাকে বিরক্ত কর?"

"তোমার ক্ষমতা থাকে তো আমাকে লইয়া যাও।"

"কেন? শূলে চড়িয়া প্রাণ দিতে কি লজ্জাবোধ হইতেছে? হায় রে লজ্জা! এমন অমূল্য জীবনই যদি গেল, তবে সে লজ্জায় ফল কি?"

"আমি তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। তোমার কার্য্য তুমি কর, আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব না।"

"মুহূর্ত্ত পরে যাহার জীবন-কাণ্ডের শেষ অভিনয় হইয়া জীবনের মত যবনিকা পতন হইবে, তাহার আবার স্পর্দ্ধা?"

"দেখ্‌, মারওয়ান! সাবধান হইয়া কথা বলিস্‌। আমার হস্ত কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে, নতুবা তোর মুখের শাস্তি দিতে ওমর আলীকে বেশী দূর যাইতে হইত না।"

মারওয়ান মহাক্রোধে ওমর আলীকে পশ্চাদ্দিক হইতে সরোষে ধাক্কা দিয়া বলিল, "চল্‌, তোকে পায়ে হাঁটাইয়া লইয়া শূলে চড়াইব।"

ওমর আলী নীরব। মারওয়ান অনেক চেষ্টা করিল, তিল পরিমাণ স্থানও ওমর আলীকে সরাইতে পারিল না;—লজ্জিত হইয়া বলিল, "সকলে একত্রে একযোগ হইয়া তোকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইব।"

ওমর আলী হাস্য করিয়া বলিলেন, "মারওয়ান, তুমি ত পারিলে না! সকলে একত্র হইয়া আমাকে শূলদণ্ডের নিকট লইয়া যাইবে, ইহাতে তোমার গৌরব কি? তুমি সুখী হও কোন্‌ মুখে?"

"আমি সুখী হই বা না হই, তোকে শূলে চড়াইবই।"

"এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিলে ত শূল?"

মারওয়ান প্রহরিগণকে বলিল, "তোমরা অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া সকলে ইহাকে ধরিয়া, শূন্যে লইয়া আমার সঙ্গে আইস।"

প্রহরিগণ প্রভু-আজ্ঞা প্রতিপালন করিল বটে, কিন্তু ওমর আলী সেইরূপ পাষণ—পাষাণবৎ অচল। যিনি যে পদ যেখানে রাখিয়াছিলেন, সেই পদ সেইখানেই রহিয়া গেল! প্রহরিগণ লজ্জিত—মারওয়ান রোষে অধীর।

মারওয়ান পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিল, "মহাবিপদ! এখান হইতে বধ্যভূমি পর্য্যন্ত লইতেই এত কষ্ট, শূলের উপর চড়ান ত সহজ কথা নহে।"

ওমর আলী বলিলেন, "মারওয়ান, চিন্তা কি? তুমি যদি আমাকে বধ্যভূমি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আমি ইচ্ছা করিয়াই শূলে চড়িব। তুমি চিন্তা করিও না। যতক্ষণ থাকি, জগতে হাসি-তামাসা করিয়া চলিয়া যাই। মরণ কাহার না আছে? আজ আমার এই প্রকার মরণ হইতেছে; কাল না হউক, কালে তোমাকেও অন্য প্রকারে মরিতে হইবে।"

মারওয়ান মনে মনে বলিতে লাগিল, "এখান হইতে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেলেও ত শূলে চড়ান মহাবিপদ দেখিতেছি। আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে ডাকি। এই স্থির করিয়া সে প্রকাশ্যে আদেশ করিল, "আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে ডাকিয়া আন, আর তাঁহার অধীনে যে কয়েকজন বলবান্ সৈন্য গতকল্য সৈন্যদলে নাম লিখাইয়াছে, তাহাদিগকেও এখানে আসিতে বল।"

ওমর আলী বলিলেন, "ওহে মন্ত্রি! কোন্ আবদুল্লাহ্ জেয়াদ? কুফা নগরের জেয়াদ?—সেই নিমকহারাম জেয়াদ?—বিশ্বাসঘাতক জেয়াদ? —না অন্য কেহ?"

"তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন কিছুই নাই—তবে পাপাত্মার মুখখানা চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই আছে। তাহাকে শীঘ্র আসিতে বল, মরণকালে দেখিয়া যাই।"

"তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত—এ সময়েও তোমার হাসি-তামাসা—এ সময়েও আমাদিগকে ঘৃণা?"

"কাহার অন্তিমকাল কোন্ সময় উপস্থিত হয়, তাহা তুমি বলিতে পার, —না, আমি বলিতে পারি?"

"আমি ত আর তোমার মত নহি যে, কারণ, কার্য্য ও যুক্তি অবহেলা করিয়া কেবল ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া থাকিব? তুমি মনে করিয়াছ যে, আমরা তোমার প্রাণবধ করিতে পারিব না,—আমাদের হস্তে তুমি মরিবে না। ওমর! অঙ্গার যদি হরিদ্রার কান্তি পায়, মশকও যদি সমুদ্র শুষিয়া ফেলে, অচলও যদি সচলভাব ধারণ করে, সূর্য্যদেবও যদি পশ্চিমে উদিত হয়, তথাপি তোমার জীবন কখনই রক্ষা হইতে পারে না। মারওয়ানের হস্ত

হইতে বাঁচিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না! মুহূর্ত্ত পরেই তোমার চক্ষের পাতা ইহকালের জন্য বন্ধ হইবে। শূলদণ্ড তোমার মস্তক ভেদ করিয়া বহির্গত হইবে। এখনও বাঁচিবার আশা—জেয়াদকে দেখিবার আশা ?"

"অত বক্তৃতা করিও না, অত দৃষ্টান্ত দিয়াও আমাকে বুঝাইও না। ঈশ্বরের মহিমার পার নাই! তিনি হযরত ইব্রাহিমকে অগ্নি হইতে, ইউসুফকে কূপ হইতে, নূহকে তুফান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ;—কত জনকে কত বিপদ, কত কষ্ট, কত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন। আর আমাকে এই সামান্য বন্ধন হইতে, এজিদের আদেশ হইতে, আর নিতান্ত আহাম্মক মন্ত্রী মারওয়ানের হস্ত হইতে উদ্ধার করা তাঁহার কতক্ষণের কার্য্য ?"

"তোমার ঈশ্বর, যুক্তি ও কারণের নিকট পরাস্ত। আমি যদি তোমার এ বন্ধন না খুলিয়া দিই, তোমার ঈশ্বর অদৃশ্যভাবে খুলিয়া দিন্ দেখি ? কারণ ব্যতীত কোন কালে কোন কার্য্য হইয়াছে ? দৈব কথা, দৈবশক্তি ছাড়িয়া দাও,—না হয়, তোমার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ, ও কথায় মারওয়ানের মন টলিবে না।"

"মন টলিবে না বটে, কিন্তু টলিতেও ত পারে!"

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মারওয়ান তোমার মত পাগল নহে।"

এদিকে বীরবর আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কয়েকজন সজ্জিত সৈন্যসহ মারওয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া উপস্থিত ঘটনা দেখিল—শুনিয়া আরও চমৎকৃত হইল। ক্ষণকাল পরে জেয়াদ গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি ওমর আলীকে বধ্যভূমিতে লইতেছি। কি আশ্চর্য্য! ওমর আলীকে মৃত্তিকা হইতে শূন্যে উত্তোলন করা যায় না,—এ কি কথা ? অস্ত্রের সাহায্যে সকলেই সকল কাজই করিতে পারে।"

জেয়াদ ওমর আলীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে শূন্যে তুলিতে অনেক চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না। লজ্জা রাখিবার আর স্থান কোথায় ? বিরক্তভাবে সে বলিল, "বাহ্‌রাম! তুমি ত আপন বাহুবলের ক্ষমতা অনেক দেখাইয়াছ—উঠাও।"

মারওয়ান বলিল, "বাহ্‌রামের বাহুবল দেখিয়া আমিও চমৎকৃত হইয়াছি ; সত্য কথা বলিতে কি, ঐ গুণেই আমি বাহ্‌রামকে সৈন্যদলে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। এখন পদোন্নতি—পুরস্কার, সকলই—যদি ওমর আলীকে—"

বাহ্‌রাম, মারওয়ান ও জেয়াদকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "গোলাম এখনই হুকুম তামিল করিবে।"

ওমর আলী আড়নয়নে বাহ্‌রামকে দেখিয়া বলিলেন, "জেয়াদ! কত জনকে ঠকাইতে চাও? স্বপ্ন-বিবরণে প্রভু হোসেনকে ঠকাইয়াছ, মদিনা-বিখ্যাত বীর মোস্‌লেমকে ঠকাইয়াছ, আজ আবার কাহাকে ঠকাইবে?"

জেয়াদ বলিল, "তোমার অস্ত্রের ধার বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কথার ধারটুকু এখনও আছে। এখনই সে ধার বন্ধ হইবে। উপযুক্ত লোকই আনিয়াছি।"

'উপযুক্ত লোক হইলে অবশ্যই পরাভব স্বীকার করিব, যে যাহা বলিবে, বিনা বাক্যব্যয়ে শুনিব। কিন্তু মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত।"

"আরে মূর্খ! এখনও মরা-বাঁচা ঈশ্বরের হাত? তোমার ঈশ্বর এখনও তোমাকে বাঁচাইবেন,—ভরসা আছে? ইচ্ছা করিলে কেবল মহারাজ এজিদ তোমাকে বাঁচাইলে বাঁচাইতে পারেন।"

"রে বর্ব্বর জেয়াদ! তুই ঈশ্বরের মহিমা কি বুঝিবি পামর?"

"তোমার হিতোপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছা করি না। এখন গাত্রোত্থান কর, যমদূত শিয়রে দণ্ডায়মান।"

ওমর আলী জেয়াদের কথার কোন উত্তর করিলেন না; একইরূপে দণ্ডায়মান রহিলেন—একেবারে অটল—অচল।

জেয়াদ বাহ্‌রামকে পুনরাজ্ঞায় বলিল, "আর দেখ কি? উহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া চল।"

বাহ্‌রাম সিংহ-বিক্রমে ওমর আলীকে ধরিল এবং 'জয় মহারাজ এজিদ' শব্দ করিয়া একেবারে শূন্যে উঠাইয়া বলিল, "হুকুম হইলেই ত এই স্থানে ইহার বধ-ক্রিয়া সমাধা করিয়া দিই।—এক আছাড়েই অস্থি চূর্ণ করিয়া মজ্জা বাহির করি।"

বাহ্‌রামের বাহুবল দেখিয়া মারওয়ানও জেয়াদ শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। মারওয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বাহ্‌রাম, ওমর আলীকে মারিয়া ফেলিও না। রাজাজ্ঞা তাহা নহে। শূলে চড়াইয়া ইহাকে মারিতে হইবে। শিবিরের মধ্যে প্রাণবধের ইচ্ছা থাকিলে অনেক উপায়ই ছিল। শূলদণ্ড পর্য্যন্ত ইহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

"যো হুকুম" বলিয়া বাহ্‌রাম এজিদের জয়-ঘোষণা করিতে করিতে ওমর আলীকে তৃণবৎ লইয়া চলিল। মারওয়ান ও জেয়াদও হাসিতে হাসিতে আর আর সঙ্গীসহ চলিল। দৃশ্য বড় ভয়ানক! সকলের চক্ষেই ভীম-দর্শন! শূলদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান। দর্শকগণের চক্ষু,—শূলের অগ্রভাগে। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই নীরব! প্রান্তর নীরব।

বাহ্‌রাম ওমর আলীকে শূলদণ্ডের নিকট লইয়া ছাড়িয়া দিল, জেয়াদ ও মারওয়ান পুনঃপুনঃ বাহ্‌রামের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল,—"বীরবর বাহ্‌রাম! তুমি ওমর আলীকে শূলদণ্ডে চড়াইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর।"

জেয়াদ মারওয়ানকে বলিল, "আমার ইচ্ছা, যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত ওমর আলী শূলদণ্ডেই বিদ্ধ থাক্।"

মারওয়ান বলিল, "এ কথাটা বড় গুরুতর! মহারাজের অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। শত্রুর মনে কষ্ট দিতে তোমার এ যুক্তি সর্ব্বপ্রধান বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা তাহা নহে। আমার মতে মৃতদেহে শত্রুতা নাই। কিন্তু শূলদণ্ডে বিদ্ধ রাখিলে ইহা হানিফার বিশেষ মনোকষ্টের কারণ হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। শত্রুকে জব্দ করাই ত কথা। তোমার মত প্রকাশ করিয়া মহারাজের নিকট হইতে ইহার মীমাংসা করিয়া আসিতেছি। তুমি এদিকের কার্য্য শেষ কর। আমার প্রতি ভার অর্পিত হইয়াছিল, আমি সে ভার তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি ওমর আলীকে মহারাজের আজ্ঞামত বধ কর। আমি মহারাজের নিকট হইতে ঐ কথার মীমাংসা করিয়া এখনই আসিতেছি।"

জেয়াদ বাহ্‌রামকে বলিল, "বাহ্‌রাম! বন্দীকে জিজ্ঞাসা কর, এখন

তার আর কথা কি? এখনও মহারাজ এজিদ দয়া করিলেও করিতে পারেন!"

বাহ্‌রাম জিজ্ঞাসা করিল, "ওমর আলী! তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত। কোন কথা বলিবার থাকে ত বল,—আর বিলম্ব নাই।"

ওমর আলী বলিলেন, "এতক্ষণ অনেক বলিয়াছি, আর কোন কথাই নাই। তবে ইচ্ছা যে, যাইবার সময় একবার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া যাই। কিন্তু আমার হস্তপদ কঠিন-বন্ধনে বাঁধা আছে, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে উপাসনার ব্যাঘাত হইতেছে। যদি তোমাদের সাহস হয়, তবে আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দাও; আমি অন্তিম সময়ে একবার পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যথার্থ নাম উচ্চারণ করিয়া আমার জাতীয় উপাসনায় অন্তরকে পরিতৃপ্ত করি।"

জেয়াদ বলিল, "ওমর! আমি তোমার বন্ধন খুলিয়া দিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ইষ্টদেবতার নাম কর, ঈশ্বরকে যথাবিধি আরাধনা কর। মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করিতে আমি কখনই বাধা দিব না। ঈশ্বর তোমাকে যে, কখনও রক্ষা করিতে পারেন,—এ ভ্রমও তুমি পরীক্ষা কর। আমি তোমাকে তোমার ইষ্টদেবতার শপথ দিয়া বলিতেছি, তোমার উদ্ধারের জন্য তুমি কায়মনে তোমার নিরাকার নির্ব্বিকার দয়াল প্রভুর নিকট আরাধনা কর।" এই বলিয়া জেয়াদ স্বহস্তে ওমর আলীর বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

ওমর আলী মৃত্তিকা দ্বারা * "অজু" ক্রিয়া সমাপন করিয়া, যথারীতি ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। উপাসনার পর দুই হস্ত তুলিয়া তিনি প্রভুর গুণানুবাদ করিতে করিতে শূলদণ্ডের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং বীরত্বের সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর আলীর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্‌রাম বলিয়া উঠিলেন, "জেয়াদ! বিশ্বাসঘাতকতার ফল গ্রহণ কর। মোস্‌লেম-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ওমর আলীকে উদ্ধার করিতে আসিয়া তোমাকে সুযোগমত পাইয়াছি—ছাড়িব না।" এই বলিয়া সজোর আঘাতে জেয়াদ-শির দেহবিচ্ছিন্ন করিলেন। সেই শিরসংযুক্ত কেশগুচ্ছে ধরিয়া, শিরহস্তে বাহ্‌রাম বলিতে লাগিলেন, "রে বিধর্ম্মী এজিদ! দেখ্, কি

* জলাভাবে মৃত্তিকা দ্বারাও শরীর পবিত্র করিবার বিধি আছে, তাহার নাম তৈয়ম্মুম

কৌশলে বাহ্‌রাম ওমর আলীকে লইয়া চলিল। কেবল ওমর আলীকে উদ্ধার করিবার জন্যই বাহ্‌রাম ছদ্মবেশে তোর প্রিয় সেনাপতি জেয়াদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আমি মোহাম্মদ হানিফার দাস। যুদ্ধ-সময়ে আগন্তুক সৈন্য-গ্রহণ করার এই প্রতিফল—সৈন্য-বৃদ্ধি লালসায় ভবিষ্যৎ চিন্তা ভুলিয়া যাওয়ার এই ফল। দেখ্—এই দেখ্—আজ কি ঘটিল। আগন্তুক সেনায় বিশ্বাস নাই বলিয়া, তোর মন্ত্রিপ্রবর শূল্দণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রে নূতন সেনা সন্নিবেশিত করিয়াছে। ইহারা বাহির-চক্রে থাকিলে কি জানি কি বিপদ ঘটায়—তাহার এই দুশ্চিন্তায় ঈশ্বর আমাদেরই মঙ্গল করিয়াছেন। এখন দেখ্! বাহ্‌রাম জেয়াদের শির লইয়া বীরের মত ওমর আলীকে সঙ্গে লইয়া চলিল।"

ওমর আলী জেয়াদের কটিবন্ধ হইতে তরবারি সজোরে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন "মোহাম্মদীয় ভ্রাতৃগণ! আর কেন? প্রভুর নাম ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের গুণগান করিতে করিতে শিবিরে চল। ওমর আলী সহজেই উদ্ধার হইল। আর আত্মগোপনে প্রয়োজন কি? প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্রের সেনাগণ সমস্বরে "আল্লাহু আক্‌বর! জয় মোহাম্মদ হানিফা! জয় মোহাম্মদ হানিফা!!" বলিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা চতুর্থ এবং পঞ্চম চক্র ভেদ করিয়া ষষ্ঠ চক্রে গিয়া পড়িল। ঘোর সংগ্রাম!—অবিশ্রান্তে অসি চলিতে লাগিল। এজিদের বিশ্বাসী সৈন্যগণ, যাহারা ষষ্ঠ এবং সপ্তম চক্রে ছিল, হঠাৎ স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগের বিদ্রোহিতা দেখিয়া মহা ভীত হইল। বাহিরের শত্রু ওমর আলীকে যেন না লইয়া যাইতে পারে,—ইহাই তাহাদের লক্ষ্য,—তাহাতেই মনঃসংযোগ ও সতর্কতা! হঠাৎ বিপরীত ভাব দেখিয়া তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারিল না;—কোথা হইতে কি ঘটিল, কি কারণে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল, কিছুই সন্ধান করিতে পারিল না। জেয়াদের খণ্ডিত শির অপরিচিত সৈন্যহস্তে দেখিয়া, মহারাজ এজিদ বাঁচিয়া আছেন কি না, ইহাই তাহাদের সমধিক শঙ্কার কারণ হইল। চক্র টিঁকিল না। মুহূর্ত্ত-মধ্যে চক্র ভগ্ন করিয়া ওমর আলী এবং বাহ্‌রাম সঙ্গীগণসহ বাহিরে আসিলেন। যাহারা সম্মুখে পড়িল, তাহারাই মৃত্তিকাশায়ী হইল।

আশা ছিল কি—ঘটিল কি? কোথায় ওমর আলীর শূলবিদ্ধ শরীর সকলের চক্ষে পড়িবে, তাহা না হইয়া জেয়াদের খণ্ডিতদেহ দেখিতে হইল। মারওয়ানের দুঃখের সীমা নাই। ওদিকে হানিফা-শিবিরে শত সহস্র বিজয়-নিশান উড়িতেছে, সন্তোষসূচক বাজনায় দামেস্ক-প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এজিদ এ সংবাদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বধ্যভূমিতে আগমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়!! কার বধ কে করিল? যাহা হউক, হানিফার কূট চিন্তার বলে ওমর আলী কৌশল করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। আমাদেরও শিক্ষা হইল। সমরক্ষেত্রে আগন্তুক সৈন্যকে বিশ্বাস করিয়া সৈন্যশ্রেণীতে গ্রহণ করার ফল, প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিল। আমাদের অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতার কার্য্যফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইতে হইল। আমার ইহাতে দুঃখ নাই! কিন্তু জেয়াদের শিরশূন্য দেহ দেখিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। জেয়াদের শির আজ হানিফার শিবিরে যাইবে, একথা কাহার মনে ছিল?—কে ভাবিয়াছিল?—কিন্তু চিন্তা কি? এখনই প্রতিশোধ, এখনই ইহার প্রতিশোধ লইব। ঐ শূলদণ্ড যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই রাখিব। ভবিষ্যৎ বিপদ গণনা করিয়া আর বিরত হইব না, আর কাহারও কথা শুনিব না। যাও—এখনই নগরে যাও। জয়নাল আবেদীনকে বাঁধিয়া আন। ঐ শূলদণ্ডে তাহাকে চড়াইয়া প্রিয়বন্ধু জেয়াদের শোক নিবারণ করিব, মনের দুঃখ দূর করিব। জয়নালবধে শত শত বাধা আসিলেও এজিদ আজ ক্ষান্ত হইবে না। শূলে চড়াইয়া শত্রুবধ করিতে পারি কি না, হানিফাকে দেখাইতে এজিদ কখনই ভুলিবে না। বন্দীকে ধরিয়া আনিয়া শূলে চড়াইব, ইহাতে আর আশঙ্কা কি? শঙ্কা থাকিলেও আজ এজিদ কিছুতেই সঙ্কুচিত হইবে না। এখন যাও মারওয়ান! এখনই যাও, জয়নালকে ধরিয়া আন—এজিদ এই বধ্যভূমিতেই রহিল। ভেরীর বাজনার সহিত, ডঙ্কার ধ্বনির সহিত নগরে, প্রান্তরে, সমরক্ষেত্রে, হানিফার শিবিরের নিকটে ঘোষণা করিয়া দাও যে, ওমর আলীর জন্য যে শূলদণ্ড স্থাপিত করা হইয়াছিল, সেই শূলদণ্ডে জয়নালকে চড়াইয়া জেয়াদের প্রতিহিংসা লওয়া হইবে।"

মারওয়ান আর দ্বিরুক্তি করিল না; রাজাদেশ মত ঘোষণা প্রচারের আজ্ঞা করিয়া সপ্তবিংশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ অশ্বারোহণে তখনই নগরাভিমুখে ছুটিল।

ষড়্‌বিংশ প্রবাহ

এক দুঃখের কথা শেষ হইতে না হইতেই আর একটি দুঃখের কথা শুনিতে হইল—জয়নাল আবেদীনকে অদ্যই শূলে চড়াইয়া জেয়াদ-বধের প্রতিশোধ লইবে, এজিদের এই প্রতিজ্ঞা!

জয়নাল বন্দীগৃহে নাই, একথা এজিদপক্ষীয় একটি প্রাণীও অবগত নহে। মারওয়ান কারাগারের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে অনুমতি করিল, "তোমরা কয়েকজনে জয়নালকে ধরিয়া আন। সাবধান, আর কাহাকেও কিছু বলিও না।"

মন্ত্রীবরের আজ্ঞায় প্রহরিগণ কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বলিল, "জয়নাল আবেদীন কারাগৃহে নাই।"

মারওয়ানের মস্তক ঘুরিয়া গেল, অশ্বপৃষ্ঠে আর থাকিতে পারিল না; উদ্বিগ্নচিত্তে স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে চাহিল! কারাগৃহের প্রত্যেক কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, সে কোনও সন্ধান পাইল না; হোসেন-পরিজনের চিত্তবিকার এবং হাব-ভাব দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিল, জয়নাল বিষয়ে ইহারাও অজ্ঞাত। বিলম্ব না করিয়া নগর মধ্যে অনুসন্ধানে মারওয়ান প্রবৃত্ত হইল।

ওদিকে মোহাম্মদ হানিফা এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বিপদ সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন,—"যাহার জন্য মহাসংগ্রাম, যাহার উদ্ধারের জন্য মদিনা হইতে দামেস্ক পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে শোণিত-প্রবাহ, শত শত বীরের আত্মবিসর্জ্জন, মদিনার সিংহাসন শূন্য—হায়! হায়!! সেই জয়নালের প্রাণবধ! ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে? ওমর আলীকে ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এজিদ জয়নালকে শূলে চড়াইয়া সংহার করিবে! হায়! হায়!! যাহার উদ্ধারের জন্য এতদূর

আসিলাম, যাহার উদ্ধার হেতু এত আত্মীয় বন্ধু হারাইলাম—হায়! হায়!! আজ স্বচক্ষে তাহার বধক্রিয়া দেখিতে হইবে! কোন্ পথে কোন্ কৌশলে তাহাকে আনিয়া শূলে চড়াইবে, তাহার সন্ধান কি প্রকারে করি,—উদ্ধারের উপায়ই বা করি কি প্রকারে? সন্ধান করিয়া কোন ফল দেখি না। সামান্য সুযোগ পাইলে যে, জয়নাল নিজের উদ্ধার নিজে করিতে পারিবে,—সে চিন্তা কি তাহার মস্তকে আছে?"

"হায়! হায়!! আমার সকল আশা মিটিয়া গেল। কেন দামেস্কে আসিলাম? কেন এত প্রাণবধ করিলাম? কেন ওমর আলীকে কৌশলে উদ্ধার কারলাম? ওমর আলীর প্রাণ দিয়াও যদি জয়নালকে রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে উদ্দেশ্য ঠিক থাকিত;—বোধ হয়, এমাম-বংশ রক্ষা পাইত! দয়াময়, করুণাময়!. জয়নালকে রক্ষা করিও। আজ আমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভেরীর বাজনার সহিত এজিদের ঘোষণার কথা শুনিয়া আমার মস্তকের মজ্জা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভ্রাতঃ ওমর আলী, ভ্রাতঃ আক্কেল আলী (বাহ্‌রাম), প্রিয় বন্ধু মস্‌হাব, চির-হিতৈষী গাজী রহ্‌মান কোথায়? তোমরা জয়নালের প্রাণ-রক্ষার উপায় কর, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি।"

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, "বাদশাহ্-নামদার! আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ধৈর্য্য ধারণ করুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলে অবশ্যই শান্তিবোধ হইবে। স্থির করিলাম,—আজই যুদ্ধের শেষ, নয় জীবনের শেষ! যে কল্পনা করিয়া আজ পর্য্যন্ত এজিদের শিবির আক্রমণ করি নাই, সে কল্পনার ইতি এখনই হইয়া গেল। যে কোন উপায়ে অগ্রে জয়নালকে হস্তগত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ,—এজিদ রীতি-নীতির বাধ্য নহে, স্বেচ্ছাচার কলঙ্করেখায় তাহার আপাদ-মস্তক জড়িত। এই দেখুন,—জেয়াদ মারা পড়িল, জয়নালের প্রাণবধের আজ্ঞা প্রচারিত হইল,—এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছিলাম, যে দিন জয়নাল হস্তগত হইবে, সেই দিনই এই যুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনয় করিয়া এজিদ-বধ কাণ্ডের যবনিকা-পতন করিব। বাদশাহ্-নামদার! যদি তাহা না হইল, তবে আর বিলম্ব কি? ভ্রাতৃগণ! চিন্তা কি?—

সাজ সমরে! বন্ধুগণ! সাজ সমরে, বাজাও ডঙ্কা,—উড়াও নিশান,—ধর তরবারি,—ভাঙ্গ শিবির, মার এজিদ, চল নগরে, দাও আগুন, পুড়ুক দামেস্ক! আর ফিরিব না—জগতের মুখ আর দেখিব না! জয়নালকে হারাইয়া শুধু প্রাণ লইয়া স্বদেশে যাইব না—এই প্রতিজ্ঞা। আজ গাজী রহ্‌মানের এই স্থির প্রতিজ্ঞা।"

মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহমানের বাক্যে সিংহগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন; আর আর মহারথিগণও ঐ উৎসাহবাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া "সাজ সমরে, সাজ সমরে" বলিতে বলিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রস্তুত হইলেন। ঘোর রোলে বাজনা বাজিয়া উঠিল। মোহাম্মদ হানিফা অসি, বর্ম্ম, তীর, খঞ্জর, কাটারি প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া দুল্‌দুলে আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিয়া শিবির হইতে বহির্গত হইল।

সংবাদ-বাহকগণ এজিদ-সমীপে করজোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ! মোহাম্মদ হানিফা বহুসংখ্যক সৈন্যসহ মহাতেজে শিবিরাভিমুখে আসিতেছেন। এক্ষণে উপায়? মন্ত্রীবর মারওয়ান শিবিরে নাই—সৈন্যগণও নিরুৎসাহ—যুদ্ধসাজের কোনই আয়োজন নাই।—কুফাধিপতির দুর্দ্দশায় সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত, উৎসাহ উদ্যম কাহারও নাই। নৈরাশ্যের সহিত বিষাদ-মলিন রেখা সৈন্যগণের বদনে দেখা দিয়াছে।"

এজিদ মহা ব্যস্ত হইয়া শিবির বহির্ভাগে গিয়া দেখিলেন: প্রান্তরের প্রস্তররাশি চূর্ণ করিয়া, বালুকারাশি শূন্যে উড়াইয়া, অসংখ্য সৈন্য শিবির আক্রমণে আসিতেছে।

এদিকে মন্ত্রীবর মারওয়ান ম্লানমুখ হইয়া উপস্থিত। সে বলিল—"জয়নাল বন্দীগৃহে নাই, নগরে নাই, বিশেষ সন্ধানে জানিলাম,—জয়নালের কোন সন্ধানই নাই। মহা বিপদ! চতুর্দ্দিকেই বিপদ, সম্মুখেও ঘোর বিপদ! মহারাজ! সেই ঘোষণা প্রকাশেই এই আগুন জ্বলিয়াছে। মোহাম্মদ হানিফার হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিবার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ ঘোষণা—জয়নালের প্রাণদণ্ডের ঘোষণা।"

এজিদ মহা ভীত হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে উপায়? সৈন্যগণের মনের গতি

আজ ভাল নয়। হানিফাকে কোন কৌশলে শান্ত করিতে পারিলে কাল দেখিব। সৈন্যগণের হাবভাব দেখিয়া আজ আমি এক প্রকার হতাশ হইয়াছি।”

মারওয়ান বলিল, “এইক্ষণে সে সকল কথা বলিবার সময় নহে, শত্রুগণ আগতপ্রায়। জয়নাল আবেদীন নগরে নাই, বন্দীগৃহে নাই, একথা প্রকাশ হইলে যে কথা—শূলে চড়াইয়া তাহার প্রাণবধ করিলেও সেই কথা। এখন এই উপস্থিত আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায় করাই আবশ্যক। বিপক্ষদলের যেরূপ রুদ্রভাব, উগ্রমূর্ত্তি দেখিতেছি, ইহাতে কি যে ঘটিবে বুঝিতেছি না; কিন্তু আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিব না।”

মারওয়ান তখনই সন্ধিসূচক নিশান উড়াইয়া দিল এবং জনৈক বিশ্বাসী দূতকে কয়েকটি কথা বলিয়া সেই বীরশ্রেষ্ঠ বীরগণের সম্মুখে প্রেরণ করিল।

মোহাম্মদ হানিফা এবং তাঁহার অপর অপর আত্মীয়গণ দূতের প্রতি একযোগে অসি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “রাখ. তোর সন্ধি! রাখ্ তোর সাদা নিশান!”

গাজী রহ্‌মান ত্রস্তে মোহাম্মদ হানিফার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, “বাদশাহ্‌-নামদার! ক্ষান্ত হউন। পরাজিত শত্রু মহাবীরের বধ্য নহে—বিশেষতঃ দূত! রোষপরবশ হইয়া রাজবিধি রাজপদে দলিত করিবেন না। অস্ত্র কোষে আবদ্ধ করুন। দূতবরের প্রার্থনা শুনিতেই হইবে, গ্রাহ্য করা না করা বাদশাহ্‌-নামদারের ইচ্ছা।”

হানিফা লজ্জিত হইয়া হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন; তরবারি পিধানে রাখিয়া বলিলেন, “গাজী রহ্‌মান! তুমি যথার্থই আমার বুদ্ধিবল। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধই লোকের মুর্খতা প্রকাশ করে—মানুষকে নিন্দার ভাগী করে। যাহা হউক, তুমি দূতবরের সহিত কথা বল।”

এজিদ-দূত মহাসমাদরে মোহাম্মদ হানিফাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “জয়নাল আবেদীনকে শূলে চড়াইয়া বধ করিবার ঘোষণা রহিত করা গেল, শূলদণ্ড এখনই উঠাইয়া ফেলা হইবে। আমাদের সৈন্যগণ মহাক্লান্ত—বিনা যুদ্ধেই আজ আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম। যদি ইহাকেই আপনারা জয় মনে করেন, তবে মহারাজ এজিদ তাঁহার হস্তস্থিত তরবারি যাহা সত্যসত্যই

তিনি ভূমিতে রাখিয়া দিয়াছেন, আর তাহা হস্তে স্পর্শ করিবেন না। এবং গলায় কুঠার বাঁধিয়া আগামী কল্য তিনি আপনার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিবেন।”

গাজী রহ্‌মান বলিলেন, “যদি জয়নাল আবেদীনের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয় এবং তাহার প্রাণের প্রতিভূ মহারাজ এজিদ হয়েন, তবে আমরা আজিকার মত কেন—যতদিন তিনি যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন, ততদিন পর্য্যন্ত সম্মত আছি। বিনা যুদ্ধে, কি দৈববিপাকে, কি অপ্রস্তুতজনিত, কি অপারগতা হেতু পরাভব-স্বীকার করিলে, আমরা তাহাকে জয় মনে করি না। যে সময় তোমাদের তরবারির তেজ কম হইবে,—সমর-প্রাঙ্গণ হইতে প্রাণভয়ে তোমরা পলাইতে থাকিবে, শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় তোমাদের তাড়াইতে থাকিব,—কোথায় নিশান, কোথায় ব্যূহ, কোথায় কে, কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ ইত্যাদির জ্ঞান থাকিবে না, রক্ত-স্রোতে রঞ্জিতদেহ সকল ভাসিয়া যাইবে, কোন স্থানে তোমাদের সৈন্য-দেহখণ্ড খণ্ডিত অশ্ব-দেহের শোণিতসংযোগে জমাট বাঁধিয়া গড়াইতে থাকিবে,—কোন স্থানে বা দ্বীপাকার ধারণ করিবে, শিরশূন্য কবন্ধসকল রক্তের ফোয়ারা ছুটাইয়া নাচিতে নাচিতে হেলিয়া দুলিয়া শবদেহের উপর পড়িয়া হাত-পা আছ্‌ড়াইতে থাকিবে, আমরা বীরদর্পে বিজয়নিশান উড়াইয়া দামেস্ক-রাজপাটে জয়নাল আবেদীনকে বসাইয়া রক্তমাখা শরীরে রঞ্জিত তরবারিসকল মহারাজ জয়নাল আবেদীনের সম্মুখে রাখিয়া ‘মহারাজাধিরাজ’ সম্ভাষণে নতশিরে দণ্ডায়মান হইব,—তোমাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে তবে সেও আমাদের সহিত ঐ অভিষেক-ক্রিয়ায় যোগদান করিবে, নগরময় যখন অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারকা-চিহ্নিত পতাকাসকল উড়িতে থাকিবে, দূতবর! সেই দিন যথার্থই জয়ী হইলাম মনে করিব। অন্য প্রকার জয়ের আশা আমাদের অন্তরে নাই। যাও দূতবর, তোমার রাজাকে গিয়া বল—আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলাম। যে দিন তোমাদের সমর-নিশান শিবির-শিরে উড়িতে দেখিব,—ভেরীর বাজনা স্বকর্ণে শুনিব, সেই দিন আমাদের তরবারির চাকচিক্য, তীরের গতি, বর্শার চালনা, অশ্বের দাপট, নিশানের ক্রিয়া—সকলই দেখিতে পাইবে। আজ ক্ষান্ত দিলাম, কিন্তু পুনরায় বলিতেছি ঃ

জয়নালের প্রাণ তোমাদের রাজার প্রতিভূতে রহিল। যাও দূতবর! শিবিরে যাও, আমরাও শিবিরে চলিলাম।”

সপ্তবিংশ প্রবাহ

রজনী দ্বিপ্রহর। তিথির পরিভাগে বিধুর অনুদয়, কিন্তু আকাশ নক্ষত্র-মালায় পরিশোভিত। মহাকোলাহলপূর্ণ রণ-প্রাঙ্গণ এইক্ষণে সম্পূর্ণভাবে নিস্তব্ধ। দামেস্ক-প্রান্তরে প্রাণীর অভাব নাই। কিন্তু প্রায় সকলেই নিদ্রার কোলে অচেতন। জাগ্রত কে?—প্রহরী দল, সন্ধানীদল, আর উভয় পক্ষের মন্ত্রীদল! মন্ত্রীদলমধ্যেও কেহ কেহ আলস্যের প্রভাবে চক্ষু মুদিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আছেন, কেহ দিবাভাগের সেই অভাবনীয় ঘটনার কোন কোন অংশ ভাবিয়া উপবেশন-স্থানেই গড়াইয়া পড়িয়াছেন, কেহ শয়ন-শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া আধ-জাগরণে, আধ-স্বপ্নে জেয়াদের শিরশূন্য দেহ দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিতেছেন। যথার্থ জাগরিত কে?—এক পক্ষে মারওয়ান, অন্য পক্ষে গাজী রহ্‌মান।

মারওয়ান আপন নির্দ্দিষ্ট বস্ত্রাবাসের বহির্দ্বারে সামান্য কাষ্ঠাসনোপরি উপবেশন করিয়া বলিতেছে, “ভাবিলাম কি? ঘটিল কি? এখন উপায়ই বা কি? রাজ্যরক্ষা, রাজার জীবন রক্ষা, নিজের প্রাণ রক্ষার উপায় কি? কি ভ্রম! কি ভয়ানক ভ্রম!! আশা ছিল শত্রুকে শূলে দিয়া জগতে নাম জাঁকাইব,—যুদ্ধে জয়লাভ করিব;—সে আশা-বারিধি গাজী রহ্‌মানের মস্তিষ্ক-তেজে, ছদ্মবেশী বাহ্‌রামের বাহুবলে এবং ওমর আলীর কৌশলে একেবারে পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখন জীবনের আশঙ্কা, রাজ-জীবনে সন্দেহ। জয়নাল আবেদীনের বন্দী-গৃহ হইতে পলায়নে আরও সর্ব্বনাশ ঘটিল। দ্বারে দ্বারে প্রহরী, নগর-প্রবেশের দ্বারে প্রহরী, বহির্দ্বারে প্রহরী। সকল প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া আপন মুক্তি সে আপনিই করিল! কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! এখন আর কাহার জন্য যুদ্ধ? আর কি কারণে হানিফার সহিত শত্রুতা? কেন প্রাণীক্ষয়? জয়নালকে হানিফা-হস্তে দিতে না পারিলে

আর রক্ষা নাই। সন্ধির প্রস্তাব মুখে আনিতেও আমার আর ক্ষমতা নাই—আর তাহাতে হানিফাও ভুলিবে না। সন্ধির নিশানে আর কিছুই হইবে না। শত সহস্র দূতের প্রস্তাবেও আর হানিফা কর্ণপাত করিবে না। পরাজয় স্বীকারে মৃত্তিকায় তরবারি রাখিয়া দিলেও আর সে ছাড়িবে না। যদি জয়নালের মুক্তির কথা গোপনই থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে আমাদের লাভ কি? জয়নালই যদি আমাদের হাতছাড়া হইল, তবে হানিফার পরাজয়ে ফল কি? ফল আছে। মহারাজের প্রাণ, স্বদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণরক্ষা করা ভিন্ন আর কি আশা? কিন্তু তাহাতেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। হোসেনপুত্র জয়নাল!—সিংহশাবক সিংহ। আজই হউক, কালই হউক, দুদিন পরেই হউক, তাহার বল-বিক্রম সে প্রকাশ করিবে,—নিশ্চয়ই করিবে। সে নব-কেশরীর নব-গর্জ্জনে দামেস্ক-নগর কাঁপিবেই কাঁপিবে। তাহার পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ সে কালে লইবেই লইবে।”

মারওয়ানের চিন্তার ইতি নাই। দামেস্কের এ দুর্দ্দশা কেন ঘটিল, ইহাও এক প্রশ্ন। এজিদের দোষ, কি তাহার দোষ—সে কথারও মীমাংসা হইতেছে। সর্ব্বোপরি প্রাণের ভয়—মহাভয়। যদি আবদুল্লাহ্ জেয়াদের উপর ওমর আলার বধসাধন-ভার অর্পণ করিয়া রাজসমীপে সে না যাইত, তাহা হইলে এই নিশীথ সময়ে প্রান্তরে বসিয়া আর চিন্তার ভার তাহাকে বহন করিতে হইত না—এই কথাই বিশেষ করিয়া মারওয়ান আলোচনা করিতেছে।

মারওয়ান যে স্থানে বসিয়াছিল, সে স্থান হইতে হানিফার শিবিরে প্রজ্জলিত দীপমালা সমুজ্জল নক্ষত্রমালার ন্যায় তাহার চক্ষে দৃষ্ট হইতেছিল। প্রদীপ্ত দীপরাশির উজ্জলাভা মনঃসংযোগে দেখিতে দেখিতে তাহার মনে নূতন একটি কথার সঞ্চার হইল। কথাটা কিছু গুরুতর, অথচ নীচ। কিন্তু মারওয়ানের হৃদয়ে সে কথার সঞ্চার আজ নূতন নহে। বিশেষতঃ, আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধিবশে মারওয়ান মনের কথা মুখে আনিল। গুপ্তভাবে হানিফার শিবিরে যাইলে জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারা যায় কি না? যদি জয়নাল হানিফার হস্তগত হইয়া থাকে, তবে সকলই

বৃথা। কোন উপায়ে, কি কোন কৌশলে, কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারিলে এখনও রক্ষার অনেক উপায় করা যায়। মদিনায় মায়মুনার আবাসে কত নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে যাইয়া কত গুপ্ততথ্য অনুসন্ধান করিয়াছি, কত অসাধ্য সাধন সহজে সাধন করিয়াছি, আর এ দামেস্ক নগর—আপন দেশ, নিজের অধিকার, এখানে কিছুই করিতে পারিব না? তবে একটা কথা,—পাত্রভেদে কিছু লঘু-গুরু আছে। আবার একেবারে নিঃসন্দেহের কথাও নহে! মোহাম্মদ হানিফা বুদ্ধিমান। প্রধান মন্ত্রী গাজী রহ্‌মান অদ্বিতীয় রাজ-নীতিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও চতুর,—তাহাদের নিকট মারওয়ান পরাস্ত! কি জানি, কি কৌশল করিয়া শিবির-রক্ষার কি উপায় তাহারা করিয়াছে! হঠাৎ বিপদগ্রস্ত হইলেও হইতে পারি! অদ্বিতীয় ভালবাসার প্রাণ-পাখীটাই যে, দেহপিঞ্জর হইতে একেবারে দূরে না যাইতে পারে, তাহাই বা কে বলিল? এও সন্দেহ; নতুবা দামেস্ক-প্রান্তরে এই নিশীথ সময়ে একা একা ভ্রমণ করিতে মারওয়ান সন্দিহান নহে, দামেস্কের রাজমন্ত্রী ভীত নহে।”

এই বলিয়া মারওয়ান আসন হইতে উঠিল। উঠিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “একা যাইব না, অলীদকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে—পথিক-সাজে—সামান্য পথিক-সাজে বাহির হইব।”

মারওয়ান বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য বস্ত্রাবাসমধ্যে প্রবেশ করিল।

অলীদের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই। মহাবীর-হৃদয় আজ মহাচিন্তায় অস্থির। এ যুদ্ধের পরিণাম-ফল কি? সমরের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, শেষ ঘটনায় নিয়তিদেবী যে কোন্ দৃশ্য দেখাইয়া এ অভিনয়ের যবনিকা পতন করিবেন, তাহা তিনিই জানেন!

বীরবর শিবিরের বাহিরে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে, আর ভাবিতেছে—মাঝে মাঝে বিমানে পরিশোভিত তারাদলের মিটি মিটি ভাব দেখিয়া মনে মনে আর একটি মহাভাবের ভাবনা ভাবিতেছে! কিন্তু সে ভাব—ক্ষণকালের জন্য সে জ্বলন্ত দৃঢ়ভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। মায়াময় সংসারে স্বার্থপূর্ণ ভাবই প্রবলবেগে তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। নিশার শেষের

সহিত কি আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিবে? কার ভাগ্যে কি আছে, কে বলিবে? আবার তারাদলে তাহার নয়ন পড়িল,—সেই মধুমাখা মিটি মিটি হাসি-হাসি ভাব,—এ তারা, ও তারা, কত তারা দেখিল, কিন্তু অরুন্ধতী নক্ষত্র তাহার নয়নে পড়িল না। তারাদল হইতে নয়ন ফিরাইয়া আনিতেই হানিফার শিবিরে প্রদীপ্ত দীপালোকের প্রতি তাহার চক্ষু পড়িল। অলীদ সে দিকে মনঃসংযোগ না করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই তীর-ধনু হস্তে লইল। ছদ্মবেশী মারওয়ান কথা না কহিলে, অলীদ-বাণে তখনই তাহার জীবন শেষ হইত।

অলীদ বলিল, "নিশীথ-সময়ে এ বেশে কোথায়? ভাগ্যে কথা বলিয়াছিলেন!"

"তাহাতেও দুঃখ ছিল না। যে গতিক দেখিতেছি, তাহাতে দুই এক দিনের অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। ভাল, তোমার চক্ষেও যে আজ নিদ্রা নাই?"

"আপনার চক্ষেই বা আছে কি?"

"অনেক চেষ্টা করিলাম,—কিছুতেই নিদ্রা হইল না। মনে শান্তি নাই, আত্মার পরিতোষ কিসে হইবে? নানা প্রকার চিন্তায় মন মহা আকুল হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, কি ভ্রম! কি করিতে গিয়া কি ঘটিল! জেয়াদের মৃত্যু জেয়াদ নিজ বুদ্ধিতেই টানিয়া আনিয়াছিল। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা, অভাবনীয় বুদ্ধিকৌশল, হাতে হাতে চাতুরী কখনই দেখি নাই, আজ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনি নাই। ধন্য মোহাম্মদ হানিফা! ধন্য গাজী রহমান!"

"গত বিষয়ের চিন্তা বৃথা,—আলোচনাতে কেবল আক্ষেপ ও মনের কষ্ট। ও কথা মনে করিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন রাত্রি প্রভাতের পর উপায় কি? যুদ্ধ আর ক্ষান্ত থাকে না,—সে যুদ্ধই বা কাহার জন্য, মূলধন ত সরিয়া পড়িয়াছে!"

"সেও কম আশ্চর্য্য নহে।"

"সময় মন্দ হইলে এই প্রকারই হইয়া থাকে।"

"যাহা হইবার হইয়াছে, এখন চল, একবার হানিফার শিবিরের দিকে যাইয়া দেখিয়া আসি, কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান লইতে পারি

কি না; এখন মূল কথা—জয়নাল আবেদীন। যুদ্ধ করিতে হইলেও জয়নাল! পরাভব স্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা—রাজ্যরক্ষা করিতে হইলেও জয়নাল! সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইলেও সেই জয়নাল! জয়নালের সন্ধান না করিয়া আর কোন কথা উঠিতে পারে না। জীবনে, মরণে সকল অবস্থাতেই জয়নালের প্রয়োজন।”

“তাহা ত শুনিলাম! কিন্তু একটি কথা—এই নিশীথ সময়ে জয়নালের সন্ধান করিতে, কি বিপক্ষ-শিবিরে সন্ধান জানিতে যাইব ?—তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে চাই। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পথিক, পরিব্রাজক, দীন-দুঃখীর পরিচয় দিলেই যে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা নহে। এ মদিনার মায়মুনা নহে, দগ্ধ-হৃদয় জাএদা নহে। এ বড় কঠিন হৃদয়, বৃহৎ মস্তক। এ মস্তকে মজ্জার ভাগও অতি অধিক, শক্তিও বেশী পরিমাণ, ক্ষমতাও অপরিসীম। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত অনেক দেখিতেছি, আবার এই নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে গোপনভাবে দেখিয়া অধিক আর কি লাভ হইবে ? তাহাদের গুপ্তসন্ধান জানিয়া সাবধান ও সতর্ক হওয়া, কি কোন কার্য্যের প্রতিযোগিতা করা, কি নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা, বহু দূরের কথা। শত্রু-শিবিরের বহিঃস্থ সীমার নিকট যাইতে পার কি না সন্দেহ! তোমার ইচ্ছা হইয়াছে—চল, দেখিয়া আসি, গাজী রহমানের সতর্কতাও জানিয়া আসি ; কিন্তু লাভ কিছু হইবে না, বরং বিপদের আশঙ্কাই অধিক।”

“লাভের আশা যাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; সে যে ঘটিবে না, তাহাও বুঝিয়াছি। তথাপি যদি কিছু পারি।”

“পারিবে ত অনেক। মানে মানে ফিরিয়া আসিতে পারিলে রক্ষা।”

“আচ্ছা, দেখাই যাউক, আমাদের ত রাজ্য!”

“আচ্ছা, আমি সম্মত আছি।”

“তবে আর বিলম্ব কি ? পোষাক লও।”

“পোষাক ত লইবই, আরও কিছু লইব।”

“সাবধান! কেহ যেন হঠাৎ দেখিতে না পায়।’

ওত্‌বে অলীদ ছদ্মবেশে মারওয়ানের সঙ্গে চুপে চুপে বাহির হইল।

প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা ফিরিয়া আসিবে,—এই কথা পথে স্থির হইল। কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া মারওয়ান বলিল, "একেবারে সোজা পথে যাইব না। শিবিরের পশ্চাৎ ভাগ সম্মুখে রাখিয়া যাইতে হইবে। এখন আমরা বাম পার্শ্ব হইয়া ক্রমে শত্রু-শিবির বেষ্টন করিয়া যাইতে থাকিব।"

এই যুক্তিই স্থির করিয়া তাহারা ক্রমে বাম দিকেই যাইতে লাগিল। ক্রমে হানিফার শিবিরের পশ্চাৎ দিক তাহাদের চক্ষে পড়িতে লাগিল। সম্মুখে যেরূপ আলোর পারিপাট্য, সেইরূপ পশ্চাৎ, পার্শ্ব—সকল দিকেই সমান। সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে কিছুই ভেদ নাই। কখনও দ্রুতপদে, কখনও মন্দ মন্দ ভাবে, চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিয়া যথাসাধ্য সতর্কে তাহারা যাইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের সঙ্গে আরও লোক আসিতেছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল, হাসি-রহস্য-বিদ্রূপসূচক কোন কোন কথার আভাস তাহাদের কানে আসিতে লাগিল। কোন্ দিক এবং কত দূর হইতে এই কথার আভাষ আসিতেছে, তাহারা তাহা স্থির করিতে পারিল না। কারণ, কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে, কখনও সম্মুখে, আবার কখনও পশ্চাতে—অতি মৃদু মৃদু কথার আভাষ তাহাদের কানে আসিতে লাগিল। উভয়ে গমনে ক্ষান্ত দিয়া মনঃসংযোগে বিশেষ লক্ষ্যে চারিদিকে দেখিতে লাগিল।—দেখিল, কোন দিকে কিছুই নাই, চারিদিক অন্ধকার, উপরে তারকারাজি।

উভয়ে আবার যাইতে লাগিল। প্রায় দশ-পদ ভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতেই, মানব-মুখোচ্চারিত অসংযুক্ত কথার ঈষৎ ভাব স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে কথার প্রতি গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা যাইতে লাগিল, কিন্তু আর বেশী দূর যাইতে হইল না। আনুমানিক পঞ্চ হস্ত পরিমাণ ভূমি পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতেই তাহাদের বামপার্শ্ব হইতেই শব্দ হইল—"আর নয়, অনেক দূর আসিয়াছ।"

মারওয়ান চমকাইয়া উঠিল। আবার শব্দ হইল,—"কি অভিসন্ধি?"

মারওয়ান ও অলীদ উভয়েই চমকাইয়া উঠিল, তাহাদের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—স্থির ভাবে তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার শব্দ হইল,—"নিশীথ সময়ে রাজ-শিবিরের দিকে কেন?

সাবধান! আর অগ্রসর হইও না। যদি আর যাইতে আশা থাকে, তবে সূর্য্য উদয়ের পর—।”

মারওয়ান ও অলীদ উভয়ে ফিরিল, আর সে পথের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কিছু দূরে আসিয়া অন্য পথে অন্য দিকে শিবিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। মারওয়ান বলিল, “অলীদ আমারই ভুল হইয়াছে, এদিকে না আসিয়া অন্য দিকে যাওয়াই ভাল ছিল।”

“অন্য কোন্ দিকে যাওয়া ভাল ছিল বলুন, সেই দিকেই যাই। ভুল সংশোধন করিতে কতক্ষণ লাগে? যে দিক আপনি নিরাপদ বোধ করেন, সেই দিকেই চলুন।”

মারওয়ান শিবিরের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইতে লাগিল, সেই দিকে যাইতে তাহার মনে কোন সন্দেহ হইল না। পশ্চাতে, সম্মুখে, কি বামে, কোন দিকেই আর শঙ্কাবোধ হইল না। নিঃশঙ্কচিত্তে তাহারা যাইতে লাগিল।

অলীদ বলিল, “দেখিলে? গাজী রহমানের বন্দোবস্ত দেখিলে?”

“এ দিকে কি?”

“বোধ হয়, অন্য দিকের মত এদিকের তত গুরুত্ব মনে করে নাই।”

“সে কি আর ভ্রম নয়?”

“মারওয়ান! এখন ও-কথা মুখে আনিও না। গাজী রহমানের ভ্রম—একথা মুখে আনিও না। কার্য্যসিদ্ধি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিজ শিবিরে যাইয়া যাহা বলিবার বলিও। অন্য দিকে কি কৌশল করিয়াছে, তাহা তাহারাই জানে!”

“তা জানুক, এ দিকে কোন বাধা নাই, নিঃসন্দেহে যাইতেছি; মনে কোনরূপ শঙ্কা হইতেছে না।”

“আমি ভাই, আমার কথা বলি।—আমার মনে অনেক কথা উঠিয়াছে—ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব না। দুই জনে একত্রে সমানভাবে যাইব, কেহই কাহারও অগ্রপশ্চাৎ হইব না।”

মারওয়ান হাসিয়া বলিল, “অলীদ, তুমি আজ মহাবীরের নাম ডুবাইলে। অল্পমতি বালকগণের মনের সহিত পরিপক্ক মনের সমান ভাব দেখাইলে!

বীর-হৃদয়ে ভয়! দুইজনে সমানভাবে একত্র যাইতে পারিলেই নির্ভয়,—এ কি কথা?"

"মারওয়ান! আমরা যে কার্য্যে বাহির হইয়াছি, সে কার্য্যের কথা মনে আছে? কার্য্যগতিকে সাহস, রুচিগতিকে বল। এখানে তোমার মন্ত্রীত্ব নাই, আমারও বীরত্ব নাই। যেমন কার্য্য, তেমনই স্বভাব।"

উভয়ে হাস্যে রহস্যে একত্রে যাইতেছে। প্রজ্জ্বলিত দীপের প্রদীপ্ত আভায় শিবির-দ্বারে মানুষের গতিবিধি স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। গমনের বেগ তাহারা কিছু বর্দ্ধিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাসি-রহস্যও চলিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের হাসি বেশীক্ষণ রহিল না। দৈবাৎ নিকটে একটি শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহারা দক্ষিণে, বামে দৃষ্টিপাত করিল—অন্ধকার! সম্মুখে—দীপালোক! তাহারা গমনে ক্ষান্ত হইল। আবার সেই হৃদ্‌কম্পনকারী শব্দ—ক্ষিপ্রহস্তে নিক্ষিপ্ত তীরের শন্ শন্ শব্দ। মারওয়ান অন্তরে জানিয়াছে—তীরের গতি, মুখে বলিতেছে—"ও কিসের শব্দ? অলীদ! ও কিসের শব্দ?" কি বিপদ, এই কথা কহিতে না কহিতেই তিনটি লৌহ-শর তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এখন কি করিবে—অগ্রে পা ফেলিবে, কি পিছনে সরিবে, কি স্থিরভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিবে—কিছুই তাহারা স্থির করিতে পারিল না। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে গভীর নাদে শব্দ: "শত্রু হও, মিত্র হও—ফিরিয়া যাও,—রাত্রে এ শিবিরে প্রবেশ নিষেধ—রাত্রে আঘাত মহারাজের নিষিদ্ধ, তাহাতেই প্রাণ বাঁচাইতে পারিলে; নতুবা ঐ স্থানেই ইহকালের মত পড়িয়া থাকিতে হইত।"

আর কোন কথা নাই। চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ। কিছুক্ষণ পরে অলীদ বলিল, "মারওয়ান! এখন আর কথা কি? অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমি আগে যাইতে আর কি সাহস হয়?"

মারওয়ান মৃদুস্বরে বলিল, "ওহে চুপ কর। প্রহরীরা আমাদের নিকটেই আছে।"

"নিকটে থাকিলে ত ধরিয়া ফেলিত।"

"ধরিবার ত কোন কথা নাই—তবে উহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত

শিবিরে রক্ষা করিতেছে। যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম, তাহা ত ঘটিল না। এখন নিরাপদে শিবিরে ফিরিতে পারিলেই রক্ষা।"

"সে কথা ত আমি আগেই বলিয়াছি। এখন লাভের মধ্যে প্রাণ লইয়া টানাটানি।"

মারওয়ান বলিল, "আর কথা বলিও না; এস, চুপে চুপে নিঃশব্দে চলিয়া যাই।"

উভয়ে কিছু দূর আসিয়া "রক্ষা পাইলাম" বলিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি কথা কহিতে, আর তাহাদের সাহস হইল না—পারিলও না। কণ্ঠতালু শুষ্ক, জিহ্বা একেবারে নীরস,—তবুও বহুদূর তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষণকাল পরে মারওয়ান একটু স্থির হইয়া বলিল, "অলীদ! বাঁচিলাম। চল, এখন একটু স্থির হইয়া আমাদের শিবিরে যাই।"

মুখের কথা শেষ হইতেই পশ্চাৎ দিক হইতে বজ্রনাদে শব্দ হইল—"সাবধান! আর কথা বলিও না,—চলিয়া যাও। ঐ বৃক্ষ—ঐ তোমাদের সম্মুখের ঐ উচ্চ খর্জ্জুরবৃক্ষ পর্য্যন্ত আমাদের সীমা। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না। যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, সীমার বাহিরে যাও।"

কি করে, উভয়ে দ্রুতপদে সীমা-বৃক্ষ পার হইয়া রক্ষা পাইল। আর কোন কথা শুনিল না। জীবনে এমন অপমান কখনও হয় নাই। কি লজ্জা!

মারওয়ান বলিল, "কি বিপদ! হানিফার প্রহরীরা কি প্রান্তরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া রহিয়াছে? এখনও আমার মন কিছুতেই সুস্থির হয় নাই, এখনও হৃদয়ের চঞ্চলতা দূর হয় নাই। এখানে আর দাঁড়াইব না। এখনও সন্দেহ হইতেছে। আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্য, সীমা-বৃক্ষ উহাদের—কি আশ্চর্য্য! সীমা-বৃক্ষ না ছাড়াইয়া আসিলে জীবন যায়—কি ভয়ানক ব্যাপার! চল শিবিরে যাই।"

উভয়ে নীরবে আপন শিবিরাভিমুখে চলিল। যাইতে যাইতে সম্মুখে একখণ্ড বৃহৎ শিলাখণ্ড দেখিয়া মারওয়ান বলিল, "অলীদ! এই শিলা-খণ্ডের উপরে একটু বিশ্রাম করি। নানা কারণে মন অস্থির হইয়াছে।

আর কোন গোলযোগ নাই। ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া মনের অস্থিরতা দূর করি। যেমন কার্য্যে আসিয়াছিলাম, তাহার প্রতিফলও পাইলাম।”

অলীদ মারওয়ানের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া শিলাখণ্ডের চতুষ্পার্শ্ব একবার বেষ্টন করিয়া আসিল এবং নিঃশঙ্কচিত্তে উভয়ে বসিয়া অস্ফুটস্বরে কথা কহিতে লাগিল।

এক কথার ইতি হইতে না হইতেই অন্য কথা তুলিলে কথার বাঁধুনী থাকে না; সমাজ-বিশেষে অসভ্যতাও প্রকাশ পায়। জয়নাল আবেদীন বন্দীগৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এমন সুযোগ পাই নাই যে, তাহার বিবরণ পাঠকগণের গোচর করি। মারওয়ান এবং ওত্বে অলীদ শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনের কথা ভাঙ্গচুর করুক, এই অবসরে আমরা জয়নালের কথাটা বলিয়া রাখি।

জয়নাল আবেদীন ওমর আলীর শূলদণ্ডের ঘোষণা শুনিয়া বন্দীগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ হইতে প্রহরীদের অসাবধানতায় নাগরিক দলে মিশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় নামেই সকলের কাছে পরিচিত; কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে চক্ষে দেখে নাই। মোহাম্মদ হানিফাকে তিনি কখনও দেখেন নাই, ওমর আলীকেও দেখেন নাই—অথচ ওমর আলীর প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন, এই দুরাশার কুহকে মাতিয়াই তিনি দামেস্ক-প্রান্তরে আসিয়াছিলেন। এজিদের শিবির, হানিফার শিবির, ওমর আলীর নিষ্কৃতি,—সমুদয়ই তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার নিজের প্রাণবধের ঘোষণাও স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। ঐ ঘোষণার পর তিলার্দ্ধকালও দামেস্ক-প্রান্তরে তিনি অবস্থিতি করেন নাই; নিকটস্থ এক পর্ব্বত-গুহায় আত্মগোপন করিয়া দিবা অতিবাহিত করিয়াছেন। নিশীথ সময়ে পর্ব্বত-গুহা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার প্রথম চিন্তা—কি উপায়ে মোহাম্মদ হানিফার সহিত একত্রিত হইবেন।—সে শিবিরে তাঁহার পরিচিত লোক কেহই নাই।—নিজ মুখে নিজ পরিচয় দিয়া দাঁড়াইতেও নিতান্ত অনিচ্ছা! ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি দুই এক পদ করিয়া হানিফার শিবিরাভিমুখেই যাইতেছেন।

অলীদ বলিল, “মারওয়ান! কিছু শুনিতে পাইতেছ?”

"স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু মানুষের গতিবিধির ভাব বেশ বুঝা যাইতেছে! এক জন দুই জন নহে, বহুলোকের সাবধানে পদবিক্ষেপের শব্দ অনুভূত হইতেছে। আর এখানে থাকা উচিত নহে। বোধ হয়, বিপক্ষেরা আমাদের পরিচয় পাইয়াছে, এখনও আমাদিগকে ছাড়ে নাই! ঐ দেখ, সম্মুখে চাহিয়া দেখ। আমরা ছদ্মবেশে আসিয়াছি, কেবল তোমার নিকট একখানি তরবারি, আর আমার নিকট সামান্য একখানি ছুরি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র আমাদের সঙ্গে নাই। আর থাকিলেই বা কি হইবে? তাহাদের তীরের মুখ হইতে দিনে রক্ষা পাওয়াই দায়, তায় আবার ঘোর নিশা। মনঃসংযোগে কান পাতিয়া শোন, যেন চতুর্দ্দিকেই লোকের গতিবিধি, চলাফেরা ও সাড়া পাওয়া যাইতেছে। চল, এখানে থাকা বিধেয় নহে!" এই বলিয়া শিলাখণ্ড হইতে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া সমতল-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল।

জয়নাল আবেদীনও নিকটবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

মারওয়ান থতমত খাইয়া শঙ্কিত-চিত্তে উত্তর করিল, "আমরা পথিক, পথহারা হইয়া আসিয়াছি।"

"নিশীথ সময়ে পথিক পথহারা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে! এ কি কথা?"

জয়নাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে পথিক! তোমরা কি বিদেশী?"

"হ্যাঁ, আমরা বিদেশী।"

"কি আশ্চর্য্য! তোমরা বিদেশী হইয়া এই মহা সংগ্রামস্থলে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? সত্য বল, কোন চিন্তা নাই।"

মারওয়ান বলিল, "যথার্থ বলিতেছি, আমরা বিদেশী, অজানা দেশ, পথ-ঘাটের ভাল পরিচয় নাই—চিনি না। দামেস্ক-নগরে চাকরীর আশায় যাইতেছি। দিবসে সৈন্য-সামন্তের ভয়; রাত্রেই নগরে প্রবেশ করিব—ইহাই আশা এবং অন্তরের নিগূঢ় তত্ত্ব।"

"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমাদের বসতি কোথায়?"

"আমরা মদিনা হইতে আসিয়াছি। মদিনাই আমাদের বাসস্থান।"

ভীমনাদে শিলারাশির পার্শ্ব হইতে আত্মাজী গুপ্ত সৈন্যদের শব্দ হইল : ওরে ছদ্মবেশী নিশাচর! মদিনাবাসীরা দামেস্কে চাকরীর আশায় আসিয়াছে? আর কোথায় যাইবি? এই স্থানে নিশা যাপন কর। প্রভাতে পরীক্ষার পর মুক্তি। এক পদও আর অগ্রসর হইতে পারিবি না। যদি চক্ষের জ্যোতিঃ থাকে, দৃষ্টির ক্ষমতা থাকে, তবে যে দিকে ইচ্ছা চাহিয়া দেখ, পঞ্চবিংশতি বর্ষার ফলক তোমাদের বক্ষ, পৃষ্ঠ, বাহু ও পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। সাবধান! কোন কথা উত্থাপন করিও না,—নীরবে তিন মূর্ত্তি প্রভাত পর্য্যন্ত এই স্থানে দণ্ডায়মান থাক। আর যাইবার সাধ্য নাই। মোহাম্মদ হানিফার গুপ্ত সৈন্য দ্বারা তোমরা তিন জন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বন্দী।"

অষ্টাবিংশ প্রবাহ

রাজার দক্ষিণ হস্ত—মন্ত্রী, বুদ্ধি—মন্ত্রী, বল—মন্ত্রী। মন্ত্রীপ্রবর গাজী রহমানের চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই, একথা সপ্তবিংশতি প্রবাহের প্রারম্ভেই প্রকাশ করা হইয়াছে। গাজী রহমান এক্ষণে মহাব্যস্ত। নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গুপ্তচরেরা এ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। আজিকার সংবাদ, দামেস্ক নগরের সংবাদ—এজিদ-শিবিরের নূতন সংবাদ, এ পর্য্যন্ত কোনও সংবাদই তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই : দ্বিতীয় দিনে শিবির আক্রমণের উদ্যোগে এজিদ জয়নাল আবেদীনের প্রাণবধ হইতে বিরত হইল,—ইহাতে কি কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে? আজ হউক, কাল হউক, শিবির আক্রমণ হইবেই হইবে,—সে ভয়ে জয়নালের প্রাণবধে ক্ষান্ত হইবে কেন?

দূরদর্শী মন্ত্রী উপরোক্ত আলোচনায় চিন্তার বেগ বিস্তার করিয়াছেন। নগর, প্রান্তর, শিবির, বন্দীগৃহ, যুদ্ধক্ষেত্র, সৈনিকদল, শূলদণ্ড, এজিদ, মারওয়ান, সকলের বিষয় এক একবার আলোচনা করিতেছেন। আবার মনে উঠিল : জয়নাল-বধে ক্ষান্ত থাকিবে কেন? মারওয়ানের কূটবুদ্ধির সীমা বহুদূরব্যাপী। নিশাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখনও কেহ শিবিরে

ফিরিতেছে না, ইহারই বা কারণ কি ? আর যে দুইটি ছদ্মবেশীর কথা শুনিলাম, তাহারা শিবিরের দিকে আসিতেছিল, প্রহরীদিগের সতর্কতায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।—দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও শিবিরের বহির্ভাগ রেখার নিকটে আশা দূরে থাকুক, সহস্র হস্ত ব্যবধান হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। ইহারাই বা কে ? বিশেষ গোপন ভাবে চরদিগকে, শেষে পঞ্চবিংশতি আম্বাজী সৈন্যকেও পাঠাইয়াছি। তাহারাই বা কি করিল ? মন্ত্রিপ্রবর এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শিবির অভ্যন্তরস্থ তৃতীয় দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া সর্ব্বপ্রধান দ্বারী মালিককে জিজ্ঞাসা করিলেন : কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ ?

মালিক বলিল, "আমি এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাই নাই।"

মন্ত্রিবর মৃদুমন্দপদে চতুর্থ দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া সাদ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সংবাদ নাই ?"

সাদ্‌ জোড়করে বলিল, "আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া জানাই নাই।"

"কি সংবাদ ?"

"শিবির-বহির্দ্বারের চন্দ্ররেখা পর্য্যন্ত শাহ্‌বাজের পাহারায় আছে। তাহার কিছু দূরেই সীমা-নির্দ্দিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের দূরে স্তূপাকার শিলাখণ্ডোপরি সেই দুইটি লোক অস্ফুটস্বরে কি আলাপ করিতেছিল। অনুমানে বোধ হয়, তাহারা কোনরূপ দুরভিসন্ধিতেই আসিয়াছিল।"

মন্ত্রিবর আরও চিন্তিত হইলেন। ক্রমে শিবির বহির্দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দাঁড়াইতেই সুদক্ষ প্রহরী আবদুল কাদের করজোড়ে বলিল, "শিলাসমষ্টির নিকটে যে দুইজন ছদ্মবেশী বসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে আর একজন আসিয়া মিশিয়াছে। এ সকল সংবাদে কোন বিশেষ সারত্ব নাই বলিয়া চরেরা পুনরায় সেইস্থানে গিয়াছে।"

উভয়ে এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে দামেস্ক-নগরে প্রেরিত গুপ্তচর দ্বারে প্রবেশ করিয়াই মন্ত্রিবরকে দেখিয়া নতশিরে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিল, "আজ বড় ভয়ানক সংবাদ শুনিতে হইয়াছে। জয়নাল আবেদীন বন্দী-

গৃহে নাই। এজিদের আজ্ঞায় মারওয়ান জয়নাল আবেদীনকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল, না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দামেস্ক-নগরে ঘরে ঘরে এজিদের সন্ধানী লোক ফিরিতেছে; রাজপথ, গুপ্তপথ, দীন-দরিদ্রের কুটীর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। জয়নাল আবেদীন কোথায় গিয়াছেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।"

এ সংবাদ শুনিয়া গাজী রহমান একেবারে নিস্তব্ধ হইলেন। বহু চিন্তার পর সাব্যস্ত হইল : জয়নাল আবেদীন নগর হইতে বাহির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। শত্রুহস্তেও তিনি পতিত হন নাই। কিন্তু আশঙ্কা অনেক। এই অভাবনীয় সংবাদে মন্ত্রীপ্রবরের মস্তক ঘুরিয়া গেল; মস্তিষ্কের মজ্জা চিন্তা-শক্তির অপরিসীম বেগে অধিকতর আলোড়িত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবিন্দুতে ললাট পরিশোভিত হইল।

একজন গুপ্তচর আসিয়া সেই সময় বলিতে লাগিলেন, "সেই নিশাচর শিলাখণ্ডে বসিয়া আলাপ করিতেছিল, কোন স্পষ্ট কথাই বুঝা যাইতেছিল না। কেবল 'মদিনা' 'চতুর' 'ফিরিয়া যাই' এই তিনটি কথা বুঝা গিয়াছিল। ইতিমধ্যে আর একজন লোক হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত হইলেই উহারা যেন ভয়ে ভীত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" তাহাতে তাহারা উত্তর করিল—"আমরা পথিক।" পুনরায় প্রশ্ন—"পথিক এ পথে কেন?" উত্তর—"পথ ভুলিয়া।" আবার প্রশ্ন—"কোথায় যাইবে?" উত্তর—"দামেস্ক নগরে।" "কি আশা?" —"চাকুরী।" "বসতি কোথায়?—"মদিনা।" অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ হইল, "আর কোথায় যাইবি?" "মদিনার লোক চাকুরীর জন্য দামেস্কে?" দেখিতে দেখিতে আম্বাজী গুপ্ত সৈন্যগণ বর্শাহস্তে তিন জনকেই ঘিরিয়া ফেলিল, পঞ্চবিংশতি বর্শা-ফলক তাহাদের বক্ষ এবং পৃষ্ঠে উত্থিত হইয়া তিন জনকেই বন্দী করিল। সৈন্যগণ বলিল, প্রভাতে পরিচয়—পরীক্ষার পর মুক্তি।"

মন্ত্রিবর এই সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া আদেশ করিলেন "এখনই আরও শত বর্শাধারী সৈন্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ঐ বন্দী তিনজনকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আনিয়া তিন স্থানে আবদ্ধ কর।

সাবধান! কাহারও সহিত যেন কেহ আর কোন কথা না কহিতে পারে,—দেখা না করিতে পারে। সাবধান! বন্দীগণের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা বা অপমানসূচক কোন কথা কেহ যেন প্রয়োগ না করে। আর তোমাদের মধ্যে কেহ দামেস্ক-নগরে যাও, কেহ এজিদ-শিবিরের নিকটও সন্ধান কর। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত, বন, উপবন, যেখানে মানুষের গতিবিধি—যাওয়া-আসা সম্ভব মনে কর, সেইখানেই সন্ধান করিবে। আর সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা এই কথা মনে মনে রাখিয়া দেখিও যে, কেহ কাহাকেও ধরিয়া কোথাও লইয়া যায় কিনা। যদি ধরিয়া লয়, তাহার অনুসরণে যাইবে—দুই এক জন আসিয়া শিবিরেও সংবাদ দিবে। নিশা অবসানের সহিত এই সংবাদ তোমাদের কাছে চাই। চরগণ, আজই তোমাদের পরিশ্রমের শেষ দিন। আজিকার পরিশ্রমই যথার্থ পরিশ্রম। প্রভুর উপকার ও সাহায্যের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে—প্রত্যুষে পুরস্কার। আমি তোমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় জাগরিত রহিলাম!"

গুপ্তচরগণ মন্ত্রিবরের পদচুম্বন করিয়া স্ব স্ব গন্তব্যপথে যথেচ্ছা চলিয়া গেল। মন্ত্রিবর চক্ষের পলক ফিরাইতে অবসর পাইলেন না, কে কোথায় কোন্ পথে চলিয়া গেল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া তিনি আর একটি আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—নিশাবসানের পূর্ব্বে এজিদ-শিবিরের নিকট ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ঘোষণা করিবে: "তিনটি লোক আমাদের হাতে বন্দী; যদি তোমাদের শিবিরস্থ কেহ হয়, তবে সূর্য্যোদয়ের পর চাহিয়া পাঠাইলেই ছাড়িয়া দিব।" মন্ত্রিবর এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া বহির্দ্বার হইতে চলিয়া গেলেন।

উনত্রিংশ প্রবাহ

মদ্যপায়ীর সুখে দুঃখে সমান ভাব। সকল অবস্থাতেই মদের প্রয়োজন! মনকে প্রফুল্ল করিতে, মনের দুঃখ দূর করিতে,—মনে কিছুই নাই অর্থাৎ কালি নাই, বালি নাই, ময়লা নাই, একেবারে সাদা—সে সময়ও মদের প্রয়োজন। গগনে শুকতারা দেখা দিয়াছে—প্রভাত নিকটে। এজিদের চক্ষে ঘুম নাই। ক্রমে পেয়ালা পূর্ণ করিতেছেন, উদরে ঢালিতেছেন। কিছুতেই তাঁহার মন প্রফুল্ল হয় না এবং তিনি আনন্দও পান না—মনের চিন্তাও দূর হয় না। ঐ কথা—ঐ ওমর আলীর নিষ্কৃতির কথা—জয়নালের নিরুদ্দেশের কথা, মধ্যে মধ্যে আবদুল্লাহ্ জেয়াদের খণ্ডিত-শিরের কথা মনে পড়িতেছে, পেয়ালাও চলিতেছে। ক্রমেই চিন্তার বেগবৃদ্ধি এবং পূর্ব্ব কথার স্মরণ! প্রথমে সূচনা, পরে অনুতাপের সহিত চক্ষের জল! আবার পাত্র পরিপূর্ণ হইল। এজিদ পাত্র হস্তে করিয়া একটু চিন্তার পর উদরে ঢালিলেন—জলন্ত হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, মনের গতির মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইল,—মুখে কথা ফুটিল। "কেন হেরিলাম? সে জ্বলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চাহিলাম? হায়! হায়!! সেই এক দিন, আর আজ এক দিন! কি প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কি না ঘটিল! কত প্রাণ —ছিঃ! ছিঃ! কত প্রাণের বিনাশ হইল। উহু! কি কথা মনে পড়িল! সে নিদারুণ কথা কেন এখন মনে হইল! আমি সীমার-রত্ন হারাইয়াছি, অকপট মিত্র জেয়াদ-ধনে বঞ্চিত হইয়াছি। এখন মারওয়ান, ওত্‌বে অলীদ, ওমর—এই তিন রত্ন জীবিত। কিন্তু শত্রুমুখে বক্ষবিস্তার করিয়া দাঁড়ায় কে? ওমর বৃদ্ধ, মারওয়ান বাক্‌চাতুরিতে পক্ক, বুদ্ধি-চালনায় অদ্বিতীয়, অস্ত্র-চালনায় একেবারে গণ্ডমূর্খ। বল, ভরসা—একমাত্র ওত্‌বে অলীদ। অলীদেরও পূর্ব্বের ন্যায় বলবিক্রমও নাই, সে মস্‌হাব কাকার নামে কম্পমান্। কাকার নাম শুনিলে সে কি আর যুদ্ধে যাইবে? যুদ্ধ কিসের?—কার জন্য যুদ্ধ?—এ যুদ্ধ করে কে?—কি কারণে যুদ্ধ? জয়নাল আবেদীন কোথায়—এ কথার উত্তর কি?"

এজিদ আর এক পাত্র লইলেন। আবার কোন্ চিন্তায় তিনি মজিলেন, কে বলিবে ? তাঁহার মুখে কথা নাই—নীরব। অগ্নির দাহনকারিতা, জলের শীতলত্ব, প্রস্তরের কাঠিন্য, আর মদের মাদকতা কোথায় যাইবে ? আবার সাধ্যাতীত হইলে সুরাও মহাবিষ !

মায়মুনা ও জাএদার নিকট এজিদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিবার পর্ব্বোপলক্ষে পাঠকগণ এজিদের সুরাপান দেখিয়াছেন। সে সময়ে এজিদের চক্ষে জল পড়িয়াছিল, এখন এজিদের চক্ষে জল নাই। তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত যুগলচক্ষে এখন আর জল নাই। কিছু যে না আছে, তাহা নহে ;—তরলতায় বেশী প্রভেদ, বোধ হয়, নাও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ণে একেবারে বিপরীত—টক্‌টকে লাল—জবাফুলও পরাস্ত। সেইজন্যই এজিদের চক্ষে জল নাই। যদি কিছু পড়িবার হয়, যদি এজিদের অক্ষিদ্বয় হইতে এইক্ষণে কিছু পড়িবার থাকে, তবে কি পড়িবে ? সে রক্তজবা সদৃশ লাল চক্ষু হইতে এইক্ষণে কি পড়িবে ? না, না, না, সে জল নহে ! যে দুই এক ফোঁটা পড়িবে, সে দুই এক ফোঁটা জল নহে—জল হইবার কথা নহে। মর্ম্মাঘাতে আহত-স্থানের বিকৃত শোণিতধারা, মর্ম্মাঘাতে ক্ষতস্থানের রক্তের ধারা, দুই চক্ষু ফাটিয়া পড়িবে ! জগৎ দেখিবে—এজিদের চক্ষে জল পড়ে নাই। এজিদও দেখিবে, তাহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হয় নাই—সে বিশাল নেত্রযুগল হইতে আজ জলধারা প্রবাহিত হয় নাই। হৃদয়ের বিকৃত শোণিতধারা চক্ষুদ্বারে বহির্গত হইয়া, সে পাপ-তাপ অংশের তেজ কিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাস বোধ জন্মাইবার জন্যই যদি পড়িতে হয়, দুই এক ফোঁটা পড়িবে। বিশাল বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় ঘোর রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, চক্ষু-তারা লোহিত সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। আজ অপাত্রের হস্তে পাত্র উঠিয়াছে। সুর-প্রিয় অনন্তসুধা মুর্খ-হস্তে পড়িয়া মহাবিষে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আবার পেয়ালা পূর্ণ হইল। চক্ষের পলকে চক্ষুদ্বয় আরও লোহিত হইল। মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী, পদদ্বয় বেঠিক। মানসিক ভাব বিলীন,—পশুভাব জাগ্রত। বাক্‌শক্তির বৃদ্ধি, কিন্তু অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতভাবেই পূর্ণ—মনে মুখে এক।

এজিদ বলিতেছেন—সুরাপূর্ণ পেয়ালা হস্তে করিয়া বারবার পেয়ালার দিকে চাহিতেছেন আর বলিতেছেন, "এ স্বর্গীয় সুরা ধরাধামে কে আনিল? এ যন্ত্রণা-নিবারক, মনোদুঃখাপহারক, মনস্তাপ-বিনাশক, প্রেমভাব-উত্তেজক, ভ্রাতৃভা'ব-সংস্থাপক, ষড়রিপু-সংহারক, নবরস-উদ্দীপক, দেহকান্তি-পরিবর্দ্ধক, কণ্ঠস্বর-প্রকাশক—এই নবগুণবিশিষ্ট অমৃত ধরাধামে কে আনিল? মরি! মরি!! আহা মরি মরি!!! এ স্বর্গীয় অমৃত ধরাধামে কে আনিল? অহো করুণা! অহো দয়া! কথা বলিব,—মনের কথা বলিব,—সত্য কথা বলিব?"

পরিপূর্ণ পাত্র আবার মুখে উঠিল। সুরা গলাধঃ হইল, জ্বলিতে জ্বলিতে পাকযন্ত্র পর্য্যন্ত যাইল, তখনই শেষ—পাত্রের শেষ। এজিদ মত্ততায় অধীর হইয়া মনের কপাট খুলিয়া দিয়াছেন,—অকপটে মনের কথা প্রকাশ করিয়া দশ জনকে জানাইতেছেন: "আজ উচিত পথে চলিব। সীমার মরিয়াছে—ভালই হইয়াছে! বেশ হইয়াছে, (হস্তের উপর হস্ত সজোরে আঘাত করিয়া)—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পাইয়াছে। হোসেন আমার শত্রু, (তেজের সহিত)—তা'র কি?—সীমারের কি?—রে পাষণ্ড সীমার! তোর কি?—তুই তাহার মাথা কাটিলি কেন?—যে ব্যক্তি টাকার লোভে মানুষের মাথা কাটে, তা'র ঘাড়ে কি মাথা থাকিবে?—(পেয়ালার প্রতি চাহিয়া) তা'র মাথা কাটা পড়িবে না? জেয়াদ গিয়াছে, মন্দ কি? বিশ্বাসঘাতকের ঐরূপ শাস্তি হওয়াই উচিত, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আগে পাপ ক'রেছে, পাছে ভুগেছে, শেষে জাহান্নামে গিয়েছে।—এজিদের কি? জেয়াদ বাহাদুরী করিয়া শত্রুর হস্তের বন্ধন খুলিয়া দেয় কেন? সে হাতে মরণ নাই,—সেই-ই পরম সৌভাগ্য। ও যে বাহ্‌রাম নয়, হানিফার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—আক্কেল আলা! আবার পাত্র মুখে উঠিল, (নিঃশ্বাস ছাড়িয়া)—সৈন্যদের কথা—কিছুই নহে। বেতনভোগী চাকর, টাকা দিয়াছি, জীবন লইয়াছি। এজিদের জন্যই আমার মরণ—কেন জয়নাবকে এজিদ চক্ষু তুলিয়া দেখিল?—কেন আবদুল জব্বারকে প্রতারণা করিল?—কেন মাবিয়ার

বাক্য উপেক্ষা করিল ?—কেন নিরপরাধ মোস্‌লেমকে হত্যা করিল ?—কেন হাসানকে বিষপান করাইল ? যে আমায় ভালবাসিল না, যে জয়নাব এজিদকে ভালবাসিল না,—এজিদ তাহার জন্য এত করিল কেন ? স্ত্রী-হস্তে স্বামী বধ ! মানিলাম, এজিদের মনে ইহকাল ও পরকালের আগুন জ্বালাইয়া হাসান জয়নাব লাভ করিয়াছিল। হাসান মরিয়া গেল, এজিদের মনের আগুন জ্বলিতে থাকিল। জ্বলুক, আরও পুড়ুক, জ্বলুক, শাস্তিভোগ করুক। কিন্তু হোসেন কি ? সে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিল, যত্নে রাখিয়াছিল। ছিঃ ! ছিঃ ! তাহারই জন্য সমর ! ছিঃ ! তাহারই জন্য কার্‌বালায় রক্তপাত ! তাহাতেই বা কি হইল ? জয়নাব সেই প্রথম দর্শনেই এজিদকে যে চক্ষে দেখিয়াছিল, আজও সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকে—লাভের মধ্যে বেশীর ভাগ—ঘৃণা। থাক্, ও কথা থাক্। হানিফার অপরাধ ? আমি তাহার মাথা কাটিতে চাহি কেন ? তওবা ! তওবা !! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে চাই ? আর একটি কথা বড় মূল্যবান, এজিদের বন্দীগৃহে জয়নাল আবেদীন নাই ! থাকিবে কেন ? সে সিংহশাবক শৃগালের কুটীরে থাকিবে কেন ? সে বীরের পুত্র বীর, তাঁর না ছুড়িয়া সে থাকিবে কেন ?"

এমন সময় সেনাপতি ওমর আসিয়া করজোড়ে বলিলেন, "বাদশাহ্-নামদার ! প্রহরিগণ বলিতেছে—নিশীথ সময়ে প্রধান মন্ত্রী মারওয়ান এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ওত্‌বে অলীদ ছদ্মবেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তাঁহারা এখনও শিবিরে আসিলেন না। সন্ধানী অনুচরেরাও কোন সন্ধান করিতে পারে নাই, বোধ হয়, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে।"

এজিদ প্রসন্নমুখে, জড়িত রসনায়, আরক্তিম লোচনে বলিলেন, "পরকে—উঃ—পরকে ঠকাইতে গিয়াছিলেন, নিজেই ঠকিয়াছেন ! আপনিও ত সেনাপতি। বলুন ত, ছল-চাতুরী করিয়া কে কয় দিন বাঁচিয়াছে ? সেনাপতি মহাশয় ! একথা নিশ্চিত যে, তেজশূন্য শরীর, বলশূন্য বাহু, সাহসশূন্য বক্ষ, বুদ্ধিশূন্য মজ্জা, ইহারাই সম্মুখ সমরে ভীত হইয়া ছদ্মবেশে

চোরের ন্যায় শত্রুগৃহে প্রবেশ করে এবং শৃগালের ন্যায় শঠতা করিয়া কার্য্যোদ্ধারের পথ দেখে। ওমর, ভয় কি? কোন চিন্তা করিও না। নিশার শেষ—যুদ্ধেরও শেষ—আমারও শেষ। আর যাহার যাহা শেষ, তাহাও বুঝিতে পার। তাই বলিয়া দামেস্ক-রাজ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না। বিন্দুপরিমাণ শোণিত থাকিতে দামেস্ক-রাজ নিরাশ হইবে না। মারওয়ান মারা গিয়াছে, ক্ষতি কি? তুমিই সেনাপতি। যদি মারওয়ান যমপুরী না গিয়া থাকে, ভালই। উভয়েই সেনাপতি, উভয়েই মন্ত্রী। যুদ্ধনিশান উড়াইয়া দাও, রণবাদ্য বাজিতে থাকুক! মারওয়ান ও অলীদ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেও যুদ্ধ, না আসিলেও যুদ্ধ। দেখ ওমর! তুমি নামে মাত্র সেনাপতি, আজ মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। চিন্তা কি?"

অকস্মাৎ ভেরী বাজিয়া উঠিল, এজিদ-শিবিরে যাহারা জাগিয়াছিল তাহারা শুনিল, ভেরী বাজাইয়া ঘোষিত হইতেছে: "শিবির-রক্ষকদের কৌশলে আজ নিশীথ সময়ে তিনজন লোক ধৃত হইয়া মোহাম্মদ হানিফার শিবিরে নজরবন্দী মতে কয়েদ আছে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিলে ভিক্ষাস্বরূপ আমাদের প্রভু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।"

শিবিরস্থ সকলেই ঘোষণা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। "আমাদের ত কেহ নহে? আমাদের শিবিরের ত কোন প্রভু নহেন?"—এইরূপ কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। এজিদ মহামতিও স্বকর্ণে ঘোষণা শুনিলেন।

ওমর বলিল, "মহারাজ, অনুমানে কি বুঝা যায়?"

"তোমাদের প্রধান মন্ত্রী, আর ওতবে অলীদ।"

"তবে তিন জনের কথা কেন?"

"বোধ হয়, মন্ত্রিবরের সহিত কোন সেনা গিয়া থাকিবে, কি শিবিরের অন্য কেহ হইবে। কি চমৎকার বুদ্ধি! হানিফার নিকট আমি ভিক্ষা করিব? ধিক্ এজিদের! অমন সহস্র মারওয়ান বন্দী হইলেও এজিদ কাহারও নিকট ভিক্ষা করিবে না। আমি প্রস্তুত, কেবল অস্ত্র ধরিতে বিলম্ব। ওমর! তুমি সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া এক শ্রেণীতে সমুদয় সৈন্য দণ্ডায়মান করিয়া

দাও। আজ হানিফার প্রাণবধ না করিয়া ছাড়িব না। এখনই যুদ্ধনিশান উড়াইয়া রণভেরী বাজাইয়া দাও।

ওমর অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। "কেবল অস্ত্র লইতে বিলম্ব"—এই বলিয়া এজিদ ওমরকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সুরার মোহিনীশক্তি তাঁহাকে শয্যায় শায়িত করিল। সুরে! অপাত্রের হস্তে পড়িয়া দুর্ণামের ভাগী হইলে, কুখ্যাতির ধ্বজা উড়াইলে, অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া ভদ্র-সমাজে অস্পৃশ্য হইলে। দশবার বলিব, তোমারই কল্যাণে, তোমারই কুহকে, মহারাজ এজিদ যুদ্ধসাজে সজ্জিত না হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। যুদ্ধের আয়োজনই বা কি চমৎকার! সুরে! তোমারই প্রসাদে আজ এজিদের এই দশা! তুমি দূর হও, বীরের অন্তর হইতে দূর হও,—জগতের মঙ্গলাকাঙ্খীর চিত্ত হইতে দূর হও,—সংসারীর নয়ন-পথ হইতে দূর হও—দূর হও—তুমি দূর হও! জগৎ হইতে দূর হও!!

ত্রিংশ প্রবাহ

তমোময়ী নিশা, কাহাকেও হাসাইয়া, কাহাকেও কাঁদাইয়া, কাহারও সর্ব্বনাশ করিয়া যাইবার সময় স্বাভাবিক হাসিটুকু হাসিয়া চলিয়া গেল। মোহাম্মদ হানিফার শিবিরে ঈশ্বর-উপাসনার ধূম পড়িয়া গেল। নিশার গমন, দিবাকরের আগমন—সেই সংযোগে বা শুভসন্ধি সময়ে, সকলের মুখেই ঈশ্বরের নাম—সেই অদ্বিতীয় দয়াল প্রভুর নাম—নূরনবী মোহাম্মদের নাম সহস্র প্রকারে সহস্র মুখে। নিশার ঘটনা, নিশাবসান না হইতেই গাজী রহ্‌মান প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও মোহাম্মদ হানিফার নিকট আদ্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। সকলেই বন্দীগণকে দেখিতে সমুৎসুক।

আজ প্রত্যুষেই দরবার। আড়ম্বরশূন্য রাজদরবারে সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব—ভ্রাতৃ-ব্যবহার। পদগৌরবে কেহই গৌরবান্বিত নহেন—সকলেই ভাই, সকলেই আত্মীয়, সকলেই সমান। ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা, গাজী রহ্‌মান, মস্‌হাব প্রভৃতি এবং প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সকলেই আসিয়া সভায় যোগ দিলেন।

ক্ষণকাল পরে একজন বন্দী সৈন্যবেষ্টিত হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইল।

গাজী রহ্‌মান গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আপনি যেই হউন, মিথ্যা কথা বলিয়া পাপগ্রস্থ হইবেন না,—এই আমার প্রার্থনা।"

বন্দী বলিল, "আমি মিথ্যা বলিব না।"

"সুখী হইলাম। আপনি কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত ?"

"আমি পৌত্তলিক।"

"আপনার ধর্ম্মে অবশ্যই আপনার বিশ্বাস আছে ?"

"বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্ম কি ?"

"মিথ্যা কথা কহা যে মহাপাপ, সকল ধর্ম্মই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বলুন ত, কি উদ্দেশ্যে নিশীথ সময়ে এ শিবিরের দিকে আসিতেছিলেন ?"

"সন্ধান লইতে।"

"কি সন্ধান ?"

"শত্রু-শিবিরে যে সন্ধান পাওয়া যায়, সেই সন্ধান।"

"আপনি কি এজিদ-পক্ষীয় ?"

"আমি দামেস্ক-মহারাজের সেনাপতি। আমার নাম ওত্‌বে অলীদ।"

"ভাল কথা, কিন্তু আমার—"

"আর বলিতে হইবে না, আমি বুঝিয়াছি। আপনার সন্দেহ এখনই দূর করিতেছি। আমরা ছদ্মবেশী হইয়া আসিয়াছিলাম, এই দেখুন উপরিস্থ এ বসন কৃত্রিম।"

ওত্‌বে অলীদ বসন পরিত্যাগ করিলেন। কারুকার্য্য খচিত সৈন্যাধ্যক্ষের বেশ—দোলায়মান অসি বাহির হইল। সভাস্থ সকলে স্থিরচক্ষে অলীদের আপাদমস্তক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

গাজী রহ্‌মান পুনরায় বলিলেন, "আপনি আমাদের মাননীয়। আপনার নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আপনার অনেক বিষয় আমরা

জ্ঞাত আছি। আপনি অতি মহৎ। সেই মহৎ নাম যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার মত কার্য্য করিবেন ?"

"বলুন! আমি যখন বন্দী, আমার জীবন আপনাদের হস্তে; এ অবস্থায় আমার নিজের কি ক্ষমতা আছে যে, তদ্বারা আমি আমার মহত্ব রক্ষা করিব ? অলীদ এখন আপনাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী, আপনাদের দাস।"

"যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনই দেখিলাম। আপনার জীবন যখন আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, তখন আর কোনও চিন্তা নাই! ঈশ্বর আপনার সেই মহত্ব, সেই মান-সম্ভ্রম, জীবন,—সকলই রক্ষা করিবেন। আপনি আমাদের সকলের পূজনীয়।"

"আমিও ভ্রাতৃভাবে পরাভব স্বীকারে এই তরবারি রাখিলাম। এ জীবনে আপনাদের বিনা অনুমতিতে এ হস্তে আর অস্ত্র ধরিব না, এই রাখিলাম!"

অলীদ গাজী রহ্‌মানের সম্মুখে অস্ত্র রাখিয়া দিলেন, গাজী রহ্‌মান বিশেষ আগ্রহে ওত্‌বে অলীদকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সমাদরে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গীদ্বয়ের পরিচয় কি ?"

"দুই জনের মধ্যে একজন আমার সঙ্গী, অপর একজনকে আমি চিনি না। যিনি আমার সঙ্গী, তাঁহার পরিচয় তিনিই দিবেন। যদি তাঁহার কোন কথায় সন্দেহ হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যাহা জানি অবশ্যই বলিব।"

গাজী রহ্‌মানের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় বন্দী (মারওয়ান) প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। সভাস্থ সকলের চক্ষু দ্বিতীয় বন্দীর প্রতি, বন্দীর চক্ষুও সকলের প্রতি। বন্দী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল,—শান্তভাব; রোষ, ঘৃণা, অবজ্ঞার চিহ্নের নাম মাত্র সভায় নাই। পদমর্য্যাদার গৌরব, ক্ষমতার ন্যূনাধিক্য, পরিচ্ছদের জাঁকজমক, উপবেশনের ভেদাভেদ কিছুমাত্র সভায় নাই। সকলেই এক, সকলেই সমান, সকলেই ভ্রাতা। ভ্রাতৃভাব মূলমন্ত্রে ইঁহারাই যেন যথার্থ দীক্ষিত। আরও দেখিল: সভাস্থ প্রায়ই

তাহার অপরিচিত। ক্রমে সকলের চক্ষুর সহিত তাহার চক্ষুর মিলন হইল। আক্কেল আলীর (বাহ্রাম) প্রতি চক্ষু পড়িতেই রোষের সহিত ঘৃণা, উভয়ে একত্র মিশিয়া তাহার চক্ষুকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। সে দিকে চাহিতেই মারওয়ান দেখিল ঃ তাহারই প্রিয় সহচর অলীদ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া হানিফার দলে মিশিয়াছে।

মারওয়ান মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—"একি কথা! বেশ পরিত্যাগ—হানিফার দলে আদৃত—অস্ত্র সভাতলে! একি কথা!"

মারওয়ান অলীদের প্রতি বারবার চাহিতে লাগিল। কিন্তু বীরবরের বিশালচক্ষু অন্য দিকে,—সে চক্ষু মারওয়ানের মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা করিল না। মারওয়ান কি করিবে, কোন উপায়ই নাই ; যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই সহস্র প্রহরী—সেই দিকেই সহস্র শাণিত অস্ত্রের চাকচিক্য।

মারওয়ান মনে মনে বলিল, "তবে কি আর শিবিরে যাইতে পারিলাম না? তবে কি আর মহারাজের সহিত দেখা হইল না? হায়! হায়!! তবে কি দামেস্কের স্বাধীনতা—"

মারওয়ানের মনের কথা শেষ হইতে না হইতেই গাজী রহ্‌মান জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?"

"ধর্ম্মের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন এমন কিছু নহে, তবে মোহাম্মদীয় হইলে আপনি অবধ্য, সহস্র প্রকারে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেও আপনি ভ্রাতা—এক প্রাণ—এক আত্মা—এক হৃদয়।"

"আমি মোহাম্মদের শিষ্য।"

"মিথ্যা কথায় কি পাপ, তাহা বোধ হয় আপনার অজানা নাই; ধর্ম্মমাত্রই মিথ্যার বিরোধী।"

"বিরোধী বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য বিধিও আছে।"

"তবে কি আপনি প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলিলেন?"

"আমি মিথ্যা বলিব না। বিধি আছে, তাই বলিলাম।"

"বলুন, আপনি কে? আর কি কারণে রাত্রে শিবিরে আসিতেছিলেন?"

"আমি পথিক, চাকুরীর আশায় আপনাদের নিকট আসিতেছিলাম।"

"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"আমি মস্কাট হইতে আসিতেছি।"

"আপনার সঙ্গে যাঁহারা ধৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কি আপনার সঙ্গী?"

"আমার সঙ্গী কেহ নাই, আমি তাহাদিগকে চিনি না।"

"এ কি কথা! অলীদ মহামতি কি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন?"

"প্রাণ বাঁচাইতে কে না মিথ্যা বলিয়া থাকে? আমি অলীদকে চিনি না। আমার পূর্ব্বে যদি কেহ কোন কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথাই যে সম্পূর্ণ সত্য, এ কথা আপনাকে কে বলিল?—এ বিশ্বাস আপনার কিসে জন্মিল?"

"কিসে যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস জন্মিল, সে কথা শুনিয়া আপনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি নিতান্তই দুঃখিত হইলাম। এখনই আপনাকে সত্য-মিথ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে পারি, কিন্তু তৃতীয় বন্দীর কথা না শুনিয়া কিছুই বলিব না। অনর্থক আমাদের অস্থির মনকে ভ্রমপথে লইয়া যাইবেন না।"

"আমি ভ্রমপথে লইতেছি না। আপনারা নিজে ভ্রমকূপে পড়িয়াছেন।"

"সে কথা সত্য, কিন্তু একটি মিথাকে সত্য করিয়া পরিচয় দিতে সাতটি মিথ্যার প্রয়োজন। তাহাতেও শ্রোতার মনের সন্দেহ দূর হয় কি না, সন্দেহ। আপনার পরিচয় জানিতে আমাদের বেশী আয়াস আবশ্যক করিবে না; তবে তৃতীয় বন্দীর কথা না শুনিয়া আপনাকে আর কিছুই বলিব না; কিন্তু আপনার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ হইয়াছে।"

এই কথা বলিয়া ইঙ্গিত করিতেই প্রহরিগণ কঠিন বন্ধনে মারওয়ানের হস্তদ্বয় তখনই বন্ধন করিল। গাজী রহ্‌মান পুনরায় বলিলেন, "তৃতীয় বন্দীকে বিশেষ সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে আনিবে, ক্রমেই সন্দেহের কারণ হইতেছে।"

সভামধ্য হইতে ওমর আলী বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিবর! বন্দীর আকার-প্রকারে, কথার স্বরেই, আমি চিনিতে পারিয়াছি কিন্তু বেশ-

পরিবর্ত্তনে একটু সন্দেহ হইয়াছে মাত্র। বন্দীর গাত্রের বসন উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করুন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই বন্দী এজিদের প্রধান মন্ত্রী মারওয়ান। কাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে, হাসি-তামাসা করিতেও বাকী রাখি নাই।"

গাজী রহমানের ইঙ্গিতে প্রহরিগণ মারওয়ানের সেই ছদ্মবেশ উন্মোচন করিতেই মহামূল্য মণিমুক্তা-খচিত বেশের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। ওমর আলী, আক্কেল আলী (বাহ্‌রাম) প্রভৃতি যাহারা বিশেষরূপে মারওয়ানকে চিনিতেন, তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"মারওয়ান!—এই সেই মারওয়ান!"

গাজী রহমান বলিলেন, "কি ঘৃণার কথা! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিবের এই দশা? মারওয়ানের মন এত নীচ! বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহার সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা বলিবেন না। দেখি, তৃতীয় বন্দীর সত্যবাদিতা এবং এই মারওয়ান সম্বন্ধে তিনিই বা কি জানেন। এক্ষণে ইহাকে সভার এক প্রান্তে বিশেষ সতর্কভাবে রাখিতে হইবে।"

মন্ত্রিবরের আদেশে মারওয়ান বন্ধন-দশায় প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সভার এক প্রান্তে রহিল।

এদিকে তৃতীয় বন্দী সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। প্রহরিগণ যে দিকে লইয়া চলিল, তিনি সেই দিকেই ঈশ্বরের নাম লইয়া চলিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাকে গাজী রহমানের সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল।

জয়নাল আবেদীনকে দেখিয়া দরবারের যাবতীয় লোকের মনে যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, সে ভাবের কথা কে বলিবে? সে কথা কে মুখে আনিবে? শত্রুর জন্য মন আকুল, এ কথা কে বলিবে? সকলের মনেই—ঐ ভাব—ঐ স্নেহপূর্ণ পবিত্রভাব—কিন্তু মনের কথা মন খুলিয়া মুখে বলিতে কেহই সাহসী হইলেন না। মোহাম্মদ হানিফা জয়নালের মুখাকৃতি স্থির নয়নে দেখিতে লাগিলেন। কত কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। বন্দীর মুখাকৃতি, শরীরের গঠন দেখিয়া ভ্রাতৃবর

হোসেনের কথা তাঁহার মনে পড়িল। জয়নাল নাম তাঁহার হৃদয়ে জ্বলন্তভাবে জাগিতে লাগিল।

গাজী রহ্মান বিশেষ ভদ্রতার সহিত বলিলেন, "আপনার পরিচয় দিয়া আমাদের মনের ভ্রান্তি দূর করুন।"

জয়নাল আবেদীন সভাস্থ সকলকে অভিবাদন করিয়া বিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন, "আমার পরিচয়ের জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। আমার প্রার্থনা এই যে, আর দুইজন যাঁহারা আমার সঙ্গে ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই স্থানে আসিতে অনুমতি করুন।"

গাজী রহ্মান একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বন্দীদ্বয় এই সভামধ্যেই আছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন, তাহা স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে।"

আমার প্রয়োজন অনেক। তবে গত রাত্রে আমার সহিত যখন তাঁহাদের দেখা হয়, তখন একজনকে আমি বিশেষরূপে চিনিয়াছি। কিন্তু রাত্রের দেখা, তাই কিছু সন্দেহ আছে।"

"তবে আপনি তাঁহাদের সঙ্গী নহেন?"

"আমি কাহারও সঙ্গী নহি—নিরাশ্রয়।"

গাজী রহ্মান অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখুন, ঐ এক বন্দী।"

জয়নাল আবেদীন ওত্‌বে অলীদকে কার্‌বালার প্রান্তরে দেখিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি ইহাকে ভালরূপ চিনিতে পারিলাম না। আমি যে পাপাত্মা জাহান্নামীর কথা বলিয়াছি, নিশীথ সময় সেই প্রস্তর-খণ্ডের নিকট যাহাকে দেখিয়াছি, চাকুরী করিতে সে মদিনা হইতে দামেস্কে আসিতেছে, তাহাও শুনিয়াছি—তাহাকেই আমার বেশী প্রয়োজন।"

গাজী রহ্মানের আদেশে প্রহরীগণ বন্ধন-অবস্থায় মারওয়ানকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "রে পামর! তোকে গত নিশীথেই চিনিয়াছিলাম। চিনিয়া কি করিব, আমি নিরস্ত্র।"

মারওয়ান বন্দী অবস্থাতেই বলিল, "আমি সশস্ত্র থাকিয়াই বা কি করিলাম। কি ভ্রম! কি ভ্রম!! সুযোগ সুবিধামত তোমাকে পাইয়াও যখন আমার এই দশা, তখন আর আশা কি? কি ভ্রম!"

"ওরে নরাধম! ঈশ্বর কি না করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষমতা তুই কি বুঝিবি পামর?"

"আমি বুঝি বা না বুঝি, মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। যদি চিনিতাম যে তুমিই—"

সভাস্থ সকলে মহা চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিতেই গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিয়া জয়নাল আবেদীন বলিতে লাগিলেন, "সভাস্থ মহোদয়গণ! আমার পরিচয়—"

"আমার পরিচয়" এই দুইটি শব্দ জয়নালের মুখ হইতে বহির্গত হইতেই সকলে নীরব হইলেন। সকলেই সমুৎসুকে জয়নালের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

জয়নাল বলিলেন, "আমরা এক সময়ে বন্দী—অথচ পরস্পর শত্রুভাব, ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। অগ্রে এই পাপাত্মার পরিচয় দিয়া শেষে আমার কথা বলিতেছি। ইহার নাম জগৎরাষ্ট্র। এই পাপাত্মার মন্ত্রণাতেই মহাত্মা হাসানবংশের একেবারে বিনাশ! প্রভু হোসেনের বংশও সমূলে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন! সে কথা এই দুরাচার নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে।--"কি ভ্রম! কি ভ্রম!!" ঐ ভ্রমই মঙ্গলের মূল কারণ। এই নরাধমই সকল ঘটনার মূল। সেই সকল সাংঘাতিক ঘটনার বিষয় যাহা আমি মাতার নিকট শুনিয়াছি, আর যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি আপনাদের নিকট বিচার-প্রার্থী।"

সভাস্থ সকলে বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। জয়নাল গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই নরাধম, এই পাপাত্মাই এজিদ-পক্ষ হইতে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া মহাত্মা হাসানের নিকট মক্কা-মদিনার কর চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। এই পামরই হাসানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে, পবিত্রভূমি মদিনার স্বাধীনতাসূর্য্য হরণ করিয়া চির পরাধীনতার অন্ধকার অমানিশায় আবদ্ধ

করিতে সসৈন্যে মদিনায় আসিয়াছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এই পামরই মায়মুনার সহযোগে জাএদার সাহায্যে হীরকচূর্ণ দ্বারা মহাত্মা হাসানের জীবন অকালে বিনাশ করিয়াছে।. এই দুরাচারই কুফা নগরে আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে টাকায় বশীভূত করিয়া মহাবীর মোস্লেমের জীবন মিথ্যা ছলনায় কৌশলে শেষ করিয়াছে। এই নারকীই কার্বালা প্রান্তরে মহা সংগ্রাম ঘটাইয়াছে ; কৌশলে ফোরাত-কূল বন্ধ করিয়া শত সহস্র যোদ্ধাকে শুষ্ককণ্ঠ করিয়া বিনাশ করিয়াছে। কি দুঃখের কথা! তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকেরও বক্ষ ভেদ করাইয়া সে জগৎ কাঁদাইয়াছে।—অন্যায় যুদ্ধে মহাবীর আবদুল ওহাবকে বধ করিয়াছে। কত বলিব, এই পাপাত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর—।"

জয়নালের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। পুনরায় করুণস্বরে তিনি বলিলেন, "আরবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর কাসেমের জীবন-লীলা এই দুরাত্মাই শেষ করিয়াছে। এই পাপাত্মাই পতিপরায়ণা সখিনার আত্মহত্যার কারণ। আর কত বলিব! এই জাহান্নামী কাফের মারওয়ানই পুণ্যাত্মা পিতা প্রভু হোসেনের জীবন—"

জয়নালের মুখে আর কথা সরিল না,—চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিতে লাগিল। মোহাম্মদ হানিফা হৃদয়-বেগ সম্বরণে অধীর হইয়া—"হা ভ্রাতঃ হাসান! হা ভ্রাতঃ হোসেন! বাবা জয়নাল! হানিফার অন্তরাত্মা শীতল কর্ বাপ্!" এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জয়নালকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহার শোকাবেগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সভাস্থ আর আর সকলে ক্রোধে, রোষে, দুঃখে, শোকে এক প্রকার জ্ঞানহারা উন্মাদের ন্যায় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি সেই মারওয়ান? এ কি সেই মারওয়ান? মার শয়তানকে! ভাই সকল, আর দেখ কি?"

গাজী রহ্মান বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও সভাস্থ সকলের সেই উগ্রমূর্ত্তি, সেই বিকট ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না; শেষে মোহাম্মদ হানিফার কথা পর্য্যন্তও কেহ গ্রাহ্য করিল না। "মার শয়তানকে!" বলিতে বলিতে পাদুকাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, অস্ত্রাঘাত, যত প্রকার আঘাত প্রচলিত আছে, বজ্রাঘাতের ন্যায় মারওয়ানের শরীরে

পড়িতে লাগিল! চক্ষের পলকে মারওয়ানের দেহ ধূলায় লুটাইয়া শোণিত-ধারায় সভাতল রঞ্জিত করিল।

মারওয়ান অস্ফুটস্বরে বলিল, "জয়নাল আবেদীন! আমি তোমার ভালও করিয়াছি—মন্দও করিয়াছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কিন্তু সম্মুখে মহা ভীষণ রূপ! এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই। আমাকে রক্ষা কর।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "মারওয়ান! ঈশ্বরের নাম কর, এ সময়ে তিনি ভিন্ন রক্ষার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। জ্বলন্ত বিশ্বাসের সহিত সেই দয়াময়ের নাম মুখে উচ্চারণ কর। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

মারওয়ান আর্ত্তনাদ সহকারে বিকৃতস্বরে বলিল, "আমি মারওয়ান, আমি মারওয়ান, দামেস্ক-রাজমন্ত্রী মারওয়ান! আমাকে মারিও না, দোহাই তোমাদের, আমাকে মারিও না! অগ্নিময় লৌহদণ্ডে আমাকে আঘাত করিও না! আমি ও-অগ্নিসমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারিব না! আমি মিনতি করিয়া দু'খানি পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, ও-অগ্নি-সমুদ্রে আমাকে নিক্ষেপ করিও না। দোহাই তোমাদের, রক্ষা কর! দোহাই তোমাদের, আমাকে রক্ষা কর! আমি এজিদের প্রধান মন্ত্রী—আমাকে আর মারিও না। প্রাণ গেল! আমি যাইতেছি! ঐ আগুণে প্রবেশ করিতেছি,—রক্ষা কর!"

বিকট চিৎকার করিতে করিতে মারওয়ানের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে অদৃশ্যভাবে উড়িয়া গেল। রক্তমাখা দেহ সভাতলে পড়িয়া রহিল! মোহাম্মদ হানিফা গাজী রহ্‌মান, ওমর আলী, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এখন আর চিন্তা কি? এখন প্রস্তুত হও। যাহার জন্য আমি এতদিন সঙ্কুচিত ছিলাম, যাহার জীবন আশঙ্কা করিয়া এতদিন নানা সন্দেহে সন্দিহান হইয়াছিলাম, আজ সে জীবনের জীবন,—নয়নের পুত্তলি,—হৃদয়ের ধন,—অমূল্য নিধি হস্তে আসিয়াছে। ঈশ্বর আজ তাহাকে আমাদের হস্তগত করাইয়াছেন, আর ভাবনা কি? এখনই প্রস্তুত হও। এখনই সজ্জিত হও। এখনই এজিদ-বধে যাত্রা

করিব। শুন, ঐ শুন, এজিদ-শিবিরে যুদ্ধের বাজনা বাজিতেছে। গাজী রহ্‌মানের স্বীকৃত বাক্য রক্ষা হইল।—ঈশ্বরই চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বও এখন আর সহ্য হইতেছে না, শীঘ্র প্রস্তুত হও। অদ্যই দুরাত্মার জীবন শেষ করিয়া পরিজনদিগকে বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধার করিব।"

সকলে মনের আনন্দে যুদ্ধসাজে ব্যাপৃত হইলেন। মোহাম্মদ হানিফা জয়নালকে ওত্‌বে অলীদের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এই অলীদ কোন সময় বলিয়াছিলেন ঃ এজিদের জন্য অনেক করিয়াছি। হাসান-হোসেনের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি! আমি উহা পারিব না। সেই কথা কয়েকটা আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। আমি সেই কারণেই ইঁহাকে মস্‌হাব কাক্কার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। এই অলীদ যদি এ প্রকারে আমাদের হস্তগত না হইতেন, তাহা হইলেও আমি কখনই ইঁহার প্রাণের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইতাম না, সজ্ঞানে কাহাকেও আক্রমণ করিতে দিতাম না। এই মহাত্মা প্রকাশ্যে পৌত্তলিক—অন্তরে মুসলমান।"

জয়নাল আবেদীন বলিলেন, "আর প্রকাশ্য ও গোপন, এই দ্বিভাবের প্রয়োজন কি?"

অলীদ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "হজরত! আমি অকপটে বলিতেছি, আপনি আমাকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।"

জয়নাল 'বিস্‌মিল্লাহ!' বলিয়া ওত্‌বে অলীদকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অলীদ্-অন্তরে সেই সত্যধর্ম্মের জ্বলন্ত বিশ্বাস, "ঈশ্বর এক—সেই এক ভিন্ন আর উপাস্য নাই" অক্ষয়রূপে নিহিত হইল।

মোহাম্মদ হানিফা অলীদকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। নূরনবী মোহাম্মদের প্রতি অটল ভক্তি হউক, দয়াময় আপনাকে জেন্নাতবাসী করুন,—এই আশীর্ব্বাদ করি।"

জয়নাল আবেদীনও অলীদের পরকাল উদ্ধার-হেতু অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে মহাঘোর নিনাদে যুদ্ধ-বাজনা বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ মনের আনন্দে সজ্জিত হইয়া শিবির-বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর আলী, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি মনোমত বেশভূষায় ভূষিত ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া জয়নাল আবেদীনকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মোহাম্মদ হানিফা বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আজ সকলকেই ভ্রাতৃ সম্বোধনে বলিতেছি ঃ আমাদের বংশের সমুজ্জল রত্ন এমাম-বংশের মহামূল্য মণি, মদিনার রাজা প্রাণাধিক জয়নাল আবেদীনকে ঈশ্বর কৃপায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্যৎ ভাবনা, জয়নালের জীবনের আশঙ্কা সদাচিন্তিত অন্তর হইতে দূর হইয়া এক্ষণে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। এ নিদারুণ দুঃখ-সিন্ধু হইতে শীঘ্রই উদ্ধার পাইবার ভরসাও হৃদয়ে জন্মিয়াছে। আজ হৃদয়ে মহাতেজ প্রবেশ করিয়াছে, আনন্দে বক্ষ স্ফীত হইয়া বাহুদ্বয় মহাবলে বলীয়ান বোধ হইতেছে। ভ্রাতৃগণ! আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, প্রকৃতি আজ আমাদের সানুকূলে থাকিয়া অলক্ষিতভাবে নানাবিধ শুভ চিহ্ন, শুভযাত্রার শুভ লক্ষণ দেখাইতেছেন। নিশ্চয় আশা হইতেছে যে, এই যাত্রায় এজিদ-বধ করিয়া পরিজনবর্গকে বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। ভ্রাতৃগণ, এই শুভ সময়ে, এই আনন্দোচ্ছ্বাস সময়ে আমার একটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি, জগৎপূজিত মদিনার সিংহাসন আজ সজীব করি। আমাদের সকলের নয়নের পুত্তলি, জগতের যাবতীয় মোস্‌লেম চক্ষের পুত্তলি, হৃদয়ের ধন, অমূল্য মণিকে আমরা ভক্তির সহিত আজই শিরে ধারণ করি। ভ্রাতৃগণ! মনের হর্ষে প্রাণাধিক জয়নাল আবেদীনকে আজই এই স্থানে—এই দামেস্ক-প্রান্তরে মদিনার রাজপদে অভিষিক্ত করি।"

সমস্বরে সম্মতিসূচক আনন্দ-ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে গগন আচ্ছন্ন করিল। মোহাম্মদ হানিফা 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া রাজমুকুট, মণি-মুক্তাখচিত তরবারি জয়নাল আবেদীনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। ওমর আলী, মসহাব কাক্কা, গাজী রহ্‌মান প্রভৃতি যথারীতি অভিবাদন করিয়া ঈশ্বরের

গুণানুবাদ করিতে করিতে জয়নাল আবেদীনের জয়-ঘোষণা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন রাজগণ নতশিরে অভিবাদন করিয়া উপঢৌকনাদি জয়নালের সম্মুখে রাখিয়া অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। মদিনা এবং নানা দেশ-বিদেশের সৈন্যগণ অবনত মস্তকে নবীন রাজার সম্মুখে অস্ত্রাদি রাখিয়া সমস্বরে মদিনা-সিংহাসনের জয়ঘোষণা করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এখন সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র পুনর্ধারণ করিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম, তার পর নূরনবী মোহাম্মদের নাম এবং সর্ব্বশেষে নবীন ভূপতির জয়-ঘোষণা করিয়া বীরদর্পে দণ্ডায়মান হও।"

হানিফার কথা শেষ না হইতেই গগনভেদী শব্দ হইল। ঈশ্বরের নামের পর, নূরনবী মোহাম্মদের প্রশংসার পর, "জয় মদিনার সিংহাসনের জয়,—জয় নবীন ভূপতির জয়,—জয়নাল আবেদীন মহারাজের জয়" এই শব্দ হইতে লাগিল।

আবার মোহাম্মদ হানিফা বীরদর্পে বীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এই অসি ধারণ করিলাম, বীরবেশে সজ্জিত হইলাম,—এজিদ-বধ না করিয়া আর ফিরিব না—তরবারি কোষে আবদ্ধ করিব না; যতদিন এজিদ বধ ও পরিজনগণের উদ্ধার না হয়, ততদিন এই বেশ—এই বীর-বেশ অঙ্গে থাকিবে। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গী, আমিও আজ সৈন্য, আমিও আজ জয়নালের আজ্ঞাবহ। সকলেরই আজ এই প্রতিজ্ঞা—এই যাত্রাতেই হয় এজিদ-বধ, না হয় আমাদের জীবনের শেষ। দিবা হউক, নিশা আগমন করুক, আবার সূর্য্যের উদয় হউক,—এজিদ-বধ! এজিদ-বধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এই বেশ—এই বীর-বেশ! আমরা বিশ্রামের নাম করিব না, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিব না, পশ্চাৎ হটিব না—জীবন পণ—হানিফার জীবন পণ,—এজিদ-বধ! সকলেরই এজিদ-বধে জীবন পণ। আজিকার যুদ্ধে বিচার নাই, ব্যূহ নাই, কোন প্রকার বিধি-ব্যবস্থাও নাই: মার কাফের, জ্বালাও শিবির!—কাহারও অপেক্ষা কেহ করিবে না, কাহারও উপদেশ প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখিবে না। আজ সকলেই সেনাপতি—সকলেই সৈন্য। সকলের মনে যেন এই কথা মুহূর্ত্তে

মুহূর্ত্তে জাগিতে থাকে,—মহাত্মা হাসান-হোসেন পরিজনগণের উদ্ধারসাধন করিতে জীবন পণ,—দামেস্করাজ্য সমভূমি করিতে জীবন পণ!"

"ভ্রাতৃগণ! মনে কর, আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন এবং শেষ সময়। শত্রুদল চক্ষে দেখা ভিন্ন আপন সহযোগী, সাহায্যকারী সৈন্য-সামন্ত প্রতি—এমন কি, স্ব স্ব শরীর প্রতি কেহ লক্ষ্য করিবে না। আজ হাসানের শোক, হোসেনের শোক, এই তরবারিতে নিবারণ করিব। সে আগুন এই শাণিত অস্ত্রের সাহায্যে এজিদ-শোণিতে আজ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিব। আজ কাফেরের দেহ-বিনির্গত শোণিতে লোহুর নদীর বহাইব,—মরুভূমে রক্তের প্রবাহ ছুটাইব। শত্রুর মনঃকষ্ট দিতে আজ কাহারও বাধা মানিব না—কোন কথা শুনিব না। ঐ জাহান্নামী কাফের মারওয়ানের মস্তক কাটিয়া একটি বর্শায় বিদ্ধ কর। পাপীর দেহ শতখণ্ডে খণ্ডিত কর। মস্তক ও খণ্ডিত দেহসকল বর্শাগ্রে বিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাও এবং মুখে মুখে বল, "এই সেই কাফের মারওয়ান! এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান!! এই সেই এজিদের প্রিয় সখা মারওয়ান!!!"

হানিফার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই মদিনাবাসী কয়েকজন নবীন যোদ্ধা, অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুটিয়া আসিয়া, "এই সেই মারওয়ান! এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান!! এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান!!! এই সেই নরাধম পিশাচ!!!!" ইত্যাদি শত শত প্রকার সম্বোধন করিয়া, চক্ষুর নিমিষে মারওয়ানের দেহ—এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে গণিয়া শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। মস্তক ও খণ্ডিত দেহসকল বর্শার অগ্রে বিদ্ধ করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব হইল না।

মোহাম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আজ হানিফা এই অস্ত্র ধরিল! পুনরায় বলিতেছি, ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—এজিদ-বধ না করিয়া এ অস্ত্র আর কোষে রাখিব না। ভ্রাতৃগণ! আমার অসহায় পরিজনদিগের কথা মনে করিও,—এই আমার প্রার্থনা। গাজী রহমান উপযুক্ত সৈন্য লইয়া জয়নাল আবেদীন সহ আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাকুন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ফিরিব না। আর শিবিরের আবশ্যক নাই।

বিশ্রাম-উপযোগী দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। জীবনরক্ষা হইলে আজই সুবিস্তৃত দামেস্ক-রাজ্য লাভ হইবে। জয়নালকে দামেস্ক-সিংহাসনে বসাইতে পারিলে বিশ্রাম-বিলাস সকলই পাইব। আর যদি জীবন শেষ হয়, তবে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইবে না। ভাঙ্গ শিবির, লুটাও জিনিষ।”

এই কথা বলিয়া মোহাম্মদ হানিফা অশ্বারোহণ করিলেন। সকলে সমস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়া ঘোরনাদে মহারাজ জয়নালের জয়-ঘোষণা করিয়া, দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মারওয়ানের খণ্ডিতদেহ একশত বর্শায় বিদ্ধ হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। শিবিরের বাহির হইয়া পুনরায় ভীমনাদে ঈশ্বরের নাম করিয়া সকলে এজিদ-বধে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে শত শত বর্শাধারী সমস্বরে বলিতে লাগিল, “এই সেই কাফের মারওয়ান! এই সেই মন্ত্রী মারওয়ান!! এই সেই এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান!!!” আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের নাম এবং নবীন রাজার জয়ধ্বনিতে দামেস্ক-প্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল।

এজিদের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মস্তক ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের বেদনাও আছে।—শরীর অলস, স্ফূর্ত্তি-বিহীন, দুর্ব্বল। নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, শয্যা হইতে তিনি উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। কিন্তু উপস্থিত ভীষণ শব্দ কর্ণকূহরে প্রবেশ করিতেই এজিদ সেই আরক্তিম নয়নে পরিশুষ্ক মুখে বিকৃত মস্তকে শয্যা হইতে চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার অন্তর কাঁপিতে লাগিল। মহা অস্থির হইয়া শিবিরদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, মহাসঙ্কটকাল উপস্থিত। কোথায় মারওয়ান? কোথায় অলীদ? এ দুঃসময়ে কাহারও সন্ধান নাই! ওমর ও অন্যান্য সেনাপতিগণ আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। রাত্রের ঘটনার আভাস দিতে সমুদয় কথা এজিদের মনে হইল। বীরদর্পে তিনি বলিতে লাগিলেন, “ওমর! তুমিই আজ প্রধান সেনাপতি। চিন্তা কি? মারওয়ান গিয়াছে, অলীদ গিয়াছে, এজিদ আছে! চিন্তা কি? যাও যুদ্ধে! দাও বাধা—মার হানিফাকে! তাড়াও মুসলমান! ধর তরবারি! আমি এখনি আসিতেছি, আজ হানিফার যুদ্ধ-সাধ, জীবনের সাধ এখনি মিটাইতেছি।”

ওমর শিবিরের বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ব হইতেও তুমুলরবে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিল। মনের উৎসাহে—আনন্দে সৈন্যগণ বিষম বিক্রমে দণ্ডায়মান হইল। এদিকে এজিদ স্বসাজে,—মণিময় বীরসাজে সজ্জিত হইয়া শিবিরের বাহির হইয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ! মারওয়ানের জন্য দুঃখ নাই, অলীদের কথা তোমরা কেহ মনে করিও না। আমার সৈন্যাধ্যক্ষ মধ্যে বিস্তর অলীদ, বহু মারওয়ান এখনও জীবিত রহিয়াছে। কোন চিন্তা নাই। বীর-বিক্রমে আজ হানিফাকে আক্রমণ কর। আমিই আজ পৃষ্ঠপোষক। এজিদের সৈন্য-বিক্রম, হানিফার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসান দেখিয়াছে,—কারবালা-প্রান্তরে হোসেন দেখিয়াছে, আর আমি আজ দামেস্ক-প্রান্তরে হানিফাকে দেখাইব। মার হানিফা! মার বিধর্ম্মী! তাড়াও মুসলমান! উহারা বিষম বিক্রমে আসিতেছে, আমরাও মহাপরাক্রমে আক্রমণ করিব। হানিফার যুদ্ধের সাধ আজই মিটাইব। সমস্বরে দামেস্ক-সিংহাসনের বিজয়-ঘোষণা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও।"

এজিদ মহাবীর। এজিদের সৈন্যগণও অশিক্ষিত নহে—প্রভুর সাহসসূচক বচনে উত্তেজিত হইয়া বীরদর্পে তাহারা পদবিক্ষেপ করিতে লাগিল। আজিকার যুদ্ধ চমৎকার! কোন দলে ব্যূহ নাই, শ্রেণীভেদ নাই—আত্মরক্ষার জন্যও কেহ দণ্ডায়মান হয় নাই। উভয় দলেরই অগ্রসর—উভয় দলেরই সম্মুখে গমনের আশা।

এজিদ সৈন্যদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন এবং সুযোগ মত হানিফার সৈন্যদলের আগমন দেখিতেছেন—অগণিত সৈন্য, সর্ব্বাগ্রে বর্শাধারী। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন—মানব-শরীরের খণ্ডিত অংশসকল বর্শায় বিদ্ধ এবং শুনিলেন—বর্শাধারীগণের মুখে একই কথা, "এই সেই মারওয়ান! প্রধান মন্ত্রী মারওয়ান!! এজিদের প্রিয়সখা মারওয়ান!!!" এজিদ সকলই বুঝিলেন, মনে মনে দুঃখিতও হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে দুঃখ-চিহ্ন কেহ দেখিতে পাইল না, তাঁহার হাবভাবেও কেহ বুঝিতে পারিল না। সদর্পে তিনি বলিলেন, "সৈন্যগণ! মারওয়ানের খণ্ডিতদেহ দেখিয়া কেহ ভীত হইও না, হাতে পাইয়া সকলেই সকল কার্য্য করিতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র

পদবিক্ষেপ কর, বজ্রনাদে আক্রমণ কর, অশনিবৎ অস্ত্রের ব্যবহার কর। আমরাও গাজী রহ্‌মানের দেহ সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া শৃগাল কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইব। কর আঘাত! কর আঘাত!!"

যেমনি সম্মিলন, অমনি অস্ত্রের বর্ষণ। কি ভয়ানক যুদ্ধ! কি ভীষণ কাণ্ড!! প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় অস্ত্র, প্রান্তরময় সমর! উভয় দলেরই আঘাত প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। অসি, বর্শা, খঞ্জর, তরবারি—সকলই চলিল। কি ভয়ানক ব্যাপার! যে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, সেই-ই তাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। পরিচয় নাই, পাত্রাপাত্র প্রভেদ নাই। সম্মিলন-স্থলে উভয় দলে যে বাধা জন্মিয়াছে, তাহাতে কোন পক্ষেরই আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হইতেছে না। কেবল সৈন্যক্ষয়—বলক্ষয় হইতেছে মাত্র। ওমর আলী, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু টি'কিতে পারিতেছেন না। মোহাম্মদ হানিফা এখনও তরবারি ধরেন নাই, কেবল সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতেছেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভৈরব নিনাদে দামেস্ক-প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। সৈন্যগণ সময় সময় "আল্লাহু আকবর" শব্দ করিয়া গগন পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

এখনও মোহাম্মদ হানিফা তরবারি ধরিলেন না। দুল্‌দুলে কশাঘাত করিয়া তিনি কেবল সৈন্য-শ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া দেখিতেছেন। যেখানে একটু মন্দভাবে তরবারি চলিতেছে, সেইখানেই—সেই দলেই তিনি পৃষ্ঠপোষক হইয়া দুই চারিটি কথা কহিয়া কাফের-বধে উৎসাহ দিতেছেন। কি লোমহর্ষণ সমর! কি ভয়ানক সমর!! বিনা মেঘে বিজলী খেলিতেছে (অস্ত্রের চাকচিক্য), হুহুঙ্কারে গর্জ্জন হইতেছে (উভয় দলের সৈন্যগণের বিকট শব্দ), অজস্র শিলার বর্ষণ হইতেছে (খণ্ডিত দেহ), মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে (দেহ-নির্গত রুধির)—কি দুর্দ্ধর্ষ সমর!

বেতনভোগী সৈন্যগণ—ইহারা হানিফার কে, এজিদেরই বা কে? হায় রে অর্থ! হায় রে হিংসা! হায় রে ক্রোধ! হানিফার সৈন্যগণ আজ অজ্ঞান; মদিনাবাসীরা বিহ্বল; পদতলে—অশ্ব-পদতলে নরদেহ, নরশোণিত! ক্রমেই খণ্ডিত দেহ, খণ্ডিত অশ্ব,—বিষম সমর!

দৈবাধীন ওত্‌বে অলীদ আর ওমরের যুদ্ধের কি চমৎকার দৃশ্য! এ দৃশ্য কে দেখিবে? ঈশ্বরের মহিমায় যাহার অণুমাত্র সন্দেহ আছে, সেই-ই দেখিবে। কাল- ভ্রাতৃভাব, আজ শত্রুভাব,—এ লীলার অন্ত মানুষে কি বুঝিবে? ওমর বলিল, "নিমকহারাম! নিশীথ সময়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া শত্রুদলে মিশিলি? প্রভাত হইতে না হইতেই আশ্রয়দাতা, পালনকর্ত্তা, তোর চির উপকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলি? ধিক্ তোর অস্ত্রে! ধিক্ তোর মুখে! নিমকহারাম! ধিক্ তোর বীরত্বে।"

ওত্‌বে অলীদ বলিলেন, "ভ্রাতঃ ওমর! ক্রোধে অধীর হইয়া নীচত্ব প্রকাশ করিও না, যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কটু বাক্য ব্যবহার করিও না। ছিঃ ছিঃ! তুমি না প্রবীণ—প্রাচীন? সময়-গুণে তোমার কি মতিভ্রম ঘটিল? ছিঃ ছিঃ ভ্রাতঃ! স্থির ভাবে কথা বল, কথায় অনিচ্ছা হয়, অস্ত্রের দ্বারা সদালাপ কর।"

"তোর সঙ্গে কথা কি? তুই বিশ্বাসঘাতক! তুই নিমকহারাম! তুই বীরকুলের কুলাঙ্গার!"

"দেখ ভাই ওমর! আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, নিমকহারাম নহি, কুলাঙ্গারও নহি। মারওয়ানের সঙ্গে আমি বন্দী হইয়াছিলাম। পরাভব স্বীকারে আত্মসমর্পণ করিয়া সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সেই একেশ্বরের জ্বলন্ত ভাব আমার হৃদয়ে নিহত হইয়াছে, চক্ষের উপরে ঘুরিতেছে। তাই বিধর্ম্মী মাত্রেই আমার শত্রু; দেখিলেই বধের ইচ্ছা হয়; কারণ,—সেই-ই নরাকার পশু, যে নিরাকার ঈশ্বরকে সাকারে পূজা করে। আবার যাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার মিত্র—মিত্র, তাঁহার শত্রু—পরম শত্রু। আর কি বলিব? তোমাকে গালি দিব না। তোমার কার্য্য তুমি কর, আমার কার্য্য আমি করি।"

দুই জনে কথা হইতেছে, এমন সময় এজিদ ওমরের নিকট দিয়া যাইতেই অলীদকে দেখিয়া অশ্ব-বল্গা ফিরাইলেন।

ওমর বলিতে লাগিল, "বাদশাহ্-নামদার! দেখুন আপনার প্রধান সেনাপতির বীরত্ব দেখুন!"

এজিদ দুঃখিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "অলীদ! এতদিন এত যত্ন করিলাম, পদবৃদ্ধি করিলাম, কত পারিতোষিক দান করিলাম, কত অর্থ সাহায্য করিলাম; তাহার প্রতিফল—তাহার পরিণাম-ফল বুঝি ইহাই হইল ?"

"আমি নিমকহারামী করি নাই, কোন লোভের বশীভূত হইয়া আপনার শত্রুদলে মিশি নাই। শত্রু-শিবিরে যাইতেছিলাম—দৈব নির্ব্বন্ধে ধরা পড়িলাম। কি করি, পরাভব স্বীকার করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। পরকালের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিতেই আজ কাফের-বধে অগ্রসর হইয়াছি —অস্ত্র ধরিয়াছি।"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন, "ওমর! এখনও অলীদ-শির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।"

এজিদ ওমরকে সজোরে পশ্চাতে রাখিয়া অলীদের প্রতি আঘাত করিলেন। কি দৃশ্য! কি চমৎকার দৃশ্য!!

অলীদ সে আঘাত বর্ম্মে উড়াইয়া বলিলেন, "আমি আপনার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। বিশেষতঃ, মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা, যিনি আজ স্বয়ং যুদ্ধভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি-পদে বরিত হইয়াছেন, তাঁহার নিষেধ আছে।"

এজিদ বলিলেন, "ওরে মূর্খ! এক রাত্রি মূর্খদলের সহবাসে থাকিয়াই তোর দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে! স্বয়ং রাজা সেনাপতি! তবে বরিত হইল কে ? রাজ-মুকুট শোভা পাইল কাহার শিরে ? রাজা স্বয়ং যুদ্ধে আসিলে ক্ষতি কি ?—সেনাপতির উপাধি লইয়া স্বয়ং রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া থাকে রে বর্ব্বর ?"

"এজিদ-নামদার! আমি বর্ব্বর নহি। রাজা সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন না, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। মোহাম্মদ হানিফা তাঁহার রাজ্যের রাজা, মদিনার তিনি কে ?"

"মদিনায় আবার কোন্ রাজার আবির্ভাব হইল ?"

"মহাশয়, যিনি মদিনার রাজা,—তিনিই দামেস্কের রাজা,—তিনিই

মুসলমান রাজ্যের রাজা—সেই রাজরাজেশ্বর, মহারাজাধিরাজ আজ রাজপদে বরিত হইয়াছেন। রাজমুকুট তাঁহারই শিরে শোভা পাইতেছে, রাজ-অস্ত্র তাঁহারই কটিদেশে ঝুলিতেছে।"

"অলীদ, তোমার বুদ্ধি এরূপ না হইলে ভিখারীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে কেন? আমি শুনিয়াছি, মোহাম্মদ হানিফাকে মদিনার লোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সমগ্র মুসলমান-রাজ্য মোহাম্মদ হানিফার নামে কম্পিত হয়,—কেমন নূতন ধার্ম্মিক?"

"ধর্ম্মের সঙ্গে হাসি-তামাসা কেন? আপনার জ্ঞান থাকিলে কি আজ হানিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ডঙ্কা বাজাইতে পারিতেন? আপনি মন্ত্রীহারা, জ্ঞানহারা, আত্মহারা হইয়াছেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই রাজ্যহারাও হইবেন। আপনার জীবন হরণের জন্য মহাবীর হানিফা আছেন। আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যাহা, তাহার কথা বলিলাম। বলুন, আজিকার যুদ্ধে স্বার্থ কি?"

"হানিফার জীবন-শেষ, জয়নাল আবেদীন-বধ—মদিনার সিংহাসন-লাভ। আর স্বার্থের কথা কি শুনিবে? সে স্বার্থ অন্তরে, হৃদয়ে,—চাপা।"

"ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলই চাপা থাকিবে। আর মুখে যাহা বলিবেন, তাহাই কেবল মুখে থাকিবে। বলুন ত মহাশয়, জয়নাল আবেদীনকে কি প্রকারে বধ করিবেন!"

"কেন, বন্দীর প্রাণবধ করিতে আর কথা কি?"

"তবে বুঝি রাত্রের কথা মনে নাই? থাকিবে কেন? কথাগুলি পেয়ালায় গুলিয়া পেটে ঢালিয়াছেন!"

এজিদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, মনে হইয়াছে; জয়নাল বন্দীগৃহ হইতে পলাইয়াছে। আমার রাজ্যে—সে যাবে কোথায়?"

"যেখানে যাইবার সেখানেই গিয়াছেন। ঐ শুনুন, সৈন্যগণ কাহার জয়-ঘোষণা করিতেছে।"

"জয়নাল কি হানিফার সঙ্গে মিশিয়াছে?"

"আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, মোহাম্মদ হানিফা আজ সেনাপতি,

সৈন্যগণ সহস্রমুখে প্রতি মুহূর্ত্তে নব ভূপতির জয় ঘোষণা করিতেছে। আর কি শুনিতে চাহেন?"

এজিদ মহাব্যস্তে বলিলেন, "অলীদ! তুমি আমার চিরকালের অনুগত, অধিক আর কি বলিব, ঐ দিকে যখন গিয়াছ, তখন মন ফিরাও, হানিফার সৈন্য-শিরেই তোমার অস্ত্র বর্ষিতে থাকুক। আর কি বলিব, আমার এই শেষ কথা—আমি তোমাকে দামেস্ক-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্বপদ দান করিব।"

"ও কথা মুখে আনিবেন না। আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করুন, না হয় আমার অস্ত্রের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাউন। আমি জয়নাল আবেদীনের দাস—মোহাম্মদ হানিফার আজ্ঞাবহ। আপনার মন্ত্রী হইয়া লাভ যাহা, তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। ঐ দেখুন, বর্শার অগ্রভাগ দেখুন, আপনার এক মন্ত্রী একশত মারওয়ান-রূপ ধারণ করিয়া বর্শার অগ্রভাগে বসিয়া আছে।"

এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, "নিমকহারাম, কমজাৎ, কমিন্! আমার সঙ্গে তামাসা? ইহকালের মত তোর কথা কহিবার পথ বন্ধ করিতেছি।" এই বলিয়া সজোরে অলীদ শির লক্ষ্য করিয়া তিনি আঘাত করিলেন। অলীদ সে আঘাত বামহস্তস্থিত বর্শাদণ্ড দ্বারা উড়াইয়া দিতেই, ওমর অলীদের গ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিল। বহু দূর হইতে ওমর আলী এই ঘটনা দেখিয়া নক্ষত্রবেগে অলীদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, এজিদ ও ওমর উভয়েই অলীদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন।

ওমর আলী চক্ষু ঘুর্ণিত করিয়া কহিলেন, "এজিদ! এ দিকে কেন? মোহাম্মদ হানিফার দিকে যাও! সে দিনও দেখিয়াছ, আজিও বলিতেছি, তোমার প্রতি কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। তোমার শোণিতে হানিফার তরবারি রঞ্জিত হইবে। যাও, সে দিকে যাও,—আজ—"

ওমর আলীর কথা শেষ হইতে না হইতেই, ওমর অলীদ প্রতি দ্বিতীয় আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে এজিদ অলীদের অশ্বকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত পার করিয়া দিলেন। অশ্ব কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। ওমর এই সুযোগে অলীদের

পৃষ্ঠে আঘাত করিল, বর্শাফলক অলীদের পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তমুখে বহির্গত হইল। অলীদ ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে শহীদ হইলেন।

ওমর আলী এজিদকে দেখিয়া একটু দূরে ছিলেন, অলীদের অবস্থা দর্শনে অসি সঞ্চালন করিয়া ভীমনাদে ওমরের দিকে আসিয়া প্রথমতঃ তিনি ওমরের অশ্বগ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিতেই বাজীরাজ শিরশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। বাম পার্শ্বে ফিরিয়া দ্বিতীয় আঘাতে তিনি এজিদের অশ্বমস্তক মৃত্তিকায় লুটাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া তিনি দেখিলেন যে, ওমর এখনও সুস্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। তৃতীয় আঘাতে ওমর আলী বৃদ্ধ ওমরকে ধরাশায়ী করিলেন।

এজিদ ওমরের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বল্লম-হস্তে ওমর আলীর দিকে ধাইয়া যাইতেই, ওমর আলী সরিয়া গিয়া বলিলেন, "এজিদ! এ দিকে কেন আসিতেছ? যাও, হানিফার অস্ত্রাঘাত সহ্য কর। ওমর আলী তোমার সৈন্য বিনাশ করিতে চলিল।"

দেখিতে দেখিতে ওমর আলী এজিদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে সিংহবিক্রমে ঘোর নিনাদে শব্দ হইতেছে, "জয়! জয়নাল আবেদীনের জয়! জয় মদিনার সিংহাসনের জয়! জয় নব ভূপতির জয়!"

এজিদ ব্যস্ততা-সহকারে চাহিতেই দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদল মধ্যে কোন দল পৃষ্ঠ দেখাইয়া মহাবেগে দৌড়াইতেছে, কোন দল রণে ভঙ্গ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিপক্ষ-দলের আঘাতে অজ্ঞান জড় পদার্থের ন্যায় এজিদ-সৈন্য নীরবে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে! আর রক্ষার উপায় নাই—কোথায় পতাকা, কোথায় বাদিএদল, কোথায় ধানুকী, কোথায় অশ্বারোহী, কোথায় অস্ত্র, কোথায় বেশভূষা—আপন আপন প্রাণ বাঁচানই এখন মূল কথা! এখন আর আশা নাই—এদিকে এজিদ-প্রহরী দ্বিতীয় অশ্বতরী যোগাইল। এজিদ অশ্বতরীতে চড়িয়া দেখিলেন: রাজশিবির লুণ্ঠিত হইয়াছে, বিপক্ষদল অন্য অন্য শিবিরও লুণ্ঠন করিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইতেছে। মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল

আলী প্রভৃতি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বর্শাঘাতে তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিতেছেন,—তরবারির আঘাতে তাহাদের শির উড়াইয়া দিতেছেন। আবার জয়ধ্বনি, আবার সেই জন-রব! এজিদ সে দিকে চাহিতেই দেখিলেন: অগণিত সৈন্য,—সকলের হস্তেই উন্মুক্ত অসি। মাঝে মাঝে উর্দ্ধদণ্ডে অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারা-সংযুক্ত দীন মোহাম্মদী নিশান শুভ্র মেঘের আড়ালে উড়িতেছে; সকলেই জয়নাল আবেদীনের বিজয়-ঘোষণা প্রকাশ করিতে করিতে নগরাভিমুখে যাইতেছে। এজিদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে জয়-ঘোষণায় জয়নালের নাম শুনিয়া মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন যে, নিশ্চয়ই জয়নাল এই সৈন্য-প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া নগরে যাইতেছে—রাজ-প্রাসাদে যাইতেছে। তিনি স্বগতঃ বলিলেন: এখন কোথা যাই, কি করি! হতাশ হইয়া চতুষ্পার্শ্বে দেখিতেই, তিনি দেখিলেন যে, সেই কালান্তক কাল, এজিদের মহাকাল দ্বিতীয় আজরাইল—মোহাম্মদ হানিফা, রঞ্জিত কৃপাণ হস্তে রক্তমাখা দেহে রক্ত আঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে "কোথায় এজিদ?" "কৈ এজিদ?" বলিতে বলিতে আসিতেছেন। এজিদ প্রাণভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মোহাম্মদ হানিফাও এজিদের দ্রুতগতি অশ্বের দিকে দুল্‌দুল্‌ চালাইলেন।

উদ্ধার পর্ব্ব সমাপ্ত
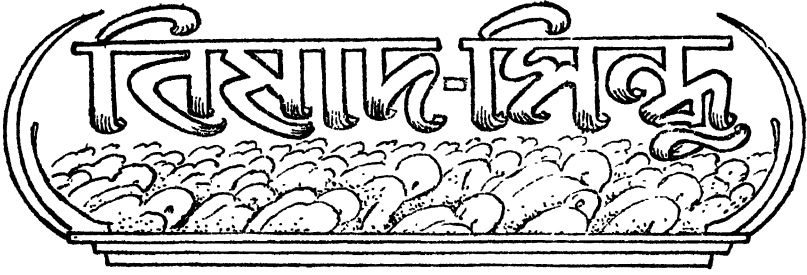
এজিদ বধ পর্ব্ব

প্রথম প্রবাহ

বন্দীগৃহ। বন্দীগৃহ সুবর্ণে নির্ম্মিত, মহামূল্য প্রস্তরে খচিত, সুখসেব্য আরামের উপকরণে সুসজ্জিত হইলেও মহাকষ্টপ্রদ—যন্ত্রণাময় স্থান। সুখ-সম্ভোগের সুখময় সামগ্রী দ্বারা পরিপূরিত হইলেও বন্দীগৃহ, দেহদগ্ধকারী মহাকষ্টপ্রদ জ্বলন্ত অগ্নিময় নরকনিবাস! সুবর্ণ-পাত্র সুস্বাদু-সুমিষ্ট-সরস খাদ্যে পরিপূরিত, রসনা পরিতৃপ্ত করিতে সুন্দর বন্দোবস্ত ও সুব্যবস্থা থাকিলেও বন্দীগৃহ মহাকাল—যমালয়! কোন বিষয়ে অভাব অনটন না হইলেও সর্ব্বতোভাবে মশান হইতে শ্মশান আদরের! অমূল্য রত্ন স্বাধীনতা-ধন যে স্থানে বর্জ্জিত, সে স্থান অমরপুরী সদৃশ মন-নয়ন মুগ্ধকর সুখসম্ভোগের স্থান হইলেও মানবচক্ষে তাহা অতি কদাকার ও জঘন্য, বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন সজীব প্রাণীর নিকট তাহা কণ্টক সমাকীর্ণ বিসদৃশ বিজন বন। বিজন বনেও পশুদিগের স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছানুসারে তাহাদের পরিভ্রমণ,—স্বজাতি-স্বজন পরিদর্শন ক্ষমতাও আছে, বন্দীখানায় বন্দীর ভাগ্যে তাহাও নাই। সুতরাং বাধ্য-বাধকতা, অধীন-অধীনতা সংস্রবে স্বর্গসুখও মহা যন্ত্রণাদায়ক। যন্ত্রণাদায়ক কেন? কারণ, তাহা সুখস্বচ্ছন্দের আমূল পরিচ্ছেদক।

বন্দীর মনে নানা ভাব,—নানা চিন্তা,—নানা কথা! কাহারও অন্তরে আত্মগ্লানির মহা বেগ শতধারে ও সহস্র প্রকারে ছুটিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত অগ্নিদাহের ন্যায় দগ্ধ করিয়া উত্তমাঙ্গস্থিত সপ্তদ্বারে তাপের শেষ পর্য্যন্ত

ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইতেছে। কাহারও অনুতাপানল আক্ষেপ-ইন্ধনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সতেজ রসনা আশ্রয়ে ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেহ মনের কথা মন-ভারে মনে মনে চাপিয়া হৃদয়ের রক্ত সমধিক হা-হুতাশে জলে পরিণত করিতেছে, কাহারও প্রতি লোমকূপ হইতে সে হা-হুতাশকৃত জলের কথঞ্চিৎ অংশ ঘর্ম্মচ্ছলে বহির্গত হইয়া তাহাকে অবসাদে নির্জীবপ্রায় করিতেছে। কেহ গত কথা স্মরণ করিয়া, বন্দীখানাস্থিত কুঠারহস্তে দণ্ডায়মান মনুষ্যঘাতী জল্লাদের উচ্চ মঞ্চের উপরিভাগ প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তিষ্কের মজ্জা পরিশুষ্ক করিতেছে। বন্দীমাত্রেই যে ন্যায় ও যথার্থ বিচারে দণ্ডিত—তাহা নহে। ভ্রান্তি ভ্রম মানবেই সম্ভবে! ইহাও নিশ্চয়, নির্ভুল অন্তর জগতে নাই। ভ্রমশূন্য মজ্জাও মানুষের নাই। ইহার পর নিরপেক্ষ সদ্বিচারকের সংখ্যা অতি অল্প। কত বন্দী—ভ্রমে, পক্ষপাতিত্বে, অনুরোধে, বিভ্রাটে আজীবন ফাটকে আটক রহিয়াছে!

পাঠক! এই ত আপনার সম্মুখে দামেস্ক-কারাগারের অবিকল চিত্র। সুবিচার, অবিচার, হিংসা-দ্বেষে কত বন্দী, কত স্থানে কত প্রকার শাস্তিভোগ করিতেছে! বন্দীখানার তুল্য কোন স্থানই জগতে নাই। প্রহরীদল মানবাকার হইলেও স্বভাব ও ব্যবহারে পশু হইতেও নীচ। তাহাদের শরীর যে, রক্ত-মাংস-হৃদয় সংযোগে গঠিত, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। চতুষ্পার্শে প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানটুকুই তাহাদের রাজ্য। এ রাজ্যের অধীশ্বর তাহারা। প্রবল প্রতাপে আধিপত্য করার কল্যাণে রাক্ষসভাব, পশুভাব, অমানুষিক-ভাব আসিয়া তাহাদের মস্তকে নির্ভর করিয়াছে। দয়া, মায়া, অনুগ্রহ, স্নেহ, ভালবাসা তাহাদের অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া পড়িয়াছে; মুখখানিও রসনা-সহকারে এমনই বিকট ভাব ধারণ করিয়াছে যে, কর্কশ, নীরস, অন্তর্ঘাতী, মর্ম্মপীড়িত নিদারুণ বাক্য-প্রয়োগে সর্ব্বদা তাহারা বন্দীদিগকে জর্জ্জরিত করিতে থাকে। তদুপরি যথা-অযথা যন্ত্রণা—পদাঘাত, দণ্ডাঘাত—বন্দীভাগ্যে কথায় কথায় হইতে থাকে। দামেস্ক নগরে এজিদের বন্দীগৃহ নরক হইতেও ভয়ানক। শাস্তির মাত্রাও সেই প্রকার। ক্রমে দেখিতে পাইবেন,—বিধির বিধানে এজিদ-আজ্ঞায়, মারওয়ানের মন্ত্রণায়, প্রভু

হোসেন-পরিবার, জয়নাল আবেদীন প্রভৃতি সকলেই ঐ বন্দীখানায় বন্দী। কিন্তু ইঁহাদের প্রতি কোনরূপ শাস্তির বিধান নাই। পৃথক খণ্ডে,—ভিন্ন কক্ষে ইঁহাদের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দৈনিক আহারের ব্যবস্থা বন্দীগৃহের প্রধান অধ্যক্ষ-হস্তে। তিনি যে সময় বিবেচনা করেন, সেই সময় শুষ্ক রুটি এবং এক পাত্র জল, যাহা বরাদ্দ আছে, তাহাই তাঁহাদিকে দিতে অনুমতি করেন। অন্য অন্য বন্দীর ভাগ্যে তাহাও নাই।

পাঠক, ঐ দেখুন! দামেস্ক-বন্দীগৃহে শাস্তির চিত্র দেখুন! অধিকক্ষণ দেখাইব না। কোন্ চক্ষু এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিতে ইচ্ছা করে?—তবে মহারাজ এজিদের বিচারের চিত্র অনেক দেখিয়াছেন, বন্দী-খানার চিত্রও কিছু দেখুন।

ঐ দেখুন, জীবন্ত নরদেহ লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে। অত্যাচারে, অনাহারে, অনিয়মে শরীর—জীর্ণ, বর্ণ—বিবর্ণ, চক্ষু—কোটরে, জিহ্বা-তালু—শুষ্ক, কণ্ঠ—নিরস,—মুখাকৃতি—বিকৃত, শরীর—অন্তঃসারশূন্য অস্থিপুঞ্জের সমাবেশ! কাহারও হস্তপদে জিঞ্জির, আবার কাহারও বা হস্তপদ মৃত্তিকার সহিত জিঞ্জিরে আবদ্ধ। কোন কোন বন্দী মৃত্তিকা-শয্যায় শায়িত, অথচ তাহাদের হস্ত-পদ লৌহশৃঙ্খলে লৌহ-পেরেকে ভূতলে আবদ্ধ। কাহারও বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত, কাহারও বা গলদেশ পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত। ঐ দিকে দেখুন! নরাকার রাক্ষসগণ হাসিতে হাসিতে জীবন্ত জীবের অঙ্গ হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা চর্ম্ম ছাড়াইতেছে, লবণ মাখাইতেছে, সাঁড়াশি দিয়া চক্ষু কেমন করিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে! দেখুন, দেখুন,—লৌহশলাকা—উত্তপ্ত লৌহশলাকা—মানুষের হাতে পায়ে হাতুড়ীর আঘাত বসাইয়া মৃত্তিকার সহিত কি ভাবে আঁটিয়া দিতেছে! এ সময়ে তাহাদের প্রাণে কি বলিতেছে, তাহা কি ভাবা যায়, না সহজ জ্ঞানে বোঝা যায়? কাহারও বা হস্ত-পদ মৃত্তিকার সহিত লৌহ পেরেকে আবদ্ধ, বক্ষে পাষাণ চাপা, চক্ষু ঊর্দ্ধে, কোন দিকে দৃষ্টির ক্ষমতা নাই, দৃষ্টি কেবল অনন্ত আকাশে! আরও দেখুন, কাহারও পা দু'খানি কঠিনরূপে ঊর্দ্ধে বাঁধা, মস্তক নিম্নে, হস্তদ্বয় ঝুলিয়া

ছড়াইয়া পড়িয়াছে; জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া নাসিকা ঢাকিয়া চক্ষুর উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে; চক্ষু উল্টাইয়া ফাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হইতেছে; ইহাতেও নিস্তার নাই, সময়ে সময়ে দোর্‌রার আঘাতে শরীরের চর্ম্ম ফাটিতেছে! রক্ত পড়িতেছে! কি মর্ম্মাঘাতী অন্তরভেদী ভীষণ ব্যাপার! আর দেখা যায় না। চলুন, অন্য দিকে যাই।

ঐ যে বৃদ্ধ বন্দী—লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানে মগ্ন, হাব-ভাব দেখিয়া যেন ইঁহাকে চেনা-চেনা বোধ হইতেছে। কোথায় যেন দেখিয়াছি, মনে পড়ে! অনুমান মিথ্যা নহে। এই সেই মহাত্মা মন্ত্রিপ্রবর হামান, হজরত মাবিয়ার প্রধান মন্ত্রী, এজিদের পুণ্যাত্মা পিতার প্রিয় সচিব! মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ হামান, এজিদ-আজ্ঞায় বন্দী—লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ! বৃদ্ধবয়সে এই যন্ত্রণা! মন্ত্রী-প্রধান হামান কি যথার্থ বিচারে বন্দী? মহারাজ এজিদ কি অপরাধে ইঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কি মনে হয়? হানিফার সহিত যুদ্ধে তাঁহার অমত, দামেস্কাধিপতির স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে তাঁহার অমত প্রকাশ, এজিদের মতের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য—সুতরাং তিনি এজিদ্-আজ্ঞায় বন্দী! দামেস্ক নগরের ভূতপূর্ব্ব দণ্ডধর হজরত মাবিয়ার দক্ষিণ-হস্তই ছিলেন—এই হামান। এজিদের হস্তে পড়িয়া মহাঋষির এই দুর্দ্দশা! হায় রে জগৎ! হায় রে স্বার্থ! দামেস্ক-সিংহাসনের চির গৌরব-সূর্য্য এজিদ-কল্যাণে আজ অস্তমিত!

পিতার,—মাননীয় পিতার ভালবাসার পাত্রকে কোন্ পুত্র অবজ্ঞা করিয়া থাকে? হামানের চিন্তা ভ্রম-সঙ্কুল ছিল না,—আশা ও দুরাশার পথে অযথা দণ্ডায়মান হইয়া কুহকে মাতিয়াছিল না—কারণ, এ আশা মানুষেরই হয়ঃ মানুষের দৃষ্টান্তেই মানুষ শিক্ষা পায়। আশা ছিল, —মন্ত্রিপ্রবরের মনে আশা ছিল,—এজিদ মাবিয়ার সন্তান; পিতৃ-অনুগৃহীত বলিয়া অবশ্যই সে তাঁহাকে দয়া করিবে; বৃদ্ধ বয়সে নবীন রাজপ্রসাদে সুখী হইয়া নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বর আরাধনায় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া যাইবে। নিয়তির বিধানে তাহা ঘটিল না। অথচ এজিদের স্বেচ্ছাচার-

বিচারে বৃদ্ধ বয়সে লৌহ-নিগড়ে তাঁহাকে আবদ্ধ হইতে হইল! শুনুন, মন্ত্রিপ্রবর মৃদু মৃদু স্বরে কি কথা বলিতেছেন,—

'রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিলে তাহারও শান্তি হয়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইলেও যথাসময়ে অবশ্যই তাহার নির্ব্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়া দিলে সে দুর্দ্দমনীয় তেজও একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়া যায়। মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈবদুর্ব্বিপাকে রাজ্যধ্বংসের উপক্রম বোধ হইলেও নিরাশ-সাগরে ভাসিতে হয় না—আশা থাকে। রাজা মজ্জা-দোষে, কি মন্ত্রণার অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য্য হইলেও আশা থাকে। মুর্খ রাজার প্রিয় পাত্র হইবার আশায়, মন্ত্রণাদাতাগণ অবিচার, অত্যাচার নিবারণে উপদেশ না দিয়া অহরহঃ তোষামোদের ডালি মাথায় করিয়া প্রতিটি রাজাজ্ঞা অনুমোদন করাতেই যদি রাজায় প্রজায় মনান্তর ঘটে, তাহাতেও আশা আছে—সে ক্ষেত্রেও আশা থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা-ধনে একবার বঞ্চিত হইলে সহজে সে মহামণির মুখ আর দেখা যায় না। বহু আয়াসেও সে মহামূল্য রত্ন আর হস্তগত হয় না। স্বাধীনতা-সূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে তাহার পুনরুদয় হওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা!"

"রাজা আর রাজ্য, এই দুইটি পৃথক কথা—পৃথক ভাব—পৃথক সম্বন্ধ। রাজা নিজ বুদ্ধি-দোষে অপদস্থ হউন, সদ্‌যুক্তি, সুমন্ত্রণা অবহেলা করিয়া পর-পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি? কার্য্যানুরূপ ফল, পাপানুযায়ী শাস্তি। স্বেচ্ছাচারী, সুমন্ত্রণা-বিদ্বেষী, নীতি-বর্জ্জিত, উচিত কথায় বিরক্ত,—এমন রাজার রাজ্যপাট যত সত্বর ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল, ততই রাজ্যের শনিক্ষয় ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা। দামেস্ক-রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, প্রেমের কুহকে, পিরিতের দায়ে, প্রণয়-বাসনায়, পরিণয়-ইচ্ছায়, যদি এই রাজ্য যথার্থই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না, সে মনঃকষ্টের আর ইতি হইবে না। রাজা প্রজা-রক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক এবং

করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের যথার্থ অধিকারী প্রজা। দায়িত্ব প্রজারই অধিক। রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রজার—বাসিন্দা মাত্রেরই। যদি রাজ্য মধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরাধীন শব্দের যথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণ জ্ঞান থাকে, একতা-বন্ধনে আস্থা থাকে, ধর্ম্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বৈরীভাব না থাকে, জাতিভেদ-হিংসা, ঈর্ষা এবং ঘৃণার ছায়া না থাকে, অমূল্য সময়ের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে, আলস্যে অবহেলা এবং শৈথিল্যে বিরোধী যদি কেহ থাকে, বিদ্যার চর্চ্চা থাকে, আর সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে যুগ যুগান্তরে হউক, শতাব্দী পরেই হউক, সহস্রাধিক বর্ষ গতেই হউক, কোন কালেই হউক, অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীনতা-গগনে স্বাধীনতা-সূর্য্যের পুনরুদয় আশা একবার করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু দামেস্ক-রাজ্যে সে আশা—আশা-মরীচিকা। দামেস্ক বীরশূন্য! দামেস্ক চিন্তাশীল দেশ-হিতৈষী মহোদয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত! সে উপকরণে গঠিত কোন মস্তক আছে কি না, তাহাতেই বিশেষ সন্দেহও হইবে কি না,—তাহাতেও নানা সন্দেহ।”

“যে দিন রমণী-মুখচন্দ্রিমার সামান্য আভায় ধরণীপতির মস্তক ঘুরিয়াছে, মহীপাল এজিদের মহাশক্তি-সম্পন্ন মজ্জা, পরকর-শোভিত মর্দ্দিত কমলদলের মুমূর্ষু অবস্থার ঈষৎ আভায় গলিয়া বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, সেই দিনই নিরাশার সঞ্চার হইয়া স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত হওয়ার সূত্রপাত ঘটিয়াছে। রাজার আচার, রাজার ব্যবহার,—প্রজার আদর্শ এবং শিক্ষার স্থল। যে রাজচক্ষু কোমলপ্রাণা কামিনীর কমলাক্ষির কোমল তেজ সহ্য করিতে অক্ষম, সে চক্ষু মোহাম্মদ হানিফার সুতীক্ষ্ণ তরবারির জ্বলন্ত তেজ সহ্য করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। সে অসীম বলশালী মহাবীরের অস্ত্রাঘাত কি রূপজ মোহে ঘূর্ণিত মস্তক সহ্য করিতে পারে?—কখনই নহে। আর আর আশা কি?—কামিনী-কটাক্ষশরে জর্জ্জরিত হৃদয়ের আশ্বাসের জন্য রাজনীতি উপেক্ষা করিয়া অকারণ রণবাদ্য বাজাইতে যে মন্ত্রী মন্ত্রণা দেয়, সে মন্ত্রী গাজী রহমানের মন্ত্রণা ভেদ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে কোন কালেও

সক্ষম হইবে না, কখনও গাজী রহ্‌মানের সমকক্ষ হইতে পারে না। যদি যুদ্ধই ঘটিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই পরাজয়—নিশ্চয়ই দামেস্কের অধঃপতন—নিশ্চয়ই দামেস্কের সিংহাসনে জয়নাল্ আবেদীন—নিশ্চয়ই এজিদের মৃত্যু, মারওয়ানের মনোগত আশা বিফল! পিরিত, প্রণয়, প্রেম,—এই তিন কারণেই আজ দামেস্কের এই দুর্দ্দশা! কি ঘৃণা! কি লজ্জা!"

"বৃদ্ধ বয়সে অবিচারে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আকুলিত হই নাই। যতদুর বুঝিয়াছি, বলিয়াছি। আমার ভ্রম দর্শাইয়া ইহা অপেক্ষা শত গুণ শাস্তি দিলেও ক্ষোভের কারণ ছিল না। উচিত কথায় আহাম্মক রুষ্ট, এ কথা নূতন নহে। প্রকাশ্য দরবারে মত জিজ্ঞাসা করায়, বুদ্ধি-বিবেচনায় যাহা আসিয়াছে, বলিয়াছি। ইহাই ত অপরাধ, ইহাতেই বন্দী, ইহাতেই পিঞ্জরে আবদ্ধ! কিছুমাত্র দুঃখ নাই; কারণ,—মূর্খ, স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী, পরশ্রী-কাতর পরস্ত্রী-আকাঙ্ক্ষী, স্বেচ্ছাচারী এবং রোষপরবশ রাজার নিকট ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে? প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় নাই, ইহাতেই আমার শত লাভ! সহস্র প্রকারে ঈশ্বরে ধন্যবাদ!"

"ভাল কথা,—ওমর আলীর বন্দী হওয়ার কথাই শুনিলাম, প্রাণবধের কথা ত শুনিলাম না। শূলে জয়নাল আবেদীনের প্রাণদণ্ড হইবে, এই ঘোষণার কথাই কানে প্রবেশ করিল, শেষ কথাটা আর কেহ বলিল না। সংবাদ কি? এ অন্যায় যুদ্ধের পরিণাম কি? কি হইতেছে, কি ঘটিতেছে, কোন্ বীর কেমন তরবারি চালাইতেছে,—বর্শা উড়াইতেছে,—তীর চালাইতেছ, কৈ—কেহই ত কিছুই বলে না! আমাদের পক্ষের অতি সামান্য সামান্য শুভ-সংবাদও লোকের মুখে ক্রমে অসামান্য হইয়া উঠে। কৈ—এ কয়েক দিন ভালমন্দ কোন সংবাদই ত শুনিতে পাইলাম না? মন্দ কথা কানে আসিবার কথা নহে—ভাল কথার যখন একটা বর্ণও প্রকাশ হইতেছে না, তখন আর কি বলি!"

"যুদ্ধকাণ্ড বড়ই কঠিন! সামান্য বিবেচনার ত্রুটিতে সর্ব্বস্ব বিনাশ,—লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ মুহূর্ত্তে ধ্বংস! বড়ই কঠিন ব্যাপার! দামেস্ক রাজ্যের যে সময় উপস্থিত, এ সময় যুদ্ধ করাই অন্যায়। যুদ্ধের কারণ

দেখিতে হইবে, লাভালাভের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, আপন আপন ক্ষমতার পরিমাণও বুঝিতে হইবে, ধনাগারের অবস্থাও ভাবিতে হইবে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পুরবাসী, প্রতিবেশী, সমকক্ষ, সমশ্রেণী, জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং রাজ্যের গণ্যমান্য ধনী ও সাধারণ প্রজার মনের ভাব বিশেষ করিয়া অতি গোপনে কৌশলে পরীক্ষা করিতে হইবে। কেবল ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াই চক্ষু শীতল করিলেই চলিবে না। আহার্য্য-সামগ্রী—কেবল মানুষের নয়, গরু ঘোড়া ইত্যাদি পালিত জীবজন্তুসহ নগরস্থ প্রাণীমাত্রেরই,—কত দিনের আহার মজুত, প্রাণীর পরিমাণ, আহার্য্য সামগ্রীর পরিমাণ, আনুমানিক যুদ্ধকালের পরিমাপ করিয়া সমুদয় সাব্যস্ত-বন্দোবস্ত, আমদানী-রপ্তানি, পানীয় জলের সুবিধা পর্য্যন্ত করিয়া—তবে অন্য কথা।"

"এ যুদ্ধে এ কথাটা অগ্রেই ভাবা উচিত ছিল : মহাবীর মোহাম্মদ হানিফা বহুদূর হইতে আক্রমণ আশায় আসিয়াছেন। দামেস্ক—ভিন্ন দেশ, তাঁহার পক্ষে সহসা এখানে প্রবেশই দুঃসাধ্য। ইহার পর নগর-আক্রমণে আশা—রাজবন্দী-গৃহ হইতে পরিজনগণকে উদ্ধারের আশা—এজিদ-বধ করিয়া দামেস্ক-সিংহাসন অধিকার করিবার আশা—এক একটি আশা কম পরিমাণের আশা নহে—কথাচ্ছলে আমি ইহাকে এক প্রকার দুরাশাও বলিতে পারি, কারণ, রাজ্যের সীমাই যুদ্ধের সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া নগর-প্রান্তভাগের প্রান্তরে এজিদের মহাকাল স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। এক গাজী রহ্মানের বুদ্ধি-কৌশলে সকল বিষয়ে সুন্দর বন্দোবস্ত। যাহা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল, তাহাও তাহারা অনায়াসেই সুসিদ্ধ করিয়াছে। রাজ্য-সীমায় প্রবেশ দূরে থাকুক, নগরের প্রান্তসীমায় রণভূমি—আর আশা কি ?"

"অন্যায় সমরে রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে! কি পরিতাপ! যে রাজা রাজনীতির বাধ্য নহে, সমরনীতির অধীন নহে, স্বেচ্ছাচারিতাই যাহার মস্তিষ্কের বল, তাহার কি আর মঙ্গল আছে ? প্রণয়ে, প্রেমে যে রাজা আসক্ত, তাহার কি আর শ্রীবৃদ্ধি আছে ? যুদ্ধবিগ্রহে পিরিত—প্রণয়ের প্রসঙ্গ আসিতেই পারে না। মূল কারণ হওয়া দূরে থাকুক, সে নামেই সর্ব্বনাশ! রাজনীতি, সমরনীতি, এই দুইটি নীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া

যতই জ্ঞানলাভ হইবে, যতই অভিজ্ঞতা জন্মিবে, ততই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার মধ্যে কি না আছে! জগতের সমুদয় ভাব, স্বভাব, ব্যবহার ও কার্য্য-প্রণালী সমুদয়ই ঐ দুই নীতির মধ্যগত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষমতা, পরিচালনার বল, কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে জগতে কোন প্রাণীর মস্তকে আছে কি না সন্দেহ!"

"এ ধর্ম্মনীতির কথা নহে যে, ঘাড় নোয়াইয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে যে, কালে হইবেই হইবে! এ প্রসূতির প্রসব-বিষয়ের চিন্তা নহে যে, দশ মাস দশ দিন পরে যাহা হয় একটা হইবেই হইবে, এ অদৃষ্ট-লিপির প্রতি নির্ভরের কার্য্য নহে যে, যাহা কপালে লেখা আছে, তাহাই ঘটিবে। এ রাজ-চক্র, ইহার মর্ম্মভেদ করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ, সমর-কাণ্ড যেমন কুটিল, তেমনি জটিল। যখনই প্রশ্ন তখনই উত্তর, যে মুহূর্ত্তে চিন্তা, সেই মুহূর্ত্তেই কার্য্য, তখনই কার্য্যফল! দ্রুতগতি সময়ের সহিত সমর-কাণ্ডের কার্য্য-সম্বন্ধ—বুদ্ধির কৌশল,—বিবেচনার ফল। জয়-পরাজয়ের সময় অতি সংক্ষেপ। একদিকে দক্ষিণ চক্ষু দেখিল: বীরবরের হস্তস্থিত তরবারি বিদ্যুত-লতায় চমকাইতেছে—অন্যদিকে বাম চক্ষু দেখিল: ঐ মহাবীরের রঞ্জিত দেহ ভূতলে গড়াইতেছে, রঞ্জিতহস্তে রঞ্জিত তরবারি বদ্ধমুষ্টিতে ধরাই রহিয়াছে! বর্ত্তমান যুদ্ধে যে কি ঘটিবে, তাহা ভগবানই জানেন! আমার সময় মন্দ। কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, কাহারও মুখে কিছু শুনিতে পাই না। মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন—বন্দী হইয়াছি। লৌহশৃঙ্খল গলায় পরিতে হুকুম দিয়াছেন, হুকুম তামিল করিয়াছি। ইহাতে দুঃখমাত্র নাই, অন্তরেও বেদনা বোধ করি নাই। তবে বেদনা লাগিয়াছে যে, এই সঙ্কট সময়ে অকারণ যুদ্ধে অগ্রসর—স্বয়ং রাজার অগ্রসর,—স্বয়ং রাজার অস্ত্রধারণ! বড়ই দুঃখের কথা! এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কি হইবে? কে হারিবে, কে জিতিবে? সন্ধি—অসম্ভব! যুদ্ধ অনিবার্য্যরূপে চলিতেছে, সমর-গগনে লোহিত নিশান বায়ুর সহিত এখনও খেলা করিতেছে,—ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমার ত এই বিশ্বাস যে, দামেস্ক-প্রান্তরই রঞ্জিত হইতেছে। দামেস্ক-ভূমি দামেস্ক-বীর-শিরেই পরিপূর্ণ হইতেছে। এ অবৈধ

সমরে সন্ধির নামই আসিতে পারে না! এজিদ-হানিফার রণক্ষেত্রে শুভ্র নিশান উড়িতেই পারে না! বড়ই শক্ত কথা!"

মন্ত্রীবর হামান মনের কথা এইরূপে অকপটে মুখে প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় দ্বাররক্ষক দ্রুতপদে মন্ত্রীপ্রবরের নিকট আসিয়া, চুপে চুপে কি কথা বলিতে লাগিল। বন্দী সচিব! তাঁহার মুখে কোন কথাই প্রকাশ হইল না। দেখিবার মধ্যে দেখা গেল,—তাঁহার চক্ষে জল। আর শুনিবার মধ্যে শুনা গেল,—তাঁহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস। পাঠক! চুপি চুপি কথা আর কিছুই নহে, সে আমাদের জানা কথা—গত কথা, যুদ্ধের বিবরণ এবং এজিদের পলায়ন—এই সংবাদ।

চলুন, অন্যদিকে যাওয়া যাক্। শুনিতেছেন?—শুনিতে পাইতেছেন? —স্ত্রী-কণ্ঠ। বুঝিতে পারিতেছেন? কি কথা, একটু অগ্রসর হইয়া শুনুন।

"বাবা জয়নাল! তুই যে বন্দীখানা হইতে পলাইয়াছিস্—বুদ্ধির কাজ করিয়াছিস্ বাপ্! আর দেখা দিস্ না। কখনও কাহারও নিকট দেখা দিস্ না! তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ! তোকে বুকে করিলে বুক শীতল হয়!—চক্ষু জুড়ায়! তুই আমাকেও দেখা দিস্ না! (উচ্চৈঃস্বরে) জয়নাল! তুই আমার—তুই আমার—কোলে আয়। এ বন্দীখানায় কি অপরাধে অপরাধী হইয়া বন্দী হইয়াছি—দয়াময় ঈশ্বরই জানেন! কত কাল এ ভাবে থাকিতে হইবে, তাহাও তিনিই জানেন! জয়নাল! তোর মুখখানির প্রতি চাহিয়াই এত দিন বাঁচিয়া আছি! তুই ইমাম-বংশের একমাত্র সম্বল,—মদিনার রাজরত্ন। তোর ভরসাতেই আজও পর্য্যন্ত দামেস্ক-বন্দীগৃহে তোর চিরদুঃখিনী মা প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। পবিত্র ভূমি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া যে দিন কুফায় গমন করিতে পথে বাহির হইয়াছি, সেই দিন হইতেই সর্ব্বনাশের সূচনা হইয়াছে। কত পথিক দূর দেশে যাইতেছে, কত রাজা সৈন্যসামন্তসহ বন, জঙ্গল, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গিরিগুহা অনায়াসে পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্ব্বিঘ্নে যাইতেছে। তাহাদের ভ্রম নাই—পথশ্রান্তি নাই—স্বচ্ছন্দে যাইতেছে—আসিতেছে—কোনরূপ পথ-বিঘ্ন নাই, বিপদ নাই, কোন কথাই নাই! হায়

হায়, আমাদের কি দুর্ভাগ্য! দিনে দুই প্রহরে ভ্রম! মহাভ্রম! কোথায় কুফা!—আর কোথায় কারবালা! সেখানে যাহা ঘটিবার ঘটিল। আত্মঘাতী হইলাম না, প্রাণও বাহির হইল না! কেন হইল না?—বাপ্! তোর মুখের প্রতি চাহিয়াই—বন্দীখানাতেও তোরই মুখখানি দেখিয়াই কিছু করি নাই। তুই দুঃখিনীর ধন!—দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন!—অঞ্চলের নিধি! তোর দশা কি ঘটিল? হায়! হায়!! কেন তুই ওমর আলীর প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া বন্দীগৃহ হইতে বাহির হইলি? আমার মন অস্থির—বিকারগ্রস্ত।—কি বলিতে কি বলি, তাহার স্থিরতা নাই! বন্দীখানায় থাকিলে দুর্দ্দান্ত পিশাচ মারওয়ানের হস্ত হইতে তোকে কখনই রক্ষা করিতে পারিতাম না, আমার ক্রোড় হইতে সে তোকে কাড়িয়া লইয়াই যাইত। হায়! হায়!! সে সময়ে তোর মুখের দিকে চাহিয়া আমার কি দশা ঘটিত বাপ্! তুই বুদ্ধিরই কাজ করিয়াছিস্! এজিদ জীবিত থাকিতে লোকালয়ে আর আসিস্ না।—বনে, জঙ্গলে, গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকিস্।—বনের ফল, মূল, পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিস্।—কখনও লোকালয়ে আসিস্ না। আর না হয়, যে দেশে এজিদের নাম নাই—তোরও নাম নাই—সে দেশে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাস্। তাহাতেও শাহ্‌রেবানুর প্রাণ শীতল থাকিবে।"

এ কি! প্রহরিগণ ছুটাছুটি করে কেন? প্রহরিগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থান হইতে ছুটিয়াছে। পরস্পর দেখা হইতেছে, কথা হইতেছে—কিন্তু বড় সাবধানে—চুপে চুপে। কথা কহিতেছে—পরামর্শ করিতেছে—সাবধান হইতেছে—আত্মরক্ষার উপায় দেখিতেছে!—কেন?—কি সংবাদ? দেখুন—আশ্চর্য্য দেখুন! একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানের কানে কানে চুপি চুপি কি কহিয়া, ঐ দেখুন কি করিল! দ্রুতহস্তে লৌহশৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিল এবং হোসেন-পরিবার ব্যতীত অন্য অন্য বন্দীগণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া সত্বরে বাহির করিয়া দিল। বন্দীগণ অবাক্!—কেহ কোন কথা কহিতেছে না! সকলেই যেন ব্যস্ত। পলাইতে পারিলেই রক্ষা! —জীবন রক্ষা।

দ্বিতীয় প্রবাহ

সমরাঙ্গণে পরাজয়-বায়ু একবার বহিয়া গেলে সে বাতাস ফিরাইয়া বিজয়-নিশান উড়ান বড় শক্ত কথা। পরাজয়-বায়ু হঠাৎ চারিদিক হইতে মহাবেগে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে না; প্রথমতঃ মন্দ মন্দ গতিতে রহিয়া রহিয়া বহিতে থাকে, পরে ঝঞ্ঝাবাত সহ তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া এক পক্ষকে উড়াইয়া দেয়। নেতৃপক্ষের ঘন ঘন হুঙ্কারে, অস্ত্রের চাকচিক্যে মহাবীরের হৃদয়ও কম্পিত হয়, হতাশায় বুক ফাটিয়া যায়।

আজ দামেস্ক-প্রান্তরে তাহাই ঘটিয়াছে। মদিনার সৈন্যদিগের চালিত অস্ত্রের চাকচিক্যে এজিদ-সৈন্য ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হইতেছে। তাহারা,—আস্‌মানে কি জমিনে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। তবে বিপক্ষগণের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা-শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া রণরঙ্গের কথা তাহাদের মনে পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে সময় প্রাণভয়ে তাহাদের প্রাণ চতুর্গুণ আকুল হইতেছে;—তাহারা দেখিতেছে, যেন প্রান্তরময় বৃষ্টিপাত হইতেছে! গগনস্থ ঘনঘটা হইতে বৃষ্টি হইতেছে না, সে রক্তবৃষ্টি মেঘ হইতে ঝরিতেছে না, ঝরিতেছে—দামেস্ক-সৈন্যের শরীর হইতে; আর ঝরিতেছে—আম্বাজী সৈন্যের তরবারির অগ্রভাগ হইতে। মেঘ-মালার খণ্ড খণ্ড অংশই শিলা,—তাহারও অভাব হয় নাই—খণ্ডিত দেহের খণ্ড খণ্ড অংশই সে ক্ষেত্রে শিলারূপ দেখাইতেছে।

দামেস্ক-প্রান্তর দামেস্ক-সৈন্য-শোণিতেই ডুবিয়াছে।—রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। মহাবীর হানিফার সম্মুখে যে সৈন্যদলই পড়িয়াছে, সংখ্যায় যতই হউক, তৃণবৎ উড়িয়া তাহারা খণ্ডিত দেহে ভূতলশায়ী হইয়াছে! সে রঞ্জিত তরবারিধারে খণ্ডিত দেহের রক্তধার, ধরণী বহিয়া মরুভূমি সিক্ত করিয়া, প্রান্তরময় ছুটিতেছে। কিন্তু হানিফার মনের আগুন নিভিতেছে না,—মদিনাবাসীর ক্রোধানল একটুও কমিতেছে না।

প্রভু হোসেনের কথা, কারবালা-প্রান্তরে এক বিন্দু জলের কথা, হোসেনের ক্রোড়স্থিত শিশুসন্তানের কোমল বক্ষ ভেদ করিয়া লৌহ তীর প্রবেশের কথা মনে হইয়া হানিফার প্রাণ আকুল করিয়াছে! বিস্ফারিত চক্ষে রোষাগ্নির তেজ বহিয়া অবশেষে বাষ্পরাশি বহাইয়া তাঁহাকে এক প্রকার উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। "কৈ এজিদ! কৈ সে দুরাত্মা এজিদ! কৈ সে নরাধম এজিদ!—কৈ এজিদ! কৈ এজিদ!" মুখে বলিতে বলিতে এজিদ-অন্বেষণে তিনি অশ্বে কশাঘাত করিয়াছেন। সে মূর্ত্তি এজিদের চক্ষে পড়িতেই এজিদ ভাবিয়াছিলেন যে, এ মহাকালের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা নাই, অতএব পলায়নই শ্রেয়ঃ। বীরের ন্যায় বক্ষবিস্তারে হানিফার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, "আমি এজিদ—আমিই সেই মদিনার মহাবীরগণের কালস্বরূপ এজিদ! হানিফা! আইস, তোমাকে ভবযন্ত্রণার দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিই!"—এই সকল কথা বলা দূরে থাকুক, যেই দেখা অমনই এজিদের পলায়নের চেষ্টা; —প্রাণভয়ে পলায়নের চেষ্টা!—প্রাণ-ভয়ে দামেস্করাজ অশ্বারোহণ করিয়া যথাসাধ্য বেগে অশ্ব চালাইতেছেন!

হানিফাও এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুল্‌দুল্ চালাইয়াছেন।- এই দৃশ্য অনেকেই দেখেন নাই। রণরঙ্গে মাতোয়ারা বীর সকল একথা অনেকেই শুনেন নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাও তাহার পর কি ঘটিয়াছে, কি হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। কোন সন্ধানীও সন্ধান আনিতে পারে নাই।

এদিকে মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল আলী (বাহ্‌রাম) প্রভৃতি মহামহিম যোদ্ধাসকল কাফেরদিগকে পশুপক্ষীর ন্যায় যথেচ্ছা বধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ' গাজী রহ্‌মানের পূর্ব্ববচন সফল হইল। এজিদ-সৈন্য প্রাণভয়ে পলাইয়াও প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেছে না। অশ্বের দাপটে, তরবারির আঘাতে, বর্শার সূক্ষ্মাগ্রে, তীরের লক্ষ্যে, গদার প্রহারে, খঞ্জরের আঘাতে তাহারা প্রাণ হারাইতেছে। কত শিবির, কত চন্দ্রাতপ, কত উষ্ট্র, কত অস্ত্র, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় হুহু শব্দে পুড়িয়া ছাই হইতেছে। এজিদ পক্ষের জীবন্ত প্রাণী আর কাহারও চক্ষে পড়িতেছে না! দৈবাৎ

কাহারও দেখা পাইলে 'মার্ মার্' শব্দে চারিদিক হইতে হানিফার সৈন্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া, ক্রীড়া-কৌতুক, হাসি-রহস্য করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। ক্রোধের ইতি নাই, 'মার্ মার্' শব্দের বিরাম নাই। সময়ে সময়ে মুখে এই হৃদয়-বিদারক, মর্ম্মঘাতী কথা কহিয়া নিজেরাও কাঁদিতেছে, জগৎকেও কাঁদাইতেছে: হায় হাসান! হায় হোসেন! তোমরা আজ কোথায়? সে মহাপ্রান্তর কার্‌বালা কোথায়? ফোরাতের উপকূল কোথায়? যে সৈন্যদল ফোরাতের জল লইতে পথ বন্ধ করিয়াছিল, তাহারাই বা আজ কোথায়? কৈ এজিদের সৈন্য? কৈ এজিদ? কৈ তাহার শিবির? কিছুই ত চক্ষে দেখিতেছি না। প্রভু হোসেন! তুমি কোথায়? এ দৃশ্য তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। আহো কাসেম! মদিনার শ্রেষ্ঠ বীর কাসেম! একবিন্দু জলের জন্য, হায়! হায়!! একবিন্দু জলের জন্য কি না ঘটিয়াছে! উহু! কি নিদারুণ কথা! পিপাসায় কাতর হইয়া প্রভুপুত্র আলী আক্‌বর পিতার জিহ্বা চুষিয়াছিল! হায়! হায়!! সে দুঃখ ত কিছুতেই যায় না। কারবালার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। সে দিন রক্তের ধারা ছুটিয়া কারবালা-প্রান্তর ডুবিয়াছে। আজ দামেস্ক-প্রান্তর দামেস্ক-সৈন্য-শোণিতে ডুবিতেছে, দামেস্ক-রাজা মদিনার সৈন্য-পদতলে দলিত হইতেছে। কিন্তু আশা মিটিতেছে না, সে মনোবেদনার অণুমাত্রও উপশমবোধ হইতেছে না। বুঝিলাম—হোসেন-শোক অন্তর হইতে অন্তর হইবার নহে; মানিলাম,—কারবালার ঘটনা, মদিনাতে মায়মুনার কীর্ত্তি ও জাএদার আচরণ জগৎ হইতে একেবারে যাইবার নহে! চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নক্ষত্র যতদিন জগতে থাকিবে, ততদিন তাহা সকলের মনে সমভাবে জ্বলন্তরূপে বিষাদ-কালিমা-রেখায় অঙ্কিত থাকিবে।

সমরাঙ্গণে অস্ত্রাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। উর্দ্ধে অগ্নিশিখা—নিম্নে রক্তের লেখা। রক্তমাখা দেহসকল রক্তস্রোতেই ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, গড়াইয়া যাইতেছে।

সৈন্যদলসহ মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি সকলে নগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। শত্রুপক্ষীয় একটি প্রাণীও তাঁহাদের চক্ষে আর পড়িল না। জয়নাল আবেদীনসহ গাজী রহ্‌মান নগরের প্রবেশ-দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া হানিফার অপেক্ষা

করিতেছিলেন। কাক্কার দল আসিয়া জুটিলেই—"জয় মদিনার ভূপতির জয়! জয় মহারাজ জয়নাল আবেদীনের জয়!" ঘোষণা করিতে করিতে সকলে বীরদর্পে নগরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য বাধা দেয়? কে মাথা উঠাইয়া সেই বীরগণের সম্মুখে বক্ষ বিস্তারে দণ্ডায়মান হয়? কাহার সাধ্য একটি কথাও কহিয়া সরিয়া যায়? জনপ্রাণী দ্বারে নাই। রাজপথেও কোন লোক কোন স্থানে কোন কার্য্যে নিয়োজিত নাই। পথ পরিষ্কার—জনতা, কোলাহলের নামমাত্র নাই। কেবল স্বদল মধ্যে, মধ্যে মধ্যে 'মার্ মার্' 'কাট্ কাট্' শব্দ—"জয় জয়নাল আবেদীন! "জয় মোহাম্মদ হানিফা!" রব,—আর বহু দূরে লোকের প্রাণভয়ে পলায়নের কোলাহল-আভাস। শত্রু-হস্তে ধন, মান, প্রাণ রক্ষা হইবে না ভাবিয়া, অনেকেই ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, স্ব স্ব জীবন রক্ষার উপায় ভাবিতেছে। পরস্পারের এই সকল কথা,—'ডাক-হাঁক', প্রস্থানের লক্ষণ অনুমানে অনুভূত হইতেছে। বিনা যুদ্ধে, বিনা বাক্যব্যয়ে, গাজী রহ্‌মান মহা মহা বীরগণ ও সৈন্যগণসহ জয়নাল আবেদীনকে লইয়া সহস্র মুখে বিজয়ঘোষণা করিয়া দীন মোহাম্মদী নিশান উড়াইয়া, বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া সিংহদ্বার পার হইলেন।

যেখানে সমাজ, সেইখানেই দল। যেখানে লোকের বসতি, সেইখানেই গোলযোগ—সেইখানেই পক্ষাপক্ষ; সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, শত্রুতা, মিত্রতা, আত্মীয়তা, বাধ্যবাধকতা। যেমন এক হস্তে তালি বাজিবার কথা নহে, তেমনই দলাদলি না থাকিলেও কথা জন্মিবার কথা নহে। কথা জন্মিলেই পরিচয়, স্বপক্ষ বিপক্ষ সহজেই নির্ণয়। সে সময় খুঁজিতে হয় না—কে কোন্ পথে, কে কোন্ দলে।

এজিদ দামেস্কের রাজা। প্রজামাত্রেই যে মহারাজগত প্রাণ—অন্তরের সহিত রাজানুগত—সকলেই যে তাঁহার হিতকারী—তাহা নহে, সকলেই যে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত,—তাহাও নহে। দামেস্ক-সিংহাসন পরপদে দলিত হইল ভাবিয়া সকলেই যে দুঃখিত হইয়াছে, চক্ষের জল ফেলিয়াছে, সকলের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাও নহে। অনেকে পূর্ব্ব হইতেই হজরত মাবিয়ার পক্ষীয়, প্রভু হাসান-হোসেনের ভক্ত রহিয়াছে। আজ পরিচয়ের

দিন—পরীক্ষার দিন। সহজে নির্ব্বাচন করিবার এই-ই উপযুক্ত সময় ও অবসর।

বিজয় ঘোষণা এবং বিজয় বাজনার তুমুলরবে নগরবাসীরা ভয়ে অস্থির হইল। কেহ পলাইবার চেষ্টা করিল,—পারিল না। কেহ যথাসর্ব্বস্ব ছাড়িয়া জাতি-ধন-মান-প্রাণ বিনাশ-ভয়ে দীন-দরিদ্র-বেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কেহ ফকির-দরবেশ, কেহ বা সন্ন্যাসী-রূপ ধারণ করিয়া জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিল। কেহ আনন্দবেগ সম্বরণে অপারগ হইয়া "জয় জয়নাল আবেদীন!" মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে জাতীয় সম্ভাষণ, জাতীয় ভাব প্রকাশ করিয়া গাজী রহমানের দলে মিশিয়া চিরশত্রু-বিনাশের বিশেষ সুবিধা করিয়া লইল। কাহারও মনে দারুণ আঘাত লাগিল,—"জয় জয়নাল আবেদীন!" কথাগুলি বিশাল শেলসম তাহার অন্তরে বিঁধিতে লাগিল, কর্ণেও বাজিল। কাহারও সাধ্য নাই!—নগর রক্ষার কোন উপায়ই নাই। রাজ-বলের কোন লক্ষণও নাই। আর উপায় কি?—পলাইয়া প্রাণরক্ষা করাই কর্ত্তব্য,—তাই অনেকেই যথাসাধ্য পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিল। যাহারা জয়নাল আবেদীনের দলে মিশিল না, তাহাদের ভাগ্যে যাহা হইবার হইতে লাগিল। বিপক্ষ-দলের জাতক্রোধে এবং সৈন্যদলের অন্তরের মহারোষে অধিবাসীরা যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতে লাগিল। সন্তানসন্ততি লইয়া ত্রস্তপদে যাহারা পলাইতে পারিয়াছিল, বা প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া গুপ্ত পথে, কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইল, তাহারাই বাঁচিল। বাড়ীঘরের মায়া ছাড়িতে, জন্মের মত জন্মভূমি হইতে বিদায় লইতে যাহাদের একটু বিলম্ব হইল, তাহাদের প্রাণবায়ু মুহূর্ত্তমধ্যে অনন্ত আকাশে—শূন্যে উড়িয়া গেল। কিন্তু জন্মভূমির মায়াবশে তাহাদের দেহ দামেস্কেই পড়িয়া রহিল। কা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কে করে? কা'র কান্না কে কাঁদে? সুন্দর সুন্দর বাস-ভবন সকল ভূমিসাৎ হইতেছে; ধনরত্ন, গৃহসামগ্রী হস্তে হস্তে চক্ষের পলকে উড়িয়া যাইতেছে। কে কথা রাখে, আর কেইবা কথা শুনে? কোথাও ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, দেখিতে দেখিতে সজ্জিত গৃহ-সকল জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। নগরময় হাহাকার! নগরময়

অন্তরভেদী আর্ত্তনাদ! আবার মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনি, বিজয়ের উচ্চরব! আবার মাঝে মাঝে কান্নার রোল, আর্ত্তনাদ, কোলাহল, হৃদয়-বিদারক "ম'লাম—গেলাম—প্রাণ যায়!"শব্দ,—বিষাদের কণ্ঠ! উহু! এ কি ব্যাপার!—ভীষণ কাণ্ড! পিতার সম্মুখে পুত্রের বধ! মাতার বক্ষের উপর কন্যার শিরশ্ছেদ! পত্নীর সম্মুখে পতির দেহে বর্শা প্রবেশ! পুত্রের সম্মুখে বৃদ্ধ মাতার মস্তক চূর্ণ! সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশযুক্ত রমণী-শির,—কৃষ্ণ, শুভ্র, লোহিত ত্রিবিধ রঙ্গের আভা দেখাইয়া পিতার সম্মুখে—ভ্রাতার সম্মুখে—স্বামীর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে গড়াইয়া পড়িতেছে।—কলিজা পার হইয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিয়াছে! কি ভয়ানক ভীষণ ব্যাপার! কত নরনারী ধর্ম্ম-রক্ষায় নিরাশ হইয়া পাতালস্পর্শী কূপে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে। কেহ অন্য উপায়ে—যে প্রকারে যে সুবিধা পাইতেছে, সেই উপায়েই অত্যাচারের ভয়ে আত্মঘাতিনী হইয়া পাপীর মস্তকে পাপভার অধিকতররূপে চাপাইতেছে। মরিবার সময় তাহারা বলিয়া যাইতেছে,—"রাজার দোষে রাজ্যনাশ, প্রজার বিনাশ।—ফল হাতে হাতে। প্রতিকার কাহার না আছে? রে এজিদ! রে জয়নাব!!"

সৈন্যদল নগরের যে পথে যাইতেছে, সেই পথেই এইরূপ জ্বলন্ত আগুন জ্বালাইয়া পাষাণ-হৃদয়ের পরিচয় দিয়া যাইতেছে। দয়ার ভাগ যেন জগৎ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে! মায়া-মমতা যেন দুনিয়া হইতে জন্মের মত সরিয়া পড়িয়াছে!

কিন্তু এত করিয়াও হানিফার সৈন্যদিগের হিংসার নিবৃত্তি হইতেছে না। এত অত্যাচার, এত রক্তধারায়ও সে বিষম তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে না। এত করিয়াও শত্রুবধ-আকাঙ্খা মিটিতেছে না! মদিনার বীরগণ করুণস্বরে বলিতেছে—"আম্বাজী সৈন্যগণ! গঞ্জামের ভ্রাতাগণ! তোমরা মনে মনে ভাবিতেছ যে, আমরা সময় পাইয়া শত্রুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেছি। ভাইসকল! ভাবিয়া দেখিলে—একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে—দেখিবে তাহা সত্য নহে। এজিদ মদিনাবাসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার, যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লওয়া এখনও হয় নাই। অস্ত্রের

আঘাতে কত দিন শরীরের বেদনা থাকে? ভ্রাতাগণ! এরূপ আঘাত হৃদয়ে লাগিয়াছে যে, সে বেদনা এ দেহ থাকিতে উপশম হইবে না, প্রশান্ত হইলেও, এ প্রাণ হইতে সে নিদারুণ আঘাতের চিহ্ন সরিয়া যাইবে কি না, —জানি না। আপনারা চক্ষে দেখেন নাই, বোধ হয়, বিশেষ করিয়া শুনিতে অবসরও পান নাই—এক বিন্দু জলের জন্য কত বীর বিঘোরে কাফেরের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে! কত সতী পুত্রধনে—স্বামীরত্নে বঞ্চিতা হইয়া নীরসকণ্ঠে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, খঞ্জরের সাহায্যে সেই জ্বালা-যন্ত্রনা নিবারণ করিয়াছে! কত বালকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া "জল জল" রব করিতে করিতে কণ্ঠরোধ এবং বাক্‌রোধ হইয়াছে—আভাসে, ইঙ্গিতে জলের কথা মনের সহিত প্রকাশ করিয়া জগৎ কাঁদাইয়া কত বালক জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে! ভ্রাতাগণ! আর কত শুনিবেন? আমাদের প্রতি লোমকূপে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এজিদের অত্যাচার-কাহিনী জাগিতেছে। মদিনার সিংহাসনের দুর্দ্দশা, রাজ-পরিবারের বন্দীদশা, তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার—অবিচারের কথা শুনিয়া আমরা বুদ্ধি হারাইয়াছি; আজরাইল * সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছি; মৃত্যুমুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।"

"ঈশ্বর মহান্, তাঁহার কার্য্যও মহৎ! কোন্ সূত্রে কোন্ সময়ে কাহার প্রতি তিনি কি ব্যবস্থা করেন, তাহা তিনিই জানেন। মদিনার বীরশ্রেষ্ঠ কাসেমের শোক কি আমরা ভুলিয়াছি? প্রভু হোসেনের কথা কি আমাদের মনে নাই? প্রভু-পরিবার এখনও বন্দীখানায়। নূরনবী মোহাম্মদের প্রাণতুল্য প্রিয় পরিজন এখনও এজিদের বন্দীখানায় আবদ্ধ —এ কি শুনিবার কথা! না—চক্ষে দেখিবার কথা! মার কাফের, জ্বালাও নগর—সকলেই আসুন আমাদের সঙ্গে।"

এই সকল কথা কহিয়া নগরের পথে পথে, দলে দলে, 'মার্ মার্' শব্দে হানিফার সৈন্যগণ ছুটিল। গাজী রহ্‌মান, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি জয়নাল আবেদীনকে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে চলিয়াছেন! রাজপুরী নিকটবর্ত্তী, বন্দীগৃহ কিছুদূরে। গাজী রহ্‌মানের আজ্ঞায় সকলের গমনবেগ ক্ষান্ত

* স্বর্গীয় দূতের নাম। যিনি জীবের প্রাণ হরণ করেন তাঁহারই নাম আজরাইল।

হইল। সঙ্কেত-চিহ্নে সমুদয় সৈন্য দামেস্ক-রাজপথে যে যে পদে, যে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সেই সেই পদে, সেই সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কি সংবাদ? ব্যস্ত হইয়া সকলেই জয়নাল আবেদীনের চন্দ্রাতপোপরিস্থ পতাকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা কোনরূপ বিরূপ বা বিপর্য্যয় ভাব দেখিলেন না। জাতীয় নিশান হেলিয়া দুলিয়া গৌরবের সহিত শূন্যে উড়িতেছে। বিজয়-বাজনা সমভাবে বাজিতেছে। গাজী রহমান অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী এবং আক্কেল আলির সহিত কথা কহিতেছেন। অশ্বসকল গ্রীবাবক্রে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, কিন্তু সময়ে সময়ে পুচ্ছগুচ্ছ হেলাইয়া ঘুরাইয়া কর্ণদ্বয় খাড়া করিয়া স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও তোজোভাবের পরিচয় দিতেছে।

গাজী রহ্‌মান বলিলেন: "রাজপুরী নিকটবর্ত্তী, বাদশাহ-নামদারের কোন সংবাদই পাইতেছি না।"

মস্‌হাব কাক্কা বলিলেন: "গুপ্তচর-সন্ধানীগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই আছে। এ পর্য্যন্ত সংবাদ নাই,—এ কি কথা! কারণ কি?"

গাজী রহমান বলিলেন: "যুদ্ধাবসানে, কি বিজয়ের শেষ মুহূর্ত্তে,—আপন আপন সৈন্যসামন্ত, ভারবাহী, সংবাদবাহী প্রধান প্রধান যোদ্ধা এবং সেনানায়ক-গণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হয়। বিজয়-আনন্দে কে কোথায় কাহার পশ্চাতে 'মার্ মার্' শব্দে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিতে থাকে, কিছুই জ্ঞান থাকে না; সে সময়ে বড়ই সতর্ক ও সাবধান হইয়া চলিতে হয়। আপন দলবল ছাড়িয়া কে কাহার পশ্চাৎ কতদূর তাড়াইয়া লইয়া যায়, সে জ্ঞান প্রায় কাহারও থাকে না। এই অবস্থায় যুদ্ধজয়ের পরেও অনেক যুদ্ধজয়ী সামান্য লোকের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, ইহারও বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। পলায়িত শত্রুগণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় লুকাইয়া থাকে,—কে বলিতে পারে? এজিদের সৈন্য বলিতে একটি প্রাণীও আর যুদ্ধক্ষেত্রে নাই। তবে মোহাম্মদ হানিফা কোথায় রহিলেন? এজিদের কোন সংবাদও পাওয়া যায় নাই। বিপক্ষ দলেরও কোন সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, বিপক্ষ দলের সংবাদ—শূন্য। মোহাম্মদ হানিফা কোথায়, আমার

সেই চিন্তাই এইক্ষণে অধিকতর হইল। অশ্বারোহী সন্ধানী পাঠাইয়া এখনই সংবাদ আনিবে। আমরা রাজপুরী পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতেই যুদ্ধস্থানের সংবাদ অবশ্যই পাইব—আশা করি।”

আদেশমাত্র সন্ধানী দূতের অশ্ব ছুটিল। শুভ্র নিশানের অগ্রভাগ আরোহীর মস্তকোপরি বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল।

গাজী রহ্‌মান পুনরায় মস্‌হাব কাক্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “নগর-প্রবেশের সময় পৃথক পৃথক পথে সৈন্যদলকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যে দিক হইতে যে দল রাজভবন পর্য্যন্ত যাইবে, সে দিক রক্ষার ভার তাহাদের উপর থাকিবে। যে পর্য্যন্ত সৈন্যদল পুরীমধ্যে দীন মোহাম্মদী নিশান উড়িতে না দেখিবে, জয়নাল আবেদীনের বিজয়-ঘোষণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণে না শুনিবে, সে পর্য্যন্ত কোন দলই পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। মোহাম্মদ হানিফার সংবাদ না জানিয়া, এজিদ-পুরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।”

“ভালই, সংবাদ না জানিয়া এজিদ-পুরীতে যাইব না। ভাল কথা, এই অবসরে বন্দীগণকে উদ্ধার করিলে ক্ষতি কি ?”

“না, না তাহা হইতে পারে না, অগ্রে মহারাজের সংবাদ, তাহার পর পুরী-প্রবেশ। পুরী-প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে রাজসিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা, পরে বন্দীমুক্তি।”

“তবে ক্রমে অগ্রসর হওয়া যা'ক্। ঐ আমাদের সৈন্যগণের জয়ধ্বনি শুনা যাইতেছে। যাহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে গিয়াছিল, তাহারা শীঘ্রই আমাদের সহিত একত্রে মিশিবে।”

আবার সঙ্কেত-সূচক বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মহারাজ জয়নাল আবেদীনের চন্দ্রাতপসংযুক্ত জাতীয় নিশান হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। “জয় মহারাজ আবেদীনের জয় !” সৈন্যগণের মুখে বারবার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। রাজপথে অন্য লোকের গতিবিধি নাই। এজিদ-পক্ষের জন-প্রাণীর নামমাত্রও নগরে নাই। সুন্দর সুন্দর বাড়ী-ঘর সকল শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে।

কিছু দূর যাইতেই দামেস্ক-রাজপুরীর স্বরঞ্জিত অত্যুচ্চ প্রবেশদ্বার সকলের নয়নগোচর হইল। এত সৈন্য, এত অশ্ব, এত উষ্ট্র, এত নিশান এত ডঙ্কা, এত কাড়া-নাকাড়া রাজপথ জুড়িয়া হুলুস্থূল ব্যাপার করিতে করিতে যাইতেছে! ঐ সকল কোলাহল ভেদ করিয়া দ্রুতগতি অশ্ব-সঞ্চালনের 'তড়াক তড়াক' পদশব্দ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু গাজী রহ্‌মানের আজ্ঞা ব্যতীত—বলিতে কি, একটি মক্ষিকারও উড়িয়া বসিবার ক্ষমতা নাই! কাহার সাধ্য—স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে? কাহার সাধ্য,—তাহার সন্ধান লয়? কে সে লোক,—তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে?

মনের কথা মন হইতে সরিতে না সরিতেই বাঁশীর স্বরে কয়েকটি কথা কর্ণে প্রবেশ করিল—"আম্বাজী সংবাদবাহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সংবাদ লইয়া আসিতেছে। রাস্তা পরিষ্কার।" দ্বিতীয়বার বাঁশী বাজিল, শব্দ হইল—"সাবধান।"

সকলেই সাবধান হইলেন। সংবাদবাহীর অশ্ব যেন বায়ুভরে উড়িয়া সকলের বামপার্শ্ব হইয়া চক্ষের পলকে গাজী রহ্‌মানের নিকট চলিয়া গেল। গাজী রহ্‌মানের নিকটস্থ হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সংবাদবাহী বলিতে লাগিল, "দামেস্ক নগরের মধ্য হইতে রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত জীবন্ত জীবের মুখ দেখিতে পাইলাম না। নগর-অভ্যন্তরস্থ পথ, রণক্ষেত্রে গমনের পথ এবং অন্য অন্য পথ-ঘাট মৃতদেহে পরিপূর্ণ,—গমনে মহাকষ্ট! ধরাশয়ী খণ্ডিত দেহ-সকলের সে দৃশ্য দেখিতেও মহাকষ্ট! বহু কষ্টে রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত যাইয়া দেখিলাম—সব শবাকার। খণ্ডিত নরদেহ এবং অশ্বদেহ সকল কতক অল্প রক্তে মাখা, কতক রক্তে প্লাবিত। দেখিলাম: মরুভূমিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত। কি ভীষণ রণ! এজিদ-শিবিরের ভস্মাবশেষ হইতে এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাসহ ধূমরাশি অনবরত গগনে উঠিতেছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম যে, একজন ফকির রণক্ষেত্রের মধ্যে খণ্ডিত দেহসকলের নিকটে যাইয়া কি যেন দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে। তাহার চলনভঙ্গী অনুসন্ধানের ভাব দেখিয়া যথার্থ ফকির বলিয়া সন্দেহ হইল। ত্রস্তে ঘোড়া

ছুটাইয়া ফকির-বেশধারীর নিকটে যাইয়াই দেখি যে, আমাদের গুপ্তচর ওসমান,—তাহার গলায় তস্‌বীহ্‌, হাতে আশা, গায়ে সবুজ পিরহান। দেখা হইবামাত্রই আমাদের পরিচয়, আদর, আহ্লাদ, সম্ভাষণ! তাহারই মুখে শুনিলাম, "মহারাজাধিরাজ মোহাম্মদ হানিফা মদিনাধিপতির সহিত দামেস্ক-নগরে প্রবেশ করেন নাই। ঘোর যুদ্ধের সময়েই তিনি এজিদের সন্ধান করেন! যুদ্ধজয়ের পরক্ষণেই এজিদ তাঁহার চক্ষে পড়ে। এজিদের চক্ষুও চঞ্চল; পশ্চাৎ চাহিতেই তিনি দেখেন যে, সে মহাবীর হানিফার বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় হইতে ঘোর রক্ত-বর্ণের তেজ সহস্র শিখায় বহির্গত হইতেছে; তাঁহার ঘোড়াটিও রক্তমাখা হইয়া এক প্রকার নূতন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার বাম হস্তে—অশ্বের বল্‌গা, দক্ষিণ হস্তে—বিদ্যুৎ-আভা-সংযুক্ত রক্তমাখা সুদীর্ঘ তরবারি, মুখে—'কৈ এজিদ! কৈ এজিদ!', রব। এজিদ আপন নাম শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াই বুঝিলেন,—আর রক্ষা নাই, এক্ষণে পলায়নই শ্রেয়ঃ। যেমনি দেখা, অমনি যুক্তি—পলায়নই শ্রেয়ঃ। এজিদ তখনি অশ্বে কশাঘাত করিলেন—অশ্ব ছুটিল। মহারাজ হানিফাও এজিদের পাশ্চাৎ পশ্চাৎ সিংহ-বিক্রমে দুল্‌দুল্‌ ছুটাইলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি দামেস্ক-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া প্রান্তরের পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর নিকটস্থ হইলেন। পশ্চাৎ-দিক হইতে তীর মারিলেই এজিদের জীবন-লীলা ঐ স্থানেই শেষ হইত। মহারাজ হানিফা একবার এজিদের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন যে, অসির আঘাত করিলে এজিদ-শির তখনই ভূতলে লুণ্ঠিত হইত। পশ্চাৎ দিক হইতে এজিদকে কোন অস্ত্রাঘাত করিবেন না, সম্মুখ হইতেই আক্রমণ করিবেন,—এই আশাতেই বোধ হয়, মহাবেগে তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন। কিন্তু এজিদও এমনভাবে অশ্ব চালাইলেন যে, কিছুতেই মহারাজকে তাঁহার অগ্রে যাইতে দিলেন না। দেখিতে দেখিতে আর দেখা গেল না। প্রথমতঃ, অশ্বের অন্তর্দ্ধান, শেষে আরোহীদ্বয়ের মস্তক পর্য্যন্ত চক্ষের অগোচর! আর কোনও সন্ধান নাই। কয়েকজন আম্বাজী অশ্বারোহী সৈন্য মহারাজ হানিফার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, কিন্তু তাহারা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। এই শেষ সংবাদ।"

সংবাদবাহী অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। গাজী রহমান আর অপেক্ষা করিলেন না। রাজপুরীমধ্যে অগ্রে পদাতিক সৈন্য-প্রবেশের অনুমতি করিলেন। তাহার পর অশ্বারোহী বীরগণ পুরীমধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। তৎপরে মহারথিগণ এজিদপুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। বীর-দর্পে জয় ঘোষণা করিতে করিতে সকলেই প্রবেশ করিলেন। সে বীর-দর্পে, জয়-রবে রাজপ্রাসাদ কাঁপিতে লাগিল, সিংহাসন টলিল। সে রব দামেস্কের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিল।

গাজী রহ্‌মান, মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী ও অন্যান্য রাজগণ মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীনকে ঘিরিয়া "বিসমিল্লাহ্" বলিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরীমধ্যে একটি প্রাণীও তাঁহাদের নয়নগোচর হইল না। সকলই রহিয়াছে, যেখানে যাহা প্রয়োজন,—সকলই পড়িয়া রহিয়াছে,—এখনই যেন পুরবাসীরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পরে সকলে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও ঐ ভাব ;—কেহই নাই। অস্ত্রধারী, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি যাহা কিছু নয়নগোচর হয়,—সকলই তাঁহাদের। ক্রমে ক্রমে তৃতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত ; সেখানেও ঐ কথা। গৃহসামগ্রী যেখানে যেরূপ সাজান, ঠিক তাহাই আছে, কোনরূপ রূপান্তর হয় নাই। গৃহবাসীরা এখনই গৃহ ছাড়িয়া —এখনই তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র ফেলিয়া যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রাসাদের পর প্রাসাদ, কক্ষের পর কক্ষ, শেষে অন্তপুর-মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। কি আশ্চর্য্য—সেখানেও সেইভাব। সকলই আছে,— রাজপুরী মধ্যে যাহা যাহা প্রয়োজন,—সকলই রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা আপন সৈন্যসামন্ত ও তুরী, ভেরী, নিশানধারিগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কক্ষে কক্ষে সন্ধান করিয়াও জনপ্রাণীর দেখা পাইলেন না ;— ভাবে বোধ হইল, অন্তঃপুরবাসীরা যেন কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে। কোথায় সে গুপ্ত স্থান ?—তাহারও কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। জয়ের পর—যুদ্ধ জয়ের পর, বিপক্ষ রাজপুরীতে প্রবেশের পর,—রাজ-প্রাসাদ অধিকারের পর যাহা হইয়া থাকে, তাহাই আরম্ভ হইল। দুই হস্তে লুট। প্রথমতঃ, সৈন্যগণের লুট,—তারপর যে যাহা পাইল, তাহা আপন অধিকারে

আনিল। কত গুপ্তগৃহের কপাট ভগ্ন হইল। হীরা, মতি, মণি, কাঞ্চন,—কত রাজবসন, কত মণিমুক্তা-খচিত আভরণ, রাজব্যবহার্য্য দ্রব্য। যাহার হস্তে যাহা পড়িতেছে,—সেই-ই তাহা লইতেছে। আর যাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছে, তাহাই ভাঙ্গিয়া ছারখার করিতেছে।

নব-ভূপতি মহারথিগণে বেষ্টিত হইয়া, ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া "আল্‌হামদ্‌-লিল্লাহ্" বলিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বিজয়-বাজনা বাজিতে লাগিল। রাজ-নিশান শতবার শির নামাইয়া দামেস্কাধিপতির বিজয়-ঘোষণা করিল। অন্যান্য রাজগণ নতশিরে অভিবাদন করিয়া রাজ-সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন এবং রক্তমাখা তরবারি হস্তে যথোপযুক্ত আসনে রাজাদেশে উপবেশন করিলেন। সৈন্যগণ নিষ্কোষিত অসি হস্তে নব ভূপতির বিজয় ঘোষণা করিয়া নতশিরে অভিবাদন করিলেন।

গাজী রহ্‌মান রাজসিংহাসন চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিভিন্ন দেশীয় মহামাননীয় ভূপতিগণ! রাজন্যগণ! মাননীয় প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ! সৈন্যগণ! যুদ্ধ-সংশ্রবী বীরগণ এবং সভাস্থ বন্ধুগণ! দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের বলবিক্রমের সহায়ে ও সাহায্যে আজ জগতে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপিত হইল। ধর্ম্মের জয়,—অধর্ম্মের ক্ষয়, তাহারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত রেখায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিল। এই দামেস্ক-সিংহাসন আজ বক্ষ পাতিয়া যে ভূপতিকে উপবেশন-স্থান দিয়াছে, ইহা এই নব ভূপতিরই পৈতৃক আসন। যে কারণে এই আসন হজরত মাবিয়ার করতলস্থ হয়, তদ্বিবরণ এক্ষণে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয়, আপনারা সকলেই তাহা অবগত আছেন। মহাত্মা মাবিয়া যে যে কারণে এজিদের প্রতি নারাজ হইয়া যাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রতিদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; যে কৌশলে এজিদ মহামান্য প্রভু হাসান-হোসেনকে বঞ্চনা করিয়া এই রাজ্য যে ভাবে নিজ অধীনে রাখিয়াছিলেন, সে বিষয়ও কাহারও অবিদিত নাই। ইমাম-বংশ একেবারে ধ্বংস করিয়া নির্ব্বিবাদে দামেস্ক এবং মদিনারাজ্য একচ্ছত্ররূপে ভোগ করিবার অভিলাষ

করিয়া যে কৌশলে এজিদ—প্রভু হাসানের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন, যে কৌশলে ইমাম হোসেনকে নূরনবী মোহাম্মদের রওজা হইতে বাহির করিয়া কুফায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই শুনিয়াছেন। মহাপ্রান্তর কারবালার ঘটনা যদিও আমরা চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু মদিনাবাসীদিগের মুখে যে প্রকার শুনিয়াছি, তাহা আমার বলিবার শক্তি নাই। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল, তাহাই হইয়াছে। তাহার পর যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ত আপনারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।"

"যে দিন দামেস্ক-প্রান্তরে আমাদের শেষ আশা—মুসলমান জগতের শেষ আশা—ইমাম বংশের একমাত্র রত্ন, পবিত্র সৈয়দ-বংশের একমাত্র অমূল্য নিধি,—এই নবীন মহারাজ জয়নাল আবেদীনকে এজিদ শূলে চড়াইয়া প্রাণবধের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দিন এজিদ-প্রেরিত সন্ধিপ্রার্থী দূতবরকে যে যে কথা বলিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছিলাম, মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবান আজ আমাদিগকে সেই শুভদিনের মুখ দেখাইলেন, আমাদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাইলেন। কিন্তু আশা মিটিল না, মনোবিকার মন হইতে একেবারে বিদূরিত হইল না,—সম্পূর্ণরূপে মনের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরের লীলা কে বুঝিবে? সিংহাসন অধিকারের পূর্ব্বে মহারাজ হানিফার তরবারি এজিদ-রক্তে রঞ্জিত হইতে দেখিলাম না। সে মহাপাপীর পাপময় শোণিতবিন্দু মোহাম্মদ হানিফার তরবারি বহিয়া দামেস্ক-ধরায় নিপতিত হইতে দেখিলাম না। সেই স্বেচ্ছাচারী, পরশ্রীকাতর, দামেস্কের কলঙ্ক, মহাত্মা মাবিয়ার মনো-বেদনাকারী এজিদের শির দামেস্ক-প্রান্তরে লুণ্ঠিত হইতে দেখিলাম না। আক্ষেপ রহিয়া গেল। আরও আক্ষেপ এই যে, এই শুভ সময়ে রাজশ্রী মোহাম্মদ হানিফাকে রাজসিংহাসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিলাম না। সময়ে সকলই হইল। কিন্তু সুখসময়ে উপস্থিত দুইটি অভাব রহিয়া গেল। না জানি বিধাতা ইহার মধ্যে কি আশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছেন! দয়াময় ভগবান কি কৌশল করিয়া, কি কৌশলজাল-বিস্তারে আম্বাজ-অধিপতিকে কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন! যে পর্য্যন্ত সন্ধান পাইলাম, তাহাতে আশঙ্কার কথা কিছুই নাই। তবে সম্পূর্ণরূপে মনের আনন্দ অনুভব করিতে

পারিলাম না (আনন্দধ্বনি)। অনেক শুনিলাম, এ জীবনে অনেক দেখিলাম। আশ্চর্য্য ঈশ্বর-লীলা! ঈশ্বরভক্ত—ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের সাংসারিক কার্য্য কখনই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না। তাঁহারা আজীবন কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন,—পরিবারগণকেও যে কি সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিয়াছেন, তাহাও দেখিলাম! অনেক অজ্ঞ লোক এই সকল ঘটনায় প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে না পারিলেও মনে মনে অবশ্যই বলিয়া থাকে যে, ভক্ত প্রেমিকের দশাই এইরূপ।"

"পয়গম্বরগণ যে ঈশ্বরের এত ভালবাসার পাত্র, এত প্রিয়—প্রিয়জন, তাঁহারাও সময় সময় মহাকষ্টে পতিত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছেন। প্রিয় বন্ধুগণ! সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ! আপনারা অবগত আছেন,—হজরত নূহকে তুফানে, ইব্রাহিমকে আগুনে মানবচক্ষে কতই না কষ্ট পাইতে হইয়াছে! —আর দেখুন! হজরত সোলেমান রাজা ও পয়গম্বর।—রাজা কেমন? —সর্ব্বপ্রাণীর উপর তাঁহার রাজত্ব, সর্ব্বজীবের উপর তাঁহার আধিপত্য ও অধিকার। পয়গম্বর কেমন?—পরিবার-পরিজন ও সৈন্যসামন্ত-সহ তাঁহার সুসজ্জিত সিংহাসন এই জগদ্ব্যাপী বায়ু মাথায় করিয়া শূন্যে শূন্যে বহিয়া লইয়া যাইত। তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতে দেব, দৈত্য, দানব, জ্বেন, পরী সাগরে —জঙ্গলে,—পর্ব্বতে কোথায় কে লুকাইত, তাহার আর সহজে সন্ধান পাওয়া যাইত না। এমন যে দেব-দৈত্য-দানব-দলনকারী নরকিন্নর পূজিত ভূপতি ও পয়গম্বর, তাঁহাকেও মহাবিপদে পতিত হইতে হইয়াছে। তাঁহার হস্তস্থিত মহাগৌরবান্বিত ও শক্তিশালী অঙ্গুরী হারাইয়া চল্লিশ দিবস তিনি কি কষ্টই না ভোগ করিয়াছিলেন। বিধির বিধানে, এক ধীবরের নিকট মজুরী-স্বরূপ দৈনিক দুইটি মৎস্য প্রাপ্ত হইবেন—এই নিয়মে চাকুরী স্বীকার করিয়া তাঁহাকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হইয়াছিল।—চাকুরী বাঁচাইতে মৎস্যের বোঝা মাথায় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।—বাধ্য হইয়া দায়ে পড়িয়া ধীবর-কন্যাকে বিবাহ করিতে পশ্চাৎপদ হইতে, কি অসম্মতি প্রকাশ করিতে তাঁহার সাধ্য হয় নাই—পারেনও নাই। এত বড় মহাবীর হজরত মোহাম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজা—কোরেশ-বংশে কেন, সমগ্র আরব দেশে যাঁহার

তুল্য বীর আর কেহ ছিলেন না, সেই মহাবীর হাম্‌জাকেও একটি সামান্য স্ত্রীলোক-হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। পয়গম্বরই হউন, আর মহাবীর গাজীই হউন,—উচ্চমস্তকে, উচ্চগৌরবে, নিষ্কলঙ্কে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুভ্রবসনে এই মায়াময় কুহকিনী ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে সরিয়া যাইতে কেহই পারেন না। —ইহাতে মোহাম্মদ হানিফা—আমাদের আম্বাজ-অধীশ্বর যে, অক্ষত শরীরে নিষ্কলঙ্কভাবে সর্ব্বদিকে সুবাতাস বহাইয়া, বিজয়নিশান উড়াইয়া, বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া, জগতে অক্ষুণ্ন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে যাইবেন, ইহা ত কখনই বিশ্বাস হয় না! মহাকৌশলী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের এ লীলার অর্থ কে বুঝিবে?—এ গুপ্ত রহস্য ভেদ কে করিবে? ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বর-প্রেমিক জীবনই কি এত কণ্টকময়—সে জীবনের কি এত বিপদ,—এত যন্ত্রণা! অপ্রেমিক অধার্ম্মিক এ জগতে এক প্রকার সুখী, অনেক কার্য্যই তাহারা সুন্দর মত সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরের সহিত সম্পন্ন করিয়া লয়!"

"ঈশ্বর-প্রেমিকগণ এবং তাঁহাদের পরিবারগণ কেন সংসারচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া এত ক্লেশ, এত দুঃখ ভোগ করেন, তাহার কারণ হয় ত অনেকেই অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা বুঝিলে এ প্রশ্নের উত্তরের, বোধ হয়, অতি সহজেই মীমাংসা হয়। প্রেমিকের প্রেম পরীক্ষাই ইহার মূলতত্ত্ব এবং তাহাই উদ্দেশ্য; দৈহিক কষ্ট জগতে কিছুই নহে! আত্মার বল এবং পরকালের সুখই যথার্থ সুখ,—অনন্তধামের অনন্ত সুখভোগই যথার্থ সুখসম্ভোগ!"

"দামেস্ক নগরের মাননীয় বন্ধুগণ! আপনারা পূর্ব্ব হইতেই ইমামবংশের প্রতি মনে মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে আমাদের এই নবীন ভূপতির কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় খোৎবা পাঠ-সময়ের ঘটনার কথায় শুনিয়াছি। ভাগ্যক্রমে অদ্য স্বচক্ষেই তাহাও দেখিতেছি। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। রাজানুগ্রহ চিরকাল আপনাদের প্রতি সমভাবে থাকুক,—ইহাই সেই সর্ব্বাধীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি।"

দামেস্ক নগরস্থ ইমামভক্ত দলপতিগণের মধ্য হইতে মহাসম্ভ্রান্ত এবং

মাননীয় কোন মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা চিরকালই হজরত নূরনবী মোহাম্মদের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস, মহাবীর হজরত মোরতজা আলীর চিরভক্ত। মধ্যে কয়েক দিন মহামহিম হজরত মাবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্তভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম রক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছি। হজরত মাবিয়ার পীড়ার সময় হইতেই আমাদের দুর্দ্দশার সূচনা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর মন্ত্রিপ্রবর হামানের অপদস্থ হওয়ায় এবং এজিদ-দরবারে বৃদ্ধ মন্ত্রীর বয়সদোষে বুদ্ধি-বিবেচনায় ভ্রম জন্মিয়াছে, —মারওয়ানের বিবেচনায় এই কথা সাব্যস্ত হওয়ার পর হইতেই আমাদের দুর্দ্দশার পথ সহজেই পরিষ্কার হইয়াছে। আর কোথায় যাই, এক প্রকার জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া দামেস্কে বাস করিতেছিলাম; এইক্ষণে দয়াময় জগদীশ্বর, যাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদের হস্তেই পুনঃ অর্পণ করিলেন; আমাদের জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ সকলই ইহকাল পরকাল হইতে উপশম হইল। আমরা দুই হস্ত তুলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীনের রাজমুকুট চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে পবিত্র শিরে শোভাবর্দ্ধন করুক। আর আমরাও মনের সহিত রাজসেবা করি, পুণ্য-ভূমি মদিনার অধীনস্থ হইয়া চিরকাল গৌরবের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকি। মদিনার অধীনতা স্বীকার করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মহারাজ জয়নাল আবেদীনের মঙ্গল কামনা করি। আজ মনের আনন্দে নবীন মহারাজের বিজয়-ঘোষণা করিয়া মনের আবেগ দূর হইল; শান্তি-সুখে সুখী হইয়া ভাগ্যবান্ হইলাম।"

বক্তার কথা শেষ হইতে না হইতেই শাহী দরবার হইতে সহস্র মুখে "জয় জয়নাল আবেদীন" রব উচ্চারিত হইয়া প্রবাহিত বায়ুর সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, "জয় জয়নাল আবেদীন!" সকলেই নতশিরে নবীন মহারাজের সিংহাসন চুম্বন করিলেন এবং যথোপযুক্ত উপঢৌকনাদি রাজগোচর করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন, ইহকাল এবং পরকালের আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া শত শত বার সিংহাসন চুম্বন করিলেন। সে সময় সাদিয়ানা-বাদ্য বাদিত না হইয়া রণবাদ্যই বাজিতে

লাগিল। কারণ, এজিদের কোন সংবাদ নাই; এজিদ-বধের কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। দরবার বরখাস্ত হইল। মহারাজ জয়নাল আবেদীন, গাজী রহমানের মন্ত্রণায় জননী, ভগ্নী এবং অন্যান্য পরিজনকে বন্দীগৃহ হইতে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন করিতে ওমর আলী ও আক্কেল আলীসহ রাজপ্রাসাদ হইতে বন্দী-গৃহে যাত্রা করিলেন, অন্যান্য রাজগণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম-সুখ প্রয়াসী হইয়া বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন। দ্বারে প্রহরী খাড়া হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ, সৈন্যগণ, দামেস্ক-সৈন্যনিবাসে যাইয়া সজ্জিত কক্ষসকল নির্দ্দিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় প্রবাহ

দয়াময় ভগবান্! তোমার কৌশল-প্রবাহ কখন কোন্ পথে কত ধারে যে অবিরত ছুটিতেছে, তোমার কৃপাবারি কখন কাহার প্রতি কত প্রকারে কত আকারে যে ঝরিতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া বুঝিবার সাধ্য জগতে কাহারও নাই! সে লীলা-খেলার যথার্থ মর্ম্ম কলমের মুখে আনিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতাও কোন কবির কল্পনায় নাই! কাল যে জয়নাল আবেদীন দামেস্ক-কারাগারে এজিদ-হস্তে বন্দী, প্রাণভয়ে আকুল;—আজ সেই দামেস্ক-সিংহাসনই তাঁহার বসিবার আসন, দামেস্ক-রাজ্যে তাঁহার পূর্ণ অধিকার—রাজপুরী পদতলে, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী প্রাণ তাঁহার করমুষ্টিতে। কাল জয়নালের বন্দীবেশে বন্দীগৃহ হইতে পলায়ন,—শূলে প্রাণবধের ঘোষণা শুনিয়া পর্ব্বতগুহায় আত্মগোপন,—নিশীথ সময় স্বজন-হস্তে পুনরায় বন্দী, চির-শত্রু মারওয়ান সহ একত্র এক সময় বন্দী! আজ হামান জীবনের মত বন্ধন-দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন! আর জয়নাল আবেদীনের শিরে রাজমুকুট শোভা পাইতেছে! ধন্য রে কৌশলী! ধন্য ধন্য তোমার মহিমা!

আবার এ কি দেখিতেছি! এখনই কি দেখিলাম, আবার এখনই বা কি দেখিতেছি। এই কি সেই বন্দীগৃহ! যে বন্দীগৃহের কথা মনে পড়িলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, হৃদয়ের শোণিতাংশ জলে পরিণত হয়, এ কি সেই বন্দীগৃহ! ইহাকে যে সূর্য্যের অধিকারে একবার দেখিয়াছি, এখনও সে অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও সেই সূর্য্য লোহিত সাজে সাজিয়া পররাজ্যে দেখা দিতে জগৎ-চক্রে চক্ষুর অন্তরাল হয় নাই,—ইহারই মধ্যে এই দশা! এত পরিবর্ত্তন? কৈ, সেই যমদূত-সদৃশ প্রহরী কৈ? সে নির্দ্দয় নিষ্ঠুরেরাই বা কোথায়? শাস্তির উপকরণ লৌহশলাকা, জিঞ্জির, কটাহ, মুষল, সকলই ত পড়িয়া আছে। জীবন্ত জীব কোথায়? কৈ কাহাকেও ত দেখিতেছি না? কেবল দেখিতেছি—জীবনশূন্য দেহ, আর চর্ম্মশূন্য মানব-শরীর।

কেন নাই? এদিকে একটি প্রাণীও কেন নাই?—যে দিকে থাকিবার সে দিকে আছে। প্রভু হোসেন-পরিবার যে দিকে বন্দী, সে দিকে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। সেই কণ্ঠনিনাদ, সেই স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত্তবিলাপ, সেই মর্ম্মান্তিক বেদনাযুক্ত গত কথা, কিন্তু—ভাব ভিন্ন, অর্থ—ভিন্ন, কণ্ঠ—ভিন্ন।

"হায়! কোথায় আমি—জয়নাব,—সামান্য ব্যবসায়ী দীন হীন দরিদ্রের কুলবধূ,—দৈহিক শ্রমোপার্জ্জিত সামান্য অর্থাকাঙ্খীর সহধর্ম্মিণী! রাজাচার—রাজব্যবহার—রাজ-পরিবারগণের অতি উচ্চ সুখ-সম্ভোগের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? আমি রাজ-অন্তপুরে কেন? মদিনার পবিত্র রাজ-পুরী মধ্যে জয়নাবের বাস অতি আশ্চর্য্য! দামেস্কের রাজ-কারাগারে বন্দিনী—সে আরও আশ্চর্য্য! আমার সহিত এ কারাগৃহের সম্বন্ধ কি? হায়! আমার নিজ জীবনের আদি-অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত প্রমাণ হইবেঃ এই হতভাগিনীই বিষাদ-সিন্ধুর মূল।—জয়নাবই এই মহা প্রলয়কাণ্ডের মূল কারণ। হায়! হায়!! আমার জন্যই নূরনবী মোহাম্মদের পরিবার—পরিজন প্রতি এই সাংঘাতিক অত্যাচার! হায় রে! আমার স্থান কোথায়? আমি পাপীয়সী! আমি রাক্ষসী! আমার জন্য "হাবিয়া" নরক-দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। কি পরিতাপ! আমার জন্যই জাএদার কোমল অন্তরে হিংসার সূচনা। এ হতভাগিনীর রূপ-গুণেই জাএদার

মনের আগুনের দ্বিগুণ—ত্রিগুণ—পঞ্চগুণ বৃদ্ধি! অবলা প্রাণে কত সহিবে? পতিপ্রাণা ললনা আর কত সহ্য করিবে? সপত্নীবাদ জনিত মনের আগুণ কি নির্ব্বাপিত হয়?—সপত্নী ছাড়িয়া শেষে স্বামীকেই আক্রমণ করে। মন যাহা চায় নিয়তির বিধান থাকিলে তাহা পাইতে কতক্ষণ? খুঁজিলেই পাওয়া যায়। মায়মুনার মনোসাধ পূর্ণ করিতে জাএদার প্রয়োজন; জাএদার মনোসাধ পূর্ণ করিতে মায়মুনার আবশ্যক। সময়ে উভয়ের মিলন হইল, সোনায় সোহাগা মিশিল। শেষে নারীহস্তে—উহু! মুখে আনিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়,—বিষ!—মহাবিষ!" (নীরব)

জয়নাব কর্ণে শুনিতেছেন: নগরের জনকোলাহল, সৈন্যগণের ভৈরব নিনাদ —কাড়া-নাকাড়া দামামার বিঘোর রোল;—মধ্যে মধ্যে জয়-উল্লাসের সহিত জয়নাল আবেদীনের নাম। মৃদু মৃদু স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এ কি! আজি আবার ও কি শুনি! এত জনকোলাহল কিসের জন্য? অনেকক্ষণ তিনি স্থির কর্ণে,—স্থির মনে রহিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলেন: বন্দীগৃহের দ্বারে দ্বারে যেখানে রক্ষীগণ পাহারা দিতেছিল, সেখানে কেহই নাই!—সমুদয় দ্বার উন্মুক্ত। দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলেন: বিবি সালেমা, শাহ্‌রেবানু, হাস্‌নেবানু ম্লান বদনে নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। ক্ষণে ক্ষণে শাহ্‌রেবানু কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, "ওরে বাপ্! বাবা জয়নাল! তুই কোথা গেলি বাপ্? তুই আমার কোলে আয় বাপ্!"—জয়নাব যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই রহিলেন এবং পূর্ব্ব কথা বলিতে লাগিলেন।

"উহু! বিষ!—জাএদার হস্তে বিষ!! যদি হতভাগিনী জয়নাব হাসানের দাসীশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা না হইত, যদি তাহার রূপ গুণ না থাকিত, যদি সে স্বামীসোহাগিনী না হইত, তাহা হইলে জাএদার হস্তে কখনই বিষ উঠিত না—মায়মুনার কথা কখনই জাএদা শুনিত না।—এই হতভাগিনীর জন্যই বিষ! এজিদ-মুখে শুনিয়াছি,—সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় যাইতে গবাক্ষদ্বারে সে আমাকে দেখিয়াছিল। কত চক্ষু এজিদকে দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল, আমি নাকি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া গবাক্ষদ্বার বন্ধ করিয়াছিলাম! আমার ত কিছুই মনে হয় না! পাপিষ্ঠ আরও বলিল,—সে

দিন আমার মস্তকোপরি চিকুর-সংলগ্ন মুক্তার জালি ছিল, কর্ণে কর্ণাভরণ দুলিতেছিল। ছিঃ ছিঃ! কেন গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই কুলক্ষণযুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে অবস্থানই আমার কাল হইয়াছিল! এই মহা দুর্ঘটনার কারণই গবাক্ষ-দ্বারে আমার অবস্থান,—বিনা আবরণে মস্তক উলঙ্গ করিয়া দণ্ডায়মান। এখন বুঝিলাম, সেই শাহীনামার মর্ম্ম! এখন বুঝিলাম: রাজ-প্রাসাদে আবদুল জব্বারের আহ্বানের অর্থ! এখন বুঝিলাম: সামান্য দরিদ্র-গৃহে রাজ-কাসেদের শাহীনামা লইয়া গমন, আবদুল জব্বারের নিমন্ত্রণের মন্ত্রণা,—সকলই চাতুরী। এরূপ আহ্বান, আদর, সমাদর, নামা প্রেরণ,—সকলই আমার জন্য। এজিদের চাতুরী আবদুল জব্বার কি বুঝিবে? রাজ-জামাতা হইয়া আশার অতিরিক্ত সুখভোগ করিবে, সামান্য ব্যবসায়ী—সামান্য অর্থের জন্য যে লালায়িত—সে রাজকুমারী সালেহাকে লাভ করিয়া জীয়ন্তে স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, নরলোকে বাস করিয়া স্বর্গীয় অপ্সরার সহিত মিলিত হইয়া পরমাত্মাকে শীতল করিয়া সুখী হইবে! সেই আশাতেই আমাকে বিনা অপরাধে আবদুল জব্বার পরিত্যাগ করিল! কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়! কি কপট! সেই শাহীনামা প্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত অমার দুঃখ দেখিয়া তাহার কত আক্ষেপ, কত মনোবেদনা প্রকাশ!—কি কপট! রন্ধনশালার কার্য্যে অগ্নির উত্তাপে আমার মুখের ঘর্ম্ম-বিন্দু মুক্তা-বিন্দু আকারে ফুটিয়াছিল!—ছাই-কয়লার কালি বস্ত্রে—হস্তে লাগিয়াছিল! সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া দর্পণে আমার ছায়া আমাকে দেখান হইল! বলা হইল—"টাকা থাকিলে কি এত দুঃখ তোমার হয়? আমার প্রাণে কি ইহা সহ্য হয়?" কত প্রকার আক্ষেপ আবদুল জব্বার করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল সে হাতে হাতে দেখাইল। সেই দিনই তাহার দামেস্কে যাত্রা।—রাজপ্রাসাদে সে সাদরে গৃহীত! যেমনই প্রস্তাব, অমনই অনুমোদন—আমাকে পরিত্যাগ! ধন্য বিবি সালেহা! স্পষ্টই তিনি উত্তর করিলেন: এক স্ত্রীর সহিত যখন এই ব্যবহার—অর্থলোভে চিরপ্রণয়ী প্রিয়-পত্নীকে পরিত্যাগ,—তখন আর বিশ্বাস কি? আবদুল জব্বারের সহিত তাঁহার বিবাহে অস্বীকার—যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল! এজিদেরই জয়! এজিদেরই মনোবাসনা পূর্ণ!—কৌশলে জয়নাবকে হস্তগত

করিবার উপায়-পথ আবিষ্কার! আবদুল জব্বারের হা-হুতাশ—পরিতাপ সার!—রাজপুরী হইতে গুপ্তভাবে বহির্গত হইয়া জনতার মধ্যে তার আত্মগোপন! সংসারে—তার ঘৃণা, পরিণামে ফকিরী গ্রহণ!—সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! আমার অদৃষ্টে যাহা লেখা ছিল, তাহাই হইয়া গেল। বিধবা হইলাম। পূর্ণ বয়সে স্বামী-সুখে বঞ্চিত হইলাম। আর কোথায়? কোথায় যাইব? পিত্রালয়ে আসিলাম।"

"পাপাত্মা এজিদ মনোসাধ পূর্ণ করিবার আশা-পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহার নিজ ভাব ও গতি অনুসারে কাসেদ পাঠাইবার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিয়াছিল: স্ত্রীলোক যাহা চায়—তাহাই আমার আছে, ধনরত্ন অলঙ্কারের ত অভাব নাই!—তাহার উপর দামেস্ক-রাজ্যের পাটরাণী! প্রভু হাসানের প্রস্তাব শুনিয়া এজিদের ধনরত্ন, পদমর্য্যাদা, দামেস্কের সিংহাসন এই পায়ে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মোস্‌লেমের শেষ প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলাম। পরিণয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইবার পর আর সংসারে মন লিপ্ত হইল না।—পরকালের উদ্ধার-চিন্তাই বেশী হইয়াছিল। জগৎ কিছু নয়;—সকলই অসার। ধন, জন, স্বামী, পুত্র, মাতা, পিতা কেহ কাহারও নয়, যাহা কিছু সত্য—সম্পূর্ণ সত্য, তাহা সেই সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা। পরকালে মুক্তি হইবে, সেই আশাতেই প্রভু হাসানের মুখ পানেই চাহিলাম। কিন্তু বড় কঠিন প্রশ্নে পড়িলাম। একদিকে জগতের অসীম সুখ, অন্য দিকে ধর্ম্ম ও পরকাল—অনেক চিন্তার পর দ্বিতীয় সঙ্কল্পের দিকেই মন টলিল। মহারাণী হইতে ইচ্ছা হইল না। সময় কাটিয়া গেল, বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল। সময়ে প্রভু হাসানের দর্শনলাভ ঘটিল। ঈশ্বর-কৃপায় সে সুকোমল পদসেবা করিতে অধিকারিণী হইলাম। প্রভু ধর্ম্ম-শাস্ত্রমতে আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। আবার সংসারী হইলাম। প্রভু হাসান অতি সমাদরে আমাকে মদিনায় লইয়া নিজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিলেন। নূতন সংসারে অনেক কিছুই নূতন দেখিলাম। পবিত্র অন্তঃপুরের পবিত্রতা, ধর্ম্মচর্চ্চা, ধর্ম্মমতের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মক্রিয়া—অনেক কিছুই দেখিলাম, অনেক কিছুই শিখিলাম। মুক্তিক্ষেত্রে আশালতার অঙ্কুরিত ভাব দেখিয়া মনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ

হইল। কিন্তু সংসারচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া, সপত্নী-মনোবাদ জনিত হিংসা-আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে হইল। তাহাতেই বুঝিলাম ঃ জগতে সুখ কোথাও নাই। দৈহিক জীবনে মনের সুখ কোন স্থানেই নাই। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, দুঃখী, ভিখারী, মহামানী, মহামহিম, বীরকেশরী আন্তরিক সুখ সম্বন্ধে সকলেই সমান—রাজরাণী, ভিখারিণী, ধনীর সহধর্ম্মিণী, দুঃখিনীর নন্দিনী সকলেরই মনের সুখ সমতুল্য। প্রাণে আঘাত লাগিলে মুখ বন্ধ থাকে না। পবিত্রপুরী মধ্যে থাকিয়া এই হতভাগিনী—সপত্নীবাদেই সমধিক মনোবেদনা ভোগ করিয়াছে। সপত্নী সহ একত্র বাস,—এক প্রকার জীয়ন্তে নরক-ভোগ! আমি কিন্তু প্রকাশ্যে ছিলাম ভাল। কারণ, যেখানে প্রভুর আদর—সেখানে অন্যের অনাদরে দুঃখ কি? সপত্নীবাদেও রহস্য আছে।—যেখানে সপত্নীবাদ, সেইখানেই শুনা যায়—স্বামীর চক্ষে কনিষ্ঠা স্ত্রীই আদরের ও পরম রূপবতী। পূর্ব্বে জাএদার ভাগ্যাকাশে যে যে প্রকারে স্বামীর ভালবাসার তারকারাজি ফুটিয়া চম্‌কিয়াছিল,—আমার ভাগ্যবিমানেও তাহাই ঘটিল।—আমিই যখন কনিষ্ঠা স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসায় আমিই সম্পূর্ণ অধিকারিণী।—সাধারণ মতে আমিই স্বামীর হৃদয়, অন্তর, প্রাণ ষোল আনা অধিকার করিয়া বসিয়াছি।—এই কারণেই আমি জাএদার চক্ষের বিষ! এই কারণেই স্বামীবধে মহাবিষের আশ্রয়গ্রহণ! এক বিষের কথাতেই এত কথা মনে হইল। প্রভুর অন্তঃপুরে আমি জাএদার চক্ষের বিষ। আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গার হইয়াই বাস করিতে হইল। স্বামীর হাব-ভাব, বিচার-ব্যবস্থায় তিন স্ত্রীর মধ্যে প্রকাশ্যে ইতর-বিশেষ কিছুই ছিল না। জাএদার চক্ষে আমি যাহা—হাস্‌নেবানুর চক্ষে কিন্তু আমি তাহার বিপরীত! হাস্‌নেবানু স্বামীগত-প্রাণ, স্বামীকে অকপটে হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন! সেই ভালবাসা—স্বামীর গুপ্ত ভালবাসা আমাকে ভাবিয়া—ভালবাসার ভালবাসা-জ্ঞানে আমাকেও তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসিলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিলেন।—আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসার কারণ কি? আমার মনে হইল যে, সপত্নী জাএদা তাঁহার অন্তরে যে প্রকার দুঃখ দিয়াছিল, আমার দ্বারা তাহা পরিমাণ অনুযায়ী পরিশোধ হইল ভাবিয়াই,

বোধ হয়, আমি ভালবাসা পাইলাম। জাএদাকে তিনি যে প্রকার বিষ-নয়নে দেখিতেন, জাএদা আমাকেও সেই প্রকার বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিল। সুতরাং, শত্রুর শত্রু—মিত্র। ইহাতে আমি হাসনেবানুর প্রিয় সপত্নী। সপত্নী—সম্পর্কে, কিন্তু স্নেহে আদরে ভালবাসায় প্রিয়তমা সহোদরা। জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠাকে যে যে প্রকারের সুমিষ্ট বচনে, উপদেশ-আজ্ঞায় সতর্ক করেন, হাসনেবানু আমাকেও সেই প্রকারে ভালবাসার সহিত নানা বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক করিতেন। আমিও তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে, দেখিয়াছি, এ পর্য্যন্তও দেখিতেছি। কোন সময়ে জাএদা বিবির সহিত চোখে মুখে নজর পড়িলেই সর্ব্বনাশ। সে তীব্র দৃষ্টির ভাব যেন এখনও আমার চক্ষের উপর আঁকা রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পারেন ত তিনি চক্ষের তেজে আমাকে দগ্ধ করিয়া ছাই করেন!—জীবন্ত গোরে পুঁতিতে পারিলেই যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন!—এমনই রোষ, এমনই হিংসার তেজ যে, অমন সুন্দর মুখখানি, আমার মুখের উপর নজর পড়িতেই, যেন বিকৃত হইত।—কে যেন এক পেয়ালা বিষ সেই মুখের উপর ঢালিয়া দিত। কিছু দিন যায়। একদিন অতি প্রত্যুষে মেঘের গুড়্ গুড়্ শব্দের ন্যায় ডঙ্কা, কাড়া, নাকাড়াধ্বনি কানে আসিল। মনে আছে,—খুব মনে আছে: প্রভাত হইতে না হইতেই মদিনাবাসীরা ঈশ্বরের নাম করিয়া বীর-মদে মাতিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে যুবা বৃদ্ধ সকলের শরীরেই চর্ম্ম, বর্ম্ম, তীর, তরবারি শোভা পাইতে লাগিল। রূপের আভা, অস্ত্রের আভা,—সজ্জিত আভায় সমুদিত দিনমণির অদ্বিতীয় উজ্জ্বলাভা সময়ে সময়ে যেন মলিন বোধ হইতে লাগিল।"

"প্রভুও সজ্জিত হইলেন,—বীরসাজে সাজিলেন। সে সাজ আমার চক্ষে সেই-ই প্রথম,—এখনও যেন চক্ষের উপর ঘুরিতেছে। দেখিলাম: প্রভুই সকলের নেতা। কিছুক্ষণের পরে দেখি: বীর-প্রসবিনী মদিনার বীরাঙ্গনাগণও মুক্তকেশে অসি-হস্তে দলে দলে প্রভুর নিকটে আসিয়া যুদ্ধে যাইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কাহার সহিত যুদ্ধ?—কে সে লোক যে, কুলের কুল-বধূরাও পর্য্যন্ত অসি-হস্তে সে মহাপাপীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে? শেষে শুনিলাম: এজিদের আগমন,—মদিনা আক্রমণের উপক্রম। ধন্য মদিনা!

বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে ধর্ম্ম রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা, জাতীয় জীবন রক্ষা হেতু নারী-জীবনে রণ-বেশ!—কোমল করে লৌহ অস্ত্র! মদিনা! হৃদয়ের সহিত তোমায় নমস্কার করি।”

“প্রভু আমার রণ-রঙ্গিণীদিগকে ভগিনী সম্ভাষণে কত অনুনয় বিনয় করিয়া যুদ্ধ-গমনে তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন। ঈশ্বর-কৃপায় মদিনাবাসীর সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ হইল। বিজয়ী বীরগণকে মদিনা ক্রোড় পাতিয়া কোলে লইল। আমার ভাবনা, চিন্তা, এজিদের ভয়—হৃদয় হইতে একেবারে সরিয়া গেল। এজিদের পক্ষ পরাস্ত—আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু একটি কথা মনে হইল। এ যুদ্ধের কারণ কি? প্রকাশ্যে যাহাই থাকুক, লোকে যাহাই বলুক, রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে জয়নাব-লাভের আশা যে, এজিদের মনে না ছিল, তাহা নহে! ঈশ্বরই রক্ষা করিলেন! কিন্তু জাএদার চিন্তা—জয়নাবের সুখ-তরী বিষাদ-সিন্ধুতে বিসর্জ্জন করা। সোনায় সোহাগা মিশিল! মায়মুনার ছলনায় জাএদা ইহকালের কথা ভুলিয়া সপত্নীবাদের হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বহস্তে স্বামীর মুখে বিষ ঢালিয়া দিল। খর্জ্জুর উপলক্ষ্য মাত্র। জাএদার কার্য্য জাএদা করিল, কিন্তু ঈশ্বর রক্ষা করিলেন,—প্রভু প্রাণে বাঁচিলেন, প্রভু রক্ষা পাইলেন! কিন্তু শত্রুর ক্রোধ দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বাড়িয়া প্রাণবিনাশের নূতন চেষ্টা হইতে লাগিল। চক্রীর চক্র ভেদ করা কাহারও সাধ্য নহে। সেই মায়মুনার চক্রে, সেই জাএদার প্রদত্ত বিষেই প্রভু আমার জগৎ কাঁদাইয়া, জগতে চির বিষাদ-বায়ু বহাইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। জয়নাবের কপাল!—পোড়া কপাল আবার পুড়িল।—আবার বৈধব্যব্রত—সংসার-সুখে জলাঞ্জলি!”

“হায়! হায়!!—পাপীয়সী জাএদা আমাকে মহাবিষ না দিয়া প্রভু হাসানকে কেন বিষ দিয়া প্রাণসংহার করিল? আমার পরমায়ু শেষ করিয়া জগৎ হইতে আমাকে দূর করিলে, আবার সে যেই সেই-ই হইত!—আবার স্বামীর ভালবাসা নূতন প্রকারে পাইত। তাহার মনের বিশ্বাসেই বলি—হতভাগিনী জয়নাব জগৎ-চক্ষু হইতে চিরদিনের মত সরিলে—তাহার স্বামী আবার তাহারই হইত। স্বামীর ভালবাসা-ক্ষেত্র হইতে জয়নাব-কণ্টক দূর হইলে

আবার প্রণয়-কুসুম শতদলে বিকশিত হইত। সে তাহা করিল না কেন? পাপীয়সী সেই সুপ্রশস্ত সরল পথে পদ-বিক্ষেপ না করিয়া এ পথে,—স্বামী-সংহার পথে কেন হাঁটিল?—মায়মুনার পরামর্শ!—আর হিংসার সহিত দুরাশার সমাবেশ—এই দুইএর একত্র সম্মিলন। ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতী বাহ্যিক সুখপ্রিয় বিলাসিনী রমণীগণের আকাঙ্খা উত্তেজনা,—রত্ন-অলঙ্কার।—মহামূল্য বসনের অকিঞ্চিৎকর আকর্ষণ।—জাএদা অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে!—শেষে পাটরাণী হইবারও আশার কুহক তাহার মনে! পাটেশ্বরী হইয়া দামেস্ক-রাজ-সিংহাসনে এজিদের বাম পার্শ্বে তাহার বসিবার ইচ্ছা! স্ত্রীজাতি প্রায়ই বাহ্যিক সুখ-সম্ভোগপ্রিয়া। প্রভু হাসান-সংসারে বিলাসিতার নামমাত্র ছিল না। সে অন্তঃপুরে রমণীর মনোমুগ্ধকারী সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণের প্রচলন—ব্যবহার দূরে থাকুক,—ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মভাব, বিশুদ্ধ আচরণ ভিন্ন সুখ-সম্পদের নামগন্ধের অণুমাত্রও কাহারও মনে ছিল না।—এজিদ-অন্তঃপুরে জগতের সুখে সুখী হইবার সকলি আছে; এজিদের মতে মত দিয়া সেই প্রকার সুখসাগরে ভাসিতে আর বাধা কি? কয় দিন—স্ত্রীলোকের মন কয় দিন? দুরাশার বশবর্ত্তিনী হইয়াই জাএদার মতিচ্ছন্ন! মদিনার সিংহাসন শূন্য! প্রভুর জলপানের সোরাহীতে হীরকচূর্ণ!—হায়! এক কথা মনে উঠিতে কত কথাই না মনে উঠিতেছে! এ কথা শুনে কে? মন ত কিছুতেই প্রবোধ মানে না। এখন এ সকল কথা মনে উঠিল কেন? উহু! আমি ত স্বামীর পদতলেই শয়ন করিয়াছিলাম। প্রভু আমার বক্ষোপরি পবিত্র পদ দুখানি রাখিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। পাপীয়সী জাএদা কোন্ সময়ে কি প্রকারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল! বিবি হাস্‌নেবানুর এত সতর্কতা, এত সাবধানতা—খাদ্য সামগ্রী, পানীয় জলে এত যত্ন,—ইহার মধ্যে কি প্রকারে কি করিল? আমার কপাল পুড়িবে, তাহা না হইলে নিদ্রাঘোরে অচেতন হইলাম কেন? কত রাত জাগিয়াছি, কত নিশা বসিয়া কাটাইয়াছি,—হায়! হায়!! সে রাত্রে নিদ্রার আকর্ষণ এতই হইল? জাএদা কক্ষমধ্যে আসিয়া পানীয় জলে বিষ মিশাইল, কিছুই জানিতে পারিলাম না।—পাপীর অধোগতি—দুর্গতি ভিন্ন সদ্গতি কোথায়? জাএদার আশা মিটিল

না! যে আশার কুহকে পড়িয়া সে স্ত্রী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বহস্তে স্বামীর মুখে বিষ ঢালিয়া দিল, সে আশায় ছাই পড়িল! পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না, কিন্তু কার্য্যফলের পরিণামফল ঈশ্বর একটু দেখাইয়া দিলেন। জাএদা নব প্রেমাস্পদ কপট প্রেমিক প্রাণাধিক শ্রীমান এজিদের নিকট প্রকাশ্য দরবারে প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ সহিত বিষময় বাক্যবাণ লাভ করিল, শেষে তাহার পরমায়ু প্রদীপও নির্ব্বাপিত হইল। দরবার গৃহের সকল চক্ষুই দেখিল—জাএদা রাজরাণী—এজিদের বাম অঙ্ক-শোভিনী, স্বর্ণ-সিংহাসনে পাটরাণী। সেই মুহূর্ত্তেই—সেই চক্ষেই আবার দেখিল—অস্ত্রাঘাতে এজিদ-হস্তে জাএদার মুণ্ডপাত। জাএদার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। দরবার গৃহের মর্য্যাদা রক্ষা পাইল। বিচার-আসনের গৌরব বৃদ্ধি হইল। আমার মনের কথার ইতি হইল না। মায়মুনাও পুরস্কারের স্বর্ণ মুদ্রা গণিয়া লইতে পারিল না।"

পুনরায় 'জয় জয়রব' ক্রমেই যেন নিকটবর্ত্তী। কান পাতিয়া জয়নাব শুনিলেনঃ জনকোলাহলের ক্রমেই বৃদ্ধি—মুখে বলিলেন,—"আজি এত গোলমাল কিসের? কি হইল? যাক্, ও গোলযোগে আমার লাভ কি? মনের কথা উথলিয়া উঠিতেছে।"

"স্থির করিলাম, এ পবিত্র পুরী জীবনে পরিত্যাগ করিব না। যেখানেই যাইব নিস্তার নাই। এজিদের হস্ত হইতে জয়নাবের নিস্তার নাই। এই ভাবিয়া, প্রভু হোসেনের আশ্রয়েই রহিলাম। এজিদের আশা যেমন তেমনই রহিয়া গেল। তাহার এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত কৌশলেও জয়নাব হস্তগত হইল না। এ পথে একমাত্র বাধা জয়নাবের আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে ইহজগৎ হইতে দূর করাই এজিদের আন্তরিক ইচ্ছা, প্রকাশ্যে রাজ্যলাভের কথা, কিন্তু মনের মধ্যে অন্য কথা। এজিদের চক্রান্তেই প্রভু হোসেনের কুফায় গমন সম্ভব হইল। পরিবারসহ প্রভু হোসেন কুফায় গমন করিলেন। হতভাগিনীও সঙ্গে চলিল। হায়! কোথায় কুফা আর কোথায় কারবালা! কারবালার ঘটনা মনে আছে সকলই, কিন্তু মুখে বলিবার সাধ্য নাই। হায়! আমার জন্য কি না হইল? মহাপ্রান্তর কারবালাক্ষেত্রে রক্তের নদী বহিল। শত শত সতী পতিহারা, পুত্রহারা হইয়া আজীবন চক্ষের

জলে ভাসিতে লাগিল। মহা মহা বীরসকল, এক বিন্দু জলের জন্য লালায়িত হইয়া শত্রুহস্তে অকাতরে প্রাণ সমর্পণ করিল। কত বালক-বালিকা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে পিতার বক্ষে, মাতার ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল। কাসেম-সখিনার কথা মনে হইলে এখনও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। শোকসিন্ধুমধ্যে বিবাহ!—কি নিদারুণ কথা! কাসেম-সখিনার বিবাহের কথা মনে পড়িলে প্রাণ ফাটিয়া যায়! দুর্দ্দিনের শেষ ঘটনায়, যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইল। সে অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা যে নাই, প্রভু হোসেন তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সীমারের খঞ্জরে দেহত্যাগ করিলেন। 'হায় হোসেন!' 'হায় হোসেন!' রবে প্রকৃতির বক্ষ ফাটিতে লাগিল। আমরা তখনই বন্দিনী! নূরনবী মোহাম্মদের পরিজনগণ তখনই বন্দিনী! দামেস্কে আসিলাম। আর রক্ষা নাই! এজিদ-হস্ত হইতে আর নিস্তার নাই। ডুবিলাম, আর উপায় নাই! নিরাশ্রয়ার আশ্রয়ই ঈশ্বর। আশা-ভরসা যাহা যাহা সম্বল ছিল, ক্রমে হৃদয় হইতে সে সকল সরিয়া এক মহাবলের সঞ্চার হইল; এজিদ্-নামে আর কোন ভয়ই রহিল না। এই ছুরিকা হস্তে করিতেই মন যেন ডাকিয়া বলিল: এই অস্ত্র—দুরাচারের মাথা কাটিতে এই-ই অস্ত্র। সাহস হইল, বুকেও বল বাঁধিল। হ্যাঁ, পারিব—সে অমূল্য রত্ন, রমণীকুলের মহামূল্য রত্ন দস্যু-হস্ত হইতে রক্ষা করিতে নিশ্চয়ই পারিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম: হয় দস্যুর জীবন, নয় ধনাধিকারিণীর জীবন এই ছুরিকার অগ্রে,—হয় এ ছুরিকা এজিদের বক্ষে প্রবেশ করিবে, নয় জয়নাবের চির-সন্তাপিত হৃদয়-শোনিত পান করিবে। আর চিন্তা কি? নির্ভয়ে সাহসে নির্ভর করিয়া বসিলাম। পাপীর চক্ষু, এ পাপচক্ষে কখনই দেখিব না ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিয়তির বিধানে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। দামেস্কে আসিবামাত্রই এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইল। পাপীর কথা শুনিলাম, উত্তর দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকাও দেখাইলাম। মহাপাপীর হৃদয় কম্পিত হইল। তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম, নিজ-প্রাণের ভয় অপেক্ষা জয়নাবের প্রাণের

ভয়ই যেন তাহার অধিক। কি জানি, জয়নাব যদি আত্মহত্যা করে, তবেই ত সর্ব্বনাশ।"

"যাহাই হউক, ঈশ্বর-কৃপায় পাপাত্মার মনে যাহাই উদয় হউক, সে সময় রক্ষা পাইলাম, কিন্তু বন্দীখানায় আসিতে হইল। এই সেই বন্দীগৃহ। জয়নাব এজিদের বন্দীখানায় বন্দিনী। প্রভুপরিজন এজিদের বন্দীখানায় এই হতভাগিনীর সঙ্গিনী। আমার কি আর উদ্ধার আছে? আমার পাপের কি ইতি আছে?"

"দয়াময়! তুমিই অবলার আশ্রয়, তুমিই নিরাশ্রয়ের উভয়কালের আশ্রয়। করুণাময়! তোমাকেই সর্ব্বসার মনে করিয়া এই রাজসিংহাসন পদতলে দলিত করিয়াছি, রাজভোগ, পাটরাণীর সুখ-সম্ভোগ ঘৃণার চক্ষে তুচ্ছ করিয়াছি; তুমিই বল, তুমিই সম্বল। তুমিই অনন্তকালের সহায়।"

পাঠক! ঐ শুনুন ডঙ্কা—তুরী—ভেরীর বাদ্য। শুনিতেছেন? জয়ধ্বনির দিকে মন দিয়াছেন?

"জয় জয়নাল আবেদীন!"—শুনিলেন? দামেস্কের নবীন মহারাজা পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। পূজনীয়া জননী, মাননীয়া সহোদরা এবং অপর গুরুজনকে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। বেশী দূরে নয়, প্রায় বন্দীখানার নিকটে! কিন্তু জয়নাবের কথা এখনও শেষ হয় নাই। আবার শুনুন, এদিকে মহারাজও আসিতে থাকুন।

জয়নাব বলিতেছেন: "আমার জন্যই প্রভু-পরিবারের এই দুর্দ্দশা। এজিদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে মদিনার সিংহাসন কখনই শূন্য হইত না। জা'এদার হস্তে মহাবিষও উঠিত না। সখিনাও সদ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিত না। হোসেনের পবিত্র মস্তকও বর্শাগ্রে বিদ্ধ হইয়া সীমার-হস্তে দামেস্কে আসিত না। মহাভক্ত আজরও স্বহস্তে তিন পুত্রের বধসাধন করিত না। চক্ষে কত দেখিয়াছি, কানে কত শুনিয়াছি। হায়! হায়!! সকল অনিষ্টের—সকল দুঃখের মূলই এই হতভাগিনী। শুনিয়াছি, সীমারের প্রাণ মদিনা-প্রান্তরে সপ্ত বীরের তীরের অগ্রভাগে গিয়াছে। আম্বাজ-অধিপতি

মোহাম্মদ হানিফা দামেস্ক নগরের প্রান্ত-সীমায় সসৈন্যে মহাবীর নরপতিগণ সহ আসিয়া এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উদ্ধারের জন্য মোহাম্মদ হানিফা এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন। এজিদও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। কত কথাই না শুনিলাম,—শেষে শুনিলাম ঃ ওমর আলীর প্রাণ-বধের সংবাদ। শূলদণ্ড এজিদ-শিবির সম্মুখে খাড়া হইয়াছে। কতলোক ওমর আলীর প্রাণবধ দেখিতে দৌড়িয়াছে! কারবালার যুদ্ধ-সংবাদও শিবিরে থাকিয়া শুনিয়াছিলাম, আর দামেস্ক-প্রান্তরের যুদ্ধসংবাদও এজিদের বন্দীখানায় থাকিয়া শুনিতেছি। কারবালায় যথাসর্ব্বস্ব হারাইলাম। আর এখানে হারাইলাম—ইমাম বংশের একমাত্র ভরসা, জয়নাল আবেদীন। এ কি শুনি! "জয় জয়নাল আবেদীন!" এ কিরূপ ঘোষণা; ঐ ত আবার শুনিতেছি, "জয়! নব-ভূপতির জয়!" সে কি কথা? আমি কি পাগল হইলাম! কি কথার পরিবর্ত্তে কি কথা শুনিতেছি। ভেরী বাজাইয়া স্পষ্ট ভাবেই জয় ঘোষণা করিতেছে! ওই ত একেবারে বন্দীখানার বহির্দ্বারে!" এই কথা বলিয়াই জয়নাব শাহ্রেবানু ও হাসনেবানুর কক্ষে যাইতে অতি ব্যস্তভাবে উঠিলেন। জয়নাবের মনের কথা আর ব্যক্ত হইল না। উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে করিতে সৈন্যগণ বন্দীখানার মধ্যে আসিয়া পড়িল। দীন মোহাম্মদী নিশান জয়ডঙ্কার তালে তালে দুলিয়া দুলিয়া উড়িতে লাগিল। নবীন মহারাজ আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনসহ বন্দী-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন!

পাঠক! এই অবসরে লেখকের একটি কথা শুনুন। সুখের কান্না পুরুষেও কাঁদে, স্ত্রীলোকেও কাঁদে। তবে পরিমাণে বেশী আর কম। জয়নাল আবেদীন বন্দী-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার মাতা, সহোদরা প্রভৃতি প্রিয় পরিজন সুখের কান্নায় চক্ষের জল ফেলিলেন, কি হাসিমুখে হাসিতে হাসিতে প্রিয়দর্শন জয়নালকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে দামেস্ক-কারাগার সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইলেও প্রত্যক্ষ দেখাইতে যে না পারি, তাহাও নহে।—কার সাধ্য রোধে

কল্পনার আঁখি! তবে কথা এই যে, তাহাই দেখিবেন, না হানিফা এজিদের পশ্চাৎ ঘোড়া চালাইয়া কি করিতেছেন, তাহাই দেখিবেন? আমার বিবেচনায় শেষ দৃশ্যই এক্ষণে প্রয়োজন। এজিদ-বধের জন্যই সকলেই উৎসুক। গাজী রহ্‌মানেরও ঐ চিন্তাই এখন প্রবল। মোহাম্মদ হানিফার কি হইল? এজিদের ভাগ্যেই বা কি ঘটিল?

নবীন মহারাজ, তাঁহার মাতার পদধূলি মাথায় মাখিয়া অন্য অন্য গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া বন্দীখানা হইতে বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে, জয়পতাকা উড়াইতে উড়াইতে প্রিয়পরিজনসহ রাজপুরী মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করুন, আমরা মোহাম্মদ হানিফার অন্বেষণে যাই। চলুন, এজিদের অশ্ব-চালনা দেখি।

চতুর্থ প্রবাহ

আশা মিটিবার নহে। মানুষের মনের আশা পূর্ণ হইবার নহে। ঘটনার সূত্রপাত্র হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকের মনে অনেক প্রকারের আশার সঞ্চার হয়। আশার কুহকে মাতিয়া অনেকেই—পথে—বিপথে ছুটিয়া বেড়ায়। ঘটনাচক্রে যতদূর গড়াইয়া লইয়া যায়, তাহাতেই বোধ হয় যেন পূর্ব্ব আশা পূর্ণ হইল। এই পূর্ণবোধ হইতে হইতে দুই তিন চারি, এমন কি, পঞ্চ প্রকারের আশা পঞ্চাশ ভাগে, পঞ্চ শত বিভাগে ঘটনালিপ্ত মানুষের হৃদয়াকাশে সচঞ্চল চঞ্চলার ন্যায় ছুটিতে থাকে,—খেলিতে থাকে। জীবনের সহিত আশার সম্বন্ধ। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, আশার শান্তি, জীবনের ইতি—এই তিনেই এক, আবার একেই তিন। সুতরাং জীবন্ত দেহে মনের আশা মিটিবার নহে। আশা মিটিল না—মোহাম্মদ হানিফার আশা পূর্ণ হইল না।

যুগল অশ্ব বেগে ছুটিয়াছে। এজিদের অশ্ব অগ্রে রহিয়াছে। হানিফার মনের আশা, এজিদকে না মারিয়া জীবন্ত ধরিবেন, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন,—কিন্তু তাহা পারিতেছেন না।

এজিদ অশ্বচালনায় পরিপক্ক ; প্রাণের দায়ে তিনি পথ, অপথ, বন, জঙ্গলের মধ্য দিয়া অশ্ব চালাইতেছেন—পলাইতে পারিলেই রক্ষা—কিন্তু পারিতেছেন না। হানিফাকে দূরে ফেলিয়া এজিদ আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। সেই একই ভাব। যাহা কিছু প্রভেদ—অগ্র আর পশ্চাৎ। এজিদ প্রাণপণে অশ্ব চালাইতেছেন, কিন্তু হানিফাকে দূরে ফেলিয়া তাঁহার চক্ষুর অগোচর হওয়া দূরে থাকুক, হানিফার হস্তস্থিত তরবারি অগ্রভাগ হইতে সূচ পরিমাণ স্থানও অগ্রে যাইতে পারিতেছেন না। সূর্য্যতেজ কমিতেছে, মোহাম্মদ হানিফার রোষও বাড়িতেছে। যতই ক্লান্ত, ততই তাঁহার রোষ বৃদ্ধি!

মোহাম্মদ হানিফা অশ্ব-বল্‌গা দন্তে ধারণ করিয়া এজিদকে ধরিবার নিমিত্ত দুই হস্ত বিস্তার করিয়াছেন। দুল্‌দুল্‌ প্রাণপণে দৌড়িতেছে, কিন্তু এজিদকে ধরিতে পারিতেছে না। মোহাম্মদ হানিফা এই ধরিলেন, এইবারেই ধরিবেন, আর একটু অগ্রসর হইলেই ধরিতে পারিবেন, অশ্ব হইতে এজিদকে চ্যুত করিবেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিতেছেন না।

এজিদ প্রাণভয়ে পলাইতেছেন। অন্য কোন কথা সে সময়ে মনে তাঁহার উদয় হইবার কথা নহে। প্রাণ বাঁচাইবার পন্থাই নানা প্রকারে মনে মনে আঁকিতেছেন। আর একটা কথাও তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন যে, মোহাম্মদ হানিফা তাঁহার প্রাণবধের ইচ্ছা করিলে বহু পূর্ব্বে তাহা শেষ করিতে পারিতেন, অথচ তাহা করিতেছেন না। তাঁহার মন ডাকিয়া বলিতেছে, "এজিদকে হানিফা ধরিবেন,—মারিবেন না—প্রাণে মারিবেন না।" হইতে পারে এজিদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ নিষেধ! এ দুয়ের এক না হইয়া এরূপভাবে বীরের সম্মুখে—বীরের অস্ত্রের সম্মুখ হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সৌভাগ্যের কথা। এখন যে কোন উপায়েই হউক হানিফার চক্ষুর অগোচর হইতে পারিলেই রক্ষা। হানিফা চিরদিন দামেস্কে বাস করিবেন না। এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যমের হস্ত হইতে বাঁচিতে পারিলেই প্রাণ বাঁচে। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই প্রকার ঘোরাফেরা করিয়া কাটাইতে পারিলেই আর ভয়ের কারণ নাই। দেশ এবং পথ আমার পরিচিত কিন্তু হানিফার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আমি অনায়াসেই অন্ধকারে চলিতে পারিব। আজিকার অস্তই আমার শুভ অস্ত,—জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়।

এই সকল চিন্তা শ্রেণীবদ্ধরূপে যে এজিদের মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা নহে। মৃত্যুর পূর্ব্বের পূর্ব্ব লক্ষণ—ক্ষণকাল বিকার, ক্ষণকাল অজ্ঞান, ক্ষণকাল ঘোর অচৈতন্যভাব! ক্ষণকাল সজ্ঞান সময়টুকুর মধ্যে চিন্তার ঢেউ ঐরূপে সময়ে সময়ে এজিদের মনে উঠিতেছিল। এজিদ হস্ত হইতে অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিলেন। অশ্বে সজোরে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। এখন আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই। অশ্বের স্বেচ্ছাধীন গতিই তাঁহার গতি। অশ্বের মনোমত পথই তাঁহার বাঁচিবার পথ—আর অশ্বকে দক্ষিণে বামে ফিরাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন না। ঘোড়া আপন ইচ্ছামত ছুটিয়াছে।

হানিফা কিঞ্চিৎ দূরে পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—“এজিদ! হানিফার হস্ত হইতে আজি তোর নিস্তার নাই। কিন্তু এজিদ! এ অবস্থায় তোকে প্রাণে মারিব না, জীবন্ত ধরিব। তোর খণ্ডিত শিরের ধরালুণ্ঠিত ভাব, শিরশূন্য দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়ার দৃশ্য,—হানিফা একা দেখিতে ইচ্ছা করে না। বিশেষতঃ বীরের আঘাত চারি চক্ষু একত্র করিয়া। আমি কাপুরুষ নহি যে, তোর পশ্চাৎ দিক হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। হানিফার অস্ত্র আজ পর্য্যন্ত কাহারও পৃষ্ঠদেশে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, অগ্রে চক্ষে ধাঁধা না লাগাইয়া অদৃশ্যভাবে কাহারও শরীরে প্রবেশ করে না। তুই মনে করিস্ না যে, তোর পিছনে থাকিয়া আমি আঘাত করিব। তুই জঙ্গলে যাস্, পাহাড়ে যাস্, হানিফা তোর সঙ্গছাড়া নহে।”

এজিদ হানিফার রক্তমাখা শরীর প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টি করিয়াছেন। একবার মাত্র চারি চক্ষু একত্র হইয়াছে। এজিদ হানিফার দিকে দ্বিতীয়-বার চাহিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু সে রক্তজবা সদৃশ আঁখি, রক্তমাখা তরবারি তাঁহার চক্ষের উপর অনবরত ঘুরিতেছে, হৃদয়ে জাগিতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণ কাঁপিতেছে। আতঙ্কে দক্ষিণে বামে তাঁহার দেহ ঢুলিতেছে, কোন কোন সময়ে সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। অশ্বচালনে বিশেষ পরিপক্কতা হেতুই এজিদের আসন টলিতেছে না।

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বীরবিক্রমে বলিতে লাগিলেন, "এজিদ! বহু পরিশ্রমের পর তোর দেখা পাইয়াছি। তুই কখনই চক্ষের অন্তরাল হইতে পারিবি না। তুই জানিস্, হানিফার বল-বিক্রম প্রকাশের আজই শেষ দিন। আজই হানিফারও ক্রোধাঙ্কের শেষ অভিনয়। আজই বিষাদের শেষ,—বিষাদ-সিন্ধুর শেষ,—তোর জীবনের শেষ। ঐ দেখ্, সূর্য্য অস্ত যায়। এই অস্তের সহিত কত অস্তের যে যোগ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি দেখিতেছি, তিন অস্ত একত্র মিশিবে, একসঙ্গে একযোগে ঘটিবে—তোর পরমায়ু, দামেস্কের স্বাধীনতা এবং উপস্থিত সূর্য্য। চাহিয়া দেখ্—যদি জ্ঞানের বিপর্য্যয় না ঘটিয়া থাকে, তবে চাহিয়া দেখ্—গমনোন্মুখ সূর্য্য কেমন চাক্‌চিক্য দেখাইয়া স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষা করিতেছে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপও ঐরূপ তেজে জ্বলিয়া ওঠে। প্রাণবিয়োগ-সময়ে শয্যাশায়ী রোগীর নাড়ীর বলও ঐরূপ সতেজ হয়। তোর কিঞ্চিৎ অগ্রসরতাও তাহাই। আর বিলম্ব নাই। যে এতটুকু অগ্রসর হইয়াছিস্, সে বাঁচিবার জন্য নহে, মরিবার জন্য। মরুভূমিতে ঘুরিয়াছিস্, বনে প্রবেশ করিয়াছিস্, পর্ব্বতে উঠিয়াছিস্, চক্ষু হইতে সরিয়া যাইতে কত চক্রই খেলিয়াছিস্, সরিতে পারিস্ নাই,—হানিফার চক্ষে ধূলি দিয়া চক্ষের অন্তরাল হইতে সাধ্য নাই। এখন নিকটে বন জঙ্গল নাই যে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া বাঁচিয়া যাইবি। তুই নিশ্চয়ই জানিস্, এই রঞ্জিত অসি তোর পরিশুষ্ক হৃদয়ের বিকৃত রক্তধারায় আবার রঞ্জিত হইবে। সূর্য্যরাগে মিশাইয়া উদয়-অস্ত একত্র দেখিব। তুই যাবি কোথা? তোর মত মহাপাপীর স্থান কোথা?"

অশ্বারোহী যদি বাগ্‌ডোর জোরে না রাখে, ঘোড়ার ইচ্ছানুযায়ী গতিতে যদি বাধা না দেয়, তবে অশ্বমাত্রই আপন বাসস্থানে ছুটিয়া আসিতে চেষ্টা করে। এজিদ নিরাশ হইয়া হস্তস্থিত অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কোন্ পথে কোথায় গেলে পশ্চাদ্ধাবিত যমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়াই তিনি তুরঙ্গ-গতিস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছেন। রাজ-অশ্ব রাজধানী অভিমুখে ছুটিয়াছে। দামেস্ক এজিদের রাজ্য। পথ ঘাট সকলই পরিচিত। রাজধানী অভিমুখে অশ্বের

গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে নূতন একটি আশার সঞ্চার হইল—রাজপুরী মধ্যে যাইতে পারিলেই রক্ষা, মনের ব্যগ্রতায় এবং প্রাণের মায়ায় আকুল হইয়া দুই হস্তে তিনি অশ্বে কশাঘাত করিতে লাগিলেন—রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই যেন প্রাণ বাঁচাইতে পারেন এই ভাবে। যুগল অশ্ব বেগে দৌড়িতে থাকুক, এই অবসরে এজিদের নূতন কথাটা ভাঙ্গিয়া বলি।

হজরত মাবিয়ার লোকান্তর গমনের পর এজিদ মারওয়ানের মন্ত্রণায় দামেস্কপুরী-সংলগ্ন উদ্যানমধ্যে ভূগর্ভে এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ গুপ্তপুরীর প্রবেশদ্বারও এমন সুন্দর কৌশলে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল যে, ইহাকে উদ্যানলতার নিকুঞ্জ ভিন্ন, দ্বার বলিয়া কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। ঐ পুরী, যে সময়ের অপেক্ষায় আছে আজ সেই সময় উপস্থিত। এজিদের প্রিয় পরিজন, আত্মীয়-স্বজন প্রাণ ভয়ে সকলেই ঐ গুপ্তপুরীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণও পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। যেখানকার যে জিনিষ, সেইখানেই পড়িয়া আছে, অথচ জনপ্রাণী মাত্র নাই! কোথায় যাইবে? শত্রু-সেনাপরিবেষ্টিত পুরীমধ্য হইতে কোথায় পলাইবে? ঐ গুপ্তপুরীই প্রাণরক্ষার উপযুক্ত স্থান। এজিদের মনেও সেই আশা। তাঁহার সে নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে এই একমাত্র আশা-বীজের নব অঙ্কুর। পুরীর কথা মনে পড়িতেই পরিবার-পরিজনের কথা মনে হইয়াছে। তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্তও হইয়াছেন। রাজপুরী পরহস্তগত হইলেও পরিবার-পরিজন কখনই পরহস্তগত হইবে না।—দামেস্কপুরী তন্ন তন্ন করিলেও তাহাদের বিষাদিত কায়া চক্ষে পড়া দূরে থাকুক, ছায়া পর্য্যন্তও নজরে আসিবে না। এখন উদ্যান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই আর পায় কে? লতা-পুষ্পজড়িত কুঞ্জ পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই হানিফা দেখিবেন যে, এজিদ লতাপাতায় মিশিয়া গেল, পরমাণু আকারের পুষ্প-রেণুর সহিত মিশিয়া পুষ্পদলে দেহ ঢাকিয়া ফেলিল। যাহাই হউক, উদ্যান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেই এজিদের জয়। নগরও নিকটবর্ত্তী। এজিদ জন্মের মত দামেস্ক নগরের পতন-দৃশ্য দেখিয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে নগরের সুরঞ্জিত সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার অবারিত—প্রহরি-বর্জ্জিত! মৃতদেহে রাজপথ পরিপূর্ণ। শবাহারী.

পশুপক্ষিগণ মহা আনন্দিত। চক্ষের পলকে প্রবেশ দ্বার পার হইয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী চক্ষে পড়িতেই দেখিলেন : উচ্চ উচ্চ মঞ্চে নানা আকারে নূতন পতাকাসকল নগরস্থ লোহিত আভায় মিশিয়া অর্দ্ধচন্দ্র এবং পূর্ণতারা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দামেস্কের পতন-দৃশ্য দর্শকগণকে দেখাইতেছে! বিজয়-বাজনা তুমুল বেগে কর্ণে আসিতেছে!—ক্রমেই তিনি নিকটবর্ত্তী হইলেন, রাজপুরী অতি নিকটে! বন্দীগৃহ দূর হইলেও দৃষ্টির অদূর নহে। বন্দীগৃহ চক্ষে পড়িল। এজিদের চক্ষে দামেস্কের বন্দীগৃহ পড়িতেই তাঁহার মন যেন কেমন করিয়া চমকিয়া উঠিল! এমন সঙ্কট সময়েও এজিদের মন যেন কেমন করিয়া উঠিল! যে রূপ হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিল, সরিয়া আসিল।—কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। চিত্তক্ষেত্র হইতে সে রূপরাশি একেবারে সরিয়া গেল। নামটি মনে উঠিল, কিন্তু মুখে ফুটিল না। দীর্ঘনিশ্বাসও বহিল না। প্রমাণ হইল, প্রমোদ অপেক্ষা প্রাণের দায়ই সমধিক প্রবল! এই সামান্য অন্যমনস্কতায় এজিদের অশ্বগতি কিঞ্চিৎ শিথিল হইল।

মোহাম্মদ হানিফা এই অবসরে ঐ পরিমাণ স্থান অগ্রসর হইয়া গভীর গর্জ্জনে বলিতে লাগিলেন, "এজিদ! মনে করিয়াছিস্ যে, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেই আজিকার মত বাঁচিয়া যাইবি? তাহা কখনই মনে করিস্ না। এই সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে তোর জীবন-প্রদীপও নির্ব্বাণ হইবে। তোর পক্ষে দামেস্ক-রাজপুরী এইক্ষণে সাক্ষাৎ যমপুরী। কি আশায় সেদিকে দৌড়িয়াছিস্? দেখিতেছিস্ না? উচ্চ মঞ্চে কাহার নিশান উড়িতেছে, দেখিতেছিস্ না? রে নরাধম! তুই সেই এজিদ, যে আরবের সর্ব্বপ্রধান বীর হাসানকে কৌশল করিয়া মারিয়াছিস্! ওরে! তুই কি সেই পামর, যে সীমার দ্বারা হোসেনের মস্তক কাটাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছিল?

মোহাম্মদ হানিফা ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বে কষাঘাত করিলেন। দ্রুতগতি অশ্বপদ-শব্দে পুরজনগণ চমকিয়া উঠিলেন। বিজয়-বাজনা, আনন্দ-রোল, জয়ধ্বনির কোলাহল ভেদ করিয়া অশ্ব-পদশব্দ মহাশব্দে

সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সিংহদ্বার দিকে ছুটিলেন। এজিদ অশ্ব হইতে প্রথমে উদ্যান, শেষে পুষ্পলতাসজ্জিত নিকুঞ্জ দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন।

মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি মহারথিগণ, কেহ অশ্বে, কেহ পদব্রজে দ্রুতবেগে অসি-হস্তে আসিতেই হানিফা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতাগণ! ক্ষান্ত হও! দোহাই তোমাদের ঈশ্বরের—ক্ষান্ত হও! এজিদ তোমাদের বধ্য নহে। বাধা দিও না! এজিদের গমনে বাধা দিও না। এজিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না।"

মোহাম্মদ হানিফার কথা শেষ হইতে না হইতে এজিদ এক লম্ফে অশ্ব হইতে নামিয়া উদ্যান অভিমুখে চলিলেন! হানিফাও ত্রস্তভাবে দুল্‌দুলের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অসিহস্তে এজিদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইলেন। এজিদ যথাসাধ্য দৌড়িয়া উদ্যানস্থ নির্দ্দিষ্ট নিকুঞ্জ মধ্যে যাইয়া ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিলেন, মোহাম্মদ হানিফাও অতি নিকটে—বিকৃত ও ভগ্নস্বরে বলিলেন, "হানিফা ক্ষান্ত হও! আর কেন? তোমার আশা, তোমার প্রতিজ্ঞা, তোমার মুখেই রহিল, এজিদ চলিল।" এই কথা বলিয়াই এজিদ গুপ্তপুরীর প্রবেশ-দ্বার কূপমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মোহাম্মদ হানিফা রোষে অধীর হইয়া—"যাবি কোথা নরাধম" এই কথা বলিয়া, বীর-বিক্রমে হুঙ্কার ছাড়িয়া অসি-হস্তে কূপ মধ্যে লম্প দিবার উপক্রম করিতেই বজ্রনাদে শব্দ হইল, "হানিফা! এজিদ তোমার বধ্য নহে।" মোহাম্মদ হানিফা থতমত খাইয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিতেই প্রভু হোসেনের তেজোময় ছায়া দেখিয়া চম্‌কিয়া উঠিয়া পিছনে হটিলেন এবং ভয়ে চক্ষু বন্ধ করিলেন।

পুনরায় গভীর নিনাদে শব্দ হইল, "হানিফা ক্ষান্ত হও, এজিদ তোমার বধ্য নহে।"

মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় চক্ষু মেলিয়া তাকাতেই দেখিলেন, মহাঅগ্নিময় মহাতেজ অসংখ্য শিখা বিস্তারে সহস্র অশনিপাত সদৃশ বিকট শব্দ করিয়া নিকুঞ্জ মধ্যস্থ কূপমধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিল। এজিদের

আর্ত্তনাদে উদ্যানস্থ পক্ষীকুল বিকট কণ্ঠে ভয়ে ডাকিয়া উঠিল, বাসা ছাড়িয়া, শাখা ছাড়িয়া, দিগ্বিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। ভূকম্পনে তরুলতাসকল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। গাজী রহ্‌মান, মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী, আক্কেল আলী প্রভৃতি উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া নির্ব্বাকে হানিফার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মোহাম্মদ হানিফার ভাব ভিন্ন—মুখাকৃতি বিকৃত অথচ হিংসায় পরিপূর্ণ। তাঁহার হৃদয় হিংসানলে দগ্ধীভূত। স্থির নেত্রে উর্দ্ধমুখ হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। তরবারি-মুষ্টি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে, তরবারির অগ্রভাগ তাঁহার বামস্কন্ধে স্থাপিত।

আবার দৈববাণী হইল—"হানিফা! দুঃখ করিও না। এজিদ কাহারও বধ্য নহে। রোজ-কেয়ামত (শেষ দিন) পর্য্যন্ত এজিদ এই কূপে এই জ্বলন্ত হুতাশনে জ্বলিতে থাকিবে—পুড়িতে থাকিবে, অথচ প্রাণ বিয়োগ হইবে না।"

মোহাম্মদ হানিফা চম্‌কিয়া উঠিলেন। তাঁহার তরবারির অগ্রভাগ স্কন্ধ হইতে মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। অশ্ব-বল্গা বাম হস্তে ধরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "এজিদ আমার বধ্য নহে। আর কি করিব? ইচ্ছা করিলে এক তীব্র তীরে নরাধমের কলিজা পার করিতে পারিতাম; হৃদয়ের রক্তধারায় তরবারি দ্বারাই নারকীর দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইত। তাহা করি নাই, চক্ষে চক্ষে সম্মুখে না যুঝিয়া, অস্ত্রের চাকচিক্য না দেখাইয়া কাহারও প্রাণ সংহার করি নাই। ইহজীবনে কাহারাও পৃষ্ঠে আঘাত করি নাই। এজিদ পৃষ্ঠ দেখাইল। আর অস্ত্রের আঘাত কি? জীবন্ত ধরিব, সকলের সম্মুখে ধরিয়া আনিব, একত্র এক সঙ্গে মনের আগুন নির্ব্বাণ করিব,—তাহা হইল না। মনের আশা মিটিল না! এত পরিশ্রম করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না! এক্ষণে কি করি! প্রিয় গাজী রহ্‌মান! ভাই মস্‌হাব! হানিফার মনের আগুন নিভিল না! আশা পূর্ণ হইল না! কি করি?"

এই বলিয়া মোহাম্মদ হানিফা পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিলেন,—চক্ষের পলকে উদ্যান হইতে বাহির হইলেন। গাজী রহ্‌মান মহা সঙ্কটকাল ভাবিয়া মস্‌হাব কাক্কা, ওমর আলী প্রভৃতিকে বলিলেন—"ভাবিয়াছিলাম, আজই

বিষাদ-সিন্ধু পার হইয়া সুখ-সিন্ধুর সুখতটে সকলে একত্রে উঠিব, বোধ হয়, তাহা ঘটিল না। শীঘ্র আসুন! বিলম্ব করিবেন না। আমি ভবিষ্যৎ বড়ই অমঙ্গল দেখিতেছি। আম্বাজাধিপতির মতিগতি ভাল বোধ হইতেছে না! শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করুন। বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত, দয়াময়ের লীলা বুঝিয়া উঠা মানুষের সাধ্য নয়!"

পঞ্চম প্রবাহ

এখন আর সূর্য্য নাই—পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী সবেমাত্র একটু ঘোমটা খুলিয়াছেন। তারাদল দলে দলে দেখা দিতে দিতে অগ্রসর হইতেছেন; কেহ কেহ সন্ধ্যা-সীমন্তিনীর সীমন্ত উপরিস্থ অম্বরে ঝুলিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন, কেহ বা সুদূরে থাকিয়া মিটিমিটিভাবে চাহিতেছেন—ঘৃণার সহিত চক্ষু বন্ধ করিতেছেন, আবার দেখিতেছেন। মানব-দেহের সহিত তারাদলের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু বহুদূরে থাকিয়াও চক্ষু বন্ধ করিতে হইতেছে—কে দেখিতে পারে? অন্যায় নরহত্যা, অবৈধ বধ, কোন্ চক্ষু দেখিতে পারে? আজিকার সূর্য্য উদয় না হইতেই হানিফার রোষের উদয়—তরবারি ধারণ। সে সূর্য্য অস্তমিত হইল। দামেস্ক-প্রান্তরের মরুভূমিতে রক্তের স্রোত বহিল, কিন্তু মোহাম্মদ হানিফার জিঘাংসা-বৃত্তি নিবৃত্ত হইল না। "এজিদ তোমার বধ্য নহে" এই দৈববাণীতে মোহাম্মদ হানিফার অন্তরে রোষ এবং ভয় একত্র এক সময়ে উদিত হইয়াছে। উদ্যান-মধ্যে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া স্থির-নেত্রে ক্ষণকাল চিন্তার কারণও তাহাই। এক সময়ে দুইভাব, পরস্পর-বিপরীত ভাব—নিতান্তই অসম্ভব; কিন্তু হইয়াছে তাহাই—ভয় এবং রোষ। বীরহৃদয় ভয়ে ভীত হইবার নহে। তবে যে কিঞ্চিৎ কাঁপিতেছিল, তাহা দৈববাণী বলিয়া—প্রভু হোসেনের জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র ছায়া দেখিয়া। কিন্তু পরিশেষে নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের স্থান হইল না; সুতরাং রোষেরই জয়! প্রমাণ—অশ্বে আরোহণ, সজোরে কশাঘাত!

কানন-দ্বার পার হইয়া হানিফা এজিদের গুপ্তপুরী-প্রবেশদ্বার আবরণকারী লতাপাতা-বেষ্টিত নিকুঞ্জ প্রতি একবার চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন ঃ দুর্গন্ধময় ধূমরাশি হুহু করিয়া আকাশে উঠিতেছে, বাতাসে মিশিতেছে। রাজপুরী পশ্চাতে রাখিয়া তিনি দামেস্ক-নগরের পথে চলিলেন। যে তাঁহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাহারই জীবন শেষ হইল। বিনা অপরাধে হানিফার অস্ত্রে জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া খণ্ডিত দেহসকল ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জয়নালভক্ত প্রজাগণ এজিদের পরিণাম দশা দেখিতে আনন্দোৎসাহে রাজ-পুরীর দিকে দলে দলে আসিতেছিল। হানিফার রোষাগ্নিতে পড়িয়া তাহারা এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না, আপন প্রতিপালক রক্ষকহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল!

নগরের প্রবেশদ্বারে প্রহরিগণ বসিয়াছিল। এজিদ সহ মোহাম্মদ হানিফা নগরে প্রবেশ করিলে, প্রহরিগণ মোহাম্মদ হানিফাকে দেখিয়াই সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত কর্ত্তব্যকার্য্যে তৎপর হইল। নিকটে আসিতেই প্রহরিগণ মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল; কিন্তু মস্তক উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয়বার সম্ভাষণের আর তাহাদের অবসর হইল না। প্রভুর অস্ত্রে প্রহরীদের মস্তক দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া সিংহদ্বারে গড়াইয়া পড়িল। দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তি সন্ধ্যাগমে নগরে আসিতেছে, পথিক পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামহেতু লোকালয়ে আসিতেছে, ত্রস্তে পদবিক্ষেপ করিতেছে—কত কথাই তাহাদের মনে উঠিতেছে! চক্ষের পলকে সে সকল কথা ফুরাইয়া গেল, বিনামেঘে বজ্রাঘাত সদৃশ হানিফার অস্ত্রে তাহাদের জীবনলীলা পথিমধ্যেই সাঙ্গ হইল।

গাজী রহমান, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি যথাসাধ্য ত্রস্তে আসিয়াও মোহাম্মদ হানিফাকে নগরে পাইলেন না। সিংহদ্বারে আসিয়া যাহা দেখিবার দেখিলেন। প্রান্তরে আসিয়া স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন, আম্বাজভূপতি যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার জীবন শেষ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এখনও ঘোর অন্ধকারে দামেস্ক-প্রান্তর আবৃত হয় নাই।

ঘোরনাদে শব্দ হইল—"মোহাম্মদ হানিফা!"

নিজ নাম শুনিতেই মোহাম্মদ হানিফা একটু থামিয়া দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। গাজী রহ্‌মান প্রভৃতিও ঐ শব্দ শুনিয়া অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না;—স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, এবং স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন যেন আকাশ ফাটিয়া, প্রান্তর কাঁপাইয়া শব্দ হইতেছে,— "হানিফা! একটি জীব সৃষ্টি করিতে কত কৌশল, তাহা কি তুমি জান?" সৃষ্ট-জীব বিনাশ করিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনা কারণে জীবের জীবনলীলা শেষ করিতে তোমার হস্তে তরবারি দেওয়া হয় নাই। তোমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যকুলে জন্ম হয় নাই। বিনাশ করা অতি সহজ, রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সৃজন করা আরও কঠিন। এত প্রাণী বধ করিয়াও তোমার বধেচ্ছা নিবৃত্তি হইল না! জয়ের পর বধ অপেক্ষা পাপের কার্য্য জগতে আর কি আছে? নিরপরাধীর প্রাণ বিনাশ করা অপেক্ষা পাপের কার্য্য জগতে আর কি আছে? তুমি মহাপাপী! তেমোর প্রতি ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, দুল্‌দুল্ সহিত রণবেশে রোজ-কেয়ামত পর্য্যন্ত প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আবদ্ধ থাক।" *

বাণী শেষ হইতেই নিকটস্থ পর্ব্বতমালা হইতে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া বিকট শব্দে মোহাম্মদ হানিফাকে ঘিরিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ হানিফা বন্দী হইলেন। রোজ-কেয়ামত পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায়ই তিনি থাকিবেন।

গাজী রহ্‌মান, মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতি এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া শত শত বার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন। ম্লানমুখে মন্দ গতিতে প্রাচীরের নিকট যাইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মানুষ দূরে থাকুক, সামান্য একটি পিপীলিকা প্রবেশেরও সুযোগ-পথ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। ধন্যরে কৌশলীর কৌশল!

গাজী রহ্‌মান কোন সন্ধান করিতে না পারিয়াই হউক, কি কোন

* কোন কোন গ্রন্থ মতে হানিফার এখনও প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ হওয়া তত্‌দূর প্রমাণ-সিদ্ধ নহে।

শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াই হউক, কয়েক বার ঐ প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাচীরের নিকট মাথা নোয়াইয়া কর্ণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন: প্রাচীর-মধ্যে যেন ঘোড়ার পদশব্দ! মস্‌হাব কাক্কা প্রভৃতিও সে শব্দ শুনিতে পাইলেন।

পাঠক! সে প্রাচীর এক্ষণে পর্ব্বতে পরিণত। ঐ পর্ব্বতের নিকট কান পাতিয়া শুনিলে আজও পর্য্যন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যায়।

রোজ-কেরামত পর্য্যন্ত মোহাম্মদ হানিফা ঐ প্রাচীর-মধ্যে অশ্ব সহ আবদ্ধ থাকিবেন! দৈববাণী অলঙ্ঘনীয়! "যাহা অদৃষ্টে ছিল হইল। যাহা দয়াময়ের ইচ্ছা ছিল, সম্পূর্ণ হইল। আর বৃথা এ প্রান্তরে থাকিয়া লাভ কি?—" গাজী রহ্‌মান এই কথা বলিয়া নগরাভিমুখী হইলেন। সঙ্গীরাও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

অন্ধকার আবরণে জগৎ অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। এ মহা মহাকাব্য "বিষাদ-সিন্ধুর" ইতিও এইখানে হইল। সিন্ধুপার হইয়াও হইতে পারিলাম না—আশা মিটিল না। পূর্ণ সুখ জগতে নাই! কাহারও ভাগ্যফলকে ষোল আনা সুখভোগের কথা লেখা নাই। সুতরাং বিষাদ-সিন্ধু পার হইয়া সুখ-সিন্ধুতে মিশিতে পারিলাম না।

জয়নাল আবেদীন পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন—পরিবার-পরিজনকে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার করিয়া বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত রাজভবনে আনিয়াছেন। মদিনা, দামেস্ক—উভয় রাজ্যই এখন তাঁহার করতলে; উভয় সিংহাসনই এখন জয়নাল আবেদীনের বসিবার আসন। পরম শত্রু—পৈতৃক শত্রু এজিদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে; ধন-জন-রাজ্যপাট সকলই গিয়াছে। যদিও প্রাণ যায় নাই, কিন্তু দৈবাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত কূপ-মধ্যে এজিদ-দেহের অন্য কোন ক্রিয়া নাই! সেই দেহ মনুষ্যেরও আর দেখিবার সাধ্য নাই! সুতরাং সাধারণ চক্ষে এজিদ-বধই সাব্যস্ত করিতে হইবে। সুখের একশেষ! আরও অধিক সুখের কথা হইত, যদি মোহাম্মদ হানিফা দৈবনির্ব্বন্ধে প্রস্তর-প্রাচীরে চির আবদ্ধ না হইতেন। হায়! আক্ষেপ—শত আক্ষেপ! সিন্ধু পার হইয়াও হইতে

পারিলাম না; বিষাদ রহিয়াই গেল! বিষাদ-সিন্ধু বিষাদ-সিন্ধুই রহিয়া গেল! হায় হোসেন! হায় হোসেন!! হায় মোহাম্মদ হানিফা!—মুখে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিয়া সজল নয়নে বিদায় হইতে হইল।

উপসংহার

ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। নিয়মিত বিধানফল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ইহজগতে মানব-চক্ষে যাহা দেখিবার সাধ্যায়ত্ত, তাহা সকলেই দেখিল।—যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিল। নানা চিন্তায় এজিদের পরিণাম, মোহাম্মদ হানিফার জীবনের শেষ ফল, ভাবিতে ভাবিতে দামেস্ক-রাজ-প্রাসাদে নব-ভূপতি ও মন্ত্রিদলের নিশাবসান হইল। সম্পূর্ণ সুখভোগে মনের আনন্দেই অনেকের চক্ষে নিদ্রা আসিল না,—ওমর আলী গাজী রহ্‌মানের চক্ষুর জলের সহিত অতি ক্লান্ত—অতি বিশ্রান্ত হইয়াও অনিদ্রিত অবস্থায় উষার সহিত সম্মিলিত হইল! প্রভাতীয় উপাসনার আহ্বানধ্বনি (আজান) রাজপ্রাসাদ জাগাইয়া তুলিল! উপাসনার পর সকলেই দরবার-গৃহে উপবেশন করিলেন।

উপস্থিত কার্য্যাদির বন্দোবস্ত করাই গাজী রহ্‌মানের ইচ্ছা। সময়ে নবীন মহারাজ রাজবেশে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। গাজী রহ্‌মানের আদেশে মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রী হামানকে আহ্বান করিয়া প্রধান মন্ত্রিপদে বরণ করা হইল। মন্ত্রিপ্রবর হামান রাজসিংহাসন চুম্বন করিয়া বলিলেন ঃ—

"ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। যাহাদের সিংহাসন, তাঁহারাই অধিকার করিলেন! মহারাজ এজিদের কর্ম্মফলে এবং পিতৃ-অভিসম্পাতে অধঃপতন! উষ্ণ মস্তিষ্ক এবং উষ্ণ শোণিত-বলে যে রাজা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন,—যাহা সম্ভবপর নহে,—সাধারণের অনুমোদনীয় নহে,—বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণের অভিমত নহে,—বহুদর্শী

জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ প্রাচীন প্রধান কার্য্যকারকগণের ইচ্ছা নহে, সেই অঘটন কার্য্য ঘটাইতে গেলেই এইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। এজিদের পতন, রাজ্য হইতে বিচ্যুতি এবং আত্মজীবন বিনাশ, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই! অবিবেচক, অপরিপক্ক-মস্তিষ্ক, উদ্ধত যুবকদিগের কার্য্যফল এইরূপই হইয়া থাকে।”

এইরূপ কহিয়া নব-ভূপতির মঙ্গল কামনা করিয়া নতশিরে অভিবাদন করিয়া মন্ত্রিপ্রবর হামান উপবেশন করিলেন, রাজকার্য্যের সমুদয় ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। নবীন মহারাজ আত্মীয়-স্বজন-পরিবারসহ পবিত্র ভূমি মদিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মদিনাবাসীরাও মহানন্দে নবীন মহারাজের সহিত মদিনা যাইতে উদ্যোগী হইলেন।

বিজয়ী বীরগণ সহ, সৈন্যসামন্ত সহ, আত্মীয়-স্বজন-পরিবার-পরিজনগণ সহ বিজয়-পতাকা উড়াইয়া বিজয়-ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে নবীন ভূপতি দামেস্ক হইতে মদিনার পথে বহির্গত হইলেন! গাজী রহমানের আদেশে এই শুভ-সংবাদ লইয়া বহুসংখ্যক দূত অশ্বপৃষ্ঠে মদিনাভিমুখে ছুটিলেন। দামেস্ক-বিজয়, এজিদের পরাজয়—পলায়ন, মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধ বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই মদিনাবাসিগণ লোক পরম্পরায় শুনিয়া মহা-আনন্দিত হইয়া উৎসুক-চিত্তে রাজকীয় সংবাদ আশায় দিবারাত্র অপেক্ষা করিতেছিলেন। সময়ে দামেস্ক হইতে প্রেরিত কাসেদগণের মুখ হইতে এই শুভ-সংবাদ পাইয়া মদিনাবাসিগন হজরত মোহাম্মদের রওজায় যাইয়া নবীন ভূপতি জয়নাল আবেদীনের মঙ্গল-কামনা প্রার্থনা করিলেন এবং নব-ভূপতিকে সাদরে গ্রহণের জন্য সমুচিত আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। নব-ভূপতির আগমনদর্শন—দর্শনাশা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্বিতীয় দল কাসেদ একদিন উপনীত হইয়া ঘোষণা করিল,—“জয় জয়নাল আবেদীন! জয় এমাম বংশের শেষ রাজদণ্ডধর! আজ মদিনা-প্রান্তর পর্য্যন্ত,—ঐ প্রান্তরেই সসৈন্যে নিশাযাপন!—আগামী কল্য প্রত্যূষে নগরে প্রবেশ!—প্রথম হজরতের রওজা জেয়ারত, পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ!”

ঘোষণা প্রচারমাত্র মদিনা নব-সাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। নব-ভূপতিকে পরিজনসহ, বিজয়ী বীরবৃন্দসহ গ্রহণ করিতে মদিনা স্বর্গীয় সাজে সজ্জিত হইল, উচ্চ উচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর উচ্চ মঞ্চে অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারকাখচিত লোহিত নিশানসকল উড়িতে লাগিল। এতকাল পর্য্যন্ত যে যে স্থানে নীলবর্ণ নিশান উড়িয়া হাসান-হোসেনের শোক জ্ঞাপন করিতেছিল, আজ সেই সেই স্থানে লোহিত, পীত এবং মন-নয়ন মুগ্ধকর নানা রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতাকাসকল বায়ুর সহিত মিশিয়া মিশিয়া খেলা করিতে লাগিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহরাজি নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জে সজ্জিত, পুষ্পহারে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করিল। গৃহসকলের প্রতি গবাক্ষ সুরঞ্জিত আবরণ-বস্ত্রে আবৃত—পুষ্পহারে সজ্জিত হইয়া অমরাপুরী সদৃশ পরিশোভিত হইতে লাগিল। যাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন এজিদ-বধ কৃতসঙ্কল্পে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মোহাম্মদ হানিফার সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার-পরিজন মনের আনন্দে কেহ বসন ভূষণে সজ্জিতা, কেহ মহাহর্ষে বস্ত্রালঙ্কার সাজসজ্জার বিষয় ভুলিয়া যেরূপে ছিলেন, সেই প্রকারে আনন্দিত মনে পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমাল্যসকল সম্মুখে করিয়া গবাক্ষদ্বারে, কেহ গৃহ-প্রবেশের সোপানশ্রেণীতে দণ্ডায়মান রহিলেন। পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন মদিনা সজীব ভাব ধারণ করিল। চতুর্দ্দিকে আনন্দ-কোলাহল। রাজপথে, রাজসংশ্রবী গৃহ-সোপানোপরি অধিবাসিগণের গৃহদ্বারে দলে দলে নগরবাসিগণের সুরঞ্জিত ও সজ্জিত বেশে সমাগম, আনন্দ-কোলা-হলে নগর পরিপূর্ণ;—ঐ আসিতেছে, ঐ ডঙ্কাধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, ঐ ভেরীরব ভীষণ রবে প্রান্তর কাঁপাইতেছে। বিগত নিশায় অনেক চক্ষুই নিদ্রার আকর্ষণ হইতে বঞ্চিত ছিল। মনের আনন্দে, মনের উত্তেজনায় বহু চেষ্টাতেও নিদ্রাদেবীর সহিত অনেকেরই সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই, কেহ কেহ প্রভাত সময়ে শরীরের ক্লান্তি-শ্রান্তি হেতু অবসাদে উপবেশন-স্থানেই শয়নশয্যাবিহীন উপাধানবিহীন উপবেশন-স্থানেই অর্দ্ধশায়িতভাবে শুইয়া পড়িয়াছেন। সুনিদ্রার আকর্ষণ হইলে আর কি বিলম্ব সয়?—না সুখ-শয্যার অপেক্ষা থাকে? যেখানে চক্ষের পাতা ভারী, সেখানেই নিদ্রা,—

অমনি অচেতন। তাহার পর জনকোলাহলে হঠাৎ জাগিয়া কি করিবেন, কি শুনিবেন, কোথায় যাইবেন, কি অপকর্ম্ম করিয়াছি, ক্ষণস্থায়ী অনুতাপ সহ্য করিয়া চতুর্দ্দিক চাহিয়া গত কথাসকল ক্রমে স্মরণপথে আনিয়া তাঁহারা মহাব্যস্তে মনোমত স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন।—একদৃষ্টে রাজপথ-পরিশোভা, সজ্জিত গৃহশ্রেণীর নয়নরঞ্জন মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে নিদ্রাবশের অলসতা দূর করিলেন।

নগরবাসিগণ নব-সাজে সজ্জিত হইয়া দলে দলে নগরের প্রান্তসীমা—সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া বিজয়ী আত্মীয়-স্বজনকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিতে উৎসুক-নয়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সময় হইল। প্রথম পদাতিকশ্রেণী বিজয় নিশানসহ দেখা দিল,—তৎ-পশ্চাৎ শস্ত্রধারী যোদ্ধাসকল শ্রেণীবদ্ধরূপে সিংহদ্বার পার হইল। তৎপরে উষ্ট্রোপরি নকীবদল বাঁশরী বাজাইয়া নব-ভূপতির জয় ঘোষণার সহিত আগমন ঘোষণা অতি সুমিষ্ট সুরে নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে জানাইয়া দিল। তৎপরে নানারূপ বস্ত্রাভরণে সজ্জিত বীরকেশরীগণ অলঙ্কৃত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া হাসি হাসি মুখে নগরে প্রবেশ করিলেন।—তৎপরে রাজ-আত্মীয় মহা মহা বীরবৃন্দ রত্নখচিত জরির সাজে সজ্জিত হইয়া বৃহদাকার সজ্জিত অশ্বে আরোহণ ও ভীমকায় রক্ষিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার পর সুবর্ণ ও রজতদণ্ডে স্থাপিত কারুকার্য্যখচিত অর্দ্ধচন্দ্র ও পূর্ণতারকা-সংযুক্ত বহুসংখ্যক নিশানধারী অশ্বারোহীদল পশ্চাতে—সুবর্ণদণ্ডে স্থাপিত কারুকার্য্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শিক্ষিত উষ্ট্রোপরি স্থাপিত হইয়া আতপতাপ নিবারণ করিতেছে এবং ঐ চন্দ্রাতপ নিম্নে মক্কা-মদিনার রাজা, মুসলমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মজগতের সর্ব্বপ্রধান ভূপতি, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার বংশধর মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ জয়নাল আবেদীন, নিষ্কোষিত অস্ত্রে সজ্জিত, সহস্র অশ্বারোহী-রক্ষা-পরিবেষ্টিত হইয়া বীরসাজে অশ্বারোহণে মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে সিংহদ্বার পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। অমনি দর্শকশ্রেণীমুখে—"জয়নাল আবেদীনের জয়! মদিনার সিংহাসনের জয়! জয় নব ভূপতির জয়!" এইরূপ রব তুমুল আকারে

বারবার ঘোষিত হইতে লাগিল। পরিবার-পরিজনদিগের বস্ত্রাবৃত আম্বারী পৃষ্ঠে করিয়া উষ্ট্রসকল রক্ষিগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সতর্কে সাবধানে পরিলক্ষিত হইয়া মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরমধ্যে প্রবেশ করিল! জনস্রোতের সহিত আনন্দস্রোত প্রবাহিত—দেখিতে দেখিতে পবিত্র রওজার সম্মুখে সকলে উপস্থিত। অশ্বারোহী উষ্ট্রারোহী স্ব স্ব বাহন হইতে অবতরণ করিলেন। কাড়া—নাকাড়ার কার্য্যসকল ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইল, পতাকাসকল অবনতমুখী হইয়া পবিত্র রওজার মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

মহারাজ জয়নাল আবেদীন—যাত্রীদল, সঙ্গীদল ও আত্মীয়-স্বজনগণ সহ পবিত্র রওজা মোবারক সপ্তবার তওয়াফ (মান্যের সহিত অতিক্রম) করিয়া পূর্ব্ব সাজ সজ্জা ও বাদ্যবাজনার সহিত জয়নিশান উড়াইয়া রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরিবার-পরিজনেরা বহুদিনের পর—বহু যন্ত্রণা উপভোগের পর ঈশ্বরের নাম করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গাজী রহমান, ওমর আলী প্রভৃতি কিছুদিন নবীন মহারাজের পদসেবা করিয়া হরিষে বিষাদ মিশ্রিত মনোভাবে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। হরিষের বিষয়—জয়নাল আবেদীনের সপরিবারে বন্দীখানা হইতে উদ্ধার, রাজ্যলাভ। বিষাদের কারণ আর কি বলিব ?—মোহাম্মদ হানিফা চিরবন্দী!

সমাপ্ত

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—'বেণী প্রেস' হইতে শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ কর্ত্তৃক এবং ৮নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস হইতে আবদুল ওহাব সিদ্দিকী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ডি-লিট্, অনুসন্ধান-বিশারদ

প্রণীত

মূল্য তিন টাকা মাত্র

সুনামখ্যাত মরহুম মীর মোশাররফ হোসেন সাহেবের "বিষাদ-সিন্ধুর" পরিচয় বাংলা সাহিত্যামোদী সম্প্রদায়ের কাছে আর নূতন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহা বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক মহামূল্য সঞ্চয়। কিন্তু ভাষা এবং ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও এই অমূল্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক সমাবেশ নির্ভুল নহে। গ্রন্থখানির এই ঐতিহাসিক ভিত্তি যদি নির্ভুল হয়, তবে ইহা প্রকৃত পক্ষেই একখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে সমাজের সর্ব্বস্তরে আরও বিপুলভাবে সমাদর লাভ করিতে পারে,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই "বিষাদ-সিন্ধুর পরিশিষ্ট" নামে স্বতন্ত্র একটা গ্রন্থ বাহির হইল। সম্প্রতি প্রবীণ সাহিত্যিক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব এই নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে "বিষাদ-সিন্ধুর" মর্য্যাদা আরও অনেকখানি বর্দ্ধন করিয়াছেন। বিষাদ-সিন্ধুর পাঠকবর্গের জন্য ইহা বাস্তবিকই পরম লোভনীয়। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সাহেব তাঁর চিন্তাশীল লেখনীমুখে যে অভিনব তথ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন,—উহা ইতিহাস হইলেও উপন্যাসের মতই উপভোগ্য!

কারবালার সেই ভয়াবহ ও আত্মঘাতী যুদ্ধের জন্য প্রকৃত পক্ষে 'কে দায়ী'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া লেখক প্রথমেই বলিতেছেন ঃ

"কাহিনীর দেশ ইরাণ (ফারেস্তান্)। সে দেশের সাহিত্যিকরা 'জংনামা' 'মোক্তল-হোসেন' প্রভৃতি সত্য-মিথ্যায় রঞ্জিত কাহিনীর কেতাবগুলি প্রচার করিয়াছিলেন কেন, সে কার্য্যে তাঁহাদের সার্থকতাই বা কি ছিল, ঐ সকল কাহিনীর কেতাবগুলির লেখকরাই বা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত মোসলমান ছিলেন,—সে কথাগুলির আলোচনাও আমাদিগকে করিতে হইবে।

পাঠক-পাঠিকারা অবগত আছেন যে, ইরাণ (ফারেস্তান্) তুরাণ, মাদায়েন প্রভৃতি পারস্যের প্রায় সর্ব্বত্রই সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মোসলমানরা বাস করেন এবং তাঁহারা মনে করেন—সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মোসলমানদিগের সম্বন্ধ সাধারণতঃ মক্কা, মদীনা, বয়তুল্ মোকাদ্দস্ প্রভৃতি স্থানের সুন্নি মোসলমানদিগের সহিত, আর শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মোসলমান-দিগের সম্বন্ধ, সাধারণতঃ এরাক, কুফা, কারবালা, মেশের প্রভৃতি স্থানের শিয়া মোসলমানদিগের সহিত।

যে-সময় কারবালার সেই দুর্নীতিপূর্ণ অত্যাচারমূলক তুলনাবিহীন যুদ্ধাভিনয়ে হজরত হোসেন প্রায় সবংশে লাঞ্ছিত ও নিহত হইয়াছিলেন, সে সময় এজিদ-পক্ষে যাহারা সেনা ও সেনাপতিরূপে কারবালার সমরাভিনয় করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ছিল এরাক-কুফার অধিবাসী। তাহার পরিচয় দিত আমরা হজরত আলী, হজরত হোসায়ান ও হজরত হাসানের ভক্ত শিয়া।"

অতএব লেখকের বর্ণনামতে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিষাদ-সিন্ধুর বর্ণিত ঘটনার উপর সম্প্রদায়গত কলহের ছাপ বিদ্যমান রহিয়াছে। মরহুম মীর মোশার্‌রফ হোসেন সাহেবের "বিষাদ-সিন্ধু"—প্রধাণতঃ "জংনামা" বা "মোক্তল হোসায়ন" শ্রেণীর গ্রন্থাবলী অবলম্বনে রচিত।

তাই ডাঃ সাহেবের এই পরিশিষ্ট—বিষাদ-সিন্ধুর জন্য অপরিহার্য্য ছিল বলিতে হইবে। যে কোন গ্রন্থই তার মুল ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইলে যে, তাহার সৌন্দর্য্য আরও কতগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে—"বিষাদ-সিন্ধুর পরিশিষ্ট" উহারই এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।